ধর্ম্মপ্রচারক।

প্রথম বর্ষ ১৩২৬ সাল।

প্রবন্ধ সূচী।

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

১ম ভাগ] বৈশাখ, সন ১৩২৬। ইং, এপ্রেল, ১৯১৯। [১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণম্।

যঃ সচ্চিদানন্দময়োঽদ্বিতীয়ো
বিবর্জ্জিতঃ কার্য্যনিমিত্তভেদৈঃ।
স কোঽপি দেবো নিজবোধরূপঃ
প্রণম্যতে ভক্তিনতেন মূর্দ্ধ্না॥
যঃ সচ্চিদেকেতি বিঘোষিতোঽপি
হ্যানন্দরূপো ভুবনে বিভাতি।
গুণৈর্বিহীনোঽপি গুণী সদাস্তে
সমীড্যতেঽস্মিন্ ভগবান্ স কোঽপি॥
বিষ্ণুশ্চিতা যস্য সতা শিবঃ সন্
স্বতেজসার্কঃ স্বধিয়া গণেশঃ।
দেবী স্বশক্ত্যা কুশলং বিধত্তে
কস্মৈচিদস্মৈ প্রণতিঃ সদাস্তাম্॥

সনাতন ধর্ম্ম।

[স্বামী দয়ানন্দ।]

ধর্ম্ম শব্দ ধৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায় ইহার অর্থ—"ধরতীতি ধর্ম্মঃ"—অথবা "যেনৈতদ্ধার্য্যতে স ধর্ম্মঃ"—অর্থাৎ যে ধারণ করে অথবা যাহার দ্বারা এই বিশ্ব-সংসার ধৃত (রক্ষিত) হয় তাহাই ধর্ম্ম—এইরূপ সিদ্ধ হয়। ভগবান্ বেদব্যাসও ধর্ম্মের এইরূপই লক্ষণ করিয়াছেন—

ধারণাদ্ধর্ম্ম মিত্যাহু র্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে; ধর্ম্ম জীবগণকে ধারণ করে; যাহা ধারণ-সংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তিনি আরও বলিয়াছেন—

যা বিভর্ত্তি জগৎসর্ব্ব মীশ্বরেচ্ছা হ্যলৌকিকী।
সৈব ধর্ম্মো হি সুভগে! নেহ কশ্চন সংশয়ঃ॥

ঈশ্বরের যে অলৌকিকী ইচ্ছা-শক্তি সমস্ত জগৎকে ভরণ, পোষণ অথবা রক্ষা করে তাহারই নাম ধর্ম্ম। যে শক্তি পৃথিবীর ভিতরে ব্যাপ্ত থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালন করে, পৃথিবীর কাঠিন্য, পৃথিবীর গুরুত্ব, এক কথায় পৃথিবীর পৃথিবীত্ব বিধান করে; যে শক্তি জলের মধ্যে থাকিয়া জলের জলত্ব, জলের তরলতা সম্পাদন করে; যে শক্তি তেজের ভিতরে বর্ত্তমান থাকিয়া তেজের উষ্ণত্ব, তেজের তেজস্ব রক্ষা করে; যে শক্তির অভাব হইলে পৃথিবী, জল বা তেজোরূপে পরিণত হইয়া যাইত অথবা তেজঃ কাঠিন্য গুরুত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া যাইতে পারিত; আজ যাহা পৃথিবীরূপে আছে কাল তাহা আকাশ-রূপে প্রতীয়মান হইতে পারিত অথবা আকাশ পৃথিবীর ন্যায় স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইত; যে শক্তি এই পঞ্চভূতকে এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও গ্রহনক্ষত্রাদি সমস্ত পাঞ্চ-ভৌতিক পদার্থকে নিজ নিজ স্বরূপে স্থিত রাখে—পরস্পরকে মিলিয়া মিশিয়া সাঙ্কর্য্যে পরিণত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইতে দেয় না—সেই শক্তির নাম ধর্ম্ম। যে শক্তির বলে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে আবর্ত্তিত হইয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দিবারাত্রির সৃষ্টি করে, যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রতি বৎসর পৃথি-

বীতে নিয়মিত সময়ে ষড়ঋতুর বিকাশ হয়, যে শক্তির বলে শীতপ্রধান দেশের পশু পক্ষী তদুপযুক্ত শারীরিক উপাদান প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে; যে শক্তির প্রভাবে সাহারার মরুভূমির মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক সেই অত্যুৎকট গ্রীষ্ম সহ্য করিবার মত শরীরের উপাদান প্রাপ্ত হয়—তাহাই ধর্ম্ম। যে শক্তির বলে শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ বা পঞ্চভূতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া শরীর রক্ষিত হয়, এক ক্ষণের জন্য যে শক্তির অভাব হইলে শরীর পঞ্চভূতে মিলাইয়া যায় অথবা তেজের দ্বারা জল শুষ্ক হইয়া কিম্বা জলের দ্বারা তেজঃ নষ্ট হইয়া শরীরে মহাবিপর্যায় উপস্থিত হয়; যে শক্তি কাষ্ঠের কাষ্ঠত্বকে রক্ষা করে, কাষ্ঠের উপাদান পরমাণুসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণের সামঞ্জস্য বিধান করে, যে সামঞ্জস্য-শক্তির অভাব হইলে, আকর্ষণের আধিক্য হইয়া কাষ্ঠের পরমাণুসমূহ পরস্পর পরস্পরকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত হইতে হইতে কিম্ভূতকিমাকার-রূপ ধারণ করিতে পারে অথবা বিকর্ষণ-শক্তির প্রাবল্যে পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া তুলার ন্যায় অতি বৃহৎ আকার ধারণ করিতে পারে কিম্বা তেজঃ বা বায়ু হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে; যে শক্তি কাষ্ঠকে, তন্মধ্যস্থিত পরমাণুপুঞ্জের সঙ্কোচনের দ্বারা ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে দেয় না অথবা বিশ্লিষ্ট হইয়া তেজঃ বা বায়ুর সঙ্গে মিলিয়া যাইতে দেয় না; এক কথায় যে শক্তি এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা-বিধান করিয়া জাগতিক সমস্ত বস্তুকে নিজ নিজ অবস্থায় অবস্থিত রাখে—তাহারই নাম ধর্ম্ম।

সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—এক জড়, অপর চেতন। যে অসাধারণ ধরাধারিকা শক্তির প্রভাবে অনাদি কাল হইতে এই উভয় পদার্থ নিজ নিজ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে তাহাই ধর্ম্ম।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, প্রত্যেক অনুপরমাণুর ভিতরে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ (Attraction and Repulsion) নামক দুই শক্তি আছে। এই শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্যের বলেই এই অনন্ত শূন্যমার্গে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে, কখনও কেহ কক্ষচ্যুত হইয়া অপর গ্রহাদির সহিত সঙ্ঘর্ষণ প্রাপ্ত হয় না; জলময় চন্দ্রলোক তেজোময় সূর্য্যালোকের গর্ভের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় না অথবা বড় গ্রহ, ছোট গ্রহকে নিজের গর্ভে টানিয়া আনিয়া ধ্বংস

করে না। যে ঐশ্বরীয় শক্তি আকর্ষণ বিকর্ষণের এই সামঞ্জস্য (Balance) বিধান করিয়া সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে রক্ষা করে—তাহাই ধর্ম্ম।

প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে ধর্ম্মের এইরূপ অপূর্ব্ব লীলা অবলোকন করিয়া হৃদয়বান ব্যক্তি চমকিত হন। এই বিরাট প্রকৃতির গর্ভে কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুশোভিত রহিয়াছে তাহার সংখ্যা করা সম্ভবপর নহে। মহানারায়ণোপনিষদে বর্ণিত আছে যে—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি জ্বলন্তি।

এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে। এক একটী সৌরজগৎ এক একটী ব্রহ্মাণ্ড। সৌরজগতে সূর্য্যই কেন্দ্র এবং একমাত্র জ্যোতিষ্মান্। সমস্ত গ্রহগণ সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করে। বুধগ্রহ সূর্য্যের অতি নিকটে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর শুক্রের পথ, তারপর পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনৈশ্চর, ইয়ুরেনস্, নেপ্‌চুন প্রভৃতি অনেক গ্রহ অপেক্ষাকৃত দূরে দূরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। উপগ্রহ, গ্রহের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ, সে প্রায় ২৮ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্রের মত মঙ্গলের চন্দ্র দুইটী। তাহারা মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতির পারিপার্শ্বিক চন্দ্র চারিটী, শনির আটটী, ইয়ুরেনসের চারিটী এবং নেপচুনের একটী। যে কয়েকটী গ্রহের নাম করা হইল সৌরপরিবারে তাহারাই প্রধান। মঙ্গলের কক্ষা হইতে বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যস্থিত দূরত্ব প্রায় ৩৩৮০০০০০০ তেত্রিশ কোটি আশি লক্ষ মাইল। সৌরজগতের এই ভাগটী ২৪০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের বিহার স্থান। ইহারা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেকেই গ্রহ এবং প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপে আমাদের সৌরপরিবারে সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০০ তিন শত গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপগ্রহ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে এবং গ্রহগণ উপগ্রহদের সঙ্গে লইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে—এই হইল একটী সৌরজগৎ বা একটী ব্রহ্মাণ্ড। সৌরজগতের গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর আয়তনে অতি বৃহৎ পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা বৃহস্পতি (১৩০০) তের শত গুণ এবং শনৈশ্চর (৭২১) সাত শত একুশ গুণ বড়। সূর্য্যের আয়তন সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ ও

উপগ্রহগণের সমষ্টিভূত আয়তন অপেক্ষা (৬০০) ছয় শত গুণ বৃহৎ। গ্রহ ও উপগ্রহের গতির তুলনায় সূর্য্যকে স্থিররূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যেরও নিশ্চলতা নাই। তিনি এই (৩০০) তিনশত গ্রহ উপগ্রহ সম্বলিত বিরাট সৌরপরিবারকে সঙ্গে করিয়া ধ্রুব নামক মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিবার জন্য বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। ধ্রুবের চারিদিকে এই সৌরজগতের মত কত শত সৌরজগৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। আবার এই ধ্রুবও নিশ্চল নহে; অনাদি অনন্ত প্রকৃতির চাঞ্চল্যই যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ, তখন সৃষ্টি ও স্থিতি-দশায় প্রকৃতিগর্ভস্থিত কোন পদার্থই নিশ্চল হইতে পারে না। কেবল প্রকৃতিরাজ্যের বহির্ব্বিরাজমান পরব্রহ্মেই চিরনিশ্চলতা বিরাজিত। এই জন্যই শ্রুতি বলেন,—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

প্রকৃতির অতীত অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম নিশ্চল বৃক্ষের ন্যায় অবস্থান করেন। সুতরাং প্রাকৃত-বস্তুর চঞ্চলতা স্বাভাবিক। অতএব উপযুক্ত বিজ্ঞানানুসারে ধ্রুব নামক মহাসূর্য্য এই সৌরজগতের মত আরও অনেক সৌরজগতকে সঙ্গে করিয়া অপর কোন মহামহাসূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এবম্বিধ অসঙ্খ্য সৌর-জগত পরিবেষ্টিত সেই মহামহাসূর্য্যও তদপেক্ষা মহত্তর কোন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ততা, বিবিধ বিলাসকলার সহিত নয়নাভিরাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। কিন্তু এই বিশ্ব যতই বিরাট হউক, যতই অনন্ত হউক, সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে শৃঙ্খলা বিদ্যমান্। যে গ্রহ বা যে উপগ্রহ, সূর্য্য অথবা অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ হইতে যত দূরে থাকিলে আকর্ষণ বিকর্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, সেই গ্রহ বা উপগ্রহ তত দূরে থাকিয়াই আপন আপন কক্ষায় পরিভ্রমণ করে। যদি এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণের কিঞ্চিন্মাত্রও অল্পতা বা আধিক্য হয়, তবে এই গ্রহ উপগ্রহগুলি আপন আপন কক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে অপর ব্রহ্মাণ্ডে যাইয়া অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের সহিত সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া এক মহাপ্রলয় উপস্থিত করিবে। যে শক্তি আকর্ষণ বিকর্ষণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এইরূপ মহাধ্বংসের কবল হইতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করে তাহাই ধর্ম্ম।

জড়-জগতে যেমন ধর্ম্মের অপরিসীম ধারিণীশক্তি স্পষ্ট দেখা গেল, চেতন

জগতেও ধর্ম্মের ঠিক সেইরূপ প্রভাবই উপলব্ধি হয়। মনুষ্য চেতন, পশুও চেতন, বৃক্ষাদিও চেতন। অথচ মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষে কত ভেদ! যে শক্তি জীব-নিবহের এইরূপ পরস্পর ভেদের সামঞ্জস্য রক্ষা করে, যে শক্তির অভাব হইলে ক্ষণকালের মধ্যে মনুষ্য স্থাবরের ন্যায় জড়বৎ হইয়া যাইত এবং পশু বা বৃক্ষ মনুষ্যের মত বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হইয়া যাইতে পারিত এবং যে শক্তি মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, বৃক্ষত্ব প্রভৃতিকে পরস্পরের সাঙ্কর্য্য হইতে রক্ষা করে, সেই সামঞ্জস্য-বিধায়িনী ধারিণীশক্তির নামই ধর্ম্ম।

ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) বিধি অনুসারে জীবভাবের বিকাশ উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ পশ্বাদিক্রমে মনুষ্যে আসিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জীবে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পাঁচকোষ বা পাঁচ বিভাগ বিদ্যমান। জীবের স্থূলশরীর অন্নময়কোষ বা প্রথম বিভাগ; প্রাণাপানাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুসঞ্চালক শক্তিগুলি প্রাণময় কোষ বা দ্বিতীয় বিভাগ; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন মনোময়কোষ বা তৃতীয় বিভাগ; জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষ বা চতুর্থ বিভাগ এবং প্রিয়-মোদ-প্রমোদ বৃত্তিত্রয়যুক্ত অন্তঃকরণেরই অজ্ঞানাত্মক এক অবস্থা বিশেষ, যাহা সুষুপ্তিকালে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই আনন্দময়কোষ বা পঞ্চম বিভাগ। এই কোষসমূহের বিকাশের তারতম্যের ফলেই বৃক্ষে এবং মনুষ্যে এত পার্থক্য। উদ্ভিদে কেবল অন্নময়কোষের বিকাশ হওয়ায় এরূপ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে—শাখামাত্র রোপণ করিলে ঐ শাখা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া যায়; ইহা উদ্ভিদস্থিত ধর্ম্মশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশেরই ফল। স্বেদজে অন্নময় এবং প্রাণময়কোষের বিকাশ; প্রাণময়কোষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বেদজ কীটা-দিতে অনেক প্রকার প্রাণক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রোগের কীট-দ্বারা শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন হওয়া, দেশে মহামারী বিস্তার এবং রক্তের শুক্ল কীটদ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি। অণ্ডজে অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় কোষের বিকাশ; মনোময় কোষের বিকাশ হওয়ায় সাধারণ পক্ষীতে শাবকের প্রতি স্নেহ এবং কপোত, চক্রবাক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পক্ষীর দাম্পত্য-প্রেমাদি মনোবৃত্তি স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে। জরায়ুজ পশ্বাদিতে বিজ্ঞান-ময় কোষেরও বিকাশ হওয়ায় অশ্ব, হস্তী ও শ্বা প্রভৃতির মধ্যে প্রভুভক্তি

ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যে পাঁচ কোষেরই বিকাশ ; আনন্দময়কোষের বিকাশ হওয়ায় মানুষ হাসিয়া নিজের মনোগত আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে, অন্যান্য জীবে আনন্দময় কোষ থাকা সত্ত্বেও বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহারা হাসিতে পারে না। জীব, কোষের বিকাশ অনুসারে উদ্ভিদ হইতে স্বেদজে, স্বেদজ হইতে অণ্ডজে, অণ্ডজ হইতে জরায়ুজ প্রভৃতে এবং পশ্বাদি হইতে মনুষ্যে উন্নীত হয়। মানুষে আসিয়াও ক্রমশঃ অসভ্য হইতে অনার্য্যে, অনার্য্য হইতে আর্য্য শূদ্রে, শূদ্র হইতে বৈশ্যে, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়ে, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও আবার মূর্খ, জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ হইতে কর্ম্মীতে, কর্ম্মী হইতে বিদ্বানে, বিদ্বান্ হইতে তত্ত্বজ্ঞে, তত্ত্বজ্ঞ হইতে আত্মজ্ঞে আসিয়া কোষসমূহ বিকাশের পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীব মুক্ত হয়। জীবের এই ক্রমোর্দ্ধ-গতি বা জীবভাবের ক্রমবিকাশ ধর্ম্মেরই কার্য্য। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, যে শক্তি জীবকে জড় হইতে পৃথক করিয়া রাখে এবং প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র সত্তাকে রক্ষা করে এবং যে শক্তি বৃক্ষাদি স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া জীবকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়া অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়, সেই অদ্বিতীয় ব্যাপক-শক্তিরই নাম ধর্ম্ম। এই জন্যই বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন,—

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ।

যদ্দ্বারা ইহ-পারলৌকিক উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম।

এক্ষণে ধর্ম্মের অঙ্গ ও উপাঙ্গের বর্ণন করা হইতেছে। ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তিনটী—যজ্ঞ, দান ও তপ। গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন যে—

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।

দানধর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত—

(১) অভয়দান (দীক্ষাদানও ইহার অন্তর্ভুক্ত)।

(২) বিদ্যাদান।

(৩) অর্থদান (যাহাতে ধন, অন্ন, ভূমি প্রভৃতিও সম্মিলিত)।

দানের এই তিন অঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোভেদে তিন তিন ভাগে বিভক্ত। এইরূপে দানধর্ম্মের নয় প্রকার ভেদ হইবে।

শারীরিক, বাচনিক এবং মানসিক শক্তিসমূহকে সংযত করিয়া দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করার নাম তপ। ইহারও তিন ভেদ। যথা—

(১) শারীরিক তপ।

(২) বাচনিক তপ।

(৩) মানসিক তপ।

তপের এই তিন অঙ্গ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ অনুসারে তিন তিন ভাগে বিভক্ত। এইরূপে তপের নয় প্রকার ভেদ হইবে।

যজ্ঞধর্ম্মের অঙ্গ অনেক। ইহার প্রধান ভেদ তিনটী। যথা—

(১) কর্ম্মযজ্ঞ।

(২) উপাসনা যজ্ঞ।

(৩) জ্ঞানযজ্ঞ।

এই তিন অঙ্গের প্রত্যেকের ভেদ নিম্নলিখিতরূপ।

কর্ম্মযজ্ঞের প্রধানতঃ ছয় ভেদ।

(১) নিত্যকর্ম্ম— যথা, সন্ধ্যাবন্দনাদি।

(২) নৈমিত্তিক কর্ম্ম—যথা, তীর্থযাত্রাদি।

(৩) কাম্যকর্ম্ম—যথা, পুত্রেষ্টিযাগাদি।

(৪) আধ্যাত্মিক কর্ম্ম—যথা, দেশোপকার কর্ম্মাদি।

(৫) আধিদৈবিক কর্ম্ম—যথা, বাস্তুযাগাদি।

(৬) আধিভৌতিক কর্ম্ম—যথা, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি।

কর্ম্মের এই ছয় অঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ অনুসারে আবার তিন তিন ভাগে বিভক্ত। এইরূপে কর্ম্মের অষ্টাদশ ভেদ সাধিত হইল।

উপাসনাযজ্ঞের ভেদ অনেক, এই অঙ্গ অতি বিস্তৃত। ইহার মুখ্যতঃ ভেদ নিম্নলিখিতরূপ।

উপাসনার পদ্ধতি অনুসারে—পাঁচ ভেদ।

(১) ব্রহ্মোপাসনা।

(২) সগুণোপাসনা (পঞ্চোপাসনা)।

(৩) লীলাবিগ্রহোপাসনা (অবতারোপাসনা)।

(৪) ঋষি, দেবতা এবং পিতৃগণের উপাসনা।

(৫) ক্ষুদ্র দেবতা এবং প্রেতাদির উপাসনা।

সাধনার পদ্ধতি অনুসারে—চারি ভেদ।

(১) মন্ত্রযোগবিধি (ইহার স্থূলমূর্ত্তিময় ধ্যান)।

(২) হঠযোগবিধি (ইহার জ্যোতির্ধ্যান)।

(৩) লয়যোগবিধি (ইহার বিন্দুধ্যান)।

(৪) রাজযোগবিধি (ইহার ব্রহ্মধ্যান)।

উপাসনাযজ্ঞের এই নয় অঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ ভেদে তিন তিন ভাগে বিভক্ত। এইরূপে উপাসনাযজ্ঞের সপ্তবিংশতি ভেদ প্রদর্শিত হইল।

জ্ঞানযজ্ঞের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন অঙ্গ। যথা—

(১) শ্রবণ (শাস্ত্র এবং গুরুমুখ হইতে)।

(২) মনন (জ্ঞানভাবের)।

(৩) নিদিধ্যাসন (জ্ঞানভাবের)।

জ্ঞানযজ্ঞের এই তিন অঙ্গকে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ অনুসারে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; সুতরাং জ্ঞানযজ্ঞেরও নয়টী ভেদ।

উপরিলিখিত হিসাবে ধর্ম্মের প্রধানতঃ চব্বিশ অঙ্গ হইল। যথা—দানের ৩, তপের ৩, কর্ম্মের ৬, উপাসনার ৯ এবং জ্ঞানের ৩; অর্থাৎ ত্রিগুণভেদানুসারে এই সকলের ভেদ বাহাত্তর প্রকার। গুণ-ভাব ভেদানুসারে এই বাহাত্তরটি অঙ্গের অনন্ত উপাঙ্গ।

সনাতন ধর্ম্মের এই অঙ্গসমূহের মধ্যে কোন একটী অঙ্গেরও পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক রীতিতে সাধন করিলে মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। কারণ অগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গও সম্পূর্ণরূপে দাহকার্য্য করিতে সমর্থ। এই জন্য কেবল অহিংসা এবং জ্ঞানযজ্ঞাদি অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে মান্য হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান য়ুরোপ এবং আমেরিকা কেবল সত্যপ্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, গুণপূজা, জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এবং নিয়মপালন প্রভৃতি কয়েকটীমাত্র ধর্ম্মবৃত্তির সাধনদ্বারাই আজকাল জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। জাপানে এই সকল গুণ ব্যতীত বৃদ্ধসেবা, পিতৃপূজা, রাজভক্তি, ধৈর্য্য এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রভৃতি আরও কতিপয় ধর্ম্মবৃত্তির উন্নতি হওয়ায় উহা ক্ষুদ্র দেশ হইলেও য়ুরোপ ও আমেরিকার অধি-

বাসিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেছে। উপরে যে সকল ধর্ম্মবৃত্তির নাম করা হইল, সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গের সহিত মিলাইলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, উহা উক্ত অঙ্গসমূহের উপাঙ্গ মাত্র। যেমন সত্যপ্রিয়তা মানসিক তপের উপাঙ্গ এবং স্বার্থত্যাগ অবস্থাভেদে তপ ও দানের উপাঙ্গ। এই স্বার্থত্যাগ যদি স্বদেশ এবং স্বজাতির সহিত সমষ্টিসম্বন্ধযুক্ত হয়, তবে উহাই আবার মহাযজ্ঞের উপাঙ্গরূপে পরিণত হয়। এইরূপ পিতৃপূজা উপাসনাযজ্ঞের উপাঙ্গ এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম কর্ম্মযজ্ঞের উপাঙ্গ। এইরূপে এক ধর্ম্মাঙ্গের বহু উপাঙ্গ হইতে পারে। আবার এক ধর্ম্মবৃত্তি অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের উপাঙ্গ হইতে পারে; যেমন স্বার্থত্যাগ মানসিক বৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে তপের উপাঙ্গ হইবে এবং উহাই দাতার দ্বারা প্রকাশিত হইলে দান-ধর্ম্মের উপাঙ্গ হইবে। বিচারবান্ পুরুষ, সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গোপাঙ্গের বিস্তার সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অবগত হইতে পারেন যে, ইহার কোন না কোন অঙ্গোপাঙ্গের সহায়তার দ্বারাই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ধর্ম্মসাধনের সাহায্য পাইয়া থাকে। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি ধর্ম্মবৃত্তিসমূহ সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত সমাজের মনুষ্যকে সমানরূপে ধর্ম্মাধিকার প্রদান করে। অতএব সনাতনধর্ম্মের পিতৃভাব সম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কোনপ্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারে না।

সুবিশাল পৃথিবীতে আজকাল বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, ইহুদিধর্ম্ম, পারসীয়ধর্ম্ম প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বিশেষণযুক্ত ধর্ম্মনাম শুনা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের "ধর্ম্ম" নাম ভিন্ন অন্য কোন নাম নাই। কালের দুরতিক্রমণীয় প্রভাবে আজকাল ইহার হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, বৈদিকধর্ম্ম প্রভৃতি অনেক নূতন কল্পিত নাম শ্রুতিগোচর হইতেছে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের প্রধান আশ্রয় বেদ, উপবেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং তন্ত্র প্রভৃতি কোন শাস্ত্রে "ধর্ম্ম" ব্যতীত অপর কোন নাম পরিলক্ষিত হয় না। সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের ন্যায় সার্ব্বভৌমদৃষ্টি, উদারতা এবং শান্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলি-বিভূষিত এই ধর্ম্মের পক্ষে কেবল "ধর্ম্ম" শব্দই উপযোগী। বিশেষণ, বস্তুকে সীমাবদ্ধ করে। ধর্ম্মকে বৌদ্ধজৈনাদি শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিলে উহা তদ্ভিন্ন ধর্ম্মসমূহ

হইতে পৃথক্ একটী পরিভাবযুক্ত ধর্ম্মমত বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মের কোন প্রকার বিশেষণ প্রদান না করিয়া উহার নির্ব্বিশেষত্ব এবং অসীমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পৃথিবীতে অন্য যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ঐ সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাশয়গণ আপন ধর্ম্মমার্গকে কয়েকটী পরিমিত নিয়মের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ইহাও স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদের সেই সেই ধর্ম্মমার্গ ব্যতীত জীবগণের উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে এই নিয়মিত ধর্ম্মদ্বারাই হইবে। যখন এই সকল নবীন ধর্ম্মাচার্য্য নিজ নিজ ধর্ম্মমার্গকে বিশেষ বিশেষ নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, তখন সেই বিশেষত্ব প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ নামকরণও আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ, এইরূপ সঙ্কুচিত অথবা ইহার দৃষ্টি এইরূপ একদেশদর্শী নহে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ নিজ নিজ ধর্ম্মকে কয়েকটীমাত্র নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ সেই সকল ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারাই তাঁহাদের ধর্ম্ম নির্ণীত হয় এবং সেই সকল নিয়ম ব্যতীত অন্যান্য উৎকৃষ্ট বিষয়ের সহিতও তাঁহাদের ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সনাতন বৈদিক-ধর্ম্ম এরূপ নহে। কারণ এই ধর্ম্মবিজ্ঞান অনুসারে জগতের যাবতীয় পদার্থ এবং পান, ভোজন, ও শয়ন আদি আচারমূলক জীবসমূহের যাবন্মাত্র কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের সীমার ভিতরে আবদ্ধ। মনুষ্যের ইহলৌকিক অভ্যুদয়, ঐশ্বর্য্য ও সুখাদির উন্নতি এবং পারলৌকিক স্বর্গাদির প্রাপ্তি সমস্তই ধর্ম্মসাধনের অন্তর্গত এবং মোক্ষপদ লাভই অন্তিম লক্ষ্য। এইজন্য সনাতন ধর্ম্মের দৃষ্টি এত মহান্ ও উদার যে উহা কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করিতে পারে না! "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" নিজের ধর্ম্মে নিধনও ভাল, অন্যের ধর্ম্মগ্রহণ ভয়জনক; ইহা এই সিদ্ধান্তেরই ঘোষণা করিয়া থাকে। আপন ক্ষুদ্রবুদ্ধিপ্রযুক্ত অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই ধর্ম্মের নিন্দা করিলেও পিতা যেমন বালকের কটুবাক্যে রুষ্ট না হইয়া উপেক্ষাই করিয়া থাকেন, সেইরূপ বৈদিক সনাতন-ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের কটূক্তিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সর্ব্বদাই সকলের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মনির্ণয় এবং ধর্ম্মশব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ বিচার করিবার সময় ধার্ম্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই ধর্ম্মের এই

মূলভিত্তির উপর স্থির থাকা উচিত। ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মনির্ণয় করিবার সময় যদি এই বেদোক্ত ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ভুলিয়া না যান তাহা হইলে কখনও তাঁহারা বিচলিত, ক্লেশযুক্ত অথবা অবনত হইবেন না। প্রত্যুত সর্ব্বদাই উন্নত থাকিয়া আপনার এবং পৃথিবীর অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবেন। যেখানে নাম, সেইখানে অহঙ্কার; যেখানে বিশেষসংজ্ঞারূপ আখ্যা সেইখানে ভাববিশেষতা; যেখানে সংজ্ঞাভেদ সেই খানে ক্ষুদ্রত্ব মহত্ত্বের বিচার এবং সার্ব্বভৌমদৃষ্টির অভাব। এই জন্য সার্ব্বভৌমদৃষ্টিযুক্ত সনাতন আর্য্যধর্ম্মই কেবল "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। অন্যান্য সম্প্রদায় অথবা উপধর্ম্মের সহিত প্রভেদ প্রদর্শনার্থ এই ধর্ম্মমার্গের সনাতন-ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম, বৈদিক-ধর্ম্ম প্রভৃতি যতই কেন নাম রাখা হউক কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপক সমদর্শী অনাদি, অনন্ত, মহান্ এবং সর্ব্বজীবহিতকারী অপৌরুষেয় ধর্ম্মমার্গের কেবল "ধর্ম্মই" সংজ্ঞা হইতে পারে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্ বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

রামচন্দ্রের তত্ত্বজ্ঞান।

বশিষ্ঠের উক্তি :—

আধ্যাত্মিক আলোচনে মূর্খতা যখন ক্ষীণ।
বাসনা স্বজনসহ একেবারে হয় লীন।
আকাশ হইতে যবে অপসরে মেঘজাল।
ব্যোমের জড়তা যায়, শান্তাকাশ সুবিশাল।
মুকুতা হারের কেহ যদি করে সূত্র ছিন্ন।
খসে পড়ে মুক্তারাজি, হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন।
তেমনি চিত্তের যবে চিত্তনাম তিরোধান।
ভ্রান্তি-বিজড়িত এই বাসনার অবসান।

না বুঝে শাস্ত্রের সার, ভাবে যেবা বিপরীত।
মানসের মলিনতা নহে কভু তিরোহিত।
বরঞ্চ দূষিত এত কলঙ্কিত হয় মন।
পাপভারে ভারি হয়ে কৃমিকীটে জ্বালাতন।
সমীরণ শান্ত হ'লে সাগর প্রশান্ত হয়।
তেমনি অজ্ঞান নাশে, জ্ঞান যবে বিকাশয়।
যে আঁখি সুন্দর নব বিকশিত পদ্মসম।
তাহারও কটাক্ষ নহে জ্ঞানী চক্ষে মনোরম।
সে চাহনি দেখিয়াও রহে সে তো অবিকৃত।
অচল অটল জ্ঞানী, উপল সমান স্থিত।
হইলে বায়ুর রোধ, চঞ্চল কমল স্থির।
অম্বরে অম্বরে স্বন্, পবন বিরাজে ধীর।
ভাবাভাব বিরহিত, মম উপদেশ শুনি।
স্থিরত্ব পরমপদ লভিয়াছ রঘুমণি!
শুনিয়া পটহধ্বনি জাগে যথা নরপতি।
তেমনি বচন মম পশিয়া তোমার শ্রুতি।
অজ্ঞান স্বপন তব করিয়াছে বিদূরিত।
অন্তরেতে আত্মবোধ হইয়াছে জাগরিত।
কেন না হইবে হেন? সামান্য নরেরো হয়।
তুমি অসামান্য সাধু, হৃদি উদারতাময়।
তপন তাপেতে তপ্ত ভূমিতে পতিত নীর।
অমনি শুকায়ে যায়—তেমতি হে রঘুবীর!
উপদেশরাজি যাহা তোমারে করেছি দান।
গ্রহণ করেছ তুমি, করি সব অবধান।
অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে লাভ।
ধরেছ তাহার ফলে আজি এই সৌম্যভাব।
চিরগুরু তব কুলে অধিক কব কি আর?
রাখহ বচন মোর হৃদয়ে করিয়া হার।

রামচন্দ্রের উক্তি ঃ—

বলিলেন রামচন্দ্র, তব বাক্য মেঘমন্দ্র,
প্রভু! সব পশেছে শ্রবণে।
বুঝিয়াছি সমুদাই, "আমি" ভাব আর নাই,
চিন্ মাত্র আছে মম মনে।
অখিল জগৎজাল, এই বিশ্ব সুবিশাল,
আজি সব হেরি তিরোহিত।
সংসারের সমুদয়, জীবাজীব ভূতচয়,
চিন্মাত্র রহে বিরাজিত।
বজ্রবাধা বিঘ্ন পরে, যখন সলিল ঝরে,
ধরা'পরে হয় সুখোদয়।
গুরু তব বাক্য-সার, সুমিষ্ট সুধার ধার,
সিক্ত করি আমার হৃদয়।
পরমাত্মা সনাতন, ঋষি-সাধনের ধন,
তাহার পরম পদে নিয়া।
চপলতা করি লয়, করি চির অনাময়,
শান্তি সবে দিল ডুবাইয়া।
দ্বন্দ্ব মোহ দূরে গেল, অন্তর শীতল হ'ল,
সুস্থদেহ, শান্তি সর্ব্বদাই।
আছি সদা সুখময়, শুদ্ধ জল জলাশয়,
জ্বালা ক্ষোভ চপলতা নাই।
এই দিগঙ্গনাকুল, সুপ্রসন্ন অনুকূল,
কণামাত্র নীহার বিহীন।
বদনে প্রসাদ হেরি, বিপদ বুঝিতে পারি,
সমুদয় ব্রহ্মরূপে লীন।
সংশয় যা কিছু ছিল, সব তিরোহিত হ'ল,
জপময়ী মরীচি তা গত।
রাগ কি নীরাগ কিবা, আর বৃত্তি ছিল যেবা,

কিছু নাই, সব বিদূরিত।
নাহিক নীহার ধূলি, শান্ত সৌম্য বনস্থলী,
শান্ত প্রাণ আমারো তেমন।
যে সুখে হতেছি ভোর, তাহার নাহিক ওড়,
অসীম অনন্ত বলে মন।
সে সুখের করি স্বাদ, সুধাস্বাদে নাহি সাধ,
তৃণবৎ তুচ্ছ তার কাছে।
সদা আপনাতে রই, প্রকৃতিতে স্থিত হই,
মন আজি মুদিত হয়েছে।
আজি আমি লোকারাম, সত্য মোর রাম নাম,
আমি ব্রহ্ম, আনন্দ অপার।
তব প্রসঙ্গেই তাতঃ! এ সম্পদ সমাগত,
প্রভু তোমা শত নমস্কার।
হ'লে নিশা অবসান, হয় যথা তিরোধান,
ভূত-ভীতি শিশু হৃদি হ'তে।
সংশয় বিভ্রম যত, হ'ল আজি অপগত
মলিনতা নাহি কোনো মতে।
সর্ব্বতাপ বিদূরিত, হৃদি সিত বিস্ফারিত,
হিমবৎ হয়েছে শীতল।
শরতে সরসী যথা, প্রশান্ত মানস তথা,
কম্পহীন অচল অটল।
আত্মা স্বতঃ চিন্ময়, কেমনে কলঙ্ক হয়?
এ সংশয় হল অপগত।
বুঝিলাম আত্মাসার, সর্ব্বত্র বিরাজ তার,
সমভাবে সদা অবস্থিত।
ইহা অন্য, ইহা ভিন্ন, এ ভাব বিভ্রম জন্য,
ইহার অস্তিত্ব কিছু নাই।
তত্ত্ববোধ বুদ্ধ মতি, কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি,

প্রাণ মন উজলে সদাই।

ছিল প্রাণ তৃষাময়, তা যখন মনে হয়,

হাসি পায় মরিয়ে লজ্জায়।

এখন বুঝেছি সার, আমি ময় এ সংসার,

আমি রাজি ধরায় মজ্জায়।

তুমি জ্ঞান-পারাবার, তব বাক্য সুধাধার,

প্রাণ মোর সিক্ত সেই রসে।

অজ্ঞান রজনী ঘোর, এবার হয়েছে ভোর,

দিব্য-জ্ঞান-তপন বিকাশে।

বেদের বচন এই, সূর্য্য নেই চন্দ্র নেই,

তারা নেই, তবু সদা আলো।

বাক্য মন নাহি যায়, পুণ্য-পূত সর্ব্বদায়,

সেই দেশ করতলে এল।

সে প্রভু, তোমার দয়া, দাসে দিব্য জ্ঞান দিয়া,

লয়ে গেলে সেই দিব্য-দেশে।

সত্যই দেখিতে পাই, কোথায়ো তপন নাই,

স্বতঃই আলোক পরকাশে।

সুবিশাল এ সংসার, বিপুল বিস্তৃতি তার,

আয়তন .সাগর সমান।

নিত্য ভাবাভাবময়, মম সত্তা শুধু রয়,

আমিই তো নমস্য মহান্।

আমাকেই নমস্কার, আজি স্বীয় মহিমার,

চরমে হয়েছি সমাগত।

হৃদয় পদ্মের মাঝে, স্থির অলি যেন রাজে,

প্রভু, তব উপদেশ যত।

রয়েছি নশ্বর ভবে, তবু স্বীয় অনুভবে,

পরিষ্কার বুঝিবারে পাই।

হয়েছি জীবন্মুক্ত, শোকের সম্বন্ধ ত্যক্ত,

বিষাদের ভয় আর নাই।*

শ্রীকৈলাশ চন্দ্র সরকার।

বৈরাগ্যতত্ত্ব।

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি. এল।]

নানাবিধ ভোগসাধন সংসার হইতে মুক্তির প্রয়োজন কি? কেনই বা আমাদের মুক্তির জন্য এত কঠোর সাধনা করিতে হইবে? যতদিন আমরা এ সংসারকে সুখস্থান মনে করি, ততদিন আমাদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় না। যে পর্য্যন্ত এ সংসার দারুণ দুঃখময় বলিয়া বোধ না হয়, যতক্ষণ সংসারে প্রাপ্তব্য সুখকে ক্ষণিক দুঃখ-মিশ্রিত, অল্প, পরিচ্ছিন্ন ও হেয় বলিয়া আমাদের ধারণা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা জানিবার প্রয়োজন হয় না।

আমাদের এ সংসারে বারবার নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এ ধারণা যতক্ষণ আমাদের চিত্তে বদ্ধমূল না হয়, "জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখদোষানুদর্শন"-রূপ জ্ঞান দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মুক্তির প্রয়োজন বোধ হয় না এবং সংসারমুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্তিও হয় না। ততদিন পর্য্যন্ত যে পদ পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রযত্ন হয় না এবং সংসারাতীত পরম পদের অন্বেষণ বা প্রাপ্তির জন্য সাধনায় উপযুক্ত চেষ্টাও হয় না। যাঁহারা সংসারে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিবিধ দুঃখে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারাই সংসার মুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন।

যাঁহারা সংসার মুক্তি লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহারা কি উপায়ে সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে পারেন, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। গীতা অনুসারে

---

* যোগবাশিষ্ট রামায়ণের মূল শ্লোক হইতে পদ্যানুবাদ।

পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হয়; এবং এই গুণের সহিত তাহার সঙ্গ হয়। এই সঙ্গই আমাদের বন্ধন হেতু। ভগবান্ বলিয়াছেন, –

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ (২।৬২—৬৩)

এই সঙ্গহেতু সংসার ভোগ হয় ও সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়; এজন্য ইহার আর এক নাম ভব।

অতএব সংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে, এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হয়। যাহাতে এই ত্রিগুণের সহিত সঙ্গ দূর হয়, – যাহাতে এই ত্রিগুণের ভোক্তা হইতে না হয় তাহা করিতে হয়। ত্রিগুণাতীত হইতে হইলে, এই ত্রিগুণের সহিত বা সংসারের সহিত সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়। সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলে, এই ত্রিগুণজ ভাব রচিত সংসার আমাদের সম্বন্ধে তিরোহিত হইয়া যায়। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা এই সংসার অশ্বত্থকে * ছেদন করিতে হইবে। যে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সংসার-অশ্বত্থ ছেদন করা যায়, তাহাকে বৈরাগ্য বলে; তাহা আমাদের আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। পাতঞ্জলদর্শন হইতে জানা যায় যে এই বৈরাগ্য দ্বিবিধ—অপর ও পর। অপর বৈরাগ্য চারি প্রকার; যথা—যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা ও বশীকারসংজ্ঞা। ইহাদের মধ্যে বশীকার বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ। পাতঞ্জলে

* মায়োপাধিক ঈশ্বর-সংকল্প হইতে এ জগৎ সৃষ্ট বলিয়া ইহা ঈশকার্য্য। আর মনোবৃত্ত্যাত্মক জীব-সংকল্প হইতে এজগৎ জীবভোগ্য হয়। তাহা প্রিয় অপ্রিয় বা উপেক্ষ্য হয়। জীবসংকল্প হইতে যে জগৎ ভোগ্যরূপে কল্পিত ও সৃষ্ট হয়, সে জগৎ মনোময়। এইরূপে বিষয় সকল দুই প্রকার হয়। এক বাহ্য ভৌতিক, আর এক আভ্যন্তরিক মনোময়। বাহ্য-বস্তু ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে, অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হয় ও মন সেই বস্তুকে গ্রহণ করিয়া তদাকারে পরিণত হয়; এইরূপে বাহ্যবস্তু মনোময় হয়। এইরূপে বাহ্য মৃণ্ময় ঘট, অন্তঃকরণে মনোময় ঘটরূপে প্রকাশিত হইয়া, মনের ভোক্তৃত্বাদির দ্বারা তাহাকে রঞ্জিত করে। এই মনোময় ঘট জীবসৃষ্ট। এইরূপে এই মনোময় জগৎ জীবসৃষ্ট হইয়াই বন্ধনের কারণ হয়। ভগবান যে "অব্যয় অশ্বত্থের" কথা বলিয়াছেন, তাহা এই জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈত-প্রপঞ্চ।

আছে "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" (সমাধিপাদ ১৫ সূত্র)। "অর্থাৎ স্ত্রী অন্নপান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ ঐহিক বিষয়ে স্বর্গে দেহরহিত ইন্দ্রিয়ে লয়রূপ এবং প্রকৃতিতে লয় পাওয়া রূপ মুক্তিবিশেষে বেদবোধিত এই সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণারহিত চিত্তের দিব্য ও অদিব্য সুখকর বিষয় সকল উপস্থিত হইলেও অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয় প্রভৃতি বিষয়-দোষ দর্শন করায় অনাভোগাত্মিকা হান উপাদান শূন্যা উপেক্ষা বুদ্ধিরূপ বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য বলে। ইহার কারণ প্রসংখ্যান অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষয়ের দুঃখরূপতা চিন্তা করিতে করিতে দোষের প্রত্যক্ষ করা" (পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু কৃত ব্যাসভাষ্যের বঙ্গানুবাদ)।

কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে জানা যায়, এ বৈরাগ্য যথেষ্ট নহে। এই বশীকার-সংজ্ঞক অপর বৈরাগ্যদ্বারা ত্রিগুণবন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায় না। ইহার দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত হয়; রজঃ ও তমোগুণের বন্ধন ছিন্ন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা সত্ত্বগুণের বন্ধন একেবারে ছেদন করা যায় না। এই সত্ত্বগুণের বন্ধন ছেদন করিবার জন্য যে দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্রের প্রয়োজন, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে। পাতঞ্জলে আছে—"তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্" (সমাধিপাদ ১৬ সূত্র)। ইহার ব্যাসভাষ্য এইরূপ "প্রথমতঃ অর্জ্জন রক্ষণ প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া যোগিগণ ঐহিক পারত্রিক ভোগ্য বিষয় সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করেন; ঐ জ্ঞানে কেবল সত্ত্বের আবির্ভাবরূপ শুদ্ধি জন্মে; তদ্দ্বারা সর্ব্বথা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া ব্যক্তাব্যক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরক্ত হয়েন। অতএব বৈরাগ্য দুই প্রকার,—অপর ও পর। ইহার মধ্যে পর বৈরাগ্যটি জ্ঞানপ্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের নির্ম্মলতার শেষ সীমা। এই পরবৈরাগ্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। যোগিগণের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে,—পাইবার যোগ্য বস্তু (কৈবল্য) পাইয়াছি, ক্ষয়ের উপযুক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশ (অবিদ্যা প্রভৃতি) ক্ষীণ হইয়াছে; অবিচ্ছিন্ন সংসার-প্রবাহ ছিন্ন হইয়াছে। যে সংসারের বিচ্ছেদ না থাকায় প্রাণিগণ জন্মিয়া মরে এবং মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানেরই চরম উন্নতি পরবৈরাগ্য কৈবল্য; ইহারই অন্তর্গত"।

(পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু কৃত—বঙ্গানুবাদ)

এই পর বৈরাগ্যের দ্বারা গুণবিতৃষ্ণা হয়—ত্রৈগুণ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় তৃষ্ণা দূর হয় এবং তাহার ফলে পুরুষখ্যাতি বা পুরুষের স্বরূপজ্ঞান সিদ্ধ হয় বা পুরুষ সাক্ষাৎকার হয় অথবা পুরুষ প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। ইহা এক অর্থে আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান। এই পরবৈরাগ্যদ্বারা জীব ত্রিগুণ বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়ায় তাহাদের চিত্তবৃত্তি বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী হয়। এই পরবৈরাগ্যদ্বারা আমরা সেই পরম মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারি। ইহাই আমাদের সংসার হইতে মুক্তির মুখ্য উপায়।

কিরূপে বৈরাগ্য সাধন করিতে হয়,—কিরূপে অপর-বৈরাগ্য পর-বৈরাগ্যে পরিণত হয়, তাহা গীতোক্ত সাধনতত্ত্ব হইতে বুঝিতে হইবে। ইহার প্রথম সাধন কর্ম্মযোগ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ॥

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন --

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ (৫।১১)

কর্ম্মযোগ গীতার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগ সাধনার দ্বারা, রজোগুণ সমুদ্ভব কাম ক্রোধাদি অভিভূত হইয়া যায়। রাগদ্বেষ দূর হয় এবং কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যবোধে বুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়। কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইলে আর রাজসিক ও তামসিকভাব আমাদিগকে অভিভূত করে না। ইহার দ্বারা রাজস ও তামস বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য দৃঢ় হয়। ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আমাদের ত্যাগবুদ্ধি দৃঢ় হয়; ইহা বৈরাগ্যের মূল। এই বৈরাগ্যলাভের দ্বিতীয় সোপান গীতার ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তাহা জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ আর ধ্যানযোগ। এই যোগ সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়; অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি সিদ্ধ হয়। ইহার ফলে সত্ত্বগুণের বৃত্তি যে সর্ব্বদ্বারে বাহ্য বিষয়ের প্রকাশ ও তাহাতে সুখানুভূতি, তাহাতে আর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। (গীতা ১৪।১১) এইরূপে সাত্ত্বিক বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য

দৃঢ় হয়। এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত আমাদের সঙ্গ শিথিল হয়। যাহা হউক এই ত্রিগুণসঙ্গ নিবৃত্তির বা ত্রিগুণাতীত হইবার যাহা মুখ্য উপায়, তাহা গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সে উপায় ঈশ্বরে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগে প্রীতিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিলে অনন্যভক্তিযোগে মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলে, ত্রিগুণবন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া যায়। সংসার-অশ্বত্থ ছেদনের যে মহান্ অস্ত্র, তাহা এইরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান-সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ॥ (১৪।২৬)। এস্থলেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে "তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।" (১৫।৪)। অতএব এই যে গীতোক্ত সাধন কর্ম্মযোগ সাঙ্খ্যযোগ ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ, ইহা অধিকারিভেদে পৃথক্‌ভাবে বা সমুচ্চয়পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতে পারিলে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ (১৪।২০)

এই দেহ-সমুদ্ভব অতিক্রম করিতে পারিলে ত্রিগুণ-রচিত এ সংসারের প্রতি অনাসক্তি জন্মে। উৎকট বা পর-বৈরাগ্য অস্ত্র লাভ হয়। তখন সেই বৈরাগ্য-অস্ত্রদ্বারা এই সংসার-অশ্বত্থচ্ছেদনপূর্ব্বক মুক্তির পথে গতি লাভ করা যায়।

এস্থলে বৈরাগ্য সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা উল্লেখ করিতে হইবে। এ সংসারকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদের মধ্যে কয়জন ইহা ত্যাগের জন্য উৎসুক হ'ন। তাঁহাদের সংখ্যা অতীব অল্প। আর যাঁহারা সংসার-মুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জনই বা মুক্তির প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন। গীতায় পরে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এ অধিকার বিচার করিতে পারি। যাঁহারা দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত বা সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত তাঁহারাই বৈরাগ্যসাধনার দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী। বুদ্ধি সাত্ত্বিকী না হইলে বৈরাগ্যলাভ হয় না। ভগবান্ পূর্ব্বে এই বুদ্ধির তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌॥ (২।৪১)

সুতরাং বুদ্ধি একনিষ্ঠ না হইলে বুদ্ধিযোগ সিদ্ধ হয় না। সে বুদ্ধির দ্বারা সুকৃত দুষ্কৃত উভয়কে অতিক্রম করা যায় না। "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে"। আরও একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যদি পারলৌকিক বিষয় কামনায় যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত অথবা ঐহিক সুখ বা অভ্যুদয়ের আশায় ধন মান যশ প্রভৃতি অর্জ্জনের জন্য ব্যাপৃত হয় তবে তাহা রাজসিক বলিয়া তাহার দ্বারা বৈরাগ্যসাধন সম্ভব হয় না। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (২।৪৪)

অতএব কেবল সাত্ত্বিক একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বৈরাগ্যসাধনের উপযুক্ত। ভগবান্‌ সাত্ত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াছেন,—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ (১৮।৩০)

সাঙ্খ্যদর্শনে আছে—সাত্ত্বিক বুদ্ধির চতুর্ব্বিধ ভাব—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য। সাঙ্খ্যমতে ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য আমাদের সংসারমুক্তির সাধন নহে। কেবল জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য সাধন দ্বারা সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বৈরাগ্য সংসার হইতে মুক্ত হইবার প্রধান উপায়। বৈরাগ্যসিদ্ধিতে সংসারমুক্ত হইতে পারিলে, তবে জ্ঞানদ্বারা পুরুষ প্রকৃতিমুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। সে যাহা হউক গীতাতে বৈরাগ্যই যে সংসারমুক্তির প্রধান উপায় তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

বৈরাগ্যদ্বারা আমাদের ভোক্তৃভাব ও কর্তৃভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি না থাকিলে সকামকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং আমাদের ভোগ ও কর্ম্মদ্বারা রচিত যে সংসার, তাহার নাশ হয়। ভোগ-বাসনার দ্বারা যে সংস্কার বা হৃদয়গ্রন্থি বহুজন্ম ধরিয়া সংবদ্ধ থাকে, বৈরাগ্য দ্বারা তাহা ভিন্ন হয়। বহুজন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কার দ্বারা যে সংসারজাল গ্রথিত হয়, বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা অব্যয় অশ্বত্থকে ছেদন করিতে হয়।

এই বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, দুঃখবাদের উপর আমাদের দর্শন শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সংসার দুঃখময়, দুঃখই হেয়—এই জ্ঞান না হইলে সংসারমুক্তির জন্য চেষ্টা হয় না। সংসারমুক্তি আমাদের দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই দুঃখ-বাদ সাঙ্খ্য ও যোগদর্শনের ভিত্তি হইলেও পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসাদর্শনের ভিত্তি নহে। যাহারা রজঃপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত, ভোগ সুখের জন্য সংসারে আবদ্ধ, তাহাদিগকে সংসারবিমুখ করিতে হইলে, সংসার যে দুঃখময় তার উপদেশের প্রয়োজন। সেইরূপ যাহারা তমঃপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত অলস ও কর্ম্মশক্তি হীন, যাহারা দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়, তাহাদের পক্ষেও এ দুঃখবাদের উপদেশের প্রয়োজন। কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান তাহাদের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

সংসার যে দুঃখময়, ইহা গীতায় উপদিষ্ট হইলেও এ দুঃখবাদ কোথাও স্থাপিত হয় নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

এই তিতিক্ষা সাত্ত্বিকগুণ; ইহা শমদমাদি ষট্সাধনসম্পত্তির অন্তর্গত।

ভগবান্ আরও সুখদুঃখ সমজ্ঞান করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ (২।৩৮)

গীতায় ভগবান্ সংসারে আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই আসক্তির মূল আমাদের নিজের ভোগসুখের প্রবৃত্তি, আমাদের রাগ-দ্বেষ, আমাদের অভিমান, আমাদের মোহ। এই আসক্তি দূর করিয়া নিষ্কাম হইতে পারিলে, আমাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। সুতরাং ইহার জন্য সংসার দুঃখময় এ তত্ত্ব স্থাপনের প্রয়োজন নাই। বাস্তবিকপক্ষে বেদান্তমতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি আমাদের পরম পুরুষার্থ নহে। তবে ইহা মুক্তির অবান্তর ফলমাত্র। কেহ কেহ সংসারে নানাবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া স্ত্রীপুত্রগৃহাদি ত্যাগ করিয়া সকল বিধেয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হন। এ

ত্যাগ বা এ সন্ন্যাস প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ইহা অনাসক্তির পরিচায়ক নহে। ইহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ (৬।১)

আর সাত্ত্বিক জ্ঞানের একভাব যে "অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু" (১৩।৯) ভগবান্ বলিয়াছেন,—তাহার দ্বারা গৃহদারাদি ত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন বুঝায় না,—তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে স্বাভাবিক আসক্তি-মোহ থাকে তাহা যে অবিদ্যামূলক, এই জ্ঞানই বুঝায়। সুতরাং বৈরাগ্য বুঝাইতে স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ অথবা কর্ত্তব্যকর্ম্মত্যাগ এইরূপ কোন ত্যাগই বুঝায় না। ভগবান, ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন মোহহেতু কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ— তামসত্যাগ; কর্ত্তব্যকর্ম্ম দুঃখকর ভাবিয়া কায়ক্লেশ ভয়ে যে ত্যাগ—তাহা রাজসত্যাগ, আর কর্ত্তব্যবোধে নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে আসক্তি ও ফলাশা পরিত্যাগই—সাত্ত্বিক ত্যাগ,—

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥ (১৮।৯)

এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ (১৮।২)

ভগবান আরও বলিয়াছেন,—

মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। (২।৪৭)

এইরূপ ত্যাগ বা সন্ন্যাস অনাসক্তির ফল, এ অনাসক্তিকে বৈরাগ্য বলে, আর ইহার দ্বারা সংসার-বন্ধন ছেদন করা যায়। সুতরাং এই অনাসক্তি বা বৈরাগ্য সাধন জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই বৈরাগ্যের পরিপাকে পরবৈরাগ্য লাভ হয়। তখন পুরুষখ্যাতি (পুরুষ সাক্ষাৎকার) হয়। তখন জীব আমরা নিজের স্বরূপ জানিতে পারি ও নিত্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে পদ পাইলে পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই পরম পদের এই অনুসন্ধান করিবার আমরা অধিকারী হইতে পারি।

—:০:—

গান।

বৈরবী—তাল একতালা।

কোথা আছ তুমি, কোথা আছি আমি ?
পরোক্ষেতে বুঝি সদা সাথী তুমি,
কিন্তু হায় একি, সাথী নাহি দেখি,
কত দূরে তুমি আছ গো।

কাতর অন্তরে, ডাকিলে তোমারে,
কোথা হ'তে সাড়া দাও যে আমারে,
খুঁজি চারিদিক পাই নাহি ঠিক,
কত গোপনে অন্তরেই আছ গো॥

নাভিতে যেমতি মৃগ কস্তূরীর,
সৌরভে মাতায় অন্তর বাহির,
বন-বনান্তরে, ছুটায় তাহারে,
তেমতি আমি যে তোমায় খুঁজি গো॥

কত নিশি দিন অতীত হইল,
কত জনম জীবন বৃথা চলে গেল,
(আছি) তোমারি আশায়, পতিত ধরায়,
কবে স্বরূপে দেখা দেবে গো॥

এস এস এস অপরোক্ষে বস,
খেলিব উভয়ে ধ্যান-ক্রিয়া-শেষ,
সচ্চিদানন্দ আজ ব্রহ্মানন্দে ভাস,
পূর্ণ পূর্ণ তব চির সাধন গো॥

(স্বামী) সচ্চিদানন্দ।

দীক্ষা-মুখে।

প্রথম অধ্যায়।

সাধন-শৈল—বহিঃপ্রাঙ্গণ।

(রূপক)।

[শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।]

শিষ্য।—সম্মুখে একি দেখিতেছি গুরুদেব! কূলহীন, দিগন্ত প্রসারিত, মহা-শূন্যের মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব মহান্ গিরিবর! ইহার শিখরদেশ অভ্রভেদ করিয়া যেন নভঃশিরকে চুম্বন করিতেছে; অধোদেশ অন্তহীন,—নিম্নভাগে কোথায় যে ইহা আত্মগোপন করিয়াছে, তাহা আমি বহু চেষ্টায়ও কিছুমাত্র নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। এই শৈলগাত্র কোথাও বা বন্ধুর, কোথাও বা সমতল; আবার কোথাও বা নিবিড় সু-উচ্চ অরণ্যানী রোমাবলীর মত, ইহাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; কোথাও বা কণ্টক-তরু ও গুল্মের আচ্ছাদন আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিতেছে! আবার এই শৃঙ্গবরকে বেষ্টন করিয়া, দীপ্তি-বিশিষ্ট কি ওই গিরি-নদীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহার শিখরদেশে উঠিয়াছে? গিরিচূড়ার উপরে ওখানে ঐ আবার কি? যেন সুপ্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির উজ্জ্বল বিভায় দিগন্ত পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব জ্যোতিরাশিতে স্নপিত করিতেছে!

যে পর্ব্বত-বেষ্টনের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে ঐ আবার কি দেখা যাইতেছে? যেন কোটি কোটি জীব ঘুরিয়া, ফিরিয়া, তাহাতে আরোহণ করিতেছে। সেই জন-স্রোতের প্রারম্ভ বা অন্ত নাই। ঐ দিকে আবার কেহ কেহ, সাধারণ-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া, যেন উন্মাদের মত, পর্ব্বতে লম্বমান লতা-রজ্জু বা উদ্গত শিলাখণ্ড ধারণ করিয়া, সেই শৈলে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কণ্টক ও শিলাখণ্ডে তাহাদের সর্ব্বগাত্র ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, ইহাতে তাহাদের কিছুমাত্র দৃক্‌পাত নাই। কি যেন

কোন মোহিনী শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা পলকবিহীন-নেত্রে গিরি-শিখরের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য এই মহীয়ান্ গাম্ভীর্য্যে স্তম্ভিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নির্ব্বাক্ হইলেন।

অজ্ঞাত ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। গুরুদেবের বদন-কমল স্নেহে এক মনোহর অপূর্ব্ব-শোভা ধারণ করিল। তাঁহার স্মিত অধর হইতে যেন অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

গুরু।—পুত্র, কেন তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছ? তুমি না আকুলচিত্তে বার বার প্রার্থনা করিয়াছিলে,—কি করিয়া মানব সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারে? অবিদ্যার মোহে বিমোহিত ক্ষুদ্র মানব, সংসারের ধূলি-খেলা ছাড়িয়া, কিরূপে ভগবানের অনন্ত করুণায় তাঁহার অনন্ত মহত্ত্বে আপনার অহঙ্কার ও বিশিষ্টতাকে ডুবাইয়া দেয়? তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে যিনি নিত্য বিরাজিত, সেই পুরুষ-প্রধান তোমার আকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাই এই চিত্র তোমার সম্মুখে বিদ্যমান। তাঁহার কৃপায়, তাঁহারি করুণারূপ প্রেরণায়, আমি এই দৃশ্যের পরিচয় দিব। একমাত্র মহাযন্ত্রী তিনি, আমাকে যন্ত্র করিয়া তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

সৃষ্টি অনাদি। অনন্তকাল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের ও তাহার সহিত জীবের অভিব্যক্তি চলিয়া আসিতেছে। মহাকালের অঙ্কে নিহিত মানবের এই অপরিসীম অভিব্যক্তি-চিত্রখানি অবলোকন কর। ওই যে সম্মুখে অভ্রভেদী পর্ব্বত-শৃঙ্গ দণ্ডায়মান, তাহা রূপক ছলে জীব ও মানবের অভিব্যক্তি-ইতিহাস প্রচার করিতেছে। সৃষ্টি অনাদি বলিয়া, তুমি এই গিরিশৃঙ্গের মূলদেশ দর্শন করিতে পারিতেছ না। জীব-আবির্ভাব অনাদি বলিয়া, পর্ব্বত-মূল অনন্তগর্ভে লুক্কায়িত। পর্ব্বতের গাত্র দিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় পথ লক্ষ্য করিতেছ, তাহা শৃঙ্গ বেষ্টন করিতে করিতে তাহার শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছে। তুমি যদি যথাযথ লক্ষ্য করিয়া থাক, তাহা হইলে

দেখিতে পাইবে যে, এই পথ পর্ব্বত-শৃঙ্গকে লতা-বন্ধনের ন্যায় সপ্তবার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেক বেষ্টনে, পথের মাঝে, সাতটী করিয়া যাত্রীদিগের বিশ্রামের স্থান আছে। পথিকেরা আরোহণ করিতে করিতে, ক্লান্ত হইয়া এক বিশ্রামের স্থানে স্বল্পক্ষণ বিশ্রাম করে এবং শ্রান্তি-দূর করিয়া, অগ্রসর হইতে হইতে, আর এক স্থানে উপনীত হয়। মনে কর, একটি তরঙ্গ কোনও বালুকা-দ্বীপ বিধৌত করিয়া তাহাতেই লুপ্ত হইতেছে; আবার নবোচ্ছ্বাসে সেই স্থানেই অধিকতর স্ফীত হইয়া তথায় বিলীন হইতেছে। এইরূপে সপ্তবার উচ্ছ্বসিত ও লয়-প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই তরঙ্গ অপর বালুকাদ্বীপে আসিয়া আত্মবল সঞ্চয় করিতেছে ও সেইরূপে সপ্তবার স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া ততবার আবার বালুকাগাত্রে মিশিয়া যাইতেছে। আমাদিগের সৃষ্টিক্রিয়াও তাহাই। মহাকল্পের প্রারম্ভে, জীব-তরঙ্গ, কোন একটি জগতে স্ফীত হইয়া উঠে, আবার প্রলয়ে কোথায় তাহা বিলীন হয়। এইরূপ সপ্তবার প্রবুদ্ধ ও সপ্তবার লয়-প্রাপ্ত মানব-মহাযান-তরঙ্গ, আর এক জগতকে আশ্রয় করে। এইরূপে সপ্তজগৎকে আশ্রয় করিয়া পরে মহাপ্রলয়ে তাহা কোথায় আত্ম-গোপন করে।

এই যে মানবের বিরাট অভিযান ও অভিব্যক্তি, তাহা তোমার সম্মুখে বিরাজিত, আদি-অন্তহীন, পর্ব্বত-শৃঙ্গ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। পূর্ব্ব-কথিত গিরিগাত্রে অঙ্কিত জ্যোতির্ম্ময় পন্থার সপ্ত বেষ্টন, প্রত্যেক বেষ্টনে যে সপ্ত বিশ্রামস্থান পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তাহা এই পূর্ব্বকথিত মানব অভ্যুত্থান ও বিকাশের জটিল তথ্য চিত্রের দ্বারা অতি সহজভাবে প্রকাশ করিতেছে।

পূর্ব্বকথিত পথের সাহায্যে উঠিতে উঠিতে, আরোহীরা অবশেষে শৃঙ্গের শিখরদেশে উপনীত হয়। সেইখানে ঐ যে রজত-শুভ্র, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার, মন্দির দেখিতেছ, যাহা হইতে সিত জ্যোতিরাশি, নীলাকাশের পবিত্র নীলিমা-মাঝে শোভা পাইতেছে, সেই মন্দিরে প্রবেশলাভ করিবার জন্যই এই যাত্রিবৃন্দ দুর্গম পর্ব্বত-পথে আরোহণ করিতেছে। যাঁহারা তথায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষেরা, শিষ্য, দেখ দেখ,—

যদিও তাঁহাদিগের সংসার-ভ্রমণ শেষ হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা এতদূর কঠোর পথশ্রমেও শ্রান্তিদূর করিবার জন্য আত্মবিশ্রাম বা নিজ শান্তি চাহিতেছেন না। কোন্ যাত্রীর কি অভাব হয়, তাহা বিমোচন করিবার জন্য, আত্মশান্তি ও আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা সংসারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন। আত্মসুখের কথা তাঁহাদের মনে আদৌ আসিতে পারে না। তাঁহাদিগের একমাত্র ইচ্ছা, তাঁহাদিগের একমাত্র চেষ্টা, কিরূপে সকল মানব তাঁহাদেরই মত হইয়া সেই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এই বহিঃস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ গর্ভমন্দিরে বিরাজিত যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, সেই অনন্তের আধারে—তাঁহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলীন করিতে পারেন ; কিন্তু মানবের কল্যাণ জন্য তাহা তাঁহারা করিতেছেন না। একজনকেও ছাড়িয়া, যেন তাঁহারা দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত ও পরমবাঞ্ছিত যে শান্তি-সুখ, তাহা স্বয়ং উপভোগ করিতে চাহেন না। তাঁহারা সেই মহাভক্ত প্রহ্লাদের মত যেন বলিতেছেন,—

"হে অচ্যুত! বহু সপত্নীর ন্যায় অতৃপ্ত রসনা একদিকে, শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক্, উদর ও শ্রবণ অন্য কোনদিকে, নাসিকা ও চপল-চক্ষু অপরদিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল কোনদিকে গৃহস্বামীকে আকর্ষণ করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে ; এই সমস্ত দীন বালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমি মুক্তি চাহি না।"

ঐ যে মন্দির দেখিতেছ, তাহার মধ্যস্থান,—যাহাকে আমি গর্ভ-মন্দির বলিয়া আসিলাম,—সেই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। সেই গর্ভ-মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া চারিটী চক্রাকার প্রাঙ্গণ আছে,—একটী অপরটীর অন্তর্গত ও সমকেন্দ্রস্থিত ; কিন্তু প্রত্যেকটী প্রাচীরে বেষ্টিত। সেই প্রাচীরগুলির প্রত্যেকটীতে একটী মাত্র প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। এক প্রাঙ্গণ হইতে অভ্যন্তরস্থিত প্রাঙ্গণে যাইতে হইলে সেই একমাত্র দ্বার দিয়া যাইতে হয়, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার উপায় নাই। এইরূপ চারিটী প্রাঙ্গণ ; সকলগুলিই মন্দিরের অন্তর্গত। চতুরঙ্গন সমন্বিত ঐ মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া একটী বৃহত্তর মণ্ডলাকৃতি চত্বর বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দিরাধিগত

যে মহাত্মাদিগের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদিগের সংখ্যা হইতে এই বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থিত লোকের সংখ্যা অনেক অধিক। ঐ পর্ব্বত-গাত্রে ঘূর্ণায়মান পথ সাহায্যে শেষোক্ত এই সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবগণ পর্ব্বত বেষ্টন করিতে করিতে মন্দির-প্রান্তবর্ত্তি প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার দেখ সহস্র সহস্র লোক ঐ পথের মাঝে এখনও পড়িয়া আছে; তাহারা শৃঙ্গের শিখরদেশে এখনও অধিরোহণ করিতে পারে নাই; অতি ধীরে ধীরে, পদের পর পদবিক্ষেপ করিতে করিতে, অতি সন্তর্পণে তাহারা যতটুকু ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার ঠিক ততখানি নিম্নে অবতরণ করিতেছে। তাহাদিগের দেহ হেলিতেছে, চরণ নড়িতেছে, অথচ যেন তাহারা চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় একই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মানবজাতির গতি ঊর্দ্ধাভিমুখী হইলেও মনে হইতেছে, যেন মানব তরঙ্গগুলি একস্থানেই প্রতিঘাত করিতেছে।

যুগযুগান্তরব্যাপী, মানবজাতির এই ধীর, এই কষ্টসাধ্য, ক্রম-বিকাশের এই চিত্রখানি দেখিলেই সাধারণের মনে ভয় ও নিরাশার যে সঞ্চার হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? একজন মানব কত যুগ ধরিয়া ঐ পথে চলিতেছে; পথিমধ্যে তার কত জন্ম, কত মৃত্যু হইয়া গিয়াছে; কত জগৎ উদ্ভূত ও লয়-প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাচ এখনও সে কত নিম্নে অবস্থান করিতেছে। সেই অনন্তকালব্যাপী সুদূর মহাযাত্রার যাত্রী হইবার কথা দূরে থাকুক, সেই যাত্রীগণকে দেখিলেও মনে বিষাদ আসে। তাহাদিগকে দেখিয়া একজনেরও মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে--কেন এত লোক অনন্তকাল ধরিয়া এই সুদূর অভিযান করিতেছে, গিরিশৃঙ্গস্থ মন্দিরে কি আছে এবং তাহারই বা কি আকর্ষণ, যাহার জন্য স্থির হইয়া মানবের এক-স্থানে থাকিবার শক্তি নাই?

তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, কেন মানবের গতি এত মন্থর? তাহাদিগের গন্তব্যস্থান অজ্ঞাত বলিয়া এবং অজ্ঞাত পথাবলম্বনে যাইতেছে বলিয়া, তাহারা এত ধীরে ধীরে, এত সন্তর্পণে উঠিতেছে। অনেকে আবার বৃথা সময় অপচয় করিতেছে। উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া, কখন ঐদিকে, কখন এই অবস্থায়, কখন ঐ অবস্থায় আকৃষ্ট হইতেছে; একমনে অভীপ্সিত স্থানে

যাত্রা করিতেছে না। বালকের মত তাহারা কখন সম্মুখস্থ ঐ একটী ক্ষুদ্র পুষ্পাহরণ মানসে ছুটিতেছে, কখন বা অন্যদিকে একটী বিবিধবর্ণে রঞ্জিত প্রজাপতির পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। এইরূপে উদ্দেশ্যবিহীন শৈশব-ক্রীড়ায়, সময় অপব্যয় করিয়া দিবসের শেষে, রজনীর যখন ঘনান্ধকার তাহাদিগের গমন-মার্গ আচ্ছন্ন করে, তখন তাহারা দেখে যে, অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছে।

তাহাদিগকে বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি কিছু বিকশিত হইলেও, সে যে এই উন্নতিমার্গে দ্রুততর অগ্রসর হইতেছে তাহা নহে। যাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এখনও বিকশিত হয় নাই, প্রত্যেক জীবন-দিবসের শেষে তাহারা পূর্ব্বদিবসে যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং নিদ্রাভঙ্গে সেই স্থান হইতে আবার নূতন যাত্রা আরম্ভ করে। সেইরূপ আবার যাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কিছু বিকাশ হইয়াছে, তাহারাও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানহীন মানবের মত অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতি-দিবসের শেষে সেই অনন্তপথের অতি অল্প অংশমাত্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হইতেছে।

শিষ্য।—মানবের এই বৃথাশ্রম ও আয়াস লক্ষ্য করিয়া এবং দুরূহ পথের অধিরোহণে তাহাদিগের যে মহা-ক্লান্তি তাহা অনুভব করিয়া, আমার চিত্ত অভিভূত হইয়া যাইতেছে। গুরুদেব, হায় কেন তাহারা একবার নয়ন উত্তোলন করিয়া দেখিতেছে না—তাহাদিগের গন্তব্যস্থান কোথায়!

পিতঃ! তাহারা যে ভুলক্রমে, অজ্ঞানতাবশতঃ, সংসারের মায়া-মরীচিকায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, আত্মহারা হইতেছে, তাহা তাহাদিগের মনে আসিতেছে না কেন? আবার এই জনপ্রবাহের মধ্য হইতে কেহ কেহ যে বায়ুরোগাক্রান্ত, চিন্তাহীন, আপন বিপদের প্রতি লক্ষ্যহীন মানবের মত, সাধারণমার্গ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া বিপদসঙ্কুল, ভৃগুমান, কণ্টকময় পর্ব্বত গাত্র সাহায্যে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এই সমস্ত মানব-দিগেরই বা গতি কোথায়? কোন্ মায়াবীর প্রলোভনেই বা তাহারা এইরূপ আত্মহারা হইয়া ঘুরিতেছে? (ক্রমশঃ)

সন্ধ্যারহস্য।

[স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।]

দ্বিজকুমারের প্রতি উপদেশ।

সন্ধ্যারহস্য বিষয়ে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে দ্বিজ তথা ব্রাহ্মণকুমারকে কয়েকটী কথা বলিবার আছে। তুমি দ্বিজকুমার, বিশেষ ব্রাহ্মণ সন্তান, যদি এই পুণ্যভূমি বিশাল ভারতক্ষেত্রে তোমার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে চাও, তবে সর্ব্বপ্রথমেই মিথ্যাচরণ, অসদ্‌ভাষণ, যে কোনরূপ প্রলোভন ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে যত্ন কর। পরমুখাপেক্ষিতায় ঘৃণা অনুভব কর। অজ্ঞাতকুলশীল পাপকর্ম্মানুরত নীচাত্মা ব্যক্তিগণের কোনরূপ দান গ্রহণ করিওনা, মন্ত্রযুক্ত দান আদৌ স্পর্শ পর্য্যন্ত করিওনা। তাহাতে দাতার পাপসমূহ তোমাতেই সংক্রামিত হইবে।

অপদান-প্রাপ্ত অর্থে উদরপূরণ ও সংসার প্রতিপালন করা অপেক্ষা ভৃত্যবৃত্তি অবলম্বন করাও ভাল। রাজসেবা তথা শ্রীমন্তের সেবা ভৃত্য-বৃত্তিরই রূপান্তর, তাহাও শূদ্রাচার, তবে ভৃত্যবৃত্তির পক্ষে তাহা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। বৈশ্যাচার অর্থাৎ সৎ ব্যবসায়দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা উত্তম কল্প। তদপেক্ষা ক্ষত্রিয়বৃত্তি বা সৈনিকের কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করা উন্নত কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণের বিশিষ্টতা আংশিক রক্ষিত হইতে পারে *। কিন্তু কেবল উদরপূরণ ও সংসারপ্রতিপালনার্থ জ্ঞান-ক্রিয়া-বিহীন পৌরোহিত্য, কুলগুরু ব্যবসায়, গ্রাম্যযাজকতা, গ্রাম্যদেবতার প্রতি নিবেদিত পূজা-সামগ্রী গ্রহণ, তীর্থপুরোহিত বা পাণ্ডার কার্য্য, যাত্রাওয়ালা বা সেথো ব্রাহ্মণের কার্য্য ও পাচকবৃত্তি অতীব ঘৃণ্য ও নীচ কর্ম্ম। তাহাতে, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ত নষ্ট হয়ই, অধিকন্তু চিরদিনের জন্য স্ব স্ব বংশও বিকৃত

---

* ব্রাহ্মণের গুণ-কর্ম্মানুসারে শ্রেণীবিভাগ ও শাস্ত্রীয় জীবিকা সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে।

হইয়া যায়। ফলে শুদ্ধ রজঃ বীর্য্যও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তাহার সংস্পর্শে সে বংশে আর সহজে বীর্য্যবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইতে পারে না। অভাব ও প্রলোভন বশে স্বয়ং পাপাসক্ত ও চিরতরে স্বীয় বংশ বিকৃত করা মহাপাতক! সুতরাং কায়মনোবাক্যে সংযম রক্ষা করিয়া যথাসাধ্য ব্রাহ্মণোচিত নিত্যকর্ম্ম ও সন্ধ্যাদি সম্পন্ন করিবে। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই পুণ্যবান্, ধর্ম্মাত্মা, সদাশয় ও সৎকুলশীল ব্যক্তির শ্রদ্ধানিবেদিত ও ইচ্ছাকৃত দানই গ্রহণ করিতে পারিবে। সতত ব্রহ্মচারী-ভাবে বিলাসিতা ও পার্থিব-কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতে যত্নবান্ হইবে। যথাবিহিত গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠান দ্বারা সন্তানের দেহ, মন ও মেধার পরিপুষ্টি কল্পে সাধ্যমত যত্নবান্ হইবে ও অন্যান্য আত্মীয়গণকেও তাহার উপদেশ প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ্য-রক্ষার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠকল্প। ইহা দ্বারা নিষ্প্রভ রজোবীর্য্যও পুনরায় সংস্কৃত, শোধিত ও পরিপুষ্ট হইবে। অনন্তর অভিজ্ঞ যোগী গুরুর নিকট মন্ত্রাদি যোগা-বলীর যথারীতি উপদেশ লইয়া মোক্ষপ্রদ উচ্চতর সাধনার পথে অগ্রসর হইবে। চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মোক্ষোপযোগী মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া, আবার কত সহস্র সহস্র জন্মের উন্নত কর্ম্মের পুণ্যফলে সৎকুল-যুক্ত উচ্চতম বর্ণের মধ্যে আসিতে পারিয়াছ, এক্ষণে যাহাতে সেই কর্ম্ম-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মুক্তির পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে পার, তাহাতে সাধ্যমতে অবহেলা করা উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেককেই বলিতেছি, তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কোনও বর্ণের সন্তান হও, বৈদিক বা তান্ত্রিক যে কোনরূপ কর্ম্মোপাসনা ও সন্ধ্যার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে। তোমার আত্মোন্নতির পক্ষে তাহা পরম সহায়ক। ত্রিকাল-সন্ধ্যা বা শ্রীগুরুর কৃপায় চতুর্থ সন্ধ্যার অধিকারী হইলে, নিত্য যথাকালে সন্ধ্যোপাসনা করিতে কখনই অবহেলা করিবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"সন্ধ্যাহীন হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের সাধকেরই দৈব অথবা আত্মোন্নতিকর যে কোনও কর্ম্ম-সাধনার অধিকার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।" অসমর্থ হইলে অর্থাৎ কোনও কার্য্যানুরোধে পথে, ঘাটে, কর্ম্মস্থলে, কোথাও যাত্রাকালে যানারোহণে থাকিলেও সন্ধ্যোপাসনার যথাকাল

উপস্থিত হইলে, তদবস্থাতেই মনে মনে সন্ধ্যার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। অন্ততঃপক্ষে তত্তৎ সময়ের নির্দ্দিষ্ট গায়ত্রীর রূপ চিন্তা করিবে। কিয়ৎক্ষণের জন্য নয়ন মুদিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে ও মনে মনে গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। কিছুতেই এই নিত্য-ক্রিয়া হইতে বিরত হইবে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"দৈবতো যদি লোপঃ স্যাৎ তদা মূলং শতং জপেৎ॥"

"সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী হ্যশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ॥"

সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হইয়া যাইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে শতবার মূলমন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা বিস্তৃতভাবে যথাযথ সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ, তাঁহারাও প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে গায়ত্রী-মূর্ত্তি ধ্যান পূর্ব্বক যথাশক্তি গায়ত্রী সহিত মূলমন্ত্র জপ করিবেন। ইহাই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সংক্ষেপ সন্ধ্যাবিধি। তাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অসমর্থ পক্ষে ইহাও একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে তোমার ইহ-পরকালের অশেষকল্যাণ সাধিত হইবে। তোমার কর্ম্ম উন্নতি-মুখী হইবে।

আর এক কথা, তোমাকে তোমার নিজের নিজত্ব রক্ষা করিতে হইলে তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তুমি আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সুতরাং তুমিও আর্য্য। সেই আর্য্যজাতি কি? তুমি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু। সেই ধর্ম্ম কি? বাহিরে তোমার আর্য্যত্বের চিহ্ন যথাক্রমে শিখা, সূত্র ও আচার এই তিনই পরিলক্ষিত হয়। অতএব সেই শিখা, সূত্র ও আচার কাহাকে বলে, তাহা জানিয়া ও সর্ব্বদা মনে রাখিয়া, তুমি আর্য্যবংশের যে কোনও বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকনা কেন, সেই বর্ণধর্ম্মের পালন করিয়াই তুমি ইহ-পরকালের সকল প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ, আর্য্য-জাতি ও অনার্য্য-জাতি সম্বন্ধে এইরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, যে মনুষ্যজাতি সকল সময়ে শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক সকল কার্য্য করিতে করিতে নিজের লক্ষ্য আত্মার দিকে রাখিতে সমর্থ হয়, যাহাদের মধ্যে চিরন্তন বর্ণচতুষ্টয় এবং আশ্রম-চতুষ্টয়ের সুব্যবস্থা বিদ্যমান আছে এবং যাহারা আচারকেও ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া মান্য করে, তাহারাই

আর্য্য নামে অভিহিত। আর যে মনুষ্যজাতির মধ্যে এই লক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে বিদ্যমান নাই, তাহারাই অনার্য্য বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে পূজ্যপাদ মহর্ষিবৃন্দ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের স্থূল সিদ্ধান্তের ন্যায় কেবল স্থূল-দেহের মধ্যে চক্ষু-নাসিকাদির গঠন-প্রণালী দেখিয়া আর্য্য ও অনার্য্যের কল্পনা করেন নাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধেও পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ অতি সরল, সারগর্ভ ও অপরিবর্ত্তনীয় সিদ্ধান্ত-বাক্যের সহিত ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীভগবানের যে ইচ্ছাশক্তি জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, যে ইচ্ছাশক্তির ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যথাক্রমে ও যথাসময়ে সংসাধিত হইয়া আসিতেছে এবং যে মহাশক্তি জীব-সমূহকে উদ্ভিজ্জ নামক প্রথম জীবশ্রেণী হইতে ক্রমশঃ স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ হইয়া তাহারই পূর্ণবিকাশ মনুষ্য-যোনি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়; আবার যে মহাশক্তি সেই জীবকে মনুষ্যযোনির অন্তর্গত বর্ণ ও আশ্রমের নানা অধিকারে ক্রমে ক্রমে উন্নত করিয়া অন্তে ভগবদ্-রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়, সেই জগদ্ধারিকা শক্তির নাম ধর্ম্ম। সরল কথায় বুঝিতে হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যজাতির পক্ষে সত্ত্বগুণবর্দ্ধক সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াকেই ধর্ম্ম বলা হয়। অর্থাৎ মনুষ্য সত্ত্ব-গুণের ক্রমাভিব্যক্তির দ্বারা অনার্য্য হইতেই আর্য্যপদবী লাভ করে এবং ক্রমশঃ বর্ণাশ্রমের অথবা মনুষ্য-জীবনের উচ্চতর সোপানগুলি অতিক্রম করিতে করিতে পরিণামে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ ভগবদ্‌রাজ্যে পৌঁছিয়া যায়। ফলতঃ মনুষ্যের শারীরিক ক্রিয়া হউক, মানসিক ক্রিয়া হউক অথবা বাচনিক ক্রিয়াই হউক, সেই ক্রিয়াসমূহের মধ্যে যাহা যাহা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক, তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা তমোগুণবর্দ্ধক তাহাই অধর্ম্ম।

আচার ধর্ম্ম—ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গ ও অগণিত উপাঙ্গের মধ্যে অতিশয় স্থূল এবং সর্ব্বপ্রধান। ধর্ম্মানুকূল শারীরিক ব্যাপারকেই আচার বলে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণবর্দ্ধক স্থূলশরীর-প্রধান ক্রিয়াগুলি আচার নামে অভিহিত। সুতরাং আচার যে স্থূল ধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান অতি স্থূল-রাজ্য হইতে সূক্ষ্মতম-রাজ্য পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, সেই জাতিই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আর্য্যের আর্য্যত্বের এবং দ্বিজের দ্বিজত্বের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আর্য্যজাতির প্রধান বহিশ্চিহ্ন শিখা ও সূত্রের বৈজ্ঞানিক রহস্যও কিছু কিছু বুঝিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যে জাতির মনুষ্যগণ উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নেও সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক কার্য্য উপলক্ষে সকল সময় সকল অবস্থাতেই নিজের ক্রিয়ার ও নিজের ধারণার লক্ষ্য পরমাত্মার দিকে রাখিতে সমর্থ হয়; যে মনুষ্যজাতি কোন সময়ই নিজের অন্তঃকরণকে অধোগামী না করিয়া সতত ঊর্দ্ধগামী করাকেই ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, সেই মনুষ্যজাতিই আর্য্য। সেই আর্য্যজাতিরই প্রধান বহিশ্চিহ্ন শিখা এবং সূত্র। মনুষ্য-শরীরের মধ্যে ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে গুহ্যদ্বারের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ছয়টী চক্রের স্থান আছে—তাহাকে ষট্‌চক্র বলে। সেই ছয়টীই জগৎ-প্রসবিনী মহাশক্তির আধারস্থান এবং সেই ছয় চক্রের উপরে মস্তকোপরি যে স্থানে আর্য্যেরা শিখা রক্ষা করে, মস্তকের সেই উন্নত ও পবিত্র স্থানটীই পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের পীঠস্থান। প্রকৃতি-রাজ্য হইতে ক্রমশঃ পরমাত্মার রাজ্যে যাওয়াই সকল ধর্ম্ম ও সকল সাধকের প্রধান লক্ষ্য। শিখা রক্ষার দ্বারা আর্য্যজাতি এই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের বীজ রোপণ করেন। উপাসনা-দ্বারা শিখাবন্ধন-সহযোগে অন্তঃকরণকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া সাধক ভগবদ্‌রাজ্যে লইয়া স্থাপন করিয়া দেয় এবং শিখাকে স্বীয় জাতীয়-চিহ্নের গৌরবরূপ মনে করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের মর্য্যাদা-স্থাপন পূর্ব্বক আর্য্যগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। শিখাদ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এবং মনের ঊর্দ্ধগামী প্রবাহ সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

শিখার ন্যায় সূত্রও দ্বিজাতির অতি পবিত্র ও অপরিত্যাজ্য বিশেষ চিহ্ন। ইহারও রহস্য ও ধারণবিধি প্রত্যেক দ্বিজ-সন্তানের অবশ্যই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

দ্বিজমাত্রেই উপনয়ন সংস্কার হইতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞোপবীত নবতন্তু বা নবগুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ নয়গাছি সূত্র পাকাইয়া এই উপবীত বা পৈতাসূতা প্রস্তুত করিতে হয়। দ্বিজজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা এই সূতা প্রস্তুত করিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এই নবতন্তু-

বিশিষ্ট উপবীত ধারণের উদ্দেশ্যবিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন, উহা ব্রাহ্মণের নয়-প্রকার গুণ ও তাহার পৃথক্ পৃথক্ অধিপতি দেবতাবৃন্দের একাধারে ধারণ করা। দ্বিজমাত্রের অবগতির জন্য সেই সেই দেবতা ও ব্রাহ্মণে তাঁহাদের বিভিন্ন গুণ সম্বন্ধে নিম্নে যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

১ম দেবতা—ওঁকার অর্থাৎ ব্রহ্ম বা বেদ, ব্রাহ্মণে ইহার গুণ—ব্রহ্মজ্ঞান বা বেদজ্ঞান ; এইরূপ, ২য় দেবতা—অগ্নি, ব্রাহ্মণে ইহাঁর গুণ—তেজঃ ; ৩য় দেবতা নাগ—অর্থাৎ অনন্ত, গুণ—ধৈর্য্য ; ৪র্থ দেবতা—চন্দ্র, গুণ—সর্ব্ব-প্রিয়তা ; ৫ম দেবতা—পিতৃগণ, গুণ—স্নেহশীলতা ; ৬ষ্ঠ দেবতা—প্রজাপতি, গুণ - প্রজাপালন ; ৭ম দেবতা—বসু, গুণ—স্বধর্ম্মে স্থিতি ; ৮ম দেবতা—যক্ষ, গুণ—ন্যায়পরতা ; ৯ম দেবতা শিব, গুণ - বিষয়ে অনাসক্তি।

দ্বিজসন্তান যজ্ঞোপবীত-ধারণ-সহ এই সকল দেবতাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন এবং তত্তদ্দেবতাশ্রিত গুণাবলীতে ভূষিত হইতে যত্ন করিবেন। প্রাচীনকালে দ্বিজমাত্রেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতেন বলিয়াই জগতের পূজ্য হইতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, উক্ত দেবতাগণের গুণসমূহের আধারভূত নবতন্তুবিশিষ্ট যজ্ঞসূত্র পুনরায় ত্রিতয়াকারে গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা ত্রিদণ্ডী প্রস্তুত করিয়া ধারণ করিতে হয়। দণ্ড অর্থে দমন বা সংযম। যোগ-বিজ্ঞানের প্রথম অঙ্গ যমই এই সংযমের অনুষ্ঠান মাত্র। উহা ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক অর্থাৎ কায়-সংযম, বাক্-সংযম ও মনঃ-সংযম। ১ম কায়-সংযম—বীর্য্য-ধারণাদি অনুষ্ঠান সহ ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ ; ২য় বাক্য-সংযম—ব্রহ্মবাক্য বা ভগবদ্‌বাক্যের আলাপন ব্যতীত বৃথা বাক্য ও মিথ্যাভাষণাদির পরিত্যাগ এবং ৩য় মনঃ-সংযম—চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা ব্রহ্মবস্তুর প্রতিই মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করা মাত্র। কায়দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড ও মনোদণ্ডরূপ এই ত্রিবিধ সংযম বা দমন অর্থাৎ দণ্ডের আধারভূতা তিনদণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী যজ্ঞসূত্র দ্বিজমাত্রেই ধারণ করিয়া থাকেন।

গৃহ্য সংগ্রহে উক্ত আছে—"ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতম্। রুদ্রেণ তু কৃতো গ্রন্থিঃ সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতম্ ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মা এই সূত্র প্রস্তুত করেন, বিষ্ণু তাহাকে ত্রিগুণী বা ত্রিদণ্ডী করেন, রুদ্র তাহাতে গ্রন্থি দেন এবং সাবিত্রী দেবী তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া

দেন। সেই কারণ যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি প্রদান কালে সূত্র নির্ম্মাণ বা গ্রন্থি-প্রদানার্থ সূত্র গ্রহণকালে ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যথা ঃ—

"ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ ॥"

তাহার পর ত্রিদণ্ডী করিবার সময় বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যথা ঃ—"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে ॥"

গ্রন্থিপ্রদান কালে দ্বিজমাত্রেই পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক দুইটী জানু উত্তোলন করিয়া, তাহারই উপর উক্ত সূত্রে ত্রিদণ্ডী ভাবে ফের দিয়া যজ্ঞসূত্র-গ্রন্থিদানের নিম্নলিখিত সংকল্প মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—

"ও অদ্বৈতস্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্দ্ধে শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতমে কলিযুগে কলি-প্রথম-চরণে জম্বুদ্বীপে শ্রীভারতখণ্ডে আর্য্যাবর্ত্তৈক দেশান্তর্গতে (অমুক) পুণ্যক্ষেত্রে, (অমুক) কলের্গতাব্দে (অমুক) অয়নে (অমুক) ঋতৌ (অমুক) মাসে (অমুক) পক্ষে (অমুক) তিথৌ (অমুক) বাসরে (অমুক) গোত্রাৎপন্নঃ শ্রী (অমুক) দেবশর্ম্মা (অমুক) বেদাঙ্গ (অমুক) শাখাশ্রিত শুভ যজ্ঞোপবীতার্থ-যজ্ঞসূত্রে-গ্রন্থিমহং করিষ্যে।" অন্যের জন্য হইলে—"(অমুক) গোত্রস্য (অমুক) দেবশর্ম্মণঃ যজ্ঞোপবীতার্থ-যজ্ঞসূত্রে-গ্রন্থিমহং করিষ্যামি।" এইরূপ পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।

অভিষিক্ত গুপ্তাবধূতাদি বা কোনও সাধনাশ্রমভুক্ত হইলে সাধক স্ব স্ব গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মগোত্রাদির স্মরণ ও গুরুদত্ত সাধক নামের উল্লেখ করিয়া যজ্ঞসূত্রে গ্রন্থি প্রদান করিবেন। কেহ কেহ গৃহস্থাশ্রমে গুপ্তাবধূতরূপে অবস্থানকালেও নিজবংশের গোত্র, প্রবর ও জন্মরাশি নির্দ্দিষ্ট নাম উল্লেখের পর ব্রহ্মগোত্রাদির উল্লেখ করিয়া থাকেন।

বেদ ভেদে সাধারণ গ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থি দিবার ব্যবস্থা আছে। সামবেদীয়-দিগের সাধারণ গ্রন্থি, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীর ব্রহ্মগ্রন্থি প্রশস্ত, কিন্তু অসমর্থ হইলে সাধারণ গ্রন্থিতে সকলেই গ্রন্থি দিতে পারেন।

গ্রন্থি-প্রদান-কালে রুদ্রকে স্মরণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যথাঃ—

"ও আবো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপ মবসে কৃণুধ্বম্ ॥"

অনন্তর গোত্রকার ঋষি অর্থাৎ বংশের আদিপুরুষ এবং প্রবরকার ঋষি অর্থাৎ গোত্রের প্রবর্ত্তকার বা গোত্রের ভিন্নতা-বোধক আর্ষের বা সেই গোত্রকার ঋষির প্রথম বংশ-পরম্পরার অপত্য কিম্বা শিষ্যপঙ্‌ক্তির নাম ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিয়া সূত্রের গ্রন্থিমূলক এক এক ফের দিয়া পরে পরে পূর্ব্ব-কথিত সাধারণ বা ব্রহ্মগ্রন্থি প্রদান করিতে হইবে। এই সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম উল্লেখ করিয়া তিনটী অন্তিম গ্রন্থি বা গাঁট দিতে হইবে। এইভাবে যজ্ঞোপবীত গ্রন্থিবদ্ধ হইলে, দশসংখ্যক ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে তাহা অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।

অনন্তর "এতৎ যজ্ঞোপবীতার্থ-যজ্ঞসূত্রং ওঁ ব্রহ্মার্পণায় অস্তু" এই মন্ত্রে ভূমিতে স্পর্শ করাইতে হইবে ও ঊর্দ্ধবাহু করিয়া দুই হস্তে সেই সূত্র শ্রীসূর্য্য ভগবানের প্রতি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবেন।

"ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং, বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।

আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥"

অতঃপর বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। অভুক্ত অবস্থায় যজ্ঞোপবীত-গ্রন্থি ধারণ করা বিধেয়। এক্ষণে সাধারণের অবগতির জন্য কতকগুলি প্রধান ও প্রচলিত গোত্র এবং প্রবরের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

গোত্র ও প্রবরের উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, প্রাচীনকালে ঋষিমুনিগণ আপন আপন আশ্রম-গো-সমূহের রক্ষার জন্য বেত্র ও কণ্টকযুক্তলতাপত্রাদি দ্বারা যে পরিমাণ ভূমি বেষ্টন করিয়া রাখিতেন, সেই গোরক্ষণ বা গোত্রাণকর বেষ্টনীর মধ্যে সেই সময় যাঁহারা বাস করিতেন অথবা পরে করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই গোত্রকর্ত্তা ঋষিমুনির পুত্র ও শিষ্যগণ আপনাদিগকে সেই গোত্রাধীন বা গোত্রীয় বলিয়া

পরিচয় দিতেন। পরবর্ত্তিসময়ে তাঁহাদেরই বংশপরম্পরায় পিতৃপরিচায়ক সেই আদিগোত্রের উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণই সেই কারণ পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পিতৃবংশ গুরুবংশ অথবা পুরোহিত-বংশের গোত্র পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

প্রবর বা প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা অর্থাৎ গোত্রের প্রবর্ত্তনকারী ঋষিমুনি। যাঁহারা গোত্রকার ঋষি বা মুনির পুত্র অথবা সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষভাবে শিষ্যস্থানীয় থাকিয়া উক্ত গো-ত্রাণ-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মোন্নতি করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিসময়ে তাঁহাদের পুত্র ও শিষ্যদিগের মধ্যে স্ব স্ব নাম সহ বংশ-পরিচয়-বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রবর নামে প্রবরকর্ত্তা ঋষি-মুনি বলিয়া পরিচিত। বহু প্রবরকর্ত্তা ঋষিমুনি বলিয়া পরিচিত। বহু প্রবরকর্ত্তা কালে গোত্র প্রতিষ্ঠাও করিয়া গিয়াছেন।

গোত্র ও প্রবরের তালিকা।

	গোত্র	প্রবর
১।	অনাবৃকাখ্য—	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।
২।	অব্য—	অব্য, বলি, সারস্বত।
৩।	আঙ্গিরস -	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।
৪।	আত্রেয়—	আত্রেয়, শাতাতপ, শাঙ্খ্য।
৫।	আলম্বায়ন—	আলম্বায়নী, সালঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
৬।	উপমন্যু—	উপমন্যু, আঙ্গিরস, ভারদ্বাজ।
৭।	কণ্ব—	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নবৎ।
৮।	কাঞ্চন—	কাঞ্চন, অশ্বথ, দেবল।
৯।	কাত্যায়ন—	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।
১০।	কাণ্ব্যায়ন—	কাণ্ব্যায়ন, আঙ্গিরস, ভারদ্বাজ, আজমীঢ়, বার্হস্পত্য।
১১।	কাশ্যপ—	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।
১২।	কুশিক—	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।

১৩। কৃষ্ণাত্রেয়— কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবস।

১৪। কৌণ্ডিণ্য— কৌণ্ডিণ্য, অস্তিমিল, কৌৎস।

১৫। গর্গ— গার্গ্য, কৌস্তভ, মাণ্ডব্য।

১৬। গৌতম—গৌতম, ঔতথ্য, আঙ্গিরস; মতান্তরে—গৌতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।

১৭। ঘৃত-কৌশিক—ঘৃত-কৌশিক, বিশ্বামিত্র, দেবরাট্।

১৮। জমদগ্নি—জমদগ্নি, ঔর্ব, বশিষ্ঠ।

১৯। জাতুকর্ণ—জাতুকর্ণ, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ।

২০। জৈমিনি—জৈমিনি, উতথ, সাঙ্কৃতি।

২১। বশিষ্ঠ—বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃত। মতান্তরে কেবল বশিষ্ঠ।

২২। বাত—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

২৩। বাৎস্য—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

২৪। বিষ্ণু—বিষ্ণু, বৃদ্ধ, কৌরব।

২৫। বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্র, মরীচ, কৌশিক।

২৬। বৃদ্ধি—কুরু, বৃদ্ধি, অঙ্গিরা, বার্হস্পত্য।

২৭। বৃহস্পতি—বৃহস্পতি, কপিল, পাঞ্চ।

২৮। বৈয়াঘ—কুশিক, কৌশিক, ঘৃত-কৌশিক; মতান্তরে—কুশিক, কৌশিক, অবকুল।

২৯। ভরদ্বাজ—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।

৩০। মৌদ্গল্য—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

৩১। শকিন—শাকিন, পরাশর, বশিষ্ঠ।

৩২। শাণ্ডিল্য—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।

৩৩। সাঙ্কৃতি—অব্যাহত, মৈত্রি, সাঙ্কৃতি।

৩৪। সাবর্ণ—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

৩৫। সৌকালিন—সৌকালিন, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।

৩৬। ক্ষেত্রি—ক্ষেত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।

এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসী, অবধূত ও বৈরাগীদিগের মধ্যে প্রচলিত গোত্র যথা—

৩৭। পরব্রহ্ম (গোত্র)—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (প্রবর)।

৩৮। সচ্চিদানন্দ গোত্র--বিষ্ণু, বাসুদেব, চৈতন্য (প্রবর)। ইত্যাদি

এইবার ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্মানুসারে শ্রেণীবিভাগ এবং শাস্ত্রীয় জীবিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া সন্ধ্যারহস্য আরম্ভ করিব।

শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদ-পাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

জন্ম দ্বারা শূদ্রত্ব, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদ পাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে। বোধ হয় সেই কারণেই সকল সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপনয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বালকগণ আজিও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। যাহা হউক সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তন্মন্ত্রো ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞাত স্তস্মাৎ ব্রাহ্মণ-দেবতা॥"

সমস্ত জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারন্দ মন্ত্রের অধীন, সেই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণই অবগত আছেন। এই হেতু ব্রাহ্মণও দেবতা বলিয়া পরিচিত ও পূজিত।

যিনি সর্ব্বমন্ত্র দূরের কথা, গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-মন্ত্রও অবগত নহেন তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় মাত্র। যে আর্য্যশাস্ত্র ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই আবার কোন কোনও ব্রাহ্মণের গুণ-কর্ম্মের নিকৃষ্টতা হেতু যথেষ্ট নিন্দাও করিয়াছেন। গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ নির্দ্দেশও করিয়া দিয়াছেন।

"দেবোমুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

(১) দেব, (২) মুনি, (৩) দ্বিজ, (৪) ক্ষত্রিয়, (৫) বৈশ্য, (৬) শূদ্র, (৭) নিষাদ, (৮) পশু, (৯) ম্লেচ্ছ, (১০) চণ্ডাল, এই দশপ্রকার বিপ্র স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

১। "সন্ধ্যাস্নানং জপো হোমো দেবতা নিত্যপূজনং
অতিথিসেবনং নিত্যং দেব-ব্রাহ্মণ উচ্যতে।"

যে ব্রাহ্মণ নিত্য স্নান সন্ধ্যা জপ হোম ও দেবতা পূজাদি যথারীতি নিত্য-ক্রিয়া সাধনা করেন এবং অতিথিসেবায় তৎপর, তিনিই দেব-ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত।

২। "শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥"

যে ব্রাহ্মণ শাক পত্র ও ফলমূলেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যিনি প্রত্যহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে তৎপর তাঁহাকে মুনি বিপ্র বলে।

৩। "বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্য-যোগ-বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥"

যিনি সর্ব্ব-সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত পাঠ ও সাংখ্য এবং যোগ-বিচারে তৎপর সেই ব্রাহ্মণ দ্বিজ-বিপ্র বলিয়া কথিত হন।

৪। অস্ত্রাহতশ্চ ধর্ম্মে সংগ্রামে সর্ব্ব সম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রো ক্ষত্র উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ সম্মুখ সংগ্রামে ধনু-র্ব্বাণ দ্বারা নিজে আহত হন অথবা অন্যকে পরাস্ত করেন তাঁহাকে ক্ষত্রিয়-বিপ্র বলে।

৫। "কৃষিকর্ম্মরতো নিত্যং গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥"

যে ব্রাহ্মণ নিত্য কৃষিকর্ম্মরত এবং গবাদি পালনে নিরত ও বাণিজ্য যাঁহার ব্যবসায় তাঁহাকে বৈশ্য-বিপ্র বলে।

৬। লাক্ষালবণ সংমিশ্র কুসুম্ভ ক্ষীর-সর্পিষাং।
বিক্রেতা মধু-মাংসানাং স বিপ্রো শূদ্র উচ্যতে।"

যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা ও লবণ সম্মিশ্র (সংযুক্ত লবণাদি) ও কুসুম ফুলজাদি বর্ণ; দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং মাংস বিক্রয় করে সে শূদ্র-বিপ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

৭। "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স তেনৈব চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

যে ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত নহে, কেবল ব্রহ্মসূত্র (উপবীত) ধারণ জন্য গর্ব্বিত, এবং পাপরত সে ব্যক্তি পশু-বিপ্র নামে অভিহিত হয়।

৮। "বাপীকূপ তড়াগানামন্যেষাং সরসাদীনাং।
নিঃশঙ্কো রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥"

যে ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্কারহিত হইয়া বাপী, কূপ, তড়াগ অথবা অন্য কোনরূপ জলাশয় রোধ করে বা অপরের ব্যবহারে বাধা দেয় সে ব্যক্তি ম্লেচ্ছ-বিপ্র বলিয়া কথিত।

৯। "চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব শোচকো দংশকস্তথা।
মৎস্য মাংস সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥"

যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া চোর, দস্যু, প্রতারক ও প্রাণিগণের পীড়া-দায়ক হয় এবং সদা মৎস্য ও মাংসলোভী হয় সে ব্যক্তি নিষাদ-বিপ্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

১০। "ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥"

যে ব্রাহ্মণতনয় ক্রিয়াহীন, মূর্খ এবং সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াবিহীন তাহাকে চণ্ডাল-বিপ্র কহে।

কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, এইরূপভাবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই বিভিন্ন-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সকলেই আপনাপন অধিকারবিচ্যুত হইয়া নানাশ্রেণীতে অতি হীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। সকল বর্ণই ঘোর সঙ্করতায় পূর্ণ হইয়াছে। কেহ বর্ণসঙ্কর, কেহ কর্ম্মসঙ্কর, কেহবা সংস্কার-সঙ্কর, কেহবা আরূঢ়-পতিত অবস্থায় শূদ্রগৃহে জন্ম লইয়াও ব্রাহ্মণ্যানুরূপ ক্রিয়ানিরত, সাধুবৃত্তিপরায়ণ; আবার কেহ উচ্চ ও উচ্চতর বর্ণের মধ্যে এমন কি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতীব ঘৃণ্য স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, অনাচারী ও অত্যাচারী; উদরান্ন সংগ্রহ ব্যতীত তুচ্ছ বিলাসিতার মোহেও সকল অনর্থের মূল অর্থোপার্জ্জনের জন্য অতি অন্ত্যজ-বৃত্তি এমন কি শূকর ব্যবসায়, পশুচর্ম্ম বিক্রয় জন্য ভাগাড়ের ঠিকা, চর্ম্মকারের ব্যবসায়, ইংরাজী হোটেলে অখাদ্য বিক্রয় করিতেছে। আবার অবসর মত সমাজে অবাধে চলিয়াও যাইতেছে। ইহাই কলিকালের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। আর্য্যসন্তান ক্রমে এই-ভাবে অতি নিম্নপথে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই দুর্দ্দিনেও উন্নতি বা মুক্তির কামনা করেন, তাঁহারাই সেই পরম পূজ্যপাদ আচার্য্য ও আর্য্য ঋষিমুনিদিগের সত্যনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কেহ হও, আপন আপন বর্ণানুকূল ধর্ম্মাচরণ করিতে যত্নবান হও। অন্যের দোষ দেখিয়া তাহার সংশোধন বা তাহাকে ঘৃণা তাচ্ছিল্য করিবার পূর্ব্বে একবার নিজের দিকে ফিরিয়া দেখ—তুমি কে, তোমার অবস্থা কি, সে অনুপাতে কোন স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তোমাকে দেখিয়া অন্য কেহ ঠিক ঐরূপভাবে তোমার কোন কোনও কর্ম্ম আলোচনায় তোমাকেও ঘৃণা করিতে পারে কি না? সাধ্যমতে তাহারই সংশোধন করিতে তুমি যত্ন কর, তাহা হইলেই তুমি আদর্শরূপে জগতের শিক্ষক হইতে পারিবে। তোমাকে দেখিয়াই লোক শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তুমিও অনায়াসে শান্তি পাইবে ও ধন্য হইবে!

আমাদের কথা।

জাহ্নবীর পূতধারার ন্যায়—কোমল-কান্ত-পদাবলী একদিন যাহার গগন-পবন পবিত্র করিয়া সাহিত্যে স্বর্গ-মন্দাকিনীর ভাব-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিল; একদিন যাহার শ্যামল-তৃণ-শষ্পাচ্ছাদিত কোন এক নিভৃত-পল্লীর অজানা বালকের আকর্ষণে বঙ্গসাহিত্যে কি এক অমৃতময়ী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল; যাহার পবিত্র-ক্রোড়ে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত পীযূষনিস্যন্দিনী সাহিত্য-ধারার পূতপ্রবাহে স্নান করিয়া আমরা আজ পবিত্র ও ধন্য; সেই বঙ্গভাষা-জননীর শ্রীচরণসরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিবার উপযুক্ত সম্ভার আমাদের না থাকিলেও ভারতে তাহার অভাব নাই। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি ভারতের সাহিত্য-কুঞ্জে যে রাশি রাশি পবিত্র-কুসুম সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের মাতৃপূজার প্রথম উপকরণ। আর যে প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য "এবং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এই মহাবাক্যের উচ্চারণ করিয়া সমগ্র জগতের মানবসমাজের সম্মুখে সাম্যের শান্ত মহিমা উন্মোষিত করিয়াছে; যে সাহিত্য ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের শ্রবণ-মন্দিরে আনন্দের পীযূষধারা বর্ষণ করিয়া প্রথমেই গাহিয়াছিল—"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে-আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—আনন্দেন প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি"; যে সাহিত্য দেহাত্মাভিমান ও চিন্তা-বিষ-জর্জ্জরিত মানবকে শান্তির অক্ষয় সিংহাসনের উৎস-মূল দেখাইবার জন্য উদাত্ত-গম্ভীর-সুরে গাহিয়াছিল—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", —জগতের সেই ব্রহ্মাত্মবিদ্যাপ্রকাশক প্রাচীনতম সাহিত্যের অব্যয় অক্ষয়, সত্য নির্ম্মল উপদেশ-কুসুমরাজি আমাদের মাতৃপূজার দ্বিতীয় উপকরণ।

হে প্রিয়তম! এই উপকরণরাজি হস্তে আজ আমরা তোমার কৃপাভিক্ষার জন্য—তোমারই পুণ্যদ্বারে সমাগত! একদিন তুমিই বলিয়াছিলে—কর্ম্ম-সমূহের সিদ্ধি-বিষয়ে "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্"—এই পাঁচটীই করণ। আমাদের কার্য্য-সিদ্ধির উপায়ীভূত ঐ কারণ-পঞ্চকের একত্র-সংযোগ-কর্ত্তা—সেও তো তুমি! ভাষাজননীর পূজার আয়োজনে আমাদের যে ত্রুটী-বিচ্যুতি

ঘটিয়াছে,—তাহা পূর্ণ করিয়া দাও প্রভু! আমাদের প্রদত্ত এই "ধর্ম্মপ্রচারক"-রূপ পুষ্পাঞ্জলি যেন সেই রাজীবচরণের স্পর্শসুখ অনুভব করে! তাহাতেই আমাদের ঋদ্ধি—তাহাতেই আমাদের সিদ্ধি।

মানুষের জীবন যেমন কৌমার, যৌবন ও জরারূপ তিন স্তরে বিভিন্ন—সাহিত্যেরও তেমনই তিনটী স্তর আছে। আমাদের বঙ্গ সাহিত্য—আজ সেই স্তরের মধ্যাবস্থা যৌবনস্তরে সমাগত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের যৌবন-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই,—তাহার অবয়বপূর্ণতার প্রথম উন্মেষেই—কি যেন একটা উচ্ছৃঙ্খলভাব তাহার শরীরে দেখা দিয়াছে। তাহার কারণ-সমূহের মধ্যে—প্রধান ও বিশিষ্ট কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিমূলে গন্ধহীন বিদেশীয় সাহিত্যের প্রভাব ও ধর্ম্মসংস্রবহীনতা। প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, যে, ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা যায় কিসে? আমাদের মনে হয়—যদি আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি—সাহিত্যের অঙ্গে ধর্ম্মের ফল্গুস্রোত প্রবাহিত করিতে পারি,—যদি আমরা সাহিত্যকে আমাদের সেই পূর্ব্বতন ভারতের গৌরবময় মনীষিবৃন্দের আবিষ্কৃত—অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সুদৃঢ় বন্ধনে সম্বদ্ধ করিতে পারি—আমাদের অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে এই উচ্ছৃঙ্খলতার ধ্বংস হইতে পারে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—"যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইতে পারে না। তাহা জাতির ভাবানিহিত ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।" তাই বলিতেছিলাম—যদি আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের মেদ মজ্জায় নৈতিক-সংশুদ্ধির মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারি,—তবেই আমরা—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া জগতে ভগবানের রাজত্ব—প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইব।

সাময়িকী।

"ধর্ম্মপ্রচারক" প্রথমে মুঙ্গের হইতে বাহির হয়। তাহার পর "ভারত-বর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা" শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের শাখা-সভারূপে পরিণত হইলে, ঐ সভার ইচ্ছায়—"ধর্ম্মপ্রচারক" শ্রীমহামণ্ডলের বঙ্গভাষায় মুখপত্ররূপে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের ইচ্ছানুসারে ইহার প্রকাশস্থল —কাশীধাম হইতে কলিকাতায় পরিবর্ত্তিত করা হয়। কয়েকটী বিশেষ কারণবশতঃ ধর্ম্মপ্রচারকের প্রচারকার্য্য কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। সম্প্রতি শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের বিশেষ প্রেরণায় উহা শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের মুখপত্ররূপে নবপর্য্যায়ে পুনরায় প্রকাশিত হইল। ইহার দ্বারা বঙ্গীয়-সমাজের সেবা এবং বঙ্গ-ভাষা-জননীর শ্রী ও পুষ্টি সাধিত হইলে আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নূতন ডিক্লারেসন পাইতে বিলম্ব হওয়ায়, বৈশাখ সংখ্যা "ধর্ম্মপ্রচারক" প্রকাশে এই অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে। আগামী সংখ্যা হইতে "ধর্ম্মপ্রচারকের" নিয়মিত প্রচারে যাহাতে কোনরূপ বিলম্ব না ঘটে, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে।

এতদিন আমরা "ধর্ম্মপ্রচারক"-পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই বলিয়া, কোন সভ্যকেই শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের চাঁদার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিই নাই; তাহাতে মণ্ডলের অনেক টাকা সভ্যগণের নিকট বাকী পড়িয়াছে। এক্ষণে আমরা নবোৎসাহে এই কার্য্য-পরিচালনায় পুনরায় প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীবিশ্বনাথের কৃপায় যাহাতে আমরা নিয়মিত সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে মণ্ডলের সভ্যগণের সহায়তা একান্ত প্রার্থনীয়। আশা করি, মণ্ডলের ধর্ম্মপ্রাণ পুরাতন ও নূতন সভ্যমহোদয়গণ মণ্ডলের এই সাধু-কার্য্যে সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনের নূতন উন্মেষের সূচনারূপ এ পবিত্র হোমাগ্নিকে চির-প্রজ্জলিত রাখিবেন।

আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার সৎসাহিত্যের উন্নতির উপর সেই জাতীয় জীবনের উন্নতি ও বিশুদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু, আমাদের সাহিত্যে এখনও সেই অধ্যাত্ম-জ্ঞানপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থরত্ন সমূহের অনুবাদ অতীব বিরল। বঙ্গসাহিত্যের গতি এ ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনেও—কেবলমাত্র রস-রচনার দিকেই অনুধাবিত। কিন্তু আমাদের মনে হয়—যতদিন সেই সমস্ত গ্রন্থনিচয়ের বঙ্গানুবাদ দ্বারা আমরা বঙ্গভাষা জননীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে না পারি—ততদিন আমরা জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সকল জাতির পশ্চাতেই পড়িয়া থাকিব। এই সকল

বিষয় চিন্তা করিয়া শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের বঙ্গপ্রান্তীয় সভা শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডলের শাস্ত্র-প্রকাশ-বিভাগ বঙ্গভাষা-জননীর ভাণ্ডার অক্ষয়-রত্ননিচয়ে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচাররূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি এই মহাযজ্ঞে সফলতা প্রদান করুন।

শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ প্রথমেই স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজীর লিখিত গ্রন্থাবলী "ধর্ম্মকল্পদ্রুম গ্রন্থমালা"-নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া, দুই সংখ্যায় দুইখানি অমৃতের পথপ্রদর্শক গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার একখানি, ধর্ম্ম, দানধর্ম্ম ও তপোধর্ম্ম ;—দ্বিতীয়খানি পুরাণতত্ত্ব।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের আগ্রহে শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অন্যতম পরিচালক, ভারতের প্রধান ধর্ম্মবক্তা স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজী মহারাজ বিগত ফাল্গুন মাস হইতে বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া তিনটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এত লোকসমাগম হইয়াছিল যে, সেরূপ জনতা-স্রোত বহুদিন, ধর্ম্ম বক্তৃতা-ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পরে তিনি মাড়োয়ারী-সম্প্রদায়ের অনুরোধে "বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ে" হিন্দীভাষাতে ধর্ম্মবিষয়ক কয়েকটী বক্তৃতা দেন। বর্ত্তমান সময়ে স্বামীজী ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চন্দ্রনাথ-তীর্থ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য দ্বারা—তত্তৎস্থানের অধিবাসীবৃন্দের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের নূতন উন্মেষ আনয়ন করিয়াছেন। স্বামীজী খুলনা, যশোহর প্রভৃতি আরও কয়েকটী স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আগামী জুন মাসেই কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে পাঠকবর্গের গোচর করিব।

মহতের কর্ত্তব্য মহনীয়ের সম্মান করা—তাঁহাদের উপযুক্ততা দৃষ্টে—তাঁহাদের যোগ্যমান অর্পণ করা। সেই মহৎ সঙ্কল্পকে অগ্রণী করিয়া, হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মসভা শ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল তাহার বঙ্গপ্রান্তীয় সভার নির্ব্বাচিত সজ্জনগণকে প্রতিবৎসরই উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করিয়া আসিতেছেন। ভারতের প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রদত্ত সে সম্মান বাঙ্গালী দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এ বৎসরও শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল বঙ্গসুধীগণের সম্মান-পূজার অনুষ্ঠানের এক বিরাট আয়োজন করিতেছেন। আশা করি, দেশ মাতৃকার সুসন্তানগণের এ সম্মানাবসরে মণ্ডলের প্রত্যেক সভ্যই—মণ্ডলের কার্য্যের সফলতা সাধনে তাঁহাদের মন প্রাণ নিয়োজিত করিবেন।

নব পর্য্যায়।
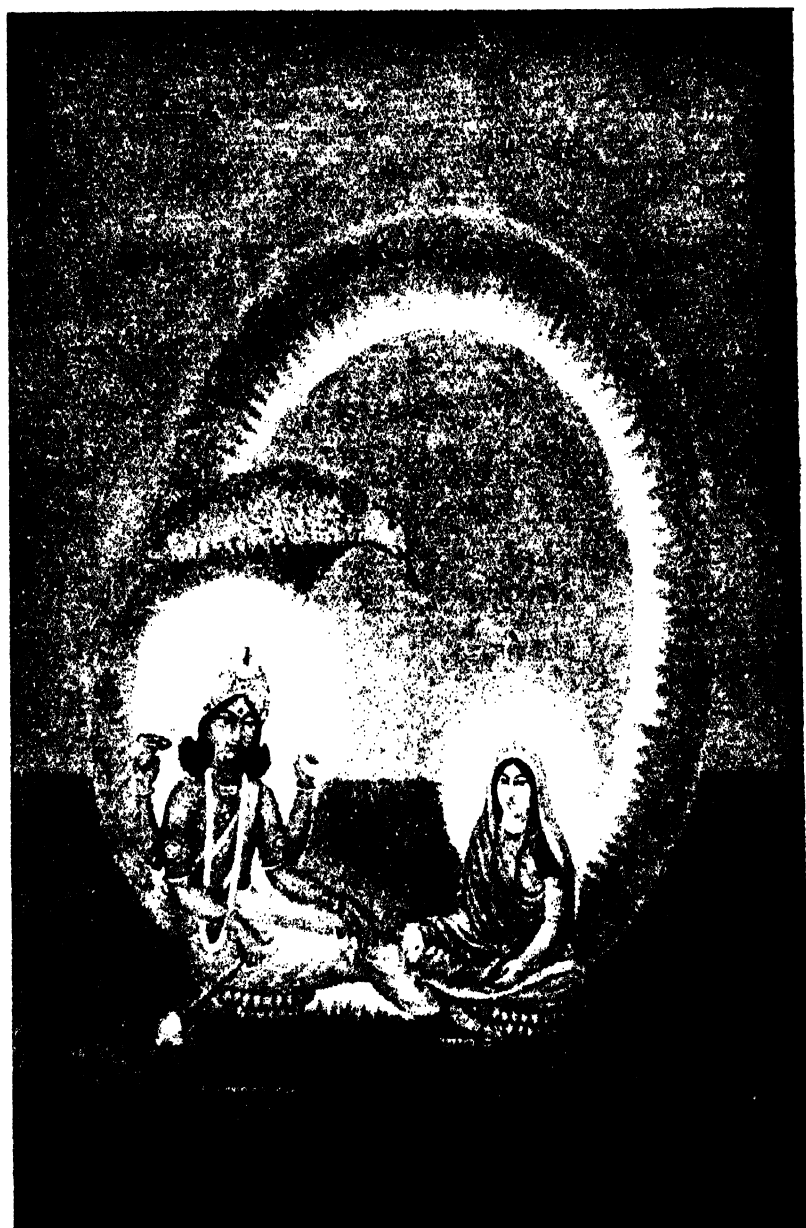
অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

১ম ভাগ | জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩২৬। ইং মে, ১৯১৯। | ২য় সংখ্যা।

সময়।

বহুক বহুক প্রবাহ তোমার
বহিয়া আমার জীবন তরী ;
তোমার অধীর প্রবাহের শেষে
চিরধীর নীরে ভাসেন হরি।

উষার আলোকে ছাড়িল তরণী
শুনিতে শুনিতে পিকের গান,
বাহিতে বাহিতে কেটেছে দুপুর,
আর কত দিন এ দিনমান ?

জীবন-গগনে হেলিয়াছে ভানু,
অপরাহ্ণ-ছায়া ঘিরিছে দিক,
কুলায় ফিরিতে আকুল হৃদয়
ফিরিবার ডাক ডাকিছে পিক।

আমারি ভবনে লয়ে যাও মোরে ঃ
তবে কেন আসে আঁখিতে জল ?
যার কাছে ছিনু তারি কাছে নিতে
পলের পরেতে আসিছে পল।

দুদিনের পথ দুদিনে ফুরাবে ;
সে চিরদিনের গৃহের দ্বারে
সে চিরদিনের আপন জনেরে
পাইয়া ভাসিব হরষ ধারে।

এ পথের ক্লেশ নিমেষে কাটিবে,
মুছে যাবে সব আঁখির জল,
এ আঁখির জলে সিঞ্চিত তরুর
ফলিবে মধুর অমৃত ফল।

প্রাণের রাগিনী না বাজিতে কত
খুলিয়া গিয়াছে প্রাণের তার,
কত সাধ করে গলায় পরিতে
ছিঁড়িয়া গিয়াছে ফুলের হার।

ভালবাসা দিয়ে উপেক্ষা পেয়েছি,
যত্ন বিনিময়ে যে অবহেলা,
সব ভুলে যাব সে ভালবাসার
দেখিয়া উদার অনন্ত খেলা।

সেথা আশা নহে আঁধার নীরদে
ক্ষণ প্রভাময় দামিনী ছটা,
নিজে প্রভাময় নবীন নীরদ,
চির আলোকের সে ঘন ঘটা।

বহুক বহুক প্রবাহ তোমার
বহিয়া আমার জীবন তরী :
এই প্রবাহের অন্তে আছে সেই
অনন্ত প্রেমের সাগর হরি।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র।

———

জীবতত্ত্ব।

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম, এ, বি, এল।]

ঈশ্বরে অনন্যভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞান-সাধনা দ্বারা আমাদের সংসার হইতে মুক্ত হইতে হয়। জ্ঞান-সাধনার দ্বারা—আমরা যে সংসারে বদ্ধ আছি, তাহার স্বরূপ বন্ধনের কারণ ও বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় জানিতে হয়, জীব আমাদের স্বরূপ কি তাহা জানিতে হয় এবং যে সাধনার দ্বারা জীব আমাদের স্বরূপ জানা যায়, তাহাও জানিতে হয়। এ জ্ঞান লাভ না হইলে, সংসার হইতে মুক্তির জন্য—আমাদের স্বরূপ-লাভের জন্য সাধনা-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অগ্রে জীবকে তাহার স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে হয়, তবে তাহার স্বরূপ প্রাপ্তি জন্য সাধনায় প্রযত্ন হইতে পারে।

যদি কোন রাজপুত্র দৈববশে আশৈশব দরিদ্র কৃষকের গৃহে প্রতি-পালিত হয়, তবে সে আপনাকে দরিদ্র কৃষক বলিয়াই জানে এবং সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যখন সে জানিতে পারে, সে রাজপুত্র, দৈববশে রাজ্যভ্রষ্ট, তখন আর সে অবস্থায় তুষ্ট থাকে না—স্বরাজ্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। সেইরূপ আমাদেরও স্বরূপ কি, আমাদেরও প্রাপ্তব্য পরমপদ কি, তাহা সবিশেষ জানিলে, তাহা লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন হইতে পারে। অতএব এই প্রবন্ধে আমরা জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১০ম শ্লোকে জীবতত্ত্ব ও জীবের সংসারবন্ধনতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। যে জীব সংসার-বদ্ধ, যাহাকে অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা সেই বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক, বিশেষ সাধন-সম্পত্তিযুক্ত হইয়া সেই পরমপদ অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা সংক্ষেপে ৭ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের সনাতন অংশই জীবলোকে জীবভূত হয়। জীব ভগবানেরই 'অংশ' বা এক বিশেষ ভাব। পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পরা প্রকৃতিই জীবভূত হয়। ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূত যোনি। ভগবান্ই তাহাদের উৎপত্তির কারণ। ভগ-

বান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—মহদ্ ব্রহ্মই ভগবানের যোনি, তাহাতে তিনি গর্ভ-নিষেক করেন বলিয়া সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। ভগবান সর্ব্বভূতের বীজ-প্রদ পিতা (১৪।৩-৪)। পূর্ব্বে ১৪।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা এই জীবোৎ-পত্তিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—ভগবানের অংশ বীজরূপে মহদ্‌ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি-গর্ভে নিষিক্ত হইলে, কিরূপে জীবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখিয়াছি। জীব প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন হয়—ব্যষ্টি হয়—বলিয়া ইহাকে ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে। যতদিন এই প্রকৃতি-বন্ধন থাকে, ততদিন এই অংশভাব থাকে,—যাহা অবিভক্ত তাহা বিভক্তের ন্যায় থাকে।

ভগবদংশ যে জীব, তাহার কিরূপে সংসার-বন্ধন হয়, তাহা গীতার ৮ম হইতে ১০ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে দেখান যাইতেছে মাত্র। ভগবানের যে অংশ জীবভূত হয়, তাহা আত্মা। এই অধ্যাত্ম-ভাবই স্ব-ভাব। ভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—'মমাত্মা ভূতভাবনঃ' (৯।৫)। এই জীবরূপ ভগবদংশ—প্রকৃতির গর্ভে ভগবৎকর্ত্তৃক উপ্ত হইয়া জীবভাবযুক্ত হইলে, প্রকৃতিস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া প্রকৃতির গর্ভে আপনার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর গঠন করিয়া লয়। জরায়ুজ জীব যেমন মাতৃগর্ভে জরায়ুতে স্থিত হইয়া, মাতার নিকট হইতে আপনার শরীর গঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আপনার স্থূল শরীর গঠন করে, সেইরূপ ভগবদংশ বীজরূপে জীবভাবযুক্ত হইয়া প্রকৃতিতে নিষিক্ত হইলে প্রকৃতি গর্ভেই প্রকৃতি হইতে আপনার সূক্ষ্মশরীর গঠনোপযোগী উপকরণ—মন (অর্থাৎ বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন অর্থাৎ চিত্ত বা অন্তঃকরণরূপ উপকরণ) এবং ইন্দ্রিয়গণকে (বহিঃকরণকে) সংগ্রহ করিয়া আপনার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর গঠন করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়। প্রকৃতিগর্ভে জীব ক্ষেত্রের উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই ক্ষেত্র গঠন করিয়া লইলে, তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া—বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া, সেই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক তাহাতে বদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন বা অংশভাবযুক্ত হয়।

যাহাহউক, জীব যে এইরূপ ক্ষেত্রে বদ্ধ হয়, সেই ক্ষেত্র বা শরীর দুইরূপ—স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর। স্থূলশরীর বার বার পরিবর্ত্তন করিতে হয়; কিন্তু সূক্ষ্মশরীর যত দিন জীবভাব থাকে ততদিন স্থায়ী। জীব

এই শরীরের ঈশ্বর। জীব যখন মৃত্যুকালে স্থূল শরীর ত্যাগ করে, তখন সে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর লইয়া উৎক্রমণ করে। তখন সে মন (বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন বা অন্তঃকরণ) এবং ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াণ করে। আবার যখন স্থূলশরীর গ্রহণ করে তখন এই মন ও ইন্দ্রিয়রূপ অবয়বযুক্ত সেই সূক্ষ্ম শরীর লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণ করিয়া, স্থূল শরীর লাভ করিয়া এই মন বা অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়গণ বা বহিঃকরণযুক্ত সেই শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক বিষয় উপভোগ করে—বিষয় হইতে রূপ রসাদি গ্রহণ করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়।

যে জীব ভগবানের সনাতন অংশভূত, যে জীব এইরূপ সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে সংসারে গতায়াত করে, বার বার নানারূপ স্থূল শরীর লাভ করে ও স্থূল শরীর ত্যাগ করে, যে জীবের নানা অবস্থা—কখন স্থূল শরীরে স্থিত হয়, কখন স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া উৎক্রান্ত হয়, কখন স্থূলশরীরে অবস্থানপূর্ব্বক বিষয় ভোগ করে, প্রকৃতিজ ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ হেতু গুণযুক্ত হয় এবং এই গুণ হেতুই বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করে, উচ্চ নীচ নানাযোনিতে ভ্রমণ করে (গীতা ১৩।২১), তাহার স্বরূপ কি?

যে জীব এইরূপে সংসারে গতায়াত করে, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, মূঢ়েরা এই জীবের স্বরূপ বুঝিতে পারে না, যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারাই ইহাকে দেখিতে পান।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। (১।০)

কেবল তাহাই নহে। যাহারা চেতনবান্ বা বিবেকী এবং কৃতাত্মা বা বিশুদ্ধচিত্ত সেই যোগিগণই প্রযত্ন করিলে (বা ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইলে) আত্মাতেই ইহাকে অবস্থিত দেখিতে পান। আত্মাতে অবস্থিত অর্থে নির্ম্মল সাত্বিক জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অবস্থিত। যিনি এই বুদ্ধিরূপ আত্মাতে অবস্থিত (৬।৬ শ্লোকে আত্মশব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)—তিনিই জীবরূপী ভগবানের সনাতন অংশ, তিনিই জীবাত্মা, তিনিই পুরুষ। প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থায় জীবরূপে তিনি ক্ষর পুরুষ। তিনি প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া কর্ত্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা হন (১৩।২০)—প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হন, এবং গুণসঙ্গ

হেতু সংসারে বদ্ধ হইয়া বার বার সদসদ্ যোনি প্রাপ্ত হন (১৩।২১)। তিনি এই দেহে স্থিত হইলেও দেহ হইতে পর বা দেহব্যতিরিক্ত, তিনিই পরমাত্মা অর্থাৎ সাধারণতঃ দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিকে ঔপচারিক অর্থে যে আত্মা বলে, তাহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ ; তিনিই স্বরূপে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভোক্তা, ভর্ত্তা ও মহেশ্বর (১৩।২২), তিনিই স্বরূপে পরম পুরুষ বা পরমেশ্বর।

এই জীবের প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহা আরও বিশেষভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবানেরই সনাতন অংশ জীবভূত হয়। জীবভূত অর্থে জীব-ভাবযুক্ত। যিনি জীবভাবযুক্ত হন, তিনি জীব, ভূত, প্রাণী প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। বেদান্তে তাঁহাকে আত্মা বা জীবাত্মা বলা হইয়াছে। সাঙ্খ্যদর্শনে তাঁহাকে পুরুষ বলা হইয়াছে। গীতায় তাঁহাকে দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। এই পুরুষ জীবভাবযুক্ত হইয়া সংসার-বদ্ধ হন বলিয়া গীতায় তাঁহাকে ক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে। নানারূপ জীবভাবে বদ্ধ সংসারী পুরুষ বহু। এজন্য পুরুষকেই ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে যে যিনি এক, অদ্বিতীয়, বিভু, পরমেশ্বর, যাঁহাকে উপনিষদে শ্রুতিতে নিরংশ নিষ্কল বলা হইয়াছে, তাঁহার অংশ কল্পনা কিরূপে সম্ভব।

শঙ্কর তাহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, এ অংশ কল্পনা মায়িক বা অবিদ্যা-মূলক ; যেমন চক্ষুরোগে একই চন্দ্রকে বহু চন্দ্ররূপে দেখা যায়, সেইরূপ ইহা ভ্রমমূলক। কিন্তু এই অংশের কথা বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে যে, আদি পুরুষ চতুষ্পাৎ—'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' (ঋগ্বেদ ১০।৯০ সূক্ত)।

শুধু তাহাই নহে, ঋগ্বেদ আরও বলিয়াছেন যে, তিনি দ্যোতনাত্মক সর্ব্বলোকেরও অতীত ; অথ যদতঃ পরোদিবঃ—এই পরমপুরুষ বিশ্বরূপ (Immanent) অথচ বিশ্বাতীত (Transcendent)। এ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে। অতএব বিশ্বভূতগণ তাঁহার একপাদমাত্র বা এক অংশমাত্র গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। (১০।৪২)

এই বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্রহ্মের সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে অংশ ভাব হয়। বিশ্বরূপ উপাধিতে তিনি নানাভাবে নানারূপ বিভূতিযোগে অভিব্যক্ত হন বলিয়া তাঁহার এইরূপ অংশভাব হয়। শঙ্কর বলেন, যেমন একই বিভু আকাশ ঘটমঠাদি বিভিন্ন উপাধিতে স্থিত হইয়া ঘটাকাশ-মঠাকাশরূপে বিভক্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ এক বিভু পরমাত্মা নানা উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন বহু হইয়া অংশের ন্যায় হ'ন। এইরূপে তিনি বহু জীবভাবের মধ্যে আত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া বহু জীবভাবযুক্ত হন। এজন্য সেই জীবভাবযুক্ত আত্মাকে পরমেশ্বরের অংশ বলা যায়। এ জগৎ অনাদি, সুতরাং জগৎ-কারণ পরমেশ্বরের যে জীবভূত অংশ, এজগতে জীবরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও অনাদি—তাহাও সনাতন। আর এই জীবস্থানে অভিব্যক্ত তাহার ভোগ্য সংসারও অনাদি অব্যয়।

যাহা হউক জীবভাব কোথা হইতে কিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং ভগবানের অংশ কিরূপে তাহাতে বদ্ধ হয়, এক্ষণে এই প্রশ্নের উত্তর যথাসাধ্য বুঝিতে হইবে। গীতা হইতে জানা যায় যে ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। ইহাই যে মুখ্যপ্রাণ, তাহা ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণে আছে—"কতমা সা দেবতেতি" "প্রাণ ইতি হোবাচ" 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে...প্রাণবন্ধনং হি সৌম্যং মনঃ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও আছে "যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণন্তর্হি বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং শ্রোত্রং স যদা প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্তে"। ছান্দোগ্য শ্রুতি ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ বলিয়াছেন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে,—

"প্রাণাদ্ধি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতানি
জীবন্তি প্রাণং প্রয়ন্তি" (৩।৩।১)।

কঠোপনিষদে আছে,—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" (২।৩।২)। এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রাণে কল্পিত (যথানিয়মে প্রবর্ত্তিত) হয়। কৌষীতকি উপনিষদে আছে 'অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা

সৈষা প্রাণে সর্ব্বাপ্তি র্যো বৈ প্রাণং সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ...প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি ॥" (৩৩)

প্রশ্নোপনিষদে আছে,—

"স ঈক্ষাঞ্চক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি। স প্রাণমসৃজত (৬।৩—৪)"

এই মুখ্য প্রাণাখ্য পরাপ্রকৃতি জীবভূত হয়। ইহাই প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি অহঙ্কার মন এবং দশ ইন্দ্রিয়গণকে বা মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণপূর্ব্বক জীবের শরীর গঠন করে। পরমেশ্বর আত্মারূপে এই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানহেতু প্রাণযোগে এই সূক্ষ্মশরীর চেতনবৎ হয়, তাহাতে অন্তঃকরণের জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তারূপ জীবভাবের অভিব্যক্তি হয়। আত্মা অন্তঃকরণরূপ উপাধির সহিত তদাত্ম্য হেতু জীবভাবযুক্ত হয়। এইরূপে অপরিচ্ছিন্ন বিভু আত্মা অন্তঃকরণ উপাধিতে বদ্ধ হইয়া জীব হয় এবং জীবভাবে পরমাত্মার অংশরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, প্রাণোপাধিযুক্ত আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, অন্তঃকরণ জীবভাববিশিষ্ট হয়। আর আত্মা সেই অন্তকরণের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া জীব বা জীবাত্মা হ'ন।

সাঙ্খ্যমতে অবিবেক হেতু পুরুষ যতদিন প্রকৃতিবদ্ধ থাকে ও প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত লিঙ্গশরীরযুক্ত থাকে, ততদিন তাহার মুক্তি হয় না। শঙ্কর বলেন—অবিদ্যা হেতু যতদিন চিত্তরূপ উপাধিতে জীবের আত্মাধ্যাস থাকে, ততদিন তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক জীবাত্মা যে শরীর-বদ্ধ হইয়া এই জীবলোকে জীবভূত থাকে, সেই শরীর স্থাবর জঙ্গম-ভেদে ভিন্ন। বৃক্ষলতাগুল্মাদি প্রভেদে স্থাবর বহুপ্রকার ও পশু-পক্ষিমনুষ্যাদি-ভেদে জঙ্গমও অসঙ্খ্য। আব্রহ্মস্তম্ব সমুদায়ই জীব। প্রত্যেক জীব প্রকৃতির আপূরণে ক্রমে নিম্নজাতীয় জীব হইতে উচ্চজাতীয় জীবে উন্নীত হয়। পরে সেই উচ্চজীবভাবযুক্ত হইয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। কত জন্ম পরে যে জীব এইরূপে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা বলা যায় না। কর্ম্মফলে প্রকৃতির আপূরণে বা ভগবদনুগ্রহে এইরূপ মনুষ্যযোনি লাভ হয়, কিন্তু মনুষ্য-যোনি একবার লাভ করিতে পারিলেও অশুভকর্ম্মফলে আবার তাহার নিম্ন

যোনিতে গতি হয়। বহু জন্ম ধরিয়া সুকৃত সঞ্চিত হইলে, তবে তাহার দেবভাবের বিকাশ হয়। সে দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষয়ে সে মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন করে। এইরূপে কত জন্ম ধরিয়া তাহার সংসারে গতাগতি হয়, তাহার জীবভাবের কতরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কে বলিতে পারে! কত জন্মের পরে তাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়—দৈবী-সম্পদ্ লাভ হয়, তাহাইবা কে বলিতে পারে। বহু জন্ম ধরিয়া পুণ্য-সঞ্চয়ের পর তবে তাহার শুদ্ধ চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহার সংসারবন্ধন মুক্ত হইবার প্রযত্ন হয়। এবং পরিশেষে সংসারবন্ধন-হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তের সংস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া তবে সে জীব পরমপদ লাভ করিতে পারে। যতদিন তাহার পরমপদ প্রাপ্তি না হয়, ততদিন তাহার জীবত্ব দূর হয় না,—ততদিন সে ভগবানের জীবভূত অংশরূপে তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকে।

এইরূপে আমরা যে সংসারদশায় ভগবানের জীবভূত অংশ, তাহা বুঝিতে পারি। উপনিষদেও এই অর্থে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। জীবের এই অংশ-বাদ সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে,—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥"
(মুণ্ডক উপ, ২।১।১)।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"
(মুণ্ডক উপ, ১।১।৭)।

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ
সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥"

এ স্থলে প্রাণ অর্থে জীবাত্মা (নীলকণ্ঠ)। কেন না শ্রুতিতে আছে,—
"অস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ।" (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৫)।

অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে অক্ষর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, এই সকল জীব সম্ভূত হয়। জীব পরমাত্মার অংশ।

শ্বেতাশ্বতর হইতে জানা যায় যে, জীব এই সংসার-বৃক্ষকে আশ্রয় করে এবং তাহাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মিষ্ট স্বাদু ফল (পিপ্পল) ভক্ষণ করে এবং অনীশ বা দীন শক্তিহীন হইয়া মোহ ও শোকযুক্ত হয়। ইহা উক্ত উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সপ্তম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। জীবের এই স্বরূপসম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১৩শ শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিব। সপ্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।

স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥" (৫।৭)

অর্থাৎ অনীশ আত্মা, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণসহ অন্বিত হইয়া সুখ দুঃখাদি ফলযুক্ত কর্ম্মের কর্ত্তা হন, এবং সেই কৃত কর্ম্মের ফল উপভোগ করেন। তিনি বিশ্বরূপ (অর্থাৎ নানা যোনিতে ভ্রমণ হেতু নানারূপ হন)। তিনি ত্রিগুণ ও ত্রিবর্ত্মযুক্ত হন, অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও জ্ঞান—এই তিন মার্গে বিচরণ করেন এবং তিনি প্রাণের অধিপতি হইয়া স্বকর্ম্ম সকল দ্বারা সঞ্চরণ বা সংসারে গতায়াত করেন।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহপ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ (৫।৮)

এই অনীশ আত্মা দেহবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়াও প্রতি জীব-হৃদয়ে স্থিত হইয়া ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ মাত্রের ন্যায় হন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি সংকল্প (মন) ও অহঙ্কার বুদ্ধির গুণ ও আত্মগুণ (বা শারীর গুণ) সমন্বিত হ'ন। এবং তিনি পরিচ্ছিন্নভাবে, লৌহশলাকার অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম ও অশ্রেষ্ঠরূপে দৃষ্ট হন। জীবভাবে আত্মা অতি ক্ষুদ্র হ'ন।

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (৫।৯)

কেশাগ্রের শত ভাগের একভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম, জীব সেইরূপ সূক্ষ্মরূপে বিজ্ঞেয় হন! অথচ এই জীব আনন্ত্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত। সর্ব্বপরিচ্ছেদ দূর হইলে—অশরীর হইলে জীবাত্মা ভূমা—সর্ব্বব্যাপক হয়।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥" (৫।১০)

এই জীব-ভাবাপন্ন আত্মা পুরুষ স্ত্রী বা নপুংসক কিছুই নহেন। তবে যেরূপ শরীরযুক্ত হন, সেই ভাবই গ্রহণ করেন।

"সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী।
স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥" (৫।১১)

অর্থাৎ দেহী সংকল্প স্পর্শ দৃষ্টি মোহে রূপানুক্রমে বা পরে পরে নানাস্থানে আপন কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে, অন্ন ও জলসেচন দ্বারা আত্ম-বিবৃদ্ধ (নিজকর্ম্ম দ্বারা বিশেষ পুষ্ট) জন্ম পরিগ্রহণ করে।

"স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহো স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥"

অর্থাৎ দেহী নিজ গুণ সকল বা প্রাক্তন জন্ম ও সংস্কার বন্ধনের দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম বহু রূপকে গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম কীটাণু—ক্রিমি কীটাদি হইতে মনুষ্যাদি স্থূল দেহ গ্রহণ করে এবং সেই সকল রূপের বা দেহের ক্রিয়াগুণ ও আত্ম (দেহ) গুণ সকল দ্বারা সেইরূপ সংযোগের হেতু 'অপর' বা ক্ষুদ্র-রূপে দৃষ্ট হন।

এইরূপে গীতার এই শ্লোকে ও উপনিষদে যে জীবের অংশত্ব ও

অণুত্ববাদ উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ,—বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে উৎক্রান্তি গত্যধিকরণে ১৯—৩২ সূত্রে এবং অংশাধিকরণে ৪২—৫৩ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষ নিরাস-পূর্ব্বক জীবাত্মার বিভুত্ববাদ ও ব্রহ্মৈক্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

"তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" ॥ (২৯)

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"অর্থাৎ আত্মা অণু, ইহা ঠিক নহে। কারণ উৎপত্তির অশ্রবণ, ব্রহ্মের প্রবেশ, ও জীবব্রহ্মের তাদাত্ম্যোপদেশ, এই সকলের দ্বারা পরব্রহ্মেরই জীবভাব প্রাপ্তি জানা গিয়াছে। যদি পরব্রহ্মই জীব, তবে ব্রহ্মের পরিমাণই জীবের পরিমাণ—এই নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত। শ্রুতিতে শুনা যায় পরব্রহ্ম বিভু ; সুতরাং জীবও বিভু।

"ঐরূপ হইলেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত" যিনি "এই সকল প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) মধ্যে বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রৌত ও আত্ম-নিত্যতার উপদেশ এবং আত্মা সর্ব্বগত ইত্যাদি স্মার্ত্ত জীববিষয়ক বিভুত্ব-কথন সমস্তই সঙ্গতার্থ হইতে পারে।......আত্মার শরীর-পরিমাণতা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। অণু-পরিমাণের ও মধ্যম পরিমাণের নিষেধ হওয়াতে অবশেষ-বশতঃ জীবের মহৎ পরিমাণতাই স্থির হয়।......বুদ্ধির যোগ ব্যতীত কেবল আত্মার সংসারিত্ব নাই। উপাধিভূত বুদ্ধির ইচ্ছাদি গুণে অধ্যস্ত হ'ন, তাই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসার হয়। অতএব বুদ্ধিগুণ অনুসারেই তাঁহার সেই সেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত আছে। উৎক্রান্তি—শরীর হইতে নির্গত হওয়া ও লোকান্তর গমন, সমস্তই বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি-ঘটিত। বিভু আত্মার স্বতঃ উৎক্রান্ত্যাদি নাই। কিন্তু বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি তাঁহাতে আরোপিত হয়।.....শাস্ত্র (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) জীবকে অণু বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। উহা সঙ্গত হইতে পারে, যদি অণুত্ব ঔপচারিক ও আনন্ত্য পারমার্থিক হয়।" (পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

পরমার্থতঃ জীবাত্মার ও পরমাত্মার যে সম্বন্ধ তাহা বেদান্তদর্শনের অনেক সূত্র হইতে জানা যায়। বেদান্তদর্শনে 'প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ'

(১।৪।২০) 'উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ' (১।৪।২১) ও 'অবস্থিতেরিতিকাশকৃৎস্নঃ' (১।৪।২২) —এই তিন সূত্রে তিনজন প্রাচীন ঋষির মত উল্লিখিত হইয়াছে। ভোক্তা কর্ত্তা জ্ঞাতা জীবাত্মা অথবা কূটস্থ বিজ্ঞানাত্মা যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, এই অভেদবাদ এক অংশে ইহাদের অভিমত।

শঙ্কর এস্থলে ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বিজ্ঞানাত্মা (জীব) যদি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান অসম্ভব হয়। সুতরাং শ্রুতির 'এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব শ্রৌত প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ জীব ব্রহ্মে অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য.........ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত।

"ব্রহ্মই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীব যখন ধ্যান-জ্ঞানাদি সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষশূন্য হন, তখন তিনি উপাধিসমূহ হইতে উৎক্রান্ত -উত্থিত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর জীবভাব থাকে না; জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয়; সুতরাং তখন জীব ও পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি হয়। সেই ঐক্য বা অভেদ লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ঐ কথা বলিয়াছেন ইহা ঔড়ুলোমি মুনির অভিপ্রায়।

... ...

"কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি অযুক্ত নহে......কাশকৃৎস্নের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন বলিলেও প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির অপেক্ষা দর্শন করায় তন্মতে জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্য্য-কারণভাব থাকা প্রতীত হয়। ঔড়ুলোমি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, জীব ও পরমেশ্বরের ভিন্নতা অবস্থাঘটিত। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরেরই অন্যবিধ অবস্থা। এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই শ্রুতির অনুগামী। ......শ্রুতি যে স্ফুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন—তাহাও ঔপচারিক।... ...২০শ সূত্রে প্রতিজ্ঞা এই—'আত্মা বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়' 'এবং এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত।' এই আত্মাই

জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান, এবং দুন্দুভির দৃষ্টান্তে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন এক, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহদ্ভূতের উত্থানবর্ণনার দ্বারা সূচিত হয়, ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত। ২১শ সূত্রের যোজনা এইরূপ—জীব উৎক্রান্তি-কালে (মোক্ষকালে) ধ্যান জ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, নিরুপাধি হয় সেভাবে ও সেকালে অভেদ। এই অভেদই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ইহা ঔড়ুলোমি মুনির মত। ২২শ সূত্রের যোজনা এই যে পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত। এ অর্থ কাশকৃৎস্ন মুনির অভিপ্রেত।"

(পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ)।

এইরূপে শঙ্করের অদ্বৈতবাদানুসারে জীব যে ব্রহ্মই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ইহা সিদ্ধান্ত হয়। বেদান্ত ডিণ্ডিমে আছে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' শ্রুতিতে আছে,—

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"

(ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ১২)

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
আপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোঽয়মাত্মা॥"

আরও উক্ত হইয়াছে,—"নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৮)।

ব্রহ্মই যে জীব হ'ন, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে জানা যায়। ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া বহু জীবভাবের সৃষ্টি করিয়া সঙ্কল্প করেন,—"হন্তানেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ।" অতএব জীবভাবের অধিষ্ঠাতা তাহাতে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাই ব্রহ্ম। তিনি অন্তরাত্মা, প্রত্যগাত্মা, বিজ্ঞানাত্মা। শঙ্কর এই অভেদ-

বাদস্থাপন জন্য বেদান্তদর্শনের ১।৪।২৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় অনেক শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শঙ্কর বলিয়াছেন—"অজমব্যয়মাত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে ন পরমার্থতঃ; তস্মান্ন পরমার্থসৎ দ্বৈতম্।"

বেদান্তসারে আছে, "নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বভাবং প্রত্যক্ চৈতন্যমেব আত্মতত্ত্বম্।"

গৌড়পাদাচার্য্য তাঁহার মাণ্ডুক্যকারিকায় লিখিয়াছেন,—

"জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্॥" (৩। ১৩)
"মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্ন তথাজং কথঞ্চন॥" (৩।১৯)
"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥" (১।১৬)

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে, উপাধি-পঞ্চকোষে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম জীব হ'ন, আর উপাধিমুক্ত হইলে তিনি স্বরূপে স্থিত হ'ন।

"কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।" (৩।৪)

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রুতির মহাবাক্য—'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহম্' প্রভৃতি পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মে অভেদবাদই উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই ঐ সকল শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য।

উপনিষদে ভিন্নভাবে জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। সংসার-দশায় জীব-ঈশ্বরে ভেদ সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে (১।১।১৭, ১।২।২২, ১।৩।১৭ সূত্রে) এই ভেদ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে মুক্ত জীবেরও কোন কর্তৃত্ব নাই, তাহা বেদান্তদর্শনে মুক্তজীবের "জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্বনিরাসক অধিকরণে" উক্ত হইয়াছে। বেদান্তভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই ভেদ স্পষ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন। তবে পরমার্থিক অর্থে পরমব্রহ্মস্বরূপ জীব ঈশ্বর ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। ব্যবহার-দশায় ভূতভাবযুক্ত জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশভূত হয়, ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদনুসারেও জীব অনীশ আত্মা। তিনি অমৃত অক্ষর হর হইলেও ভোক্তৃরূপে ক্ষর প্রধানের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্ষর হ'ন; আর ভোক্তৃভাব দূর হইলে ভোগ্য সংসার হইতে মুক্ত হইলে, তিনি অক্ষর স্বরূপ লাভ করেন। ঈশ্বর প্রেরয়িতা; তিনি ক্ষর ও অক্ষরের নিয়ন্তা; জীব তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার সাধনা করিলে মুক্ত হয়। যখন জীব এই পুরুষোত্তম স্বরূপ বা তাঁহার পরমধাম—পরম ব্রহ্মপদ লাভ করে, তখন তাহার জীবত্ব ঘুচিয়া যায়, তখনই পরমার্থতঃ জীবব্রহ্মে ভেদ থাকে না।

এইরূপে শাস্ত্র হইতে আমরা জীবব্রহ্মে ভেদবাদ ও অভেদবাদ এ উভয়বাদেরই আভাস পাই। ইহার মীমাংসায় শঙ্কর যে বলিয়াছেন, 'সংসারদশায় সংসারী শারীর আত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন', কিন্তু পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই—ইহাই সঙ্গত মনে হয়। পরমার্থতঃ জীবে জীবে বা জীবে ঈশ্বরে ভেদ নাই। তবে যতদিন সংসার দশা, ততদিন এই ভেদ স্থায়ী। যতদিন জীবের জীবত্ব বা সংসার-দশা থাকে, ততদিন এ ভেদও থাকে।

অদ্বৈত ব্রহ্মের তাত্ত্বিকত্বাধিকরণে বেদান্তদর্শনের (২।১।১৪ —২০ সূত্রে) এইরূপ ভেদাভেদবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সে স্থলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে একমাত্র অভেদবাদই তাত্ত্বিক—পারমার্থিক, আর ভেদবাদ বা ভেদাভেদবাদ উভয়ই ব্যবহারিক। বৈয়াসিক ন্যায়মালায় আছে,—

"ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌস্তো যদি বা ব্যবহারিকৌ।
সমুদ্রাদাবিব তয়োর্বাধা ভাবেন তাত্ত্বিকৌ।
বাধিতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবতো ব্যবহারিকৌ।
কার্য্যস্থ কারণাভেদাদদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকম্॥"

(২।১।৬।১১-১২ শ্লোক) সমুদায় বেদান্ত শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত।

(ক্রমশঃ)

সরমের-বাধা।

সেই দেশে মন জনম লভিতে চায় ;
বসনের ভার তীরেতে ফেলিয়া, যথা
যুবতী সিনানে যায়।

দুনয়ন তার উল্লাসে ভরিয়ে ওঠে
দুবাহু বাড়ায়ে ঝাঁপ দেয় তীর হতে
নাহি আর চায় ফিরে,
কেহ কি দেখিছে ? সব আশা যায় সরে
তটিনীর পূত-নীরে।
কালিমা-ধৌত নব যৌবন-রূপে
উজলিয়া দশ দিশি
স্রোতের সঙ্গে কত খেলা করে, তার
অণুতে অণুতে মিশি ;
নাহি আর বাধা ; লাজ ব্যবধান নাই,
চাহিবার কিছু নাই !
সব দিয়ে ফেলে প্রভুর চরণ-তলে
চাহিবার কিছু নাই !
শুধু মগন হইয়া যায় !
সে কারণ সেই দেশে —
মন, জনম লভিতে চায়।

আমি সমাজের নারী !
উচ্ছল স্রোতে নামিয়া, ডুবিয়া, লাজ
কিছুতে ছাড়িতে নারি।
সদা ভয় হয় ঐ তীর-তরু-তলে
দাঁড়ায়ে দেখিছে কেহ !

ভুলিতে পারি না তীরে তুলিয়াছি এক
আমার নূতন গেহ!

আমার সিনানে বসনের সব কালি
অঙ্গেতে লাগিয়া যায়;
তাই সেই দেশে নব জনম লভিতে
আকুল হৃদয় চায়!!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দীক্ষা-মুখে।

সাধন-শৈল—বহিঃপ্রাঙ্গণ।

(রূপক।)

[শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[পূর্ব্বে শিষ্য প্রশ্ন করিয়াছেন—মানব অজ্ঞানতাবশতঃ মায়ামোহে ভুলিয়া আত্মহারা হইতেছে, ইহা তাহাদের মনে আসিতেছে না কেন? আবার কেহ বা সাধারণ মার্গ ত্যাগ করিয়া কণ্টকময় পর্ব্বতগাত্র অবলম্বন করিতেছে, তাহাদেরই বা গতি কোথায়? এবং কোন্ মায়াবীর প্রলোভনে তাহারা আত্মহারা হইতেছে?]

গুরু।—সেই যে মন্দিরের বহিঃস্থ প্রাঙ্গণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উঠিতে হইলে কেবল যে ঐ সম্মুখে দেদীপ্যমান পূর্ব্বোল্লিখিত ঘূর্ণায়মান পর্ব্বত বেষ্টনকারী পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়, তাহা নহে। ঐ সুদীর্ঘ পথের স্থানে স্থানে তুঙ্গ বা ঋজু আরোহণোপায় আছে। সেই দুর্গম পথ সাহায্যেও ঐ প্রাঙ্গণে অধিরোহণ করা যায়। যদি আরোহীর

হৃদয়ে সাহস থাকে, মনে শক্তি থাকে, তাহা হইলে এই ঋজু পথের সাহায্যে, অল্পতর সময়ে ঐ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়। তাহা হইলে তাহাকে আর অনন্তকাল ধরিয়া এই আবর্ত্তিত পথ সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠিতে হয় না। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত-পথ ধরিয়া অতি ধীরে ধীরে, আরোহণ করিতে করিতে, যখন মানব এই মহাযানের উদ্দেশ্য প্রথমে বুঝিতে পারে, যখন জ্যোতির্ম্ময়, শৃঙ্গ-শিখরস্থ মন্দিরের অমল ধবল, আত্মা-রশ্মি, প্রথমে চকিতের জন্য সে হৃদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তখনি সে সেই আবর্ত্ত-মার্গে স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং বিস্ময়ে ও আনন্দে যুগপৎ উৎফুল্ল হইয়া শীঘ্র আরোহণোপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হয়। তুমিইত এই মাত্র পরিচয় দিলে যে, এই বিমল-শুভ্র মন্দির, চতুর্দ্দিকে অতি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি প্রসার করিতেছে। ক্রীড়াপরায়ণ পথিক, সম্মুখে বিরাজিত জগদ্বস্তুরূপ নানাবর্ণের পুষ্প, প্রস্তর-খণ্ড বা বিচিত্র মনোমোহনকারী প্রজাপতি হইতে ক্ষণিকের জন্যও যখন তাহার দৃষ্টি সরাইয়া উর্দ্ধদিকে আত্মস্বরূপের দিকে নয়নবিক্ষেপ করে, তখন ঐ মন্দিরের জ্যোতির একটী রশ্মিরেখা আসিয়া তাহার নেত্রপথে পতিত হয়। সে তখন প্রথমে সেই রশ্মির সাহায্যে দেখিতে পায় যে, তাহার শিরোপরি, সুদূরে, কেমন নীলিমার মাঝে মহাশূন্যে, এক অপূর্ব্ব মন্দির বা ধাম বিরাজ করিতেছে। তাহার অতি স্নিগ্ধকর, অতি পবিত্র রূপের নিকট, এই সমস্ত প্রাকৃত ক্রীড়া-সামগ্রী অতি তুচ্ছ; তখন এই ক্ষণিকের অনুভূতিই তাহার জীবনে যুগান্তর আনিয়া দেয়। চকিতের এই অনুভূতিতে সে বুঝিতে পারে যে, তাহার জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে,—এই যে তাহার অভিযান তাহা লক্ষ্যহীন জীবনীশক্তির কেবলমাত্র একটা অনর্থক বিকাশ নহে। অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও তাহার আর পূর্ব্বক্রীড়া-দ্রব্য ভাল লাগে না; সে তখন সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দুর্গম গিরি-আরোহণোপায় অবলম্বন দ্বারা উদ্দেশ্য স্থানে উঠিতে সঙ্কল্প করে। যাহারা এই পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগেরই কার্য্য লক্ষ্য করিয়া তুমি ইতিপূর্ব্বে স্তম্ভিত হইয়াছিলে। ঐ দেখ, কেমন তাহারা কণ্টকে ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও লতা, রজ্জু বা অন্য কিছু উপায় অবলম্বন করিয়া পর্ব্বত-শিখরে উঠিতেছে।

এই আলোক-রশ্মি বিবেক-জ্যোতির প্রথম আভাস। সে দেখিয়া আসিয়াছে যে, ঐ আবর্ত্তিত পথ সহজগম্য হইলেও, তাহা অনন্ত, তাহার সীমা নাই; সে দেখিয়া আসিয়াছে যে, পুষ্প বা অপরাপর পার্থিব ক্রীড়া-দ্রব্য আপাত-মনোলোভা ও মধুর বোধ হইলেও তাহারা চিরসুখের নিদান নহে। এখন সে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে; দুর্গম হইলেও এই ঋজু-পথ, এখন তাহার হৃদয়পটে অবলম্বনীয় বলিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। এই পথ চিরবিদ্যমান থাকিলেও তাহার পরিচয় সে এতদিন পায় নাই। অদ্য প্রথম বুঝিয়াছে এই ঋজু-পথ কি? তাহার নাম "জীব-সেবা" ও "নামে রুচি"। সেই দুর্গম পথের প্রবেশদ্বারের উপর সুবর্ণ-বর্ণে লেখা রহিয়াছে "জীব-সেবা" ও "নামে রুচি"। অদ্য সে প্রথম বুঝিতে পারিয়াছে যে, ঐ মন্দির-বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে আরোহণ করিতে হইলে, পূর্ব্বেই এই সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। সে অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, তাহার জীবন-ধারণ তাহার স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত নহে, তাহা ভগবদুদ্দেশে সর্ব্বজীবের সেবার জন্য। সে কেন দ্রুততর অগ্রসর হইতে বাসনা করিয়াছে? তাহা কি আপনি নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করিবে বলিয়া? না, তাহা নহে; তাহার মনে জীব-সেবা ও ভগবৎপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। সে যে সাধারণ অপেক্ষা দ্রুততর আরোহণ-প্রয়াসী, তাহা তাহার আত্ম-সিদ্ধির জন্য নহে। যাহারা আপনাদিগের সুখান্বেষণ চেষ্টায় বৃথা সময় অপচয় করিতেছে, সেই বালকদিগকে উন্নত করিবার জন্য তাহার এই সঙ্কল্প;—মন্দির-মধ্যস্থিত মহাত্মাদিগের সেবক হইয়া ভগবদুদ্দেশে জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে বলিয়া, তাহার স্থূল-দেহের শক্তি, তাহার মনস্বিতা, এমন কি তাহার আধ্যাত্মিকতা, সমস্তই পরার্থে উৎসর্গ করিতে চলিয়াছে। তাহার অপেক্ষা যে মানবেরা অধিকতর দুর্ব্বল, অধিকতর শিশু-স্বভাবসম্পন্ন, তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগের সঙ্গের সাথী হইয়া, আত্মীয়তা ও সখিতা আকর্ষণে বালক-প্রকৃতির চক্ষু ফুটাইবার জন্য তাহার আপন সাধনা। মন্দির-মধ্যস্থিত মহাপুরুষদিগের জগৎ মঙ্গলার্থে যে মহান্ উৎসর্গ, সেই অতি পবিত্র করুণারূপী বিসর্জ্জনানন্দে স্নাত হইয়া, জগতের কল্যাণকামনায় আপনার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সে এখন সেবানন্দ

উপভোগ করিতে চলিয়াছে। মন্দিরের যে কমনীয়া ও শান্তিময়ী বিভার কথা বলিয়াছি, তাহা বহিঃপ্রাঙ্গণস্থিত ভক্ত সেবক-সম্প্রদায়ের ভাব-সম্মিলনে যেন উজ্জলতর হইয়া জগৎকে আলো করে। যেরূপ প্রতিফলক সাহায্যে আলোক বর্দ্ধিত ও উজ্জলতর হইয়া প্রকাশ পায়, ঠিক সেইরূপ প্রাঙ্গণস্থিত ভক্তদিগের সাহায্যে ভগবৎ-করুণা সংসার-মাঝে বিকাশ পায়। এইরূপে নিমিত্ত কারণ হইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তদিগের বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থিতি; মন্দিরের ও গুরুদেবদিগের সান্নিধ্য উপভোগ করিবে বলিয়া নহে।

শিষ্য।—গুরুদেব, বুঝিলাম ভগবানের মোহিনী-শক্তির আকর্ষণে ঐ সাধকবৃন্দ আত্মতৃপ্তি ও জগতের প্রিয়-বস্তু ত্যাগ করিয়া এই দুর্গম শৈলপথ অতিক্রম করিতে এত সচেষ্ট। কিন্তু আমি দেখিতেছি তাহারা কিছুদূর মাত্র এইরূপে আরোহণ করিয়া আবার সাধারণ মানবের সহিত মিশিতেছে; মিশিয়া আবার পূর্ব্বাভ্যস্ত-ক্রীড়ায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বের মত ছুটাছুটি করিতেছে। এই স্নিগ্ধকরী আধ্যাত্মিক বিভা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মোহে আক্রান্ত হইতেছে? আমিত শুনিয়াছি, এই আধ্যাত্মিক-জ্যোতিঃ "অমোঘ-দর্শনা"। তবে কেন সেই মহাবাক্যের ব্যভিচার হইতেছে? অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সন্দেহ দূর করুন।

গুরুদেব।—পুত্র, আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই জ্যোতির অনুভব কেবল ক্ষণিকের নিমিত্ত; এই গিরিশৃঙ্গস্থিত শ্বেত-মন্দিরের বিমল-শুভ্র কিরণজাল, তাহার নয়নসমীপে চপলা-বালার চকিত-স্পন্দন মাত্র;—তাহা ক্ষণিকের তরে আসিয়া আবার পুনরায় ঘোর অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া যায়।

বিক্ষিপ্ত চিত্তের নিমিত্ত একেত জ্যোতিঃ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হয় তাহার উপর এই ঘূর্ণায়মান পথের চারিধারে মানবের মনোলোভা চিত্ত-বিনোদন এত প্রকার প্রিয় পদার্থ বিকীর্ণ আছে যে, মানবের দৃষ্টি আবার তাহাদিগের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়, সুচিরাভ্যস্ত অভক্রীড়া আবার তাহাকে সংসারের মাঝে টানিয়া আনে। কিন্তু সুখের বিষয়, আশাপ্রদ এইটুকু, যে সেই উজ্জল জ্যোতিঃ একবারের নিমিত্তও, যে মানবের নয়নমধ্যে প্রতি-ফলিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি সহজে আবার তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

মানবের চরম গতি ও অবস্থা, তাহার কর্ত্তব্য ও সেবাপরায়ণতা যে ক্ষণিকের জন্যও এমনকি কল্পনায়ও হৃদয়ে একবার অনুভব করিয়াছে, তাহার মনে সেই ঋজু-পথ আবার জাগিয়া উঠে এবং তৎসাহায্যে পর্ব্বত-শিখর দেশে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই ফুটিয়া উঠে।

প্রথম দর্শনের পর হইতে, মাঝে মাঝে, বার বার ঊর্দ্ধদৃষ্টির সহিত সেই মন্দিরের জ্যোতির্ম্ময়ী কমনীয়া বিভা তাহার হৃদয়াকাশে উদিত হইতে থাকে এবং সে ঘূর্ণায়মান সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যমে ঐ দুর্গম মার্গ-সাহায্যে অধিরোহণে সচেষ্ট হয়। এইরূপে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও সংসার-ক্রীড়ার পরিণাম যতই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে, সহজগম্য সাধারণ অয়নে বিক্ষিপ্ত ক্রীড়া-সামগ্রী ত্যাগ করিয়া সে ততই অবিচলিতভাবে সেই দুর্গম পথ অবলম্বনে স্থির থাকিতে সক্ষম হয়। যদিও এখনও তাহার সমস্ত মোহ অপসারিত হয় নাই, যদিও এখনও সংসারের মায়াময়ী ক্রীড়া-সামগ্রী উপভোগেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই, যদিও এখনও অধিকতর সময় সর্ব্বসাধারণের অনুসৃত সেই সুগম পথ দেবাযানরূপ আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; তথাপি, তুমি যদি তাহার গতি ও লক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, তাহার কার্য্যপ্রণালী অপরের হইতে পৃথক। জাতীয় নীতিশাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্ম্মের শাসন কীর্ত্তিত আছে, তাহা সাধনা করিতে সে চেষ্টা করিতেছে। সাধারণে যাহাকে ধর্ম্মনীতি বলে, সে তাহাদিগের সাধনায় আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে সতত আছে। ঐ সমস্ত ধর্ম্মনীতি এই পর্ব্বত আরো-হণের প্রধান সহায়। তাহাদিগের পরিপালনই এই দুর্গম পথকে সুগম করিয়া দেয়।

এইরূপে যাহারা পূর্ব্বোক্ত মন্দির-জ্যোতিঃ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, যাহারা মানব অভিব্যক্তির চরম-চিত্র কল্পনা—চক্ষেও দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যে মার্গ অবলম্বন করিলে পর্ব্বত-শিখরস্থ ঐ পবিত্র বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার হয়, সেই পন্থা অবলম্বনে উঠিতে যাহাদিগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহারা অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা কি অধ্যবসায়, কি একাগ্রতায় যে প্রকর্ষতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

সেই মানব অভিযান তরঙ্গটির তাহারাই যেন শীর্ষস্থানীয়। মানব-ক্রমোন্নতি-রূপ তরুবরের তাহারাই প্রথম ফলস্বরূপ। তাহারা জনসাধারণ হইতে অধিকতর দ্রুতবেগে সেই পর্ব্বত-পথ অতিক্রম করিতে থাকে। কারণ, তাহারা বুঝিয়াছে যে, এতকাল ধরিয়া যে অতিদীর্ঘ পথ লঙ্ঘন করিতে তাহারা সময় অপচয় করিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিণাম কি? তাহারা এখন পরিদৃশ্যমান শোভায় আকৃষ্ট হইয়া বিক্ষিপ্ত বালকের ন্যায় পথের এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে ছুটাছুটি করিয়া বৃথা সময় অপব্যবহার করিতেছে না। সম্পূর্ণরূপেই না হউক, তাহারা অন্ততঃ আংশিকভাবে একটী উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন ভ্রমণ করিতেছে। অতএব তাহাদিগকে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, মহৎ উদ্দেশ্যের ছায়া তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ঘটনায় স্বপ্রকাশ রহিয়াছে।

মানব-জীবনের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য যদিও তাহারা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তথাপি তাহার আভাস মাঝে মাঝে তাহাদিগের মানসপটে জ্যোতিঃরূপে যাহা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেই তাহারা উদ্দেশ্যহীনের মত এখন আর মিছা ছুটাছুটী করিতে পারে না। যদিও এখনও তাহারা সর্ব্বসাধারণের মত সেই সাধারণ ঘূর্ণায়মান পর্ব্বত-পথ অবলম্বনেই উঠিতেছে, এখনও পূর্ব্বোক্ত দুর্গম ঋজু-পথ সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিতে সক্ষম হয় নাই; যদিও এখনও তাহারা সংসারক্রীড়ায় জনসাধারণের মত রত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী অপরের হইতে অনেক বিভিন্ন। কোনও বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একজন রসায়নবিদ্ পণ্ডিত ও একজন অজ্ঞ এই দুইটী লোকের কার্য্যপ্রণালী যদ্যপি তুমি অবলোকন কর, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। দুইজনেই সমভাবে কার্য্য করিতেছে; নানা রাসায়নিক দ্রব্য পরস্পর সংমিশ্রিত করিতেছে, কখনও বা তাহাতে উত্তাপ দিতেছে, কখনও বা তুষার মধ্যে রাখিয়া শীতল করিতেছে; কিন্তু অবশেষে দেখা যাইতেছে যে, দুইজনের প্রক্রিয়ার ফল বিভিন্ন। একজন এই সামান্য প্রক্রিয়া হইতে এক অপূর্ব্ব রাসায়নিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, আর যে অনভিজ্ঞ, হয়ত তাহার মূর্খতার জন্য এমন একটী রাসায়নিক শক্তি উদ্ভূত হইল, যাহাতে

তাহার প্রাণনাশের সম্ভব। এই মানব-উন্নতি-মার্গে ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্দিরের জ্যোতিঃ আসিয়া যাহাদিগের হৃদয়ে মাঝে মাঝে প্রতিফলিত হইতে থাকে, তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃতি হয় না। একবার সেই জ্যোতিঃ কাহার হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিলে, তাহার আভা তাহার সমস্ত কার্য্যকে রঞ্জিত করে। তাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, পুত্র—পরিজনকে লালনপালন করিতেছে, এমনকি, তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী হইয়া আত্মপরিপুষ্টি করিতেছে, অথচ অপর সাধারণ হইতে তাহাদিগের কার্য্যে বেশ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সবগুলিই যেন একটা কমনীয়, একটা মধুর আবরণে আবরিত ; অপর সাধারণের মত ততদূর রূক্ষ, ততদূর কর্কশ, ততদূর অতৃপ্তি-কর নহে। এইরূপে কখন ঘূর্ণায়মান পথ সাহায্যে, কখন বা দুর্গম তুঙ্গ-পথাবলম্বনে উঠিতে উঠিতে অবশেষে তাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা, কি আধ্যাত্মিক উন্নতিতে, কি ধর্ম্ম অনুশীলনে, কি মানবের সেবাকার্য্যে, উৎকর্ষ লাভ করে। তাহারা বর্দ্ধমান গতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তাহাদিগের জীবন সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিয়মিত হইয়া যায়।

শিষ্য।—গুরুদেব! আপনি এইমাত্র বলিয়া আসিলেন,—যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন-শৈলের তুঙ্গ-স্থানস্থিত বহিঃপ্রাঙ্গনে অল্পকালমধ্যে উপনীত হইতে পারে, তাহার শিরোদেশে সুবর্ণ বর্ণে "জীব সেবা" ও "নামে রুচি" লেখা আছে। আমি ইহাতে বুঝিয়াছিলাম যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, আপনার উন্নতি বিস্মৃত হইয়া, পরার্থে চিন্তা ও পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনই ঐ স্থানে শীঘ্র আনয়নের কেবল একমাত্র উপায়। কিন্তু পিতঃ আপনি এখন যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে, যেন মন্দিরের অমল-ধবল আধ্যাত্মিক-জ্যোতির আভাস, হৃদয়ে ধারণ করিয়াও মানব কেবল আত্মসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র থাকে। আত্মোন্নয়ন চিন্তায় পূর্ণ মানব-হৃদয়ে, জীবনের স্থান কোথায়, আমি দেখিতে পাইতেছি না। পিতঃ, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ঘোর সন্দেহ দূর করুন। আমার দ্বিতীয় সংশয় এই—বৈর-বৃত্ত নিয়মের আদেশাত্মক শাসনের ভিতর, আমি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখিতে পাইতেছি না। শাস্ত্রের আদেশ

তাহা ব্যতিরেকে আর কি ? এই এই কার্য্য করিবে, এই কর্ম্ম কখন করিও না। এই গুলিকে পাপ বলে ; এই সমস্ত পুণ্য-কার্য্য। এইরূপ শাসনাত্মক উক্তি লইয়াই শাস্ত্র। শাস্ত্রের অর্থও ইহাই। এই সমস্ত সম্বন্ধহীন আদেশ-পালনে মানবের যে কি প্রকারে, অভিব্যক্তি হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ দেখা যায় যে, ধর্ম্মের আদেশ-পালনে মানব উত্তরোত্তর উন্নত হইতেছে। কিন্তু জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া সমস্ত জীবের ও পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। তবে মানবসম্বন্ধে বৈপরীত্য কেন হয় ?

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণময়ী।

অভিলাষ করি হরি সাজাব চরণ ধরি
তুলিতে এলাম ছুটে
মনোমত নানা ফুল।
কুসুমে কুসুমে একি ! তোমারি যে রূপ দেখি ;
সবেতে রয়েছ তুমি
বিনাশিতে সব ভুল।
মোহন বাঁশরী লয়ে কি প্রেমে বিভোর হয়ে,
দাঁড়াইয়া দেখাইছ
অনন্ত তোমারি বেশ ;
শিরসে শিখির পাখা পড়েছে হইয়া বাঁকা,
হৃদয় কমলে ওই
বিহরিছ হৃদয়েশ !
তবে বল কোন্ ফুলে পূজিব তোমারে তুলে ?
তোমার করহে পূজা
দিয়া তব শকতি ;

তোমারে তোমায় দিয়া তুমি আমি হয়ে গিয়া
চরণ জ্যোতিটী লয়ে
এস করি আরতি।
কোথা আমি ? আমি কই ? কিছু নাই তুমি বই ;
অনন্ত অনন্ত সব,—
অনন্ত আলোকময়,
অনন্ত সৃজিত সব অনন্ত করিয়া রব,
অনন্ত চরণে গিয়া
হইয়া যাইছে লয়।
নাহিক মূরতি আর, আরতি হইবে কার ?
কেইবা করিবে বল
এ বিরাট আরতি ?
অনন্ত অব্যয় বেশ, নাহিক যাহার শেষ,
অনন্ত বিহনে কেবা—
হেরিবে এ মূরতি ?

শ্রীরাধা।

—— —

সন্ধ্যারহস্য

[স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন ব্রহ্ম তেন উপাসিতম্॥
স চ সূর্য্যসমো বিপ্র স্তেজসা তপসা সদা।
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ॥"

যিনি সন্ধ্যা তিনিই গায়ত্রী ; সেই অদ্বৈত মহাশক্তি দ্বিধাভূতা হইয়া

ব্রহ্মসাধকের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। সন্ধ্যার উপাসনা করিলে সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারণস্বরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়। যিনি সন্ধ্যোপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন তিনি তেজে ও তপস্যায় সাক্ষাৎ সূর্য্যসদৃশ। তাঁহার পদধূলিদ্বারা বসুন্ধরাও সদ্যঃপূতা হইয়া থাকেন। সেই সন্ধ্যাপূত দ্বিজই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হইয়া থাকেন। অতএব বেদবাক্য ও ঋষি প্রবর্ত্তিত সন্ধ্যাক্রিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে সন্ধ্যা দ্বিবিধ। বৈদিক-সন্ধ্যা বিশেষ ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্র-বহুল, সামবেদীয় অনুষ্ঠান-বহুল এবং তান্ত্রিক-সন্ধ্যা যোগক্রিয়া-বহুল হইলেও প্রত্যেকের তাৎপর্য্য প্রায় একই প্রকার। সন্ধ্যায় সাধারণতঃ দশটী ক্রিয়া আছে, তাহা সমুদায় বৈদিক বা তান্ত্রিক উপাসনাকাণ্ডের অতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াসিদ্ধানুষ্ঠান মাত্র। এই কার্য্য নিত্য যথারীতি করিতে পারিলে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার পথ পরিষ্কৃত হয়। মানব একেবারেই ব্রহ্মের সেই নির্গুণ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেনা। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাপকচৈতন্যসত্তা সমন্বিত সামান্য জড়বস্তুর মধ্যে অনন্ত ব্রহ্ম-বিভূতির অনুসন্ধান অপেক্ষা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিভূতিযুক্ত ও তেজ-চৈতন্যসত্তা-সমন্বিত সবিতা দেবতার মধ্যে গায়ত্রী উপাসনা শ্রেষ্ঠতর কল্প। সেই কারণ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধকের নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

প্রাচীন কালে গায়ত্রী বা সন্ধ্যোপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া নির্ণীত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অধিকারী অভাবে সাধারণ নিত্যক্রিয়ারূপে তাহা পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্রে সম্যক্ প্রকারে ধ্যান বা উপাসনা করাকেই সন্ধ্যার ব্যুৎপত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি দিবারাত্রের চারিটী সন্ধিক্ষণকে এবং সেই সেই সময়ের উপাস্য বিষয়কেও সন্ধ্যা বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সেই সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই—যিনি জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল—প্রতি অহোরাত্রের প্রত্যেক সন্ধিসময়ে তাঁহারই সম্যক্ ধ্যান করাই সন্ধ্যাক্রিয়া বলিয়া উক্ত হয়। পক্ষান্তরে সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত এই ত্রিবিধ

ক্রিয়াপ্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। সেই ত্রিগুণ বৈচিত্র্যের কারণ পিণ্ডশরীরে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপী ত্রিধারাত্মিকা নাড়িত্রয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তিন নাড়ী আবার লক্ষ্যরূপে ত্রিভাবাত্মক এবং ক্রিয়ারূপে ত্রিদেবাত্মক বলিয়া যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে। ঈড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিতেই সুষুম্নার উদয় হয়। প্রতি অহোরাত্রের প্রত্যেক সন্ধিসময়ে সেই সুষুম্না অধিক স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্যদিকে সুষুম্না-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মরন্ধ্রের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হেতু সাধকের চিত্ত অধিক স্থির হয়। যোগাচার্য্যগণ এই কারণ সুষুম্নাপ্রবাহরূপ সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া-থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মধ্যান করিবার অতি সুন্দর ও প্রকৃতি-অনুগত প্রশস্ত সময় উক্তরূপ কোন সন্ধিক্ষণই জানিতে হইবে। সন্ধ্যার ক্রিয়া-বিষয়ে শাস্ত্রে অনন্ত ফলের উল্লেখ আছে। অতএব সাধকমাত্রের ইহা অপরিত্যাজ্য একমাত্র ক্রিয়া বলিতে হইবে। মন্ত্র, হঠ ও লয়াদি সকল যোগ-ক্রিয়ার সহিতই যে ইহার বিচিত্র সম্বন্ধ জড়িত আছে তাহা যোগী সাধকবৃন্দই যথার্থরূপে অনুভব করিতে থাকেন। ব্রহ্মোপাসনার অতি উচ্চ অধিকারীর পক্ষেও ইহাতে যথেষ্ট ক্রিয়া অনুস্যূত আছে। ইহার নিত্য রীতিমত সাধন দ্বারা সাধক পরা-বৈরাগ্যসম্পন্ন উচ্চতম জ্ঞানীরূপেও পরিণত হইতে পারেন। সেই কারণ সাধকমাত্রের পক্ষেই ইহা একান্ত অবলম্বনীয়; তবে উপযুক্ত গুরুর আজ্ঞা ও উপদেশক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর পক্ষে ক্রিয়ার বিভিন্নতা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণের সাধকই সন্ধ্যোপাসনা করিতে পারেন। তবে বৈদিক সন্ধ্যার উপাসনা কেবল দ্বিজদিগের মধ্যেই শুচি অবস্থায়—জননা-শৌচ দিবস, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিনের সায়ং-সন্ধ্যা ব্যতীত নিত্য করিবার বিধি আছে। সন্ধ্যোপাসনার নিষিদ্ধ দিবসে মানসিক গায়ত্রী জপ করিবার বাধা নাই। কিন্তু তান্ত্রিক-সন্ধ্যা সর্ব্ববর্ণের সাধকই সকল দিনেই সকল অবস্থায় করিতে পারেন। একথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, ইহার মন্ত্রাদিও অধুনা কাহারও অপরিজ্ঞাত নাই। কিন্তু বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যার ক্রিয়ানুষ্ঠান বিধি অনেকেই জানেন না। সেই কারণ তাহা সংক্ষেপে দুই,এক কথায় বলিতেছি।

সাধারণে জানেন, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ণ ও সায়াহ্নকালে অনুষ্ঠেয় ভেদে সন্ধ্যা ত্রিবিধ; কিন্তু উচ্চতর সাত্ত্বিক সাধকদিগের মধ্যে সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ বলিয়া গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

আপ্তবাক্যে প্রকাশ আছে: -

চত্বারঃ কিল সন্ধয়ো ভবন্ত্যহোরাত্রস্য তাঃ।
যথা প্রাতঃ সায়ং মধ্যাহ্নো নিশীথশ্চ॥"

অর্থাৎ সমস্ত অহোরাত্রির মধ্যে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও নিশীথ ভেদে চারিটী সন্ধিক্ষণ। এই চারিসময়েই সাধকের নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করিতে হয়। দিবা ও রাত্রির এক এক সন্ধিক্ষণে এই সন্ধ্যাচতুষ্টয়ের উপাসনার ব্যবস্থাই চিরপ্রসিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান নির্ণয়।

[স্বামী দয়ানন্দ]

যথার্থই আর্য্যগণ ভিন্নদেশ হইতে ভারতে আসিয়া বাস করিতেছেন কিম্বা ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের সূতিকা-গৃহ? এ পর্য্যন্ত মনস্বীগণের ভিন্ন ভিন্ন মত-বাদের কোন স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রথমতঃ আর্য্যজাতির আদি নিবাসভূমি নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নিজদেশে থাকিয়া বিদেশী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করা কেবল যে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা নহে—অধিকন্তু যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা হিসাবেও তাহা দোষের বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় কিম্বা অন্য কোন দেশ হইতে প্রাচীনতম কালে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে বসবাস

করিতেছেন, এই বিষয়টী বর্ত্তমান আলোচনার পূর্ব্বেও নব্য-সম্প্রদায়ের অনেক পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। ঐ সকল আলোচিত ভিন্ন ভিন্ন মতসমূহকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে আর্য্যগণ অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ন হ্রদের তীর হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার জন্য নানারূপ যুক্তিও দেখান হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ সংহিতায় আর্য্যদিগের বাসভূমির বহু নদনদী ও নগরের নাম উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল নদনদী ও নগরের নাম মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে আর্য্যদিগকে শ্বেতাঙ্গ-পুরুষ বলা হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার লোক শ্বেতাঙ্গ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর্য্যদিগের উপাস্য দেব-দেবীর নামের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন নিবাসী জাতির দেবদেবীর নামেরও অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। এই সকল যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ মধ্য এশিযার কাস্পিয়ন হ্রদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানবিশেষকে আর্য্যজাতির আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের মতে উত্তর মেরু আর্য্যদিগের আদি নিবাস-ভূমি। সেই স্থান হইতে আর্য্যগণ ধীরে ধীরে ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। যেহেতু আর্য্যদিগের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ বেদেও দীর্ঘকালব্যাপী রাত্রি ও দিবামানের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। উত্তর মেরুতে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি। অতএব উক্ত মেরুশিখরই আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি। পারস্যদেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ "জিন্দাভিস্তা"ও ঐ সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, উত্তর মেরুদেশে আর্য্যদিগের স্বর্গ; সেই স্থানে বৎসরের মধ্যে একবারই সূর্য্য উদিত হয়। অবশিষ্ট ছয়মাস কাল দুর্ভেদ্য অন্ধকার থাকে। প্রাচীনকালে আর্য্যেরা সুমেরুদেশে বসবাস করিতেন; তৎপরবর্ত্তীকালে শীতাধিক্যপ্রযুক্ত বাসের অযোগ্য বোধে ধীরে ধীরে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্রসর হইয়া পরে ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতএব ভারতবর্ষ আর্য্যদিগের আদি নিবাসভূমি নহে; আর্য্যজাতির জন্মভূমি অন্ধকারময় তুষারাবৃত সুমেরু শৃঙ্গ। জর্ম্মনদেশের সন্নিকটে

কোনস্থানে আর্য্যদিগের প্রাচীন নিবাস ছিল; যেহেতু আর্য্যদিগের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের সহিত জর্ম্মন ভাষার অধিক পরিমাণে নৈকট্য দেখিতে পাওয়া যায়। জর্ম্মনদেশের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন—তৃতীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের ইহাই তৃতীয় কল্পনা। ইহা ব্যতীত আরও একটী সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান কালে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে আর্য্যগণ তিব্বত হইতে ভারতে আসিয়া বাস করিতেছেন এইরূপ প্রমাণ হয়।

বিশ্বের রচয়িতা, মানবমাত্রকেই চিন্তাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই শক্তির বলে মানব আপন আপন চিন্তা প্রকট করিয়া থাকে। কিন্তু চিন্তামাত্রই যে কল্যাণবাহিনী গঙ্গার মত দেশ, ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণসাধন করিবে তাহা বলা যায়না; প্রত্যুত চিন্তা অনেকস্থলে ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া থাকে; এবং সেই ভ্রান্তিযুক্ত চিন্তা, জাতি ও ধর্ম্মের ধ্বংসের কারণ হয়। এইজন্য দীক্ষা ও সাধনার দ্বারা চিন্তার উপযোগী শক্তিসঞ্চয় করা প্রত্যেক চিন্তাপ্রিয় লোকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যথা সাধনাহীন চিন্তার ফলে চিন্তনীয় বিষয়সমূহ সত্তাহীন হইয়া যায়। নবযুগের ঐতিহাসিক ও প্রাচীন ভারতের পূজ্যপাদ ঋষি, এতদুভয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে চিন্তার তারতম্য লক্ষিত হয়। ঋষিগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আর্য্যদিগকে ভারতমাতার সন্তান বলিয়া গভীর গবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমরা আর্য্যঋষির সন্তানদিগের বিচার-বুদ্ধির সমক্ষে সেই সকল চিন্তা-শক্তি উপস্থিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকদিগের মতবাদ নিরসন পূর্ব্বক উহার অন্তর্নিহিত যথার্থ সত্য প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

কোন বস্তুর যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে কারণের বিচার দ্বারা কার্য্যসত্তার নির্ণয় করাই সফলতা লাভের একমাত্র সুচারু উপায়। কারণের সম্যক পরিশীলন না হইলে কার্য্যের সত্তার সিদ্ধান্ত-নিশ্চয় সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেহেতু কার্য্য কারণেরই বিকাশ মাত্র। এই জন্য দার্শনিকেরা কারণের তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক কার্য্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। মৃন্ময় ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা; তাহার কার্য্য ঘট। ঘট-জ্ঞানের পূর্ব্বে ঘটের

উপাদান-কারণ মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে, মৃন্ময় ঘটের সম্বন্ধে যে নিশ্চয়রূপ জ্ঞান হইবে, উহা ভ্রান্তিশূন্য যথার্থ জ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আর্য্যজাতির আদি নিবাস-ভূমি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, ভারতের প্রাকৃতিক উপাদান-কারণ-সমূহ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা যথার্থ সত্য কখনও নিশ্চিত হইবার নহে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্তানুসারে সমষ্টি সৃষ্টির ধারা, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির প্রথম দশায় পূর্ণ-প্রকৃতির মানব জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। সেই হেতু সৃষ্টির প্রথম অবস্থার নাম সত্যযুগ। ঐ সময় পূর্ণ-সত্ত্ব বিকশিত প্রকৃতি; তাই প্রকৃতি মাতার সকল সন্তানই পূর্ণ সত্ত্ব-গুণী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতেন। পূর্ণ-সাত্ত্বিক-পুরুষ জ্ঞানে ধর্ম্মে পবিত্রতাযুক্ত জীবন লাভ করিয়া মাতৃমুখ উজ্জ্বল করিতেন। ভারতের অতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় ঐরূপ পূর্ণ উন্নত পুরুষের জন্মবিবরণ লিখিত আছে। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারিটী পুত্ররত্ন সৃজন করেন এবং তাহাদিগকে সৃষ্টিবিস্তার করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু—

"তে সর্ব্বে বাসুদেব পরায়ণাঃ"

তাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-যুক্তান্তঃকরণে নিবৃত্তিপথের অনুধাবন করিয়াছিলেন। সাংসারিক ভোগবিলাস তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। যোগ-শক্তির সর্ব্বোচ্চশিখরে তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা অপর দশটী পুত্র সৃষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে সৃষ্টিবিস্তারের আজ্ঞা প্রদান করিলে, কালে ঐ সকল পুত্রই পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া সৃষ্টি সাধন করিতে লাগিল। ইহারা ব্রহ্মার প্রথম উৎপন্ন সন্তানদিগের ন্যায় পূর্ণ নিবৃত্তিসেবী হইলেন না। পরবর্ত্তীকালে ইহাঁদের সন্তানগণ আরও অধিক পরিমাণে ভোগরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিবিকাশের প্রথম অবস্থায় পূর্ণ-নিবৃত্তি সেবী জ্ঞানী মহাপুরুষগণই জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন; তৎপরে সৃষ্টিপ্রবাহ নিম্নাভিমুখী হওয়ায়, সত্ত্বগুণ হইতে রজঃ, রজঃ হইতে তমঃ, এবং তমঃ হইতে আলস্য প্রমাদ ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে।

"চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাঽধর্ম্মেণাঽগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যা ন প্রতিবর্ত্ততে॥
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভি র্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ॥"

সত্যযুগে সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ থাকায় চারিপাদের দ্বারা ধর্ম্ম পূর্ণ ছিল। তখন মনুষ্যের অধর্ম্মের দ্বারা অর্থকাম সেবার ইচ্ছা আদৌ হইত না। তদনন্তর ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হইল। তাহার ফলে চৌর্য্য, কপটতা, মিথ্যাপবাদ প্রভৃতি অধোগামিনী প্রবৃত্তি সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সমষ্টি সৃষ্টির ধারা যে নিম্নগামিনী, এই ক্রমিক অধঃপতন তাহার একটী বিশেষ নিদর্শন। কেবল ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নহে, পাশ্চাত্য দেশের অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদিতেও ঐ সকল সিদ্ধান্তবাক্য বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। পশ্চিমদেশের সর্ব্বপ্রাচীন হিব্রু গ্রন্থে আদম হইতে জীবোৎপত্তি বর্ণনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, প্রথম সৃষ্টির সময় আদমের শরীর হইতে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বহির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিল। তাহা হইতে অনেক পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ উৎপন্ন হইয়া জ্ঞানে ধর্ম্মে জগৎ উজ্জ্বল করিলেন। পরন্তু সৃষ্টিবিকাশের এই পবিত্র ধারা বেশী দিন বিদ্যমান ছিল না। উহা ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হইয়া পড়িল। গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত "প্লেটো" "ফিড্রস" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রথম বিকাশের সময় যে সকল পুণ্যাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা এমন উন্নত ছিলেন, যে, স্বর্গে দেবতাদিগের সঙ্গে পর্য্যন্ত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইতেন। পরন্তু কালানুসারে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। মানবের বুদ্ধি মায়ায় আবৃত হইল। তাহা হইতে অধার্ম্মিক সন্তান উৎপন্ন হইতে লাগিল। যাহা হউক, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থানুসারে ইহা দৃঢ়নিশ্চয় হয়, যে, জ্ঞানে ধর্ম্মে পূর্ণ-জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মজ্ঞ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণই সৃষ্টির আদি অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে সৃষ্টির অধোমুখিনী গতির সঙ্গে সঙ্গে রাজসিক ও তামসিক বিবিধ-প্রকৃতি-সম্পন্ন প্রজার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখন সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষগণের কোন-দেশের প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করা সম্ভব তদ্বিষয়ক আলোচনা করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, ঠিক তদনুকূল প্রকৃতিযুক্ত ভূমিতে তাহার জন্ম হওয়া সম্ভব। অন্যত্র প্রতিকূল প্রকৃতিরাজ্যে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যব্যাপার আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি লক্ষিত হয় নাই; সুতরাং পূর্ণজ্ঞানী পুরুষের জন্ম, সর্ব্ববিষয়ে প্রাকৃতিক-উপাদান-পূর্ণ ভূমিতেই একমাত্র সম্ভব-যোগ্য বলিয়া অগ্রজন্মা মনস্বীগণ স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। অপূর্ণ-ভূমির অসম্পূর্ণ উপাদানাদি দ্বারা পূর্ণ-পুরুষের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব পূর্ণ-ভূমিই যদি পূর্ণ-পুরুষের জন্ম-ভূমির একমাত্র যোগ্যস্থান হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পূর্ণপ্রকৃতিযুক্ত ভূমির অন্বেষণ করিলেই আর্য্য-জাতির আদি জন্মভূমি যে নির্ণীত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর মধ্যে কোনদেশের প্রকৃতি পূর্ণ? পূজ্যপাদ আর্য্যগণ এবং গবেষণাপরায়ণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, সকলেই একবাক্যে পৃথিবীর মধ্যে ভারত-ভূমিকেই পূর্ণ-ভূমিরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দার্শনিক ভাষায় যাহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকভাব বলে, সেই ত্রিবিধভাবের দ্বারাই প্রকৃতি পূর্ণ হইয়া থাকে। প্রকৃতির পূর্ণতা লইয়া চিন্তাশীল আর্য্যপুত্রগণ চিন্তা করিলে পৃথিবীর মধ্যে কেবল-মাত্র ভারতের প্রকৃতিতেই, উক্ত ত্রিবিধ পূর্ণতা দেখিতে পাইবেন। প্রাকৃতিক পূর্ণতার যাহা যথার্থ লক্ষণ, দৃষ্টান্তরূপে এক একটী করিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। আধিভৌতিক অর্থাৎ স্থূল পূর্ণতার প্রথম লক্ষণ ষড়-ঋতুর অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। সমস্ত সৌরজগতের কেন্দ্রশক্তি সূর্য্যের গতি অনুসারে, দুই দুই মাস অন্তর একটী ঋতুর যথাক্রম বিকাশ, ভৌতিক-পূর্ণতার একটী প্রধান পরিচয়। অপূর্ণ প্রকৃতিতে কেন্দ্রশক্তির ঐপ্রকার সম্বন্ধ না হওয়ায়, তথায় ঋতুর পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়না। কারণ সূর্য্যের প্রভাবের উপর ঋতু-বিকাশ নির্ভর করে। কিন্তু অপূর্ণ ভূমিতে পূর্ণরূপে সূর্য্যের বিকাশ হয় না। ভারতের স্থূল-প্রকৃতি পূর্ণ; তাই সূর্য্য-প্রভাব-বশতঃ ষড়-ঋতুর অপূর্ব্ব-বিকাশ ভারতবর্ষে লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত একই

সময়ে ষড়-ঋতুর বিকাশও প্রাকৃতিক-পূর্ণতার অন্যতম বিশেষ লক্ষণ। সেই অনুসারে, একই সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ষড়-ঋতুর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় হিমালয়ের শীতময় প্রদেশের তুষারাবৃত পর্ব্বত-রাজি হেমন্ত ও শিশির ঋতুর প্রবল পতাকা উড়াইয়া দেয়, ঠিক সেই সময়ে সিন্ধু-দেশের মরুভূমিতে গ্রীষ্ম-ঋতুর প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর ধূলিকণা পর্য্যন্ত অগ্নিময় হইয়া উঠে এবং তৎকালে মহীশূরাদি প্রদেশে বসন্ত নিজের প্রস্ফুটিত যৌবন লইয়া সোহাগভরে খেলা করে। আবার আসাম প্রদেশে বর্ষা তখন অমৃত-ধারা বর্ষণ করে ও বঙ্গদেশ তখন শরতের নয়নাভিরাম মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া শারদার আগমনী-গানে জীবন সার্থক করে। এইরূপে প্রকৃতিমাতার মনঃ-প্রাণ-মুগ্ধকর অশেষ-সৌন্দর্য্যরাশি, ভারতের প্রত্যেক অঙ্গে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকলই ভারত-প্রকৃতির পূর্ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্থূল-পূর্ণতার দ্বিতীয় লক্ষণ বর্ণ সমন্বয়। আফ্রিকা দেশের মানুষ কৃষ্ণবর্ণ ; ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোক শ্বেতবর্ণের ; এবং চীন জাপানাদিদেশের লোক পীতবর্ণের হইতে দেখা যায়। প্রকৃতির অপূর্ণতাই তাহার একমাত্র কারণ। পরন্তু আর্য্য-জাতির পবিত্র মাতৃভূমি পূর্ণ-প্রকৃতি-যুক্ত হওয়ায়, ভারতবর্ষে উজ্জ্বল গৌর-বর্ণ, গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের স্ত্রী, পুরুষ সমানরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভূমিগত পূর্ণতার চিহ্ন। ভারতের স্থূল-প্রকৃতির পূর্ণতা বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্ভিজ্জতত্ত্ববেত্তা পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় লতাবৃক্ষাদি ভারতের পূর্ণ-ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ফল-পুষ্পে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। যেহেতু, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মৃত্তিকার উপাদানসমূহ, ভারতের মৃত্তিকায় সঞ্চিত আছে। ঐ প্রকার প্রাণি-তত্ত্ববিদা-চার্য্যগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী, ভারতের কোননা কোন প্রদেশে বসবাস করিয়া আনন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে সন্দেহ নাই। ভারতসমুদ্রের অনন্তবিস্তার ও অতলস্পর্শী গভীরতাও সমুদ্রসেবী নানাপ্রকার জীবজন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া মহামূল্য রত্ন প্রসব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ধারণ করে। অন্যদেশীয় সমুদ্র অপেক্ষা ভারতমহাসমুদ্রের এই অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা, পবিত্র-সলিলা ভাগিরথী-

জলের অপূর্ব্বতা এবং উহার শক্তি, বর্ত্তমান যুগের দাম্ভিক জড়বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্যগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রকৃতিমাতার পূর্ণ লীলা-ক্ষেত্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার ভূমি লক্ষিত হয়। সিন্ধুদেশের ও রাজপুতনার কোন কোন অংশে জলহীন শুষ্ক মরুস্থল, বঙ্গদেশ কিম্বা মিথিলাদিদেশে সজলা-ভূমি এবং ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশের ভূমিতে উক্ত দুই অবস্থার সমতা বিদ্যমান। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতরাজি হিমালয় এই ভারতবর্ষে। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত সাগর অপেক্ষা বিস্তৃত ও গভীর ভারত-মহাসমুদ্র, কত অনাদি অনন্তকাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তের মহিমা প্রচার করিতেছে। শ্বেতবর্ণের ব্রাহ্মণ-জাতীয় ভূমি, রক্তবর্ণের ক্ষত্রিয়-জাতীয় ভূমি, পীতবর্ণের বৈশ্য-জাতীয় ভূমি, এবং কৃষ্ণবর্ণের শূদ্র-জাতীয় ভূমি, ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভারতের ইহা মৃত্তিকাগত পূর্ণতার লক্ষণ।

বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বথঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
তথা শ্রেষ্ঠা কর্ম্মভূমি র্ভূমৌ ভারতমণ্ডলম্ ॥

(শিবরত্নসারতন্ত্র)

দেবতাদিগের মধ্যে যেরূপ বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, হ্রদসমূহের মধ্যে যেমন সমুদ্র, নদী সকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা, পর্ব্বতরাজির মধ্যে যেরূপ হিমলয়, বৃক্ষাদির মধ্যে যেমন অশ্বথ ও রাজন্যগণের মধ্যে যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য ভূমি অপেক্ষা ভারতভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সকল আধিভৌতিক পূর্ণতারই লক্ষণ। এক্ষণে আধিদৈবিক পূর্ণতার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

আধিদৈবিকভাবেও ভারতপ্রকৃতি পূর্ণ বিকশিত। তাহারই ফলে অনাদি-কাল হইতে ভারতবর্ষে কাশী আদি দৈব-শক্তি-প্রকাশক কেন্দ্ররূপী নিত্য-তীর্থ ও বহু নৈমিত্তিক তীর্থ এবং বিবিধ পীঠস্থান ও জ্যোতির্লিঙ্গাদি বিরা-জিত রহিয়াছে। আধিদৈবিক পূর্ণতার ফলে ভগবদ্ভক্তির আধারভূত বিভূতি-সম্পন্ন পুরুষ ও অবতারগণ, প্রয়োজনানুসারে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন। আধি-

দৈবিক পূর্ণতার কারণ পূর্ণভূমি ভারতবর্ষে পূর্ণব্রহ্ম আনন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত আধ্যাত্মিক পূর্ণতার কারণ পূর্ণভূমি ভারতবর্ষে পূর্ণজ্ঞানাধার বেদ এবং পূর্ণ-জ্ঞানময় ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বেদে লিখিত আছে,—

ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ ॥

অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না। ভারতবর্ষে মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায়, আর্য্যগণ, ভারতকেই মানবের মুক্তিভূমিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই ত্রিদিবের অমরমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে ভারতবাসীর যশোগাথা গাহিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-জগতের "মোক্ষমূলার" "কোলব্রুক্" ও "টড্" প্রভৃতি মনস্বীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই পূর্ণজ্ঞানজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বসংসারকে আলোকিত করিয়াছিল। উল্লিখিত যুক্তি ও বহুবিধ প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পূর্ণজ্ঞানময় পুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পূর্ণভূমি ব্যতীত অপূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত ভূমিতে পূর্ণ-পুরুষের উৎপত্তি অসম্ভব। যখন পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র পূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত ভূমি বলিয়া বহুবিধ শাস্ত্রাদি প্রমাণে প্রমাণিত ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত, তখন প্রথম জাত পূর্ণ-জ্ঞানী মহাপুরুষগণ যে ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। শাস্ত্রমতে আর্য্যজাতির যাহা যথার্থ লক্ষণ, তদনুসারে ভারতের উপরিলিখিত অগ্রজন্মা পূর্ণপুরুষগণকেই প্রকৃত আর্য্য বলা যাইতে পারে; সুতরাং সকল-মহিমা-শালিনী রাজ্ঞী ভারতমাতার পবিত্রক্রোড়ে ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্য-গণই প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছিলেন। অতএব ভারতবর্ষই আর্য্যজাতির আদি নিবাস-ভূমি। ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের পবিত্র সূতিকাগৃহ। আর্য্যগণ যশের মাল্য গলায় পরিয়া, দেবাদেশে তপস্বীবেশে উদাত্তস্বরে সামগাথা গাহিতে গাহিতে, কোন দেব-নিবাস হইতে, ভারতমাতার এই পবিত্র-কুটীরে আসিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বর্ণদৃষ্টি; তাই মাতার অঙ্গ স্বর্ণময় হইয়াছিল; তাই বুঝি ভারত আজিও "সোনার-ভারত"। ভারতবর্ষই যৌবনের প্রমোদ উদ্যান; সেই সুরম্য উপবনে আর্য্যগণ জীবন শেষ করিয়া

গিয়াছেন। উন্নতির অত্যুচ্চ হিমাদ্রিশিখর হইতে দুর্দ্দশার পূতিগন্ধময় অন্ধকূপ-নিমজ্জিত অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বার্দ্ধক্যের ভারতবর্ষই—আর্য্যদিগের অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্র। সেই পুণ্যতীর্থে বসিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-নিপীড়িত আর্য্যগণ—অন্তর-মথিত বিষাদের করুণ-গীতি গাহিয়া থাকেন। অন্যদেশ হইতে আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ সকল স্বাধীন-চিন্তা মনস্বীসমাজে কেবল ভ্রান্তবুদ্ধির পরিচায়ক মাত্র। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সংশয়-বিরহিত-চিত্তে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ভারতবর্ষান্তবর্ত্তী কোন্-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শাস্ত্রে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষান্তর্গত কুরুক্ষেত্রাদি ব্রহ্মর্ষিদেশে পূর্ণমানব আর্য্যদিগের প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতেও বহু প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। মনুসংহিতায় আছে,—

> আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
> তয়োরেবাঽন্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
> সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
> তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
> কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
> এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
> এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
> স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

যে দেশের পূর্ব্বভাগে ও পশ্চিমদিকে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যগিরি, সেই দেশকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেরই প্রাচীন নাম আর্য্যাবর্ত্ত। কেহ কেহ বর্ত্তমান বিন্ধ্যাচলের উত্তরভাগস্থিত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানযুগের অনেক ঐতিহাসিক, ঐরূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কেবল হিন্দুস্থানই আর্য্যাবর্ত্ত। কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মতে, আর্য্যাবর্ত্তের যে বিস্তৃত পরিধি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষকেই

আর্য্যাবর্ত্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিলে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমসীমায় সমুদ্র লক্ষিত হয় না। উত্তর ভারতের পূর্ব্বভাগে বঙ্গদেশে পদ্মা ব্রহ্মপুত্র আদি নদনদী এবং পশ্চিমসীমায় পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে সিন্ধু ইরাবতী প্রভৃতি নদ নদী বিদ্যমান। সুতরাং বর্ত্তমান বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরভাগস্থিত ভূখণ্ডকে যদি কেবল আর্য্যাবর্ত্ত বলা হয়, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তের যথার্থ লক্ষণ তাহাতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্ব ও পশ্চিমসীমায় সমুদ্র, উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে বিশাল ভূখণ্ড বিদ্যমান, ভারতবর্ষ নামে যাহা চিরন্তন প্রসিদ্ধ, তাহারই নাম আর্য্যাবর্ত্ত।

বর্ত্তমানকালে যে বিন্ধ্যপর্ব্বত পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ভারতের কোন সীমায় স্থিত না থাকিয়া মধ্যদেশে স্থিত থাকায়, বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল পুরুষের মনেও নানাবিধ আশঙ্কার উদ্রেক হইতেছে। কিন্তু মন্বাদি মতের অনুসরণ করিয়া, উক্ত শঙ্কা সমাধানের পথে অগ্রসর হইলে বিশদরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, মধ্যস্থিত আধুনিক বিন্ধ্যপর্ব্বত শাস্ত্রবর্ণিত বিন্ধ্যপর্ব্বত নহে; পরন্তু ভারতের দক্ষিণসীমায় যে বিশাল পর্ব্বতরাজি বিদ্যমান, তাহাকেই বিন্ধ্যাচল বলিয়া ভারতের ব্যাস-নিরূপক আর্য্যগণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। পুরাণশাস্ত্রে নীল-পর্ব্বতের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যায়, দক্ষিণ ভারতে এবং হরিদ্বারে অদ্যাপি নীলপর্ব্বত বিদ্যমান। সুতরাং কোন নীলগিরি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণন পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। অতএব বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিষয় শাস্ত্রে বর্ণন দেখিয়া কেবলমাত্র মধ্যভারতস্থিত বিন্ধ্যকেই গ্রহণ করা যায় না; ভারতের দক্ষিণসীমার বিশাল পর্ব্বতরাজিই বিন্ধ্যাচল। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষকেই বুঝিতে হইবে। সরস্বতী এবং দৃশদ্বতী, এই দুইটী দেবনদীর অন্তবর্ত্তী যে দেবনির্ম্মিত দেশ, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল এবং মথুরা প্রভৃতি ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তর্গত এবং উহারা ব্রহ্মর্ষিদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমজাত পূর্ণ-জ্ঞানময় পুরুষ, যাঁহারা পৃথিবীতলে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্মভূমি শাস্ত্রনির্দ্ধারিত এই ব্রহ্মর্ষিদেশে। এই মর্ত্ত্যের অমরাপুরী ব্রহ্মর্ষিদেশ হইতে আচার, ব্যবহার, চরিত্র ও মহান আদর্শ

সমস্ত বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ব্রহ্মর্ষিদেশকে পৃথিবীর গুরুস্থানরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্যগণ যে এই ব্রহ্মর্ষিদেশে প্রথম জন্মগ্রহণ করেন, বেদাদি শাস্ত্রে তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—

তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং॥

দেবতাদিগের দেবযজ্ঞের স্থান কুরুক্ষেত্র। দেবতাগণ কর্ম্মের প্রেরক; এই জন্যই দেবযজ্ঞের দ্বারা দৈবীশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে সৃষ্টিপ্রবাহ চালিত হয়। দৈবীশক্তির প্রথম বিকাশভূমি যখন কুরুক্ষেত্র, তখন সৃষ্টির প্রথম বিকাশস্থলও যে কুরুক্ষেত্রেই, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই জন্যই ভগবান পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রকে গীতায় ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জাবালোপনিষদে লিখিত আছে,—

যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং।

দেবতাদিগের দেবযজ্ঞের স্থান এবং সমস্ত জীবের আদি জন্মভূমি কুরুক্ষেত্র। সৃষ্টির আদিকালে পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ, ভারতের এই কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে ভারতের সমস্ত প্রান্তে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে বিচরণ ও বসবাস প্রভৃতি নানা কারণবশতঃ সমস্ত ভারতখণ্ডই আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ। আর্য্যশাস্ত্রেও আমরা তাহার বহুপ্রমাণ দেখিতে পাই।

আর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠা আবর্ত্তন্তে পুণ্যভূমিত্বেন বসন্ত্যত্র ইতি আর্য্যাবর্ত্তঃ॥

পবিত্র-ভূমি হওয়ার কারণ আর্য্যগণ ভারতের সর্ব্বত্রই বাস করিতেন। তদনুসারে সমগ্র ভারতের নামই আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছিল। কুল্লুক-ভট্ট আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—

আর্য্যা আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনরুদ্ভবন্তি ইতি আর্য্যাবর্ত্তঃ।

আর্য্যগণ এই স্থানে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেন, এই জন্য ভারতবর্ষের নাম আর্য্যাবর্ত্ত।

সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে তত্রাপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তি।

বেদে এইরূপ বহুপ্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের প্রথম কাণ্ডের অষ্টম প্রপাঠকের দশম অনুবাকে লিখিত আছে,—

যে দেবা দেবসুবঃ স্থ ত ইমমামুষ্যায়ণমনমিত্রায় সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহত আধিপত্যায় মহতে জানরাজ্যায়ৈষ বো ভরতা রাজা সোমোস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা। হে দেবা অগ্ন্যাদয়ো যে যূয়ং দেবসুবো যজমানপ্রেরকাঃ স্থ তে যূয়মিমং যজমানমামুষ্যায়ণং অমুষ্য দেবদত্তস্য পুত্রং অমুষ্য যজ্ঞদত্তস্য পৌত্রং চানমিত্রায় শত্রুরাহিত্যার্থং সুবধ্বং অনুজানীধ্বং কিঞ্চ মহতে ক্ষত্রায়ানুত্তম-ক্ষত্রিয় কুলায় মহতে আধিপত্যায় অপ্রতিহতনিয়মন-সামর্থ্যায় মহতো জানরাজ্যায় জনসম্বন্ধি যদ্রাজ্যং তচ্চ সাগরপর্য্যন্ত-ভূমিবিষয়ত্বান্মহৎ—তস্মৈ সার্ব্বভৌমত্বায় সুবতাং অভ্যনু-জানীতাম্। হে ভরতা রাজন্যবৈশ্যাদয়ো ধনিকা এষ যজমানো যুষ্মাকং রাজা, এনং স্বামিনং যথোচিতং সেবধ্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। সোম উত্তমো দেবোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা ন ত্বধমঃ ইতি।

রাজসূয় যজ্ঞের অঙ্গীভূত অভিষেচনীয় যজ্ঞের ঋত্বিক্ আর্য্য ক্ষত্রিয়েরা ভারতখণ্ডে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, সমস্ত ভূমণ্ডলে নিজাধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য, অগ্ন্যাদি দেবতাদিগের নিকট বিনীতভাবে অনুজ্ঞাভিক্ষা করিতেছেন। এই বেদবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্যগণ ভারতখণ্ডেই জন্মগ্রহণ করিয়া, শক্তিবলে সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইয়া, পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়,—

সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।

রাজা সুরথ নামে সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলের একজন অধীশ্বর ছিলেন। কেবল সুরথ রাজা বলিয়া নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজন্যগণ ঐরূপ সমগ্র পৃথিবীর শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জন্মভূমি যে একমাত্র ভারতবর্ষ, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অতএব বেদাদি শাস্ত্রীয় বহু প্রমাণের দ্বারা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলক বিচারের দ্বারা স্থির হইল, যে, আর্য্য-জাতি ভিন্নদেশ হইতে সমাগত নহে; উহা কেবল আধুনিক চিন্তাশীল ঐতি-হাসিক মহোদয়গণের কপোল-কল্পনামাত্র।

কর্ম্ম-তরু।

বশিষ্ঠের প্রতি রামচন্দ্র :—

বুঝিয়াছি গুরু, দেহ কর্ম্মতরু,
সংসার কাননে জাত।
করণ চরণ, নয়ন শ্রবণ,
শাখা প্রশাখাদি যত।
পূর্ব্বের জনম- কৃত যে করম,
এ দেহের বীজ তাই।
সুখ দুখ চয়, ফল সমুদয়,
তাহাতে সন্দেহ নাই।
যৌবন শোভায়, মনোরম হয়,
ক্ষণকাল তরে কায়া।
কুসুম আকারে, জরা শোভা করে,
দেয় সুশীতল ছায়া।
এই দেহ গাছে, কপি এক আছে,
তার নাম বটে কাল।
সে ত প্রতি পলে তরুবরে দলে,
পাতা ছেঁড়ে ভাঙ্গে ডাল।
নিদ্রার শিশিরে, সঙ্কুচিত করে,
স্বপ্নরূপী ফুল দল।
শরৎ জরায়, ঝরে' পড়ে' যায়,
প্রয়াস-পত্র-সকল।
এ ভব-ভবন, এ ত মহাবন,
দেহ তরু তাহে হয়।
কলত্র সকল, উপতৃণ দল,
তাহাকে বেড়িয়া রয়।
বাহু ও চরণ, অরুণ বরণ,
তরুর পল্লব যথা।
তাহাদের তল, লোহিত চঞ্চল,
সুখ রেখান্বিত পাতা।
অঙ্গুলীর গণ, কচি সুচিকণ,
পল্লব বায়ুতে দোলা।

---

* যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে।

নথর সকল, চাঁদ সমুজ্জল,
ফুলের কলিকাগুলা।
দেহ-তরু রূপী, করমের মূল,
করম-করণ-চয়।
সে মূলের মাঝে, ছিদ্র যত আছে,
কামসর্প তাতে রয়।
ছিদ্র যাতে নাই, গ্রন্থিশালী তাই,
কোনো মূল অস্থি-বিদ্ধ।
পঙ্কের ভিতরে, অন্যে বাস করে,
ডুবে থাকে হ'য়ে বদ্ধ।
রস যে তাহার, শোণিত আকার,
বাসনা করে তা পান।
কতিপয় মূল, গুল্‌ফযুত স্থূল,
মসৃণ ত্বক্‌বান।
এ মূল সবার, মূল আছে আর,
জ্ঞানের করণ যত।
ইহারা যদিও, বহু দূর স্থিত,
বিষয় হইতে জাত।
তথাপি সহজে, গ্রহণীয় এরা,
করিতেছে অবস্থান।
আশ্রয় করিয়া, নয়ন তারাদি
পঞ্চ আশয়ের স্থান।
বাসনার পাঁকে, মগ্ন হয়ে থাকে,
সরল বিপুল তারা।
ইহাদেরো মূল, করিছে বিরাজ,
ব্যাপিয়া বিপুল ধরা।
শুণ্ডের আকার, মন নাম তার,
জ্ঞানের করণ দিয়া।
অনন্ত রসের, করে আকর্ষণ,
ছেড়ে দেয়, সুখে পিয়া।
এ যে মনোমূল, ইহাও সমূল,
সে মূলেরে বীজ কহে।
বিষয় উন্মুখ, চিদাত্মাই নিজে,
ঐ নামে খ্যাত রহে।

নিখিল মূলের, কারণ চেতন,
সকল চিতের আদি।
চিৎ যারে কয়, জ্ঞানী সমুদয়,
নহে কভু সে অনাদি।
বটে সে সমূল, ব্রহ্ম তার মূল,
আদি-অন্ত-নাম-হীন।
সে যে পরাৎপর, চিত্ত আগোচর,
জ্ঞানী-হৃদে সমাসীন।
নিখিল করম, তাহার জনম,
চিদাত্মা হইতে হয়।
চিদাত্মার বীজে, বিশাল বিটপী,
নরদেহ জনময়।
"আমি" ভাবনায়, জীবের চেতনা,
যবে আবিলতাময়।
উহা ত তখন, জীবের করম-
বীজ রূপে বিকাশয়।
তাহা না হইলে, পর-ব্রহ্ম রূপে,
রহে সে ত প্রকাশিত।
চেতনা যখন, চেত্যাকার ভাবে,
হয়ে যায় অভিভূত।
তখনি সে হয়, করমের বীজ,
হয়ে আবিলতা যুত।
নতুবা যে সৎ, যে পরম পদ,
বিরাজিত সে ত তথা।
করম-কারণ, দেহ-আমি—ভার,
তাহার জনিত ব্যথা।
করমের মূল, নিবেদিনু যাহা,
সবি গুরু তব কথা।
উপদেশ কালে, বলেছিলে প্রভু!
শুনেছিনু নত মাথা।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সরকার।

আমাদের কথা।

তাই বলিতেছিলাম, আমাদের সাহিত্যে নৈতিক-সংশুদ্ধির সেই মন্দাকিনী-প্রবাহ কিরূপে আসে? সগরবংশ যখন মুনিশাপে ভস্মীভূত হইয়াছিল, সে সময় তাহার উদ্ধার হইয়াছিল—ভগীরথের তপস্যার ফলে—পতিত-পাবনী গঙ্গার পবিত্র-নির্ম্মল প্রবাহে। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যও অভিশপ্ত সগরবংশের ন্যায় অঙ্গারস্তূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ধর্ম্মসংস্রবহীনতা ও গন্ধহীন বিদেশীয় সাহিত্যের সংসর্গাঘাতে, তাহার কনক-মন্দিরের প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে। এখন হইতে তাহার উদ্ধার সাধন না করিলে, পরিপূর্ণ যৌবনে—যখন সে তাহার পূর্ব্ব আদর্শ - সীতা-সাবিত্রী-শকুন্তলাকে ভুলিয়া, প্রতীচ্যের আদর্শে, তাহার "যৌবন-জল-তরঙ্গের" প্রবল বন্যায় দু'কুল প্লাবিত করিয়া পূর্ব্বভাব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তখন শতচেষ্টাতেও তাহার সে উদ্দাম-গতি রোধ করিতে পারিবে না · সে উচ্ছৃঙ্খলতার ধ্বংস হইবে না! তখন আর সে বলিবে না,—

"শ্যাম পরশমণি, কি দিব তুলনা;
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণ-সেবন;
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপ দরশন,
বদনের ভূষণ আমার শ্যাম-গুণ-গান।"

তখন তার কলগীতি আর বাঙ্গালীর প্রাণে ভাবের যমুনার পবিত্র প্রবাহের মধুর-স্রোত আনয়ন করিবেনা! তখন তাহার সে রূপ দেখিয়া, তোমাকে কাতর-অন্তরে বলিতে হইবে,--

"সখি কি মোর করম লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি!"

তখন দেখিবে, তোমার সাহিত্যের কনকমন্দিরের, ভুবনে অতুল, বসন্ত-শোভার মাধুরী-প্রতিমা কোথায় সরিয়া গিয়াছে! তোমার নির্ম্মল-নীল

সাহিত্যাকাশের স্বর্ণ-প্রতিমা—কল্যাণময়ী দেবী প্রতিমা, যে তোমাকে নিশিদিন কত ছলে—তোমার ঐ কুঞ্জতলে, তোমারই চরণপ্রান্তে বসিয়া, সরল-সহজ-মনে—তোমাকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিত, তোমাকে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের চিরসঙ্গী বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে—তাহার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইত; তোমার শত অবহেলা—সহস্র লাঞ্ছনা—কোটি গঞ্জনা সহ্য করিয়াও, যে, "তব প্রেম লাগি সরব তেয়াগী" বলিয়া আপনাকে তোমার চরণতলে ফেলিয়া রাখিয়াই তৃপ্ত হইত, তাহার পরিবর্ত্তে—আর একজন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সে রূপবতী বটে, তবে তাহার রূপে সে কমনীয়তা নাই—তাহার রূপে সে আত্মদান নাই—তাহার রূপে সে পবিত্র প্রেম নাই! তাহাতে আছে,—

"উপহাস আর মূক অবহেলা।"

তখন বুঝিবে—

"প্রেমে দেয় কতখানি।"

তখন বুঝিবে, তোমার মহিমা-শৈল-শিরে প্রেম-পুণ্য-পবিত্রতাময়ী যে রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার স্থানে আর এক বহিঃ-সৌন্দর্য্যোপভোগ-পুলকিতদেহা—কামনাময়ী- বিলাসময়ী মূর্ত্তি! আর তাহাতে দেখিবে;—

"ঘৃণার বেদনা, যাতনা, তাড়না।"

তাই বলিতেছিলাম—নৈতিক-সংশুদ্ধির কথা।

যৌবনের প্রথম বিকাশের উদ্দাম-স্রোতের উচ্ছৃঙ্খলতায়, তোমার বঙ্গ-সাহিত্যের জীবন-মন্দিরের যে প্রাচীন প্রাচীর ভগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই ভাঙ্গা প্রাচীর মেরামত করিতে হইবে। সেই মেরামতের "মসলা", যদি তুমি, নৈতিক-সংশুদ্ধির পূতধারায় মাখিতে পার, যদি তোমার পুরুষ-পরম্পরাগত সংস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের স্নিগ্ধ-কিরণে তাহাকে পবিত্র-কোমল করিতে পার—তবেই তোমার সাহিত্যের জীবন-প্রবাহে অমৃতের আস্বাদ পাইবে; নচেৎ, কেবল প্রতীচ্য মসলায়, প্রাচ্য-সাহিত্যের প্রাচীর গঠনের চেষ্টা করিলে, তাহাতে শুভফলের সম্ভাবনা নাই—তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের বিন্দুমাত্র লাভ নাই! মনে রাখিও, সেই প্রাচীরনিহিত মদিরা-স্বপ্ন,

সাহিত্যের ভিতর দিয়া—"তোমার জাতীয় জীবনের অন্তস্তম তলেও, প্রতীচ্য চিন্তার" বিষয়াসক্তিরূপ প্রবল বন্যা প্রবাহিত করিবে। তাহাতে তুমি, তোমার সেই মূলভিত্তি আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া ফেলিবে! তাহাতে তোমার হৃদয়-বৃন্দাবন চিরদিনের জন্য অমাবস্যার ঘনান্ধকারে আবরিত হইবে! বুঝি সহস্র জীবনান্তেও সে অমানিশার অবসান হইবে না!

তাই বলিতেছিলাম, চাই আমাদের সাহিত্যে নৈতিক-সংশুদ্ধি—অতীত পারম্পর্য্য। তাই আমাদের এখন একমাত্র বরণীয় ও আরাধ্য বস্তু। সেই আরাধ্যের সন্ধান করিতে হইবে; তাহার দর্শনলাভের বেগবতী ইচ্ছা, সতত হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইবে। তাহার জন্য তোমাকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে! সাধনার জন্য, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির একত্র সম্মিলনের শুভ মিলনাবসর-প্রতীক্ষায়—তোমাকে আবার বলিতে হইবে—

"অহং যতিষ্যে।"

এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যাফলে যখন তোমার হৃদয় মন্দিরের নিভৃতকক্ষ,—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি,
ধন্যাস্তু তে ভারত-ভূমি-ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গ-ভূতে,
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

এই পুরাণ-গীতির পুণ্য ধ্বনির পবিত্র প্রতিঘাত মূর্চ্ছনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে—তখন আবার তোমার সাহিত্যে জ্ঞান-গঙ্গার আবির্ভাব হইবে। সেই পবিত্র স্রোতে, তোমার সাহিত্যে নৈতিক-সংশুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইবে; সেই পুণ্য-শুভ মুহূর্ত্তে সাহিত্যের শতাবিতান, তোমার অতীত-পারম্পর্য্যের গৌরব-গরিমায় উদ্ভাসিত হইবে; তোমার সাহিত্যের কনক-মন্দিরের ভগ্ন-প্রাচীর আবার জোড়া লাগিবে—তোমার সাহিত্যের আকাশ-বাতাস-ছটা—সকলই তখন মধুময় হইবে।

সেই মহেন্দ্রক্ষণে, সেই মধুময় প্রভাতে—তোমার "চিত্ত ফুল বন মধু" লইয়া, সাহিত্যে যে অপূর্ব্ব "মধুচক্র" রচিত হইবে তাহা হইতে "গৌড়জন" "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

সাময়িকী।

আনন্দ সংবাদঃ—পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারের সময় স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজী, হিজ্ হাইনেস হিন্দুধর্ম্মতিলক স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির আহ্বানে, ত্রিপুরারাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে, মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে স্বামীজী ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকটী বক্তৃতা দেন। তাহার

ফলে, মহারাজা বাহাদুর ও ত্রিপুরাবাসী, স্বামীজীর গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর স্বামীজীর প্রমুখাৎ শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্য প্রভৃতি অবগত হইয়া, ত্রিপুরাধিপতি মণ্ডলের কার্য্য পরিচালনার জন্য, স্বামীজীর হস্তে, দুইহাজার টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ এই সাধু-অনুষ্ঠান-পরায়ণ হিন্দু-নরপতিকে মঙ্গলময় দীর্ঘজীবনে আহ্বান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আশাকরি, বঙ্গ ও উড়িষ্যাদেশীয় অন্যান্য হিন্দু নরপতিবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ মহারাজার এই সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

বাঙ্গালায় শঙ্করমঠ :—আজ প্রায় এক মাসকাল অতীত হইল, হাবড়ার অন্তর্গত রামরাজাতলা নামক পল্লীর প্রান্তভাগে "শঙ্কর মঠ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী পরমানন্দপুরী মহোদয়ের ভক্ত-শিষ্য রামরাজাতলা নিবাসী শ্রীমান মন্মথনাথ শেঠ, এই ধর্ম্মকার্য্যের যাবতীয় ব্যয় প্রদান করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে যাহাতে মঠের কার্য্য স্বচ্ছন্দভাবে নির্ব্বাহ হয়, তজ্জন্যও উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিয়াছেন। আমরা "শঙ্কর মঠ" দেখিয়া ভক্ত মন্মথনাথের এই সাত্ত্বিক দানে হৃদয়ে পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। যাঁহাকে হিন্দুজাতি শিবাবতাররূপে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই নিকট ভক্তের শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। আর স্বামীজী মহোদয়ের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি বাঙ্গালায় যে পবিত্র-স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা যাহাতে সেই শিবাবতারের পুণ্য-কল্যাণময় নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বাঙ্গালাদেশের আদর্শ জ্ঞান-ধর্ম্ম-মন্দিরে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সযত্ন দৃষ্টি রাখিবেন।

জ্যোতির্মঠ :—শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়কল্পে ভারতবর্ষকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটী মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উক্ত মঠ-চতুষ্টয়ের অন্যতম উত্তরাখণ্ডের জ্যোতির্মঠ বা জোশিমঠ, বিগত চারিশত বৎসর হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের "ধর্ম্মালয় সংস্কার" বিভাগ ঐ মঠের উদ্ধারসাধনে যত্নবান হইয়াছেন এবং মহামণ্ডলের চেষ্টায় ও ভারতের স্বাধীন নরপতিবৃন্দের সাহায্যে, মঠের সংস্কার-কার্য্যের সূত্রপাতও হইয়াছে। মঠের সংস্কার সাধনের পর, শ্রীমহামণ্ডল একজন যোগ্য আচার্য্যকে উক্ত মঠের অধিপতিরূপে নির্ব্বাচিত করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

উপদেশক মহাবিদ্যালয় :—শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় ভবনে, সাধু এবং গৃহস্থ ধর্ম্মোপদেশক ও ধর্ম্মশিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য, "উপদেশক মহাবিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে সাধু বিদ্যার্থিগণের জন্য আজীবন যোগক্ষেমের ভার মহামণ্ডল গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং গৃহস্থ শিক্ষার্থীদিগকে যথোচিত মাসিক বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥

১ম ভাগ | আষাঢ়, সন ১৩২৬। ইং জুন, ১৯১৯। | ৩য় সংখ্যা।

আত্মনিবেদন।

(অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।)

স্রষ্টা হ'য়ে সৃষ্টিকর জীব রূপে কর তুমি লীলা;
ব্যাপ্ত হ'য়ে আছ তুমি জল স্থল তরু গুল্ম শিলা।
তোমার সত্তায় পূর্ণ এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মহান্,
তোমা হ'তে উদ্ভব সবার তোমাতেই স্থিতি অবসান।
তোমার ইচ্ছায় সদা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বচরাচর,
বিকার রহিত তুমি পূর্ণ সত্য মঙ্গল সুন্দর।
জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান তুমি, তুমি শক্তি, তুমি অনুভূতি,
উপাস্য ও উপাসক তুমি, হব্য হোতা, তুমি মন্ত্র স্তুতি।
পিতা মাতা পুত্রকন্যারূপে করিতেছ নিত্য অভিনয়,
তোমার কর্ত্তৃত্বাধীনে কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হয়।
সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ তুমি দাও তুমি কর ভোগ,—
অথচ নির্লিপ্ত তুমি কারো সনে নাহি তব যোগ।

বেদরূপে নিত্য তুমি সত্য-ধর্ম্ম করিছ প্রচার,
হেয় উপাদেয় তুমি জ্ঞান বুদ্ধি রূপে কর আবিষ্কার।
একমাত্র তুমি আছ, তুমি ছাড়া কিছু নাহি আর ;
তুমি আমি অভিন্নস্বরূপ ভেদ শুধু মায়ার বিকার।

* * *

যখন যে ভাবে তুমি করিয়াছ লীলা মোর মাঝে,
সেই ভাবে করেছ প্রকাশ মোরে মানব সমাজে।
তুমি দিয়াছিলে ভাষা বলেছিনু তাই এতদিন,
ছিলাম নীরব আমি করেছিলে তুমি ভাষাহীন।
আবার আদেশে তব পূর্ব্ব বেশ করিয়া ধারণ,
আসিয়াছি লীলাময় তব নিত্য লীলার কারণ।
তুমি লীলা করিতেছ অহরহ মোর অন্তরালে,
আমারে মোহিত করে রাখিয়াছ তব ইন্দ্রজালে।
স্তুতি নিন্দা দিয়া তুমি চাহ মোরে করিতে চঞ্চল,—
কৌতুক জড়িত হাস্যে চাহ মোরে দেখিতে কেবল ?
তাই যদি ইচ্ছা তব বল মোরে কি করিতে হ'বে,
তব তৃপ্তি সাধিবারে দাস তব পরাঙ্মুখ কবে ?
তোমার এ রঙ্গমঞ্চে কতবার তোমারি আদেশে
কত অভিনয় আমি করিয়াছি নব নব বেশে।
আমার আমিত্ব দেব ! কতদিনে হবে অবসান
কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হবে, মিশে যাবে ভক্ত ভগবান।

শ্রী :—

প্রকৃতি ও ঈশ্বর।

[শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।]

বাহ্য জগৎ যে নিয়ত ক্রীড়াশীল তাহা হিন্দুরাই বুঝিতেন। খ্রীষ্টীয় মতে জগত স্থির ও নিশ্চল এবং ঈশ্বরের লীলাভূমি ও তিনি যে জগতকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সেই ভাবেই চলিতেছে। প্রথমে মানবের সৃষ্টি, তাহার পর অপরাপর জীব সৃজিত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; সেই একভাবেই জীব-ধারা চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি অনন্ত নহে, ইহা কাল-ভাবী; অর্থাৎ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। এই অভিব্যক্তি-বাদের দিনে এরূপ মত বালকেও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। নব্য-জ্যোতিষ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, এক একটী তারা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আকাশে রহিয়াছে। আমাদের চন্দ্র এখন বৃদ্ধ কঙ্কালসার গ্রহ। সেখানে জীব নাই, জল নাই, বায়ু নাই, উদ্ভিদ্ নাই। সমুদ্রের গহ্বর পড়িয়া রহিয়াছে এবং উহাকেই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলি। কোন্ সময়ে চন্দ্রলোকে জীব বিচরণ করিত, তাহা আমরা জানি না এবং কতদিন ধরিয়া উহা মৃতপ্রায় হইয়া আছে তাহাও বলা যায় না। খ্রীষ্টীয়ানদের আর একটা ভুল—তাহারা পৃথিবীকেই একমাত্র জগৎ মনে করে; এই পৃথিবী ছাড়া অপর জগৎ আছে, তাহা তাহাদের শাস্ত্রে বলে না।

হিন্দুরা জগৎকে কি মহামন্ত্রের দ্বারা এরূপভাবে দেখিতে শিখিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। এরূপ সূক্ষ্মব্যাপার তাঁহাদের অলস চক্ষে কিরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারাই জানেন। ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন বাদ দিয়া আর যত গ্রন্থ আছে, তাহাতে ঐ এক কথা পরিণাম ও বিবর্ত্ত। উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন, পুরাণ তন্ত্র, যেখানে অনুসন্ধান করিবে সেই খানেই জগতের পরিণামের কথা। বোধ হয় কপিলমুনিই এই মহামন্ত্রের পুরোহিত এবং পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির সৃষ্টি-প্রকরণ তাঁহারই মতের প্রতি-

ধ্বনি। জগৎ শব্দের নিরুক্তিই ক্রিয়া-বাচক। যাহা যায় তাহাই জগৎ। আবার প্রকৃতিশব্দও ক্রিয়া-বাচক—যাহা করে, তাহাই প্রকৃতি।

বৌদ্ধেরা এই পরিণামবাদ লইয়া এত নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তন্ত্রে অবশেষে আর ঈশ্বরের বা জগৎ-কর্ত্তার আবশ্যক হয় নাই। মাধ্যমিক-দর্শন মতে বাহ্য জগৎটাত অস্থির বটেই, মানস-জগতও অস্থির। প্রত্যেক অনুভূতির সহিত এক এক আমি—নিত্য আমি, স্থায়ী আমি! কিছুই নাই অর্থাৎ আত্মা নাই। পরমাণুস্পন্দনে বা আধুনিক ভাষায় রাসায়নিক ক্রিয়ায় যদি জগত গড়ে ও ভাঙ্গে, তাহা হইলে জগৎ কর্ত্তার অবকাশ কোথায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই বৃহস্পতি শিষ্যেরা পরিণামবাদটা বড় মানিতেন না। তাঁহারা ন্যায় বৈশেষিকের মত আরম্ভবাদী। তাঁহাদের মত এখনও যেটুকু লিখিত আকারে চলিতেছে, তাহা প্রায় সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহারা আত্মা ও প্রাণ উভয় ব্যাপারকেই জড়-শক্তি বলিয়া বুঝিতেন। যাহা হউক, এ সকল মতের খণ্ডন বা সমর্থন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ষড়-দর্শনের মধ্যে এই সকল মতের এত সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, যে, আর কাহারও এ বিষয়ে কথা কহিবার বিশেষ আবশ্যক হইবে না। এক বেদান্তদর্শনেরই, প্রথম দুই তিনটী সূত্র বাদ দিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় কেবল সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ খণ্ডন।

যাহা হউক, বৃহস্পতি শিষ্যেরা যে জড়বাদ প্রবর্ত্তন করেন, তাহার ঢেউ এখনও চলিতেছে। নব্য জড়বাদীদের, বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত দাঁড়াইবার স্থল আরও বাড়িয়াছে; রসায়নের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রাণীতত্ত্ববিদের মতে জীবদেহটা একটা রসায়ন-পাত্র। উহাতে যাহা কিছু কার্য্য হইতেছে, সে সমস্তই রাসায়নিক ব্যাপার। খাদ্য পরিপাক, এবং ঐ জীর্ণ খাদ্য হইতে মেদ, মাংস, অস্থি, শোণিত প্রভৃতি সকলই রাসায়নিক ব্যাপার। মানবের শরীরটাই মূলতঃ কার্ব্বণ ও নাইট্রোজেন সংঘটিত। জীব-শরীরের যে অঙ্গটাই পরীক্ষা কর, উহা ছাড়া আর কিছুই

পাইবেনা। প্রোটোপ্লাস্‌ম, যাহা লইয়া জীব ও উদ্ভিদ শরীর—উহা একটা যৌগিক পদার্থ। অর্থাৎ কতকগুলি রাসায়নিক মৌলিক বস্তুর সংঘাত। কাজেই প্রাণীতত্ত্ববিদের ভিতর দুইটা দল দেখা যায়। এক দলের মতে জীব-শরীর কতকগুলি রাসায়নিক বস্তু সংঘটিত। অতএব ঐ রাসায়নিক বস্তু-গুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে সংশ্লিষ্ট হইলে, সপ্রাণ জীব গঠিত হইতে পারে। আর এক দলের মতে, প্রাণ একটা স্বতন্ত্র শক্তি; উহা জীবদেহে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জীব সক্রিয় এবং সহস্র সহস্র জড় সংযোজনা করিলেও উহা আনিতে পারা যায়না। অতএব তাঁহাদের মতে জড়ের অতীত এমন একটা কোনও বস্তু আছে, যাহা প্রাণ-রূপে জীবদেহেতে সংস্থিত। সুতরাং এক পক্ষের মতে জড়ের সংহনন হইতেই প্রাণ ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং অপর সম্প্রদায়ের মতে জড় যতই একত্র হউক না কেন, তাহা দ্বারা প্রাণ—উৎপন্ন হইতে পারেনা। সহস্র শূন্য একত্র করিলে, এক বা দুই হইতে পারে না, তাহা শূন্যই থাকিবে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এক দল, পরিদৃশ্যমান অস্থির জগতকেই (ফেনোমেনা) সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। অপর দল, জগতকে সত্যের একটা রূপ বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের মত অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, যাহা সত্য, যাহা স্থায়ী বা নিত্য, তাহা জগতের অনেক পশ্চাতে, জগত তাঁহারই একটী প্রকার (মোড)। বৌদ্ধেরাও এই শেষোক্ত মত অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে—যদিও এই জগৎ ধারাবাহিক অর্থাৎ ইহার এক মুহূর্ত্তে যে অবস্থা থাকে, পরমুহূর্ত্তে আর তাহা নাই; যেমন দীপশিখা ও নদীস্রোত। এই যে উজ্জ্বল দীপশিখা, ইহা খানিকটা কার্ব্বণগ্যাস দগ্ধ করিতেছে এবং ঐ খানেই উহার শেষ। তাহার পর আবার গ্যাস, আবার দহন; অথচ আমরা একই দীপ-শিখা দেখিতেছি। নদীর জলও ঐরূপ; এখন যে জল আমার সম্মুখে রহিয়াছে তাহা চলিয়া গেল, আবার তাহার স্থলে পশ্চাতের জল আসিয়া পূরণ করিল, কিন্তু আমরা নদী একটাই দেখিতেছি! দৃষ্টান্ত বেশ সুন্দর বটে—জগৎ এইরূপই এবং আত্মাও হয়ত ঐ ভাবেরই হইতে পারে; কিন্তু কাহার ধারাবাহিকত্ব? বৌদ্ধেরা বলিবেন শূন্যের! শূন্যের ভাব, শূন্যের ধারাবাহিকত্ব, নাস্তির প্রবাহ—

কথাগুলি অসঙ্গত নয় কি? যাহা হউক, বৌদ্ধেরা তাঁহাদের দার্শনিক ভিত্তিটা বেশ দৃঢ় রাখিয়াছেন, তবে ইহাতে তাঁহাদের ঈশ-তত্ত্ব শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

নাস্তিক্যের ও জড়বাদীর মতটা আরও একটু বিশেষভাবে সমালোচনা করিতে হইবে। সম্মুখে মেঘ, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে; তাহার পর বারিধারা আমার গাত্রস্পর্শ করিতেছে ও বারিবিন্দু চোখ দিয়া দেখিতেছি। এবিষয় চক্ষুকর্ণের কোনও বিবাদ নাই; সকলেই একবাক্যে বলিবে, মেঘ কারণ, বৃষ্টি কার্য্য। মেঘ ও বৃষ্টি সমনিয়তভাবে আছে বা উহাদিগকে ব্যাপ্য ব্যাপকও বলিতে পার। কিন্তু অবাঙ্‌-মনস-গোচর ঈশ্বর সম্বন্ধে সে কথা খাটেনা। যদি "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই কথা বলিয়া ঈশ্বরকে জগতের আদি-কারণ বল, অমনি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের দল আসিয়া তোমার মুখে হাত দিয়া বলিবেন পাগলের মত কি বলিতেছ "জগতের আদি কারণ"। জগতের আদি কারণত জড় ও জড়শক্তি। যদি ইহাতেই তোমার কাজ চলিয়া যায়, তবে আবার সমস্যা বাড়াও কেন? দর্শন এ স্থলে বিহ্বল হইয়া পড়ে কিন্তু দর্শন নিস্তব্ধ হইবার পাত্র নহে। দর্শনের চিরকালই এই এক ধারা; যদি তুমি একটা পথ বন্ধ কর, তাহা হইলে ইহা অপর পথ অনুসন্ধান করিয়া নিজের মত বজায় রাখিবে।

এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ধর্ম্ম মতের অনেক পরিবর্ত্তন হয় এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের অসার অংশসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া ধর্ম্মের নির্ম্মল-স্নিগ্ধ-রশ্মি জনসমাজে উদ্ভাসিত হয়। চার্ব্বাকেরা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষতঃ যজ্ঞসমূহের উপর ভীষণ আক্রমণ করিলেন, বেদের রচয়িতাদের ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচর বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন, বৈদিক কর্ম্মের অসারতা দেখাইয়া প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ফল দাঁড়াইল শ্রীকৃষ্ণের গীতা-ধর্ম্ম, উহাতেও কর্ম্ম-কাণ্ডের উপর কটাক্ষ আছে এবং তৎপরে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম। ইহাতে ঈশ্বর নাই, কিন্তু কর্ম্মের নূতন অর্থ আছে। অগ্নিতে "স্বাহা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঘৃত ঢালিলে স্বর্গ-হয়, বৌদ্ধেরা একথা ভুলিয়া যাইতে বলিলেন। ইহা তাঁহাদের মতে কর্ম্ম নয়; উহা অকর্ম্ম। কর্ম্ম আবার নূতন আচ্ছাদনে আসিল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা—সত্যভাষণ, কামবর্জ্জন

প্রভৃতি দশবিধ কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম আমাদের মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংহিতাতেও স্থান পাইয়াছে।

শেষের কথাটা পূর্ব্বেই বলা হইয়া গেল; আশাকরি ইহাতে ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন হইবেনা। যে কথাটা তুলিয়াছিলাম অর্থাৎ প্রকৃতির উপর আবার একজন কর্ত্তা দাঁড় করান, ইহা কি তর্কশাস্ত্রের মতে গৌরব নহে অর্থাৎ ইহা কি অধিক হইয়া পড়ে না। জড়বাদীরা বলিবেন পরিস্পন্দিত-পরমাণু পাইলেই সব হইল, আবার তাহার উপর কর্ত্তার কোনও প্রয়োজন নাই। যদি স্থাবর-জঙ্গম দুই রাসায়নিক ক্রিয়া-সম্ভূত হয় এবং রাসায়নিক ক্রিয়া যদি পরমাণুসমূহের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ হয়, তাহা হইলে পরমাণুই সৃষ্টির মূল, তাহার পশ্চাতে যাইবার কি আবশ্যকতা আছে।

হিন্দুদর্শনে প্রকৃতির অধিকার বহু বিস্তৃত। সাংখ্যদর্শনে স্থাবর জঙ্গম সকলই প্রকৃতির অন্তর্গত। মন, প্রাণও প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্তেরও ঐ একই কথা। তবে ন্যায় ও বৈশেষিক তন্ত্রে পরমাণুকে নিত্য অর্থাৎ উহা আপনা হইতেই হইয়াছে ও চিরকালই আছে এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতিও নিত্য অর্থাৎ উহা সৃষ্ট বস্তু নহে। এরূপস্থলে সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান কোথায়? আবার জৈমিনীর তন্ত্রের শ্লোক-বার্ত্তিককার বলেন যে, বৃক্ষপ্রভৃতির জন্ম, মৃত্তিকা ও জল সাপেক্ষ। কুম্ভকার যেরূপ ঘট রচনা করে, বৃক্ষের উৎপত্তি সে ভাবের নহে—তবে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকারের প্রয়োজন কি?

নব্য ইউরোপীয় দর্শনেও "নেচরকে" খুব উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীনেরা যাহা দৈব-রাজ্যের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, নব্যেরা তাহা একে একে কাড়িয়া লইয়া প্রকৃতির মধ্যে পুরিতেছেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি একটা যন্ত্র। যাহাকে আমরা ক্রিয়া বলি, তাহা জড়-নিহিত শক্তি প্রসূত। শক্তি শব্দটাই তাঁহাদের নিকট হেয়। নাস্তিকশিরোমণি হিউম, শক্তি মানিতেই চাহেন না; তিনি বলেন মানুষ ও শব্দটা নিজের দেহের অনুপাতে তৈয়ারী করিয়াছে। নব্য-ন্যায় কতকটা ঐ ভাবেই গিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, তোমরা যাকে শক্তি বল, উহা জড়ের একটা গুণ। হক্‌স্‌লি, স্পেন্‌সার প্রভৃতি "ফোরস্‌" শব্দটা সাধ্যমত বাদ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তবে "মিকানিক্‌স্‌"

বিষয়ক গণিতে উহার আবশ্যক হইয়া পড়ে। "হাইড্রোজেন" ও "অক্সিজেন" কোনও বিশেষ অনুপাতে একত্র কর, তাহা হইতে জল হইবে। অম্ল ও ক্ষার ঐরূপভাবে এক কর তাহা হইতে লবণ পাইবে। প্রকৃতি কতকগুলি নিয়ম অনুসারে কাজ করে। একটা মৌলিক পদার্থের সহিত অপর এক বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগ হইলে পদার্থান্তর উৎপন্ন হয় এবং সৃষ্টি এই ভাবেই চলিতেছে ইহাতে অপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা এই শিক্ষাই জগতকে এত দিন দিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু; জড় জগতে যেমন আমরা নানা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, আসল জগতেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতি-সর্ব্বস্ববাদটা জগতের লোকের আর ভাল লাগে না। হয়ত ইহার মধ্যে কোনস্থলে যুক্তির ব্যভিচার আছে, হয়ত ইহাতে তর্ক প্রণালীর দোষ আছে অথবা মানবের স্বতঃবুদ্ধি এ মতের পোষণ করিতে পারে না। জার্ম্মন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক লোট্জ, তিনি দৃশ্যমাত্রবাদী বা প্রকৃতি-বাদীদের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি বলেন তোমরা বল প্রকৃতি কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী। ইহাতে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা আছে। ক উপস্থিত থাকিলে খ'এর উপস্থিত থাকিতেই হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। বেশ কথা, এই যে কার্য্য কারণ নিয়ম এই যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ, এই এক বস্তুর সহিত অপরের সমনিয়ত সম্বন্ধটা প্রকৃতি পাইল কোথা হইতে? ইহা কি প্রকৃতির স্বসৃষ্ট আত্ম-প্রতিষ্ঠিত কার্য্য অথবা ইহাতে অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব আছে। জড়ের তোমরা একটা গুণ আছে বলিয়া থাক অর্থাৎ উহা দেশ অধিকার করিয়া থাকে এবং নিউটনের নিয়মগুলি ধরিলে উহা হয় স্থির-নিশ্চল-ভাবে থাকে অথবা উহাতে গতিপ্রয়োগ করিলে এবং কোনও বাধা না পাইলে চিরকালই চলিতে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় জড়, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা কোথা হইতে পাইল। জল, বায়ু, উত্তাপ এই তিনটি পদার্থ জগৎকে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে; এবং জীবের জীবন ও প্রাণ এইগুলির উপর নির্ভর করিতেছে ইহা সত্য। বায়ু জীবের রক্ত পরিষ্কার করিতেছে; শরীরের দুই তৃতীয়াংশ জল; কাজেই জল জীবের এক প্রকার জীবন; আর উত্তাপেরত কথাই নাই এখনই তাপ বন্ধ কর, সূর্য্যকে সরাইয়া দেও—দেখিবে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে পৃথিবীতে আর জীব নাই। ইহাকে লাইবনীজের কথামত পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত-ব্যবস্থা (প্রি-এস্ট্যাবলিস্‌ড্ হার-

মনি) বলিলে তোমরা চটিয়া যাইবে। যাহাই বল জড় বলিলে যাহা লোকে বুঝে তাহা কখনও আপনার নিয়ম আপনি করিতে পারে না। দুই মৌলিক পদার্থে অপর একটী মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহানা হইলেই পারে—জড় কি সত্য-গ্রহ করিয়াছে। নিয়ম ও ব্যবস্থা কর্তৃত্বের পরিচয়; অতএব ইহা হইতে জড়ের এক জন নিয়ন্তা, জড়ের এক জন ব্যবস্থাপক আছে ধরিয়া লইতে হয়। নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহাদেরও ইহার প্রত্যুত্তর আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার অল্পমাত্র পরিচয় দিতে পারা যায়। বিষয়টা অতি বড়, লেখকেরও শক্তির অভাব; কাজেই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এ বিসয়ের আলোচনা ঘটিয়া উঠিবে না। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আস্তিকদের কথায় চক্রক দোষ রহিয়াছে। জড়ের ব্যবস্থা ও নিয়মের কথা তুলিবার আবশ্যক কি, সেটা আমাদের মানিয়া লইতেই হইবে যে ইহার অন্যথা হইতে পারেনা। জল, বায়ু, তাপ আছে বলিয়াই জীবের আবির্ভাব; যে গ্রহে উহা নাই সেখানে জীবও নাই। তোমরা সৃষ্টির কথা বল, সৃষ্টি কি একদিনে হইয়াছে? কত-শত যুগ কাটিয়া গিয়াছে তবে পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে বাষ্পীয় অবস্থা, তাহার পর অর্দ্ধ কঠিন, তাহার পর কঠিন, তাহার পর জল ও বায়ু, তাহার পর উদ্ভিদ্, তাহার পর জলের জীব, তাহার পর স্থলের জীব, ইত্যাদি ইত্যাদি। সৃষ্টি একদিনের ব্যাপার নহে, ইহা কুম্ভকারের ঘট নিৰ্ম্মাণ বা দার্শনিক পেলির কথামত কারুকারের ঘটিকাযন্ত্র নিৰ্ম্মাণও নহে। জড়ের মধ্যেই সৃষ্টি-কুশলতা রহিয়াছে। ইহাতে বাহিরের কর্ত্তার আবশ্যক নাই। উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থের গতি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে; কেন উহারা গতি উৎপাদন করে তাহা আমরা জানি না; যেহেতু উহারা মূল কারণ। মূল কারণ বা জগতের চরম ব্যাপারের আমরা কিছুই জানি না ও কোনকালে জানিব তাহারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। উত্তাপ প্রভৃতির গতি উৎপাদনই নিয়ম, উহার স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া কোনও ফল নাই। দ্বিতীয়ক কারণ লইয়া থাকাই বিজ্ঞানের কার্য্য; মূল কারণের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া দর্শনের একটা রোগ।

দার্শনিকই বা ছাড়িবেন কেন? তিনি ইহার উত্তরে বলেন, দ্বিতীয়ক বা মধ্য-কারণ লইয়াই তুমি থাক কেন? আহার-বিহারই জীবের প্রধান

প্রবৃত্তি। মধ্য-কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইহার মধ্যে তোমার কোন্‌টা চরিতার্থ হয়। যদি বল উহা একটা প্রবৃত্তি একটা প্রেরণা (ইম্‌পল্‌স), তাহা হইলে মূল-কারণ-সমূহের আলোচনা করাও একটা প্রেরণা; তাই আমরা উহা করি এবং যদি দর্শনের উহা রোগ হয়, তাহা হইলে তোমাদেরও উহা রোগ।

আপাততঃ প্রশ্ন এই যে, দর্শনের ঈশ্বর ও হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের ঈশ্বর একই বস্তু কিনা? বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহা এক নহে। ধর্ম্ম, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবস্থা। অসভ্য মৌলিক জাতিরও ধর্ম্ম আছে। ভারতবর্ষ, ভারত সাগর দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় যে সকল আদিম-জাতির বাস, যাহারা কৃষিকার্য্য জানেনা, রাঁধিয়া খাইতে জানেনা, যাহারা এখনও প্রকৃতির সন্তান, সেই সব জাতির মধ্যে জগৎ-কর্ত্তার অথবা মানুষের সুখ দুঃখের মূল কারণের একটা জ্ঞান আছে। সাকই জাতির (ক) কল উৎসবে সাকই অধিপতি উপাসনা করিতেছিলেন। কোন ইউরোপীয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কাহার পূজা করিতেছ?" তদুত্তরে সাকই অধিপতি বলেন "আমি (১) বনের হান্তু, পর্ব্বতের হান্তু, নদীর হান্তু (২) পূর্ব্বতন সাকই অধিপতিদিগের হান্তু (৩) উদর-শূলের হান্তু, মস্তক-শূলের হান্তু (৪) যে হান্তু মানুষকে জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত করে ও অহিফেন পান করায় (৫) যে হান্তু মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আনিয়া দেয় (৬) যে হান্তু মশক পাঠাইয়া দেয়, আমি সেই হান্তুর পূজা করিতেছি।" ঐ অসভ্য জাতির ধর্ম্মে ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ সংস্কার আছে অধিপতি তাহাই বলিয়াছেন। হান্তু (১) বন, পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির দেবতা (২) মৃত মানবের আত্মা (৩) পীড়ার কর্ত্তা (৪। ৫) সমাজে কদাচার ও কুনীতির প্রবর্ত্তক (৬) ক্লেশ-দায়ক জীবের প্রেরক। ইহাতে একদিকে হান্তুদেব যেমন প্রকৃতির অধিপতি, আত্মারূপে বিরাজমান, আবার অপর দিকে মানুষের অমঙ্গলের নিদান। এই এক প্রকার ঈশ্বরবিষয়ক সংস্কার। আবার খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মে দেখা যায় যে, ঈশ্বর রাজতুল্য, মানবের শাসক ও অনন্ত স্বর্গ ও নরকের বিধায়ক। তিনি শরীরী ও সিংহাসনোপবিষ্ট। হিন্দুদের পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা

(ক) ব্রহ্ম উপদ্বীপের অসভ্য জাতি বিশেষ।

ঈশ্বরের এই মানবীয় ভাব দেখিতে পাই। কিন্তু বৈদান্তিক মতে তিনি অশরীরী, জগতে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত, মালার সূত্রের ন্যায় প্রত্যেক বস্তুতে অনুস্যূত, এবং তাঁহার ভাষায় জগৎ বিভাসিত। এখন শেষোক্ত মতটিরই আদর বেশী এবং অনেক ইউরোপীয় ও মার্কিন পণ্ডিত ঈশ্বরকে এই ভাবে দেখিতেই ভালবাসেন; তাহার পরিচয় ক্রমশঃ দিতেছি।

ধর্ম্ম, মনীষী কল্পিত তত্ত্ব বিশেষ। ঋষি, জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শীর মানস-জগতে ঈশ্বরের ভাব যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছে, ধর্ম্মে আমরা তাহাই পাইয়াছি। মনীষী বা মহাজন, সকল বিদ্যারই আছে। শিল্প বল, বিজ্ঞান বল, নীতি বল, ধর্ম্ম বল, সকলই কোনও ব্যক্তিবিশেষের ধ্যানের ফল। তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে, প্রমাদ থাকিতে পারে; কারণ সম্যকদৃষ্টি, সমগ্রের পরিস্ফুরণ, মানবের ভাগ্যে ঘটে না। সভ্যতার ইতিহাস উলটাইয়া যাও, দেখিবে, মানুষ তিল তিল করিয়া এক এক বিষয়ে অগ্রসর হইতেছে। আদিম-জাতিরও শিল্প আছে, নীতি আছে, ধর্ম্ম আছে; কিন্তু সভ্যজাতির তুলনায় তাহা কত হীন। এই আদিম জাতির নিকট হয়ত আমরা কত বিষয়ে ঋণী। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্ব, কত অপরিণত বিদ্যা, আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে তাহাদের নিকট পাইয়াছি। উহার ইতিহাস এখন অন্ধকারে মগ্ন। যাহা হউক, অসঙ্গতি নির্ব্বাচন দর্শনের একটা কাজ। তুমি নূতন তত্ত্ব বাহির করিলে দর্শন তাহার যেটুকু খুঁত আছে তাহাই দেখাইয়া দিবে। ধর্ম্মসম্বন্ধেও দর্শনের ঐ অধিকার আছে। দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ঈশ-তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব এত পরিমার্জ্জিত। প্রধান উপনিষৎগুলি দর্শন বলিলেও চলে। ঈশ্বর, আত্মা, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান সম্বন্ধে বিচার প্রত্যেক উপনিষদে রহিয়াছে।

খৃষ্টীয়ান গ্রন্থে আমরা যেরূপ নিরাকার অথচ শরীরী ঈশ্বরের বর্ণনা দেখিতে পাই, জার্ম্মন বৈজ্ঞানিক "হেইকেল" উহা "বাষ্পীয় স-মেরুদণ্ড জীব" (গ্যাসস্ভারটিব্রেট) বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। একদিকে নিরাকার আবার শরীরী অধিষ্ঠান, যুক্তির অগম্য ঐরূপ একটা কিম্ভূতকিমাকার হইয়া পড়ে। স্রষ্টার বর্ণনায়, ন্যায় ও যুক্তি দুইই থাকা চাই; তাহা না থাকিলে উহা বিদ্রূপের বিষয় হইয়া পড়িবে। "টক্‌ওয়েল্" নামক একজন খ্যাতনামা ইংরাজ দার্শনিক তাঁহার ধর্ম্ম ও সত্য "রেলিজন ও রিয়ালিটি"

নামক গ্রন্থে বৈদান্তিক ধর্ম্মের অকপটভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। প্রফেসর "ল্যাড্ অব্ হারভারড্" একজন প্রথিতনামা অদ্বয়বাদী। তাঁহার কোনও গ্রন্থের বিচার অবসরে টক্ওয়েল্ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন "পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে প্রফেসর ল্যাডই কেবল চরম-সত্যকে এই মায়িক জগতের মধ্যে পূর্ণ আত্মা রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বহুপূর্ব্বে বেদান্ত এই অভ্রান্ত-বাক্য জগতকে এরূপভাবে উপদেশ দিয়াছেন ও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, তাহা কিছুতেই ভোলা যায় না বা উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। এই ব্রহ্মের সহিত জগতের ঐক্য-জ্ঞান আমাদের মতে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও দার্শনিক প্রতিভার এক অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া এবং পাশ্চাত্যজগৎ ইহার মূল্য এখনও বুঝিতে পারে নাই।" (ক) পুনরায় ঐ গ্রন্থে "পূর্ণব্রহ্মকে (আবসোলিউট) তোমরা শরীরী বলিতে পার না, তাঁহাকে আত্মন্ বলিতে পার; তাহা না হইলে স্বোক্তি-বিরোধ হইয়া পড়ে। .....ভারতের বেদান্ত-দ্রষ্টা ঋষিরা যে পূর্ণব্রহ্ম বহু পূর্ব্বে সমাধান করিয়াছেন এইরূপে আমরা তাহাতে উপনীত হইতে পারি। নির্জ্জন অরণ্যে, বহু যুগ-ব্যাপী ধ্যানে এই প্রাচীন ঋষিরা মানবের প্রকৃতি ও জগতের গতি প্রভৃতি অতি গভীর প্রশ্নের বিচারে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীব ও তাবৎ বস্তু এক ভূমা আত্মন্ হইতেই উৎপন্ন। উপনিষৎ বলেন "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" (খ)

দর্শন বুদ্ধির ব্যাপার আর ধর্ম্ম রসের ব্যাপার। দার্শনিকের ব্রহ্ম আলোচনায় একটা রস আসে বটে,কিন্তু উহাতে তর্ক-কূটই অধিক। ধার্ম্মিকের ঈশ্বরের স্মরণে আবেগ আসে, পুলক-স্পন্দ দেখা দেয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে এই সাইকোলজির বা ঈশ্বর-আবেশে মানসিক ভাবের অনেক আলোচনা দেখা যায় এবং পৃথিবীর অন্য কোনও গ্রন্থে এত বিশ্লেষণ আছে কিনা বলা যায় না। ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ বা মানবভক্তি কত প্রকারে বিকশিত হইতে পারে তাহাও আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই। আজকাল পাশ্চাত্য জগতে ঈশ্বরানুভূতি (মিস্টিসিসম্) সম্বন্ধে কএকখানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। কেবল বিজ্ঞান-রস লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। ইহা কেন

* (ক) রেলিজান ও রিয়ালিটি ১১৫ পত্র। (খ) ১৫২ পত্র।

হইল, কি করিয়া হইল, কেবল ইহা জানিয়া মানুষের তৃপ্তি হয় না। চিনি খাওয়া ও চিনির রাসায়নিক বিশ্লেষ এক জিনিষ নহে। এই দুইয়ে মানসিক অবস্থার প্রভেদ আছে। মার্কিন দার্শনিক "জেমস্" ধর্ম্মবিষয়ক অনুভূতি সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা বিজ্ঞানের ছাঁচে ধর্ম্মের বিষয় অনুসন্ধান। ধর্ম্ম যে পুরোহিতের জীবিকার উপায় নহে ইহার সত্তা আছে এবং ইহা বাস্তব, জেমসের ইহাই দেখান উদ্দেশ্য। যাহা হউক, ধর্ম্ম বিষয় চর্চ্চা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে "ব্রহ্মবিদ্যায়" আমরা লিখিতেছি। প্রবন্ধ উপসংহারের পূর্ব্বে আমাদের দেশের দার্শনিকদের মধ্যে ঈশ্বর বিচার কিরূপ হইয়াছে একটু দেখান আবশ্যক। সকলের কথা বলিতে গেলে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। তবে নৈয়ায়িক চুড়ামণি "জয়ন্ত ভট্টের" ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থ অবলম্বনে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

জয়ন্ত প্রথমে জগৎ-সৃষ্টির প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্ন তুলিলেন। জগৎ-সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন ইহা বলিতে পার না ; কারণ পাগলের কার্য্যই অনেকস্থলে নিষ্প্রয়োজন দেখা যায়। তাহা হইলে প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তরে এক প্রাচীন বচন তুলিয়া দেখাইলেন, প্রয়োজন কি তাহা জানি না। তবে কি অনুকম্পাপূর্ব্বক ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন ? তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবও থাকেনা কাহারও মুক্তিরও আবশ্যক হয় না; সুতরাং কাহার প্রতি দয়া ? আর স্রষ্টা যদি কারুণিকই হয়েন, তবে দারুণ দুঃখভার-যুক্ত সংসারের সৃষ্টির আবশ্যক কি ? যদি বল ক্রীড়া বা লীলার জন্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ! তাহাও বলিতে পার না ; কারণ তাহা হইলে সৃষ্টি, সংহার বা লয় হইবে কেন ? আর ক্রীড়াসাধ্য সুখলাভের আশায় যদি সৃষ্টি বল, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দ কোথায় ? তবে কি জগতের কর্ত্তা নাই ? জগতের কর্ত্তা আছে। কারণ, জগৎ—কার্য্য এবং কার্য্য থাকিলে তাহার একজন কর্ত্তা থাকা চাই। জগৎ-রচনায় সন্নিবেশ আছে ও সংস্থান আছে। যেখানে আমরা সন্নিবেশ ও সংস্থান অর্থাৎ "সাজানগোজান" ব্যবস্থা দেখি, সেইখানেই কর্ত্তা আছে অনুমান করি। মীমাংসকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা জগতের কর্ত্তা নাই বল, অথচ মানুষের কর্ম্ম "অপূর্ব্ব" আকারে তোলা থাকে এবং কর্ম্মই মানুষের সুখ-দুঃখ বা স্বর্গ-নরক দিয়া থাকে।

অচেতন কর্ম্মকে তোমরা যদি এতবড় স্থান দিতে পার তাহা হইলে এই জগতের একজন চেতন কর্ত্তা অনুমান করায় কি দোষ আছে? তাহার পর সাংখ্যের প্রতিও কটাক্ষ আছে। অচেতনের চেতনবৎ কার্য্য "বৎসের জন্য গাভীর অচেতন দুগ্ধের উৎপত্তি।" এ সকলের খণ্ডন সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং উল্লেখের প্রয়োজন নাই। জয়ন্তের মতে সৃজন ও সংহারই ভগবানের স্বভাব। পরমাণু নিত্য বটে কিন্তু তাহার সংস্থান সন্নিবেশ স্রষ্টার কার্য্য। এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম-ফল-দাতা অচেতন হইলে চলে না। অতএব মানুষের শুভাশুভ ফল ও মুক্তিদাতা এক ঈশ্বরই হইতে পারেন। নব্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এ মতগুলি বড় ভাল লাগেনা। সন্নিবেশ ও সংস্থান বা আদিকারণবাদ এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এইগুলি ঈশ্বর প্রমাণে অন্যতম উপায়। ঈশ্বর আছেন কি নাই এ প্রশ্ন এখনও বহুকাল ধরিয়া চলিবে এবং মানুষের জ্ঞান উন্নতির সহিত আমরা ইহা বিভিন্ন কলেবরে দেখিতে পাইব। আস্তিক্য ও নাস্তিক্যবুদ্ধি তাঁহারই সৃষ্টি, তবে এ খেলা কেন তাহা বলিতে পারি না।

জীবতত্ত্ব।

(শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম, এ, বি, এল।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে জীবের জন্মমরণরাহিত্য অধিকরণে (১৬ সূত্রে), নিত্যত্ব অধিকরণে (১৭ সূত্রে), চিদ্রূপত্ব অধিকরণে (১৮ সূত্রে), সর্ব্বগতত্ব অধিকরণে (১৯-৩২ সূত্রে), এই তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-তত্ত্ব স্বীকার করিলে ও জীবের অজত্ব স্বীকার করিলে, জীব-ব্রহ্মে তাত্ত্বিক অভেদ সিদ্ধান্ত

অপরিহার্য্য। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ১৭শ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"এ সম্বন্ধে এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীবও ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ন্যায় জন্মে। এইরূপ পক্ষ পাওয়ায় বলা হইল যে, আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে, শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তি-প্রকরণের বহু প্রদেশে জীবের উৎপত্তি অশ্রুত আছে। জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। কেননা জীব নিত্য। শ্রুতির ও শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব্দের দ্বারা জীবের নিত্যতা প্রতীত হয়। অজত্ব কি? অজত্ব অবিকারিত্ব। অতএব অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাবে অবস্থান ও জীবের ব্রহ্মত্ব শ্রুতির দ্বারা বিনিশ্চিত হয়। তাদৃশ জীবের উৎপত্তি যুক্তিবহির্ভূত। আত্মনিত্যত্ববাদিনী শ্রুতিসমূহ এই—'ন জীবো ম্রিয়তে,' 'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়োব্রহ্ম,' 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,' 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ,' 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,' 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি,' 'স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ,' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি। এই সকল জীব-নিত্যত্ববাদিনী শ্রুতি জীবোৎপত্তির বাধক। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকারবান্ (জন্মবান্), বিকারত্ব-নিবন্ধন উৎপত্তিমান, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছি। জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই। 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'—এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটাদিসম্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্ পৃথক্‌রূপে) প্রতিভাত হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি-উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা বিভক্তের ন্যায় (পৃথক্ প্রায়) প্রতিভাত হ'ন। এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—'প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।' ঐ বিনাশ যে উপাধির বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন,—'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতি।' অবিকৃতব্রহ্মই শরীরসম্পর্কে জীব, ইহা স্বীকার করিলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা উপরুদ্ধ (নষ্ট) হয় না। উপাধিনিবন্ধন জীবলক্ষণ একরূপ ও ব্রহ্মলক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে। শ্রুতি প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম উপদেশের পর 'অতঃপর মোক্ষের উপায় ও স্বরূপ বলুন' এতদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার

সংসারধর্ম্ম নিষেধপূর্ব্বক পরমাত্মভাব উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, আত্মা উৎপন্নও হ'ন না, লয় প্রাপ্তও হ'ন না।

(কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ)।

পূর্ব্বে গীতায় (১৪।৩-৪ শ্লোকে) জীবোৎপত্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তাহা এই অর্থে বুঝিতে হইবে। জীব অজ হইলেও তিনি যখন ঈশ্বরের অংশভাবে বীজরূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকৃতিগর্ভে উপ্ত হ'ন, অথবা পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীগর্ভে বীজরূপে নিষিক্ত হন, তখন তাঁহার প্রথম জন্ম হয় বলা যায়। প্রকৃতিগর্ভে যখন তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া ভূলোকে আগমন করেন, অথবা স্ত্রীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম। আর যখন বিদ্যা বা কর্ম্মফলে তিনি ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, তখন তাঁহার তৃতীয় জন্ম (ঐতরেয় ২।৩-৪)। এইরূপে অজ-জীবের জীবভাবে উৎপত্তি হয়।

এইরূপে আমরা জানিতে পারি যে, জীব-ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও উপাধিহেতু জীব-ব্রহ্মে জীবে-ঈশ্বরে বা জীবে-জীবে ভেদ সিদ্ধান্ত হয়। বুদ্ধ্যাদি-উপাধিতে উপহিত হইয়াই আত্মা অনুপরিমাণ হ'ন, অল্পজ্ঞ হ'ন, অনীশ হ'ন, কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া বদ্ধ হ'ন। আত্মার সান্নিধ্যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ চেতনবৎ হয়, জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। সেই বুদ্ধি উপাধিতে আত্মার অধ্যাস হেতু, তাহার জীবভাব বা জ্ঞাতৃ কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃ-ভাব হয়। কিরূপে জীবের কর্ত্তৃভাব হয়, তাহা বেদান্তদর্শনের (২।৩।৩৩—৩৯) সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। এই কর্ত্তৃভাব জীবে অধ্যস্ত হয় মাত্র; ইহা পারমার্থিক সত্য নহে। যতদিন জীবের কর্ত্তৃত্বভাব থাকে, ততদিন তাহার কর্ম্মবন্ধন থাকে। ততদিন তাহার সম্বন্ধে বেদাদি বিধিনিষেধশাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে। তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মে ঈশ্বরের প্রেরণা থাকে!

(বেদান্তদর্শন ৩।৩।৪১—৫৩।)

এইরূপে অবিদ্যাহেতু যতদিন আত্মার বুদ্ধ্যাদি-উপাধির সহিত তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন তাহার এই জীবভাব থাকে এবং এই জীবভাবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত তাহার ভেদ ব্যবহার থাকে।

বেদান্তদর্শনের ২।৩।৩০ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল :—

"এক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বুদ্ধিসংযোগবশতঃই আত্মার সংসারিত্ব ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি ও আত্মা এই দুই বিভিন্ন পদার্থের সংযোগবিনাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ 'সংযোগাঃ বিপ্রযোগান্তাঃ' এতন্নিয়মানুসারে অবশ্যই কোনও না কোন সময়ে বুদ্ধ্যাত্মসংযোগের অবসান হইবে; বুদ্ধি বিয়োগ হইলেই নিরবলম্বনতা নিবন্ধন আত্মার অসদ্ভাব বা অসংসারিত্ব ঘটিবে।

"এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরসূত্র এই—'যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ নদোষস্তদ্দর্শনাৎ" অর্থাৎ ঐ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ এই যে বুদ্ধিসংযোগ যাবদাত্ম ভাবী অর্থাৎ সংসারী থাকা পর্য্যন্ত। আত্মা যতকাল সংসারী থাকিবেন, ততকাল তাঁহার বুদ্ধির সহিত সংযোগ (তাদাত্ম্যাপন্ন হওয়া) ও সংসারিত্ব অনিবৃত্ত থাকিবে। যতকাল বুদ্ধি উপাধির সহিত তাঁহার সম্পর্ক—ততকালই তাঁহার জীবত্ব ও সংসারিত্ব। পরমার্থ অর্থাৎ অকল্পিতভাব অনুসন্ধান করিতে গেলে পাওয়া যায়, জীব বুদ্ধিপরিকল্পিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অহংভাব থাকা পর্য্যন্ত বুদ্ধিসংযোগ থাকে; এ তত্ত্ব কিসে জানা যায়, সূত্রকার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিয়াছেন,—'তদ্দর্শনাৎ'। শাস্ত্র তাহা দেখাইয়াছেন 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান-ময়শব্দে বুদ্ধিময়; বুদ্ধি তাদাত্ম্যাপন্ন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। 'বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময় শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনঃপ্রভৃতির সহিত বিজ্ঞানের পাঠ থাকায়, তাহার বুদ্ধিময়ত্ব অর্থই অভিপ্রেত এবং বুদ্ধিময়ত্ব শব্দের অর্থও বুদ্ধিপ্রাধান্যবিশিষ্ট। বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ বুদ্ধিবশ্যতা। স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি, এ শ্রুতিও লোকান্তর গমনকালে বুদ্ধ্যাদির সহিত অবিচ্ছেদ দেখাইয়াছেন। বুদ্ধির সমান—যেমন বুদ্ধি তেমনই হইয়া—এ অর্থ সন্নিধানবলে লব্ধ হয়। যেন ধ্যান করেন, যেন চালিত হ'ন এ অংশ ঐ অভিপ্রায়ের দ্যোতক। উহাতেই বলা হইয়াছে যে, আত্মা স্বয়ং ধ্যান করেন না, গমনাগমনও করেন না, বুদ্ধিই ধ্যান করে, চিন্তা করে, গমনাগমন করে, আত্মা বুদ্ধিময় হইয়া থাকায় আত্মাতে উপচরিত হয়।...আরও দেখ, আত্মার বুদ্ধি সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞান-মূলক।

সুতরাং সম্যক্‌জ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞান উন্মূলিত হয় না। কাজেই যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মতাবোধ উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধিসম্বন্ধও নিবৃত্ত হয় না। এ রহস্য শ্রুতি বলিয়াছেন। যথা—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। যদি কেহ বলেন, সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে আত্মার বুদ্ধিসংযোগ থাকে না, থাকা স্বীকার করিতেও পার না, কেন না—'সতাসৌম্যতদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে এবং প্রলয়কালেও নিরবশেষ প্রলয় স্বীকৃত আছে। যদি সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে বুদ্ধিসংযোগ না থাকিল, তবে, বুদ্ধিসম্বন্ধের যাবদাত্মভাবিত্ব কিরূপে সঙ্গত হয়? সূত্রকার এক্ষণে এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলিতেছেন,—'পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ'।...অর্থাৎ বুদ্ধিসম্বন্ধও সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে শক্তিরূপে থাকে, জাগ্রতে ও সৃষ্টিতে তাহা আবির্ভূত হয়, যেমন বাল্যকালে পুংধর্ম্মসকল বীজভাবে থাকে, ব্যক্ত থাকে না, যৌবনে তাহা ব্যক্ত হয়।

(পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ)

এইরূপ বুদ্ধ্যাদি-উপাধিযোগে আত্মা জীবভূত হইয়া পরমেশ্বরের অংশ হ'ন, ইহাই গীতোক্ত ১৫।৭ শ্লোকের অভিপ্রায়। বেদান্তদর্শনের ২।৩।৪৬ সূত্রের ইহাই যে অর্থ, শঙ্কর তাহা ভাষ্যে দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামানুজ সংসারদশায় জীব-ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে এই ভেদ ও অংশাংশিভাব সংসার-মুক্তাবস্থায়ও থাকে, ব্রহ্মে এই ভেদ এই বিশিষ্টতা যে নিত্য পারমার্থিক সত্য, তাহা বেদান্তদর্শনের এই সকল সূত্র হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার শ্রীভাষ্যের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"এখন সংশয় হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই? কিংবা উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ? শ্রুতিবিরোধবশতঃ এইরূপ সংশয় হইতেছে। ...এখন কোন পক্ষটি স্থির হইল? জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বটে, শ্রুত্যুক্ত 'জ্ঞাজ্ঞৌদ্বারজাবীশানীশৌ' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশই কারণ। ঈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় (বুঝিতে হইবে) যে ঔপচারিক। আর জীব

যে ব্রহ্মাংশ, একথাও সমীচীন হয় না, কেননা 'অংশ' শব্দটি হইতেছে একই বস্তুর একদেশবোধক ; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত দোষরাশি ব্রহ্মেতে প্রসক্ত হইতে পারিত। আর ব্রহ্মেরই খণ্ড বিশেষের নাম জীব হইলেও যে, তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে, কারণ, ব্রহ্মবস্তু কখনও খণ্ড করা যাইতে পারে না, উহা অখণ্ড। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত দোষসংস্পর্শাদিদোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ব্রহ্মাংশতা প্রতিপাদন করাও সহজ নহে। অথবা ভ্রমসম্পন্ন ব্রহ্মই জীব, (তদতিরিক্ত নহে) কারণ অদ্বৈত-বোধক শ্রুতি হইতে ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। শ্রুতি ও অভেদবাদী শ্রুতিসমূহকে অবিষ্ঠাপর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। অথবা অনাদি উপাধিভূত মায়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে,—ব্রহ্মাংশ ইতি। কারণ? অন্যথাচ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয় প্রকারেই নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও সৃজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব কল্যাণময়ত্ব গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও সেব্যত্ব বা সেবক প্রভৃতি ধর্ম্মে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আবার অন্য প্রকারেও 'তুমি হইতেছ তাহা' (ব্রহ্ম) এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইত্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।...এইরূপ আথর্ব্বণ-শাখীরা ব্রহ্মের দাশকিতবাদিরূপত্ব অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এইরূপে উভয়-প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দ্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যে ভেদনির্দ্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই অন্যথাসিদ্ধ বা অকারণ হইবে, তাহা নহে। অতএব যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তর সিদ্ধভেদ-প্রকাশক বলিয়া সে সমুদায়ই প্রসিদ্ধার্থ প্রকাশক...আর যে, উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব একথাও সমীচীন হয় না ; কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়ম্যত্বাদি নির্দ্দেশেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। অতএব, উক্ত উভয়প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"

রামানুজ ২।৩।৪৬ সূত্রের ভাষ্যে আরও বলিয়াছেন,—'এবং স্মৃতিতেও

প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ ॥'
'যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনু।'

শ্রুতিসমূহও 'যস্যাত্মা শরীরম্' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদিরূপে (জীব জগৎ ও ব্রহ্মের) অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন।'

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ)

এস্থলে জীবতত্ত্বপ্রতিপাদক এই সকল বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, ও অভেদবাদ প্রভৃতি, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ যেরূপ বুঝাইয়াছেন, এস্থলে তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এবং জীব সম্বন্ধে অন্যান্য তত্ত্ব বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর ও রামানুজকর্ত্তৃক তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এস্থলে তাহার আর উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এই জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাহা দেখিয়া লইবেন। এস্থলে আমরা এই জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা উল্লেখ করিব মাত্র।

প্রথমে জীবভাব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, এলোকে ব্রহ্মের পরাখ্য আত্মশক্তি হইতে যে বুদ্ধ্যাদি আধ্যাত্মিক অন্তঃপ্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে ব্রহ্ম আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। বুদ্ধ্যাদি—উপাধিতে আত্মরূপে তিনি এই জীবভূত বা জীবভাবযুক্ত হন। যে উপাধিতে ভূতভাবের অভিব্যক্তি হয়, সেই ভূতভাব বা জীবভাব গ্রহণ করিয়া আত্মা জীব হ'ন। এই ভূতভাব কি, এবং কোথা হইতে অভিব্যক্ত, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে হইবে। আত্মার সান্নিধ্যে বুদ্ধিতে যে 'অহং' বা 'আমি' ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই মুখ্য জীবভাব বা ভূতভাব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতিজ বুদ্ধি হইতে যে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহা জড়। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে এই অহংভাব ব্রহ্মের বা আত্মারই। বৃহদারণ্যকে উল্লিখিত হইয়াছে,—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।

সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ।

সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোঽহন্নামাভবৎ।" (১।৪।১)

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ।" (১।৪।১০)

অতএব আত্মার অহংপ্রত্যয় বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাতে অহংভাবের অভিব্যক্তি হয়। ইহাই মূল জীবভাব। বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে উপহিত এই অহংভাব আমোক্ষস্থায়ী ; জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা নিত্য অনুস্যূত। শঙ্কর বলিয়াছেন,—

'সর্ব্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি' (১।১।১ সূত্র ভাষ্য) ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে বুদ্ধি উপাধিতে যেমন অহংরূপ দ্বৈতভাবের অভিব্যক্তি হয়, বুদ্ধি উপাধির মলিনতায় তাহা মলিন ও পরিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ অন্যান্য নানাবিধ ভূতভাবও ঈশ্বর হইতে বুদ্ধি উপাধিতে অভিব্যক্ত। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।

সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ (১০।৪—৫)

আর এই সকল ভূতভাব যে ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বহুরূপে বিভক্ত হয় সেই ত্রিগুণজভাবও ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ (৭।১২)

অতএব চিত্তরূপ উপাধিতে অভিব্যক্ত সমুদায় জীবভাব বা ভূতভাব ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্ম আত্মা-রূপে সেই চিত্ত উপাধিযুক্ত হইয়া—সেই ভূতভাবযুক্ত হইয়া জীব হ'ন এবং এই জীবরূপে তিনি পরিচ্ছিন্ন ও ভগবানের অংশের ন্যায় হ'ন। কিন্তু ইহা যে ঔপাধিক, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে এই উপাধির সহিত আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিম্ববাদ ও প্রতিবিম্ববাদ প্রসিদ্ধ আছে। প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধে বেদান্তসূত্র এই 'আভাস এবচ' (২।৩।৫০)। ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন —"জল-সূর্য্য (জলে সূর্য্য প্রতিবিম্ব) যেমন বিম্বভূত সূর্য্যের আভাস, (প্রতিবিম্ব) তেমনি, জীবও পরমাত্মার আভাস (প্রতিবিম্ব) ইহা জানিতে হইবে। যেহেতু আভাস, সেহেতু জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মও নহে পদার্থান্তরও নহে। যেমন এক জলসূর্য্য কম্পিত হইলে অন্য জলসূর্য্য কম্পিত হয় না, তেমনি একজীবে কর্ম্মফল সম্বন্ধ ঘটিলে, অন্য জীবকে স্পর্শ করে না। অবিদ্যা আভাসের জনক। অবিদ্যা অস্তগত হইলেই পারমার্থিক ব্রহ্মভাব স্ফুরিত হয় এ উপদেশ যুক্তিযুক্ত ও সার্থক।"

বেদান্তদর্শনে ৩।২।২০ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন :—

"জল বাড়িলে বা বর্দ্ধিত হইলে জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল হ্রাস বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রাস হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাত্বে নানা দেখায়। এইরূপে সূর্য্য জল ধর্ম্মানুযায়ী, কিন্তু পরমার্থ পক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থ পক্ষে ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায় উপাধি ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধ্যাদি ভজনা করেন।" * অর্থাৎ সূর্য্য যদি দ্রষ্টা হইয়া জলরূপ মলিন উপাধিতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে আপনার স্বরূপ বলিয়া বুঝিতেন, তবে তিনি যেমন ভ্রান্ত হইতেন, সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ জীব বুদ্ধ্যাদি মলিন উপাধিতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হন।

যাঁহারা জীব-ব্রহ্মে বা জীব ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন না। আমাদের বুদ্ধিতে বা চিত্তে যে চেতন

---

* হস্তামলকে আছে,—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানমুখত্বাৎ পৃথক্‌ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—মুখের প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে জল তৈল কাচ প্রভৃতিতে

ভাবের যে জ্ঞাতৃ কর্ত্তৃ ভোক্তৃভাবের অভিব্যক্তি হয় -যাহা জীবভাব, তাহা হইতে জীব ভিন্ন নহে। এই জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। জীব মুক্ত হইলেও সে নির্ম্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধিযুক্ত থাকে। তাহার অণুত্ব থাকে। সেজন্য সে পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) সহিত কখনও একীভূত হইতে পারে না। মুক্তাবস্থায় ঈশ্বর-সামীপ্যলাভ করিলেও -এমন কি, ঐশীশক্তিলাভ করিলেও সে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন থাকে। কিন্তু এই বাদানুসারে জীব যে ঈশ্বরের অংশ, তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অংশবাদে জীবব্রহ্মে অংশাংশিভেদ স্বীকার করিলে, সিদ্ধান্ত করিলে, অন্ততঃ চিদ্রূপে জীবব্রহ্মে অভেদত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। আর এ অংশবাদ যদি পারমার্থিক সত্য হয়, তাহা হইলে, বিশিষ্ট বা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি উক্ত স্ফুলিঙ্গবাদ বা বিম্ববাদানুসারে ইহা সিদ্ধ হয়। অগ্নি হইতে যেমন বহু স্ফুলিঙ্গ উদ্ভূত হইয়া আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিদ্ঘন ব্রহ্ম হইতে বহু আত্মা বা চিৎকণা উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মের কল্পিত বা সৃষ্ট বহু নামরূপ উপাধিতে বা প্রকৃতিজ বহু লিঙ্গশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহাতে বহু জীবভাবের বিকাশ করে। এইরূপে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অংশই বিম্বরূপে জীব হয় এবং দেহভেদে জীবে জীবে ভেদ হয়। জীবে জীবে ভেদ হেতু যোনি বিভিন্ন হইয়া থাকে। কেহ উচ্চ বা সদ্‌যোনি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, কেহ বা নীচ বা অসদ্‌যোনি লাভ করিয়া হেয়রূপে পরিগণিত হয়।

বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইলে বস্তুতঃ উহা মুখ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। যদিও মুখাভাসরূপ কোন বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই, তথাপি উহা উপাধি-ভেদে মুখ হইতে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়, অতএব উপাধিগত মালিন্যে মুখাভাসও মলিন বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ বুদ্ধিতে দৃশ্যমান আত্মপ্রতিবিম্ব জীব ঔপাধিক-ভেদানুসারে সুখী বলিয়া প্রতিভাসিত হয়। সিদ্ধান্তপক্ষে আত্মা একই, ঔপাধিক গুণ আপনাতে আরোপ করিয়া উহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

অতএব প্রতিবিম্ববাদানুসারে 'পরমার্থসন্মুখাভাসকবৎ চিদাভাসকো বুদ্ধিষু দৃশ্যমানেষু জীব ইত্যুচ্যতে।

যাহা হউক যদি সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আত্মশক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই প্রতিবিম্ব-বাদের সহিত বিম্ববাদের সামঞ্জস্য হয়।

দেহাদি উপাধিভেদ হেতু এই ভেদ শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন জীবে জীবে ঔপাধিক ভেদ সম্বন্ধে, শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ২।৩।৪৯ সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—"যেমন অগ্নি এক হইলেও অশুচি-জ্ঞানে শ্মশানাগ্নির পরিত্যাগ ও শুচিজ্ঞানে অন্য অগ্নির গ্রহণ, সূর্য্যালোক এক হইলেও অমেধ্য-দেশস্থের পরিহার ও শুচি-দেশস্থের গ্রহণ, সমস্তই মৃদ্বিকার, অথচ হীরকাদির গ্রহণ ও দেহাদির পরিবর্জ্জন, পবিত্রজ্ঞানে গোজাতির মূত্র-পুরীষাদির গ্রহণ ও অপবিত্রজ্ঞানে অন্য জাতির মূত্র-পুরীষের পরিবর্জ্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও দেহাদি উপাধিসম্পর্কে লৌকিক বৈদিক অনুজ্ঞা ও পরিহার, উভয়ই সঙ্গতার্থক হয়।"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উপাধির মলিনতায় উপাধেয় কখন মলিন হয় না। ঐ যে কুক্কুর-চণ্ডালাদি জীবের শরীর, ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতির মলিনতাবশতঃ উহাদিগকে অস্পৃশ্য, হেয় ও মলিন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি; উহাদের অন্তরস্থ আত্মা যিনি, তিনি এ মলিনতায় মলিন হ'ন না—অস্পৃশ্য বা হেয় হ'ন না—তাহাদের আত্মা ও আমাদের আত্মা একই, তিনিই ব্রহ্ম।

যাহা হউক, একাত্মবাদ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অর্থাৎ সংসারদশায় জীব ব্রহ্মে ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ যে কোন ভেদ নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, এই বিম্ববাদের সহিত প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ করিতে হইবে। সংসার বা ব্যবহারদশায় জীবের সহিত ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের ভেদ এবং পারমার্থিক অর্থে জীব-ব্রহ্মে অভেদ—ইহাই তত্ত্বতঃ সত্য হইলে, বিম্ববাদ ও প্রতিবিম্ববাদ উভয়ই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। যেমন বিম্ববাদে পরমার্থতঃ অভেদ-বাদ সিদ্ধ হয় না সেইরূপ প্রতিবিম্ববাদে সংসারদশায় ভেদবাদ বা অংশবাদ স্থাপিত হয় না। যাহা হউক, যদি সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আত্মশক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই প্রতিবিম্ববাদের সহিত বিম্ববাদের সামঞ্জস্য হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার মায়া বা প্রকৃতিরূপা পরাশক্তির কোন ভেদ নাই।

জগৎকারণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে কার্য্যরূপে যে বহু জীবোপাধির অভিব্যক্তি হয়, ব্রহ্মের পরাখ্য-শক্তিরূপা মায়াদ্বারা তাহা বিধৃত হয়। ব্রহ্ম

আত্মারূপে সেই উপাধিতে অধিষ্ঠিত হইলে, ব্রহ্মের এই শক্তির অংশ বা বিম্ব গ্রহণ করিয়া, সেই উপাধিতে বিভিন্ন ভূতভাবের অভিব্যক্তি হয়। সেজন্য আত্মা জীব হইয়া তাহাতে বদ্ধ হ'ন।

এই যে সর্ব্বগত বিভু পরমাত্মার প্রত্যেক উপাধিতে ভিন্নভাবে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রকাশ, ইহাই এক অর্থে তাঁহার প্রতিবিম্ব। আর এই বিভিন্ন উপাধিতে ব্রহ্ম-শক্তি বিম্বিত হওয়ায় ইহাতে যে ভূতভাবের অভিব্যক্তি হয়, ইহাই তাঁহার বিম্ব। এইরূপে বিম্ব ও প্রতিবিম্ববাদ সমন্বিত হয়। ইহা আমরা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সূর্য্য বাপী-কূপ-তড়াগাদির জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, সেই প্রতিবিম্বের সহিত সূর্য্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ জানা যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন পাত্রস্থ জল সূর্য্যের কেবল প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না; তাঁহার বিম্বও গ্রহণ করে। সেইরূপ দর্পণে কেবল আমাদের মুখ প্রতিবিম্বিত হয় না, তৎসহ আমাদের মুখজ্যোতিও বিম্বিত হয়।

শঙ্কর যে বিভিন্ন পাত্রস্থ জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব-প্রকাশের দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিবিম্ববাদ বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা এইরূপে বিম্ববাদের আভাষ পাই। কেননা, তেজোময় সূর্য্য চতুর্দ্দিকে তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করিয়া সর্ব্ব-দিগ্ব্যাপ্ত হন। সেই তাপ ও আলোক বিম্বরূপে সেই জল গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়। দর্পণ যে আমাদের মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করে, ইহাও প্রতিবিম্ববাদের এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু বিজ্ঞান হইতে জানা যায় যে, দর্পণ আমাদের মুখজ্যোতিও গ্রহণ করে। দর্পণ-স্থলে আলোকচিত্রের যন্ত্র রাখিলে সেই মুখবিম্ব তাহাতে স্থায়ীভাবে বিম্বিত হয়। অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যহেতু লৌহ সেই মণির চুম্বক-শক্তির বিম্ব গ্রহণ করে; অর্থাৎ তাহাতে সেই চুম্বক-শক্তির কতক পরিমাণে অনুপ্রবেশ (Induction) হয়। সেজন্য তাহা হইতে সেই শক্তির স্বরূপ আংশিক প্রতিবিম্বিত হয়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা এই বিম্ব ও প্রতিবিম্ববাদ কিরূপে সমন্বিত হইতে পারে, তাহা আমরা কতকটা বুঝিতে পারি। যাহা হউক, জীব-ব্রহ্মে যে সম্বন্ধ তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বিম্ব ও প্রতিবিম্ববাদ সমন্বয় করিয়া আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এক অনাদি অব্যয় অনন্তশক্তি এই

জগতের মূল কারণ; তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ব্যয় নাই, সঞ্চয় নাই, তাহা মূলতঃ এক ও অখণ্ড। বিজ্ঞানের এই শক্তি-সাতত্যকে ইংরাজীতে Conservation of Energy বলে। এই শক্তি স্বরূপতঃ অপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ। ইহা নানারূপ জড়োপাধির সাহায্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়। কোথাও আলোকরূপে বা জ্যোতিরূপে, কোথাও তড়িৎরূপে, কোথাও চুম্বক-শক্তিরূপে, কোথাও রাসায়নিক সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ শক্তিরূপে ইহা অভিব্যক্ত হয়। জড় উপাধি (Matter) যোগে ইহার পরিণাম (Transformation) দৃষ্ট হয় এবং নানাভাবে ও নানাপরিমাণে ইহা অভিব্যক্ত হয়। এই শক্তির আদিরূপই তেজঃ। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে এই তেজঃ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত (তত্তেজোঽসৃজত), এই তেজঃ স্বরূপতঃ নিরুপাধিক, সর্ব্বব্যাপ্ত, অপরিচ্ছিন্ন; তবে কেবল আধার বা উপাধিবিশেষে ইহা অভিব্যক্ত হয়, তখনই ইহা প্রকাশিত হয়। আর আধারভেদে ইহার প্রকাশেরও ভেদ হয়। এই তেজঃ জড় সূর্য্যমণ্ডলে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হয়—আমাদের চক্ষুর অনুগ্রাহক হয়। এই তেজঃই ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ কাষ্ঠাদি অবলম্বন করিয়া তাপ ও আলোকরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। আধার বা উপাধি না পাইলে, এই তেজঃ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইত না, এবং আমরা ইহার অস্তিত্বও জানিতে পারিতাম না। এই সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত তেজঃ আকাশে সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাও উপাধিযোগে প্রকাশ না হইলে তাহার রূপ আমরা জানিতে পারিতাম না। এস্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। যে উপাধিযোগে এই তেজঃ বা শক্তি প্রকাশিত হয়, সেই উপাধি তাহার পূর্ণ প্রকাশের বাধা দেয়। সর্ব্বত্রই যে উপাধি,—শক্তি প্রকাশের অনুকূল, তাহাই তাহার পূর্ণপ্রকাশের বাধক। এজন্য যে কোন উপাধিতে এই তেজের যে প্রকাশ হয়, তাহা তাহার পূর্ণপ্রকাশ নহে; তাহা তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ প্রকাশ। এমন কি, তাহার যে ইহা স্বরূপের প্রকাশ, তাহাও বলা যায় না। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্ম সৃষ্টিকল্পে দিক্‌কালরূপে ব্যাপ্ত হইলে তাহা হইতে আকাশাদির অভিব্যক্তি হয়; এবং ব্রহ্মও জগতের উপাদানকারণরূপে বহু বুদ্ধ্যাদি-উপাধি সৃষ্টি করেন। তাহাদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাত্মকতা হেতু আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট

হ'ন। সর্ব্বব্যাপক তেজঃ যেমন কাষ্ঠাদি উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন, এবং আত্মরূপে প্রকাশিত থাকেন। যতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণ উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট আত্মার জীবভাবে পৃথক্ প্রকাশ থাকে। উপাধি নষ্ট হইলে, কাষ্ঠস্থ অগ্নির মূল-তেজে লয় হইবার ন্যায় উপাধি নষ্ট হইলে, সেই উপাধিস্থ আত্মাও ব্রহ্মে বিলীন হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতে জীব-ব্রহ্মের উক্তরূপ সম্বন্ধ আমরা কতকটা বুঝিতে পারি।

এইরূপে শ্রুতি হইতে, এবং বিভিন্ন শ্রুতির সমন্বয়পূর্ব্বক বেদান্তদর্শনে এই জীবতত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ তাহা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতে সংসারদশায় জীব-ব্রহ্মের ভেদ ও ঈশ্বরের সহিত অংশাংশি-ভাব এবং পরমার্থতঃ, জীব-ব্রহ্মের অভেদ আমরা বুঝিতে পারি।

গীতায়ও এই শ্রুত্যুক্ত ভেদাভেদবাদই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যে সংসাররূপ অশ্বত্থে বদ্ধ জীবের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" আর পারমার্থিক অর্থে যে জীব-ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই, জীব অজ, নিত্য, বিভু, সনাতন, সর্ব্বগত ; সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

জীব বা দেহীর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা গীতায় প্রথমে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান বলিয়াছেন যে, আমরা জীব—নিত্য ; আমাদের উৎপত্তি বা বিনাশ কখনও নাই।

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্।।" ২।১২

আমাদের আত্মাই সর্ব্বব্যাপক বিভু অবিনাশী ও অব্যয়,—

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।।" ২।১৭

জীব বিনাশশীল শরীরে স্থিত হইয়াও নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়,—

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য———— ।।" ২।১৮

ইনি অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয়, নিষ্ক্রিয়—হননাদি কোন ব্যাপারের অধীন নহেন।

"বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥" ২।২১

দেহী—সর্ব্বদেহে নিত্য-অবধ্য,—

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।" ২।৩০

ইনি জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু প্রভৃতি ষড়্ভাব-বিকারের অতীত,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" ২।২০

ইঁহার দেহে বাল্য-যৌবন-জরা প্রভৃতি ভাবান্তর আছে; কিন্তু ইঁহার কোন ভাবান্তর নাই। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন বস্ত্র ধারণের ন্যায়, জীর্ণ-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য নবদেহ গ্রহণেও ইঁহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। (২।২২) অতএব সর্ব্বদেহে দেহী যে স্বরূপতঃ অচল, নিত্য, সর্ব্বগত সনাতন ব্রহ্ম, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

গীতায় অন্যস্থান হইতেও আমরা এই তত্ত্ব আরও বিশেষভাবে জানিতে পারি। গীতায় যেমন এস্থলে ভগবান বলিয়াছেন যে, তাঁহারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবভূত হইয়া সংসারে গতায়াত করে, সেইরূপ তিনি অন্যস্থলে বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা সর্ব্বভূতে একই, সকল জীবে সমভাবে আত্মা প্রত্যগাত্মারূপে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বজীবে সমভাবে অন্তর্য্যামী নিয়ন্তৃ-রূপে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত ও ব্রহ্মই সর্ব্বভূতে সমভাবে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় স্থিত। ভগবান বলিয়াছেন যে, যিনি ধ্যান-যোগী, তিনি আপনার আত্মাই যে সর্ব্বভূতস্থ আত্মা তাহা দর্শন করেন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" ৬।২৯

মনু-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥" ১২।৯১

অতএব গীতার উপদেশ এই যে, পরমার্থতঃ সর্ব্বভূতের আত্মা একই—তৃণে, কীটে, মানুষে—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র আত্মা একই। সেই আত্মাই ব্রহ্ম, ইহাই জীবের স্বরূপতত্ত্ব। আর সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র সমভাবে অদ্বয় আত্মদর্শন ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শনই সমদর্শন; তাহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তত্র ইতর ইতরম্।
পশ্যতি, যত্র তু সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ॥"
(বৃহদারণ্যক, ২।৪।১৩)

এই আত্মতত্ত্ব ধারণ করা বড়ই কঠিন; তাই ভগবান বলিয়াছেন যে, জীবের এই স্বরূপ,—

"বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।"

বিশেষ সাধনায় সিদ্ধ না হইলে, এই আত্মতত্ত্ব জানা যায় না।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥" ১৩।২৪

অতএব এই সংসারদশায় জীবে জীবে ও জীবে-ঈশ্বরে যে ভেদ প্রতীত হয়, সেই ভেদ পরমার্থতঃ সত্য নহে। আমাদের সকলের আত্মাই যে এক—এ জ্ঞান লাভ করা অতীব দুরূহ। মায়ার আবরণ (Principium individutionis) দূর না হইলেও অভেদ-জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আমরা ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে পারি না।

এইরূপে গীতা, উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন হইতে জীব-ঈশ্বরে ভেদবাদ ও অভেদবাদ আমরা বুঝিতে পারি। জীবাত্মা জীব-ভাবে বদ্ধ হইয়া সংসার ভোগ করে। এই জীব-ভাবেই ভগবানের অংশ।

সংসারদশায় ঈশ্বরের সহিত জীবের ভেদ সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে ("ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" ১।১।২১ এই বেদান্তসূত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পারমার্থিক অর্থে এই ভেদ সত্য নহে। যতদিন জীব-ভাব থাকে, ততদিন জীব—অংশ, পরমেশ্বর—অংশী; জীব—অণু, পরমেশ্বর—মহান্; জীব—নিয়ন্ত্রিত, পরমেশ্বর—নিয়ন্তা; জীব—অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ, পরমেশ্বর—সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি ভেদ

থাকে ; ইহা বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, যিনি দেহী, —যিনি দেহরূপ পুরে স্থিত বলিয়া পুরুষ নামে অভিহিত, তিনি দেহাতীত— তিনি স্বরূপতঃ মহেশ্বর। (গীতা—১৩।২২।) ভগবান আরও বলিয়াছেন,—

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বাত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥" ১৩।৩১।৩৩।

উপনিষদের "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোহহম্" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি—মহাবাক্য হইতেও এই পারমার্থিক অভেদবাদ সিদ্ধ হয় ; ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে,—

যিনি আমার প্রকৃত স্বরূপ—আমার আত্মা—অন্তর্য্যামী, অমৃত, তিনিই পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, সূর্য্য, দিক্, আকাশ, তমঃ, তেজঃ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক্, বিজ্ঞান-বীর্য্য প্রভৃতি সমুদায়ে স্থিত, সমুদায়ের অন্তর্য্যামী—অন্তর্ব্বর্ত্তী, এ সমুদায়েই তাঁহার শরীর। (৩য় অধ্যায়, ৭ ম ব্রাহ্মণ—৩—২৩ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

অতএব আমি আমার এই ক্ষুদ্র মনুষ্যদেহে অবস্থিত থাকিলেও স্বরূপতঃ আমি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী—তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তর" (বৃহদারণ্যক—৩।৪।১)।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে,—"য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবোঽহমস্মি" এইরূপ চন্দ্র বিদ্যুৎ চক্ষুঃ সম্বন্ধে উক্ত-হইয়াছে যে, তাহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ ও আমি একই। (ছান্দোগ্য ৪।১১।১—৪।১৫।১) অতএব যিনি আপনাকে এই সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া সেই ভাবে স্থিত হ'ন ঋষি বামদেবের ন্যায় তিনি বলিতে পারেন—"ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ)। তিনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্দেবীর ন্যায় বলিতে পারেন,—"অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরামি" ইত্যাদি (ঋগ্বেদ ১০।১২৫ সূক্ত)। তিনি ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় হস্তী পদতলে পতিত

হইয়াও ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া বলিতে পারেন,—আমি সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই সূর্য্য, চন্দ্র, মনু প্রভৃতি হইয়াছি।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্তই ব্রহ্মময় ছিল। ব্রহ্ম আপনাকে আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে তাদৃশ ব্রহ্ম জানেন বলিয়াই সর্ব্বময় হন। দেবতাদিগের মধ্যেও যিনি আপনাকে ঐ ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বিদিত হ'ন, তিনিও ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বময় হ'ন। ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও আত্মতত্ত্বজ্ঞের সর্ব্বময়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মদর্শন করিয়া তদায়ত্তবৃত্তিকত্বপ্রযুক্ত তাহা হইতে অভেদজ্ঞানে বামদেব ঋষি "আমি মনু হইয়াছিলাম"—"আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম" এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।" (বৃহদারণ্যক্ ১।২।৪।১০)

অতএব সংসারদশায় জীবব্রহ্ম ভেদ বাদ বা ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ হইলেও পারমার্থিক অর্থে অভেদবাদই যে বেদান্তশাস্ত্রসম্মত, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

এইরূপে গীতা ও উপনিষদ হইতে আমাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা জানিতে পারি। সংসারের ক্ষুদ্র কীটানুসদৃশ জীব আমি, এই যে সংসারে নানারূপে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখের ভার লঘু করিবার জন্য উৎসুক হইয়া নানা দুষ্কর্ম্মে রত হইতেছি, এই বিশ্বের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটু স্থান-কাল অবলম্বনে সাধারণ মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্বের সীমা ক্ষুদ্রতর করিয়া ইহকালকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া আত্মহারা হইয়াছি, সেই আমার স্বরূপ যে ব্রহ্ম, আমিই যে সকলের আত্মা, আমারই যে বিরাট্‌রূপ—পরমেশ্বর,—উপযুক্ত সাধনা দ্বারা আমি যে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই মহা সত্য—এই অমৃতময়ী—আশ্বাসবাণী—এই সর্ব্বভয়-নিবারক অভয়ের কথা কেবল আমাদের এই শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। এই গুহ্যতম পরম শাস্ত্র, গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যে উপায়ে বা যে সাধনা দ্বারা আমরা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, এই পরমপদ লাভ করিতে পারি, তাহার আভাস গীতায় যেরূপ পাওয়া যায়, সকলেরই তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তমসো মা জ্যোতির্গময়।

অন্ধকার—বড় অন্ধকার!
অন্ধকারে ঘেরা চারিধার!
হে নাথ, হে জ্যোতির্ম্ময়! ক্ষুদ্র প্রাণে কত সয়!
সারা বক্ষে জাগে হাহাকার!
অন্ধকার—বড় অন্ধকার!

কোথা আলো-কোথা আলো হায়!
পথে পথে পাগলের প্রায়
ছুটিতেছি নিশিদিন, বিরাম-বিশ্রামহীন,
অন্বেষিয়া ব্যাকুল হিয়ায়!—
কোথা আলো—কোথা আলো হায়!

আঁধারের অতল-তলায়
হারায়ে ফেলেছি আপনায়!
হয়ে শুধু দিশাহারা, মুছি আজ অশ্রুধারা,
আঁখি-জ্যোতিঃ বুঝিবা মিলায়!—
আঁধারে হারানু আপনায়!

হে দয়াল! দুটী হাত ধরি'
আলো মাঝে লও কৃপা করি'!
কত জন্ম বৃথা গেছে, কি ফল মরিয়া বেঁচে,
এইবার দাও প্রাণ ভরি'
ভূমালোকে আনন্দে বিহরি'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আচার-তত্ত্ব।

[ভিষগাচার্য্য কবিরাজ শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত বৈদ্যরত্ন।]

সদাচার আর্য্যধর্ম্মের মূল ভিত্তি। যিনি আচারহীন তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা; ধর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব না জানিয়া না বুঝিয়াও যদি কায়মনোবাক্যে সদাচার-নিষ্ঠ হইতে পারা যায়, তবে সদাচারের এমনই মাহাত্ম্য যে তৎপ্রভাবে ধর্ম্ম স্বয়ংই স্বরূপতঃ তাঁহার হৃদয়ে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি আচারবিমুখ, তিনি আজীবন ধর্ম্মের পথে অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেও শান্তিময় সুখময় প্রকৃত ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবেন না। ধর্ম্ম একান্ত সদাচারনিষ্ঠ। যম ও নিয়ম, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা প্রভৃতি যে দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বিচার করিয়া দেখিলে সেগুলি একমাত্র সদাচার ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সুতরাং যিনি আচারবান্ অর্থাৎ সদাচারী তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

ধর্ম্ম যেমন সদাচারনিষ্ঠ, সদাচারও সেইরূপ কর্ম্মনিষ্ঠ, পরন্তু সেই কর্ম্ম আবার কেবল শারীরিক কর্ম্ম নহে, কায়মনোবাক্যসম্ভূত ত্রিবিধ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই সদাচার অবস্থিত। অন্যথা দিবসে তিনবার স্নান করিব, গাত্রে চন্দন লেপন করিব, দিনান্তে একবারমাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিব, অথচ মনে মনে অহিত-চিন্তা ও স্বার্থসিদ্ধির আশায় কাপট্যের অনুশীলন করিব এবং উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিবন্ধকতায় বা অকারণ কঠোর ও কর্কশ বাক্যপ্রয়োগে অপরের প্রাণে ব্যথা দিব, সেরূপ সদাচার প্রকৃত সদাচার নহে—কদাচার। তদ্দ্বারা কচিৎ মানসম্ভ্রম বা প্রতিষ্ঠালাভের আশা থাকিলেও বা কথঞ্চিৎ শারীরিক উপকার সাধিত হইলেও শরীরাধিষ্ঠিত জীব, যিনি অনন্তকাল ধরিয়া সংসারের সুদীর্ঘ পথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া শান্তিপ্রদ বিশ্রামসুখলাভের জন্য ধর্ম্মের দ্বারে শরণাপন্ন, তাহাতে তাঁহার কোন উপকারের আশা নাই। পরন্তু তাঁহাকে সুখী করিতে হইলে বা তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিতে হইলে, কায়মনোবাক্যরূপ ত্রিবিধ কর্ম্মাশ্রিত সদাচারই যুগপৎ পালনীয়।

সংসারবদ্ধ জীব, কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মের প্রেরণায় তাহার শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তদনুরূপ ভোগায়তন দেহ লাভ করিয়া থাকে। কায়মনোবাক্যের শুভানুষ্ঠান জন্য যে সুকৃতি জন্মে তাহার ফলে সেই জীব উচ্চযোনিতে উচ্চ বংশে উচ্চ অন্তঃকরণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর উক্ত কায়মনোবাক্যের অশুভানুষ্ঠান জন্য যে দুষ্কৃতি সঞ্চিত হয়, তাহার ফলে জীব সেইরূপ নীচ যোনিতে, নীচ বংশে, নীচ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এমন কি কায়মনোবাক্যের উৎকট পাপানুষ্ঠানের ফলে, জীব, শ্রেষ্ঠ মানবাদি জন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত অপকৃষ্ট পশ্বাদি তির্য্যক্‌যোনিতেও প্রেরিত হইয়া থাকে (ক)। কায়মনোবাক্যের অশুভ অর্থাৎ পাপানুষ্ঠানের নাম অনাচার, আর তাহার শুভ অর্থাৎ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের নাম সদাচার। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কায়মনোবাক্যের যেরূপ অনুষ্ঠানের ফলে জীব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘোর তমসাবৃত অধঃপাতের পথে চালিত হয় ও আসুরিকভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনাচার, আর কায়মনোবাক্যের যেরূপ অনুষ্ঠানের ফলে জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞানালোকের মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর আত্মানুসন্ধানের উন্নত পথে আরূঢ় ও দেবভাব প্রাপ্ত হয় তাহাই সদাচার।

অতএব মানবমাত্রেরই কায়মনোবাক্যরূপ ত্রিবিধ শুভানুষ্ঠানেই সতত অবহিত হওয়া আবশ্যক। কারণ বহুভাগ্যে জীব মানবজীবন লাভ করিয়া থাকে। মানবজীবনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জীবন আর নাই; আত্মচৈতন্যের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা ও স্ফূর্ত্তি যদি কোথাও থাকে, তবে সে কেবল এই মানবদেহে। সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্ববিধাতা, মানবহৃদয়ে যে ভাব, যে শক্তি ও যে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছেন, মানব ইচ্ছা করিলে সেইভাব, শক্তি ও জ্ঞানালোকের সাহায্যে বাক্য-মনের অতীত বিশ্বস্রষ্টাকেও প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ; কিন্তু মানবেতর জীবে, সে ভাব, সে শক্তি, সে জ্ঞান নাই। তাই বলিতেছিলাম, বহুভাগ্যে জীব, শ্রেষ্ঠ মানবজীবন লাভ করিয়া থাকে।

কিরূপভাবে উক্ত ত্রিবিধ সদাচার প্রতিপালিত হইলে মানব আত্মতত্ত্বের

(ক) শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং॥

ভিতর দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে উপনীত হইয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতে পারে,তৎপ্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান বাসুদেব, মানবের কল্যাণকামনায় উক্ত কায়মনোবাক্যরূপ ত্রিবিধ সদাচারকে ত্রিবিধ তপস্যা নামে অভিহিত করিয়া বলিতেছেন,—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃ প্রসাদ সৌম্যত্বং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানস মুচ্যতে॥ (গীতা)

দেবতা-ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, গুরুজন (মাতা পিতা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রভৃতি) ও বেদজ্ঞ জ্ঞানিব্যক্তির পূজা, স্নানাদি শৌচসাধন, সারল্য প্রদর্শন, ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং হিংসাশূন্য ব্যবহার; এইগুলি শারীর তপস্যা বা শারীর সদাচার নামে অভিহিত। সদাচার ও তপস্যা উভয়ই অভেদ বস্তু; কারণ উভয়ই এক জাতীয় এবং উভয়ই আত্মতত্ত্বের অভিন্ন পথপ্রদর্শক। সুতরাং এখানে তপস্যা নামে অভিহিত হইলেও উহা সদাচার ব্যতীত অপর কিছু নহে।

কায়মনোবাক্যরূপ ত্রিবিধ সদাচার কথনপ্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে কায়িক সদাচার উল্লিখিত হইবার কারণ,—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ সাধনের প্রধান সহায় শরীর। শরীরকে সুস্থ রাখিতে না পারিলে মানবের কোন মুখ্য উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবার নহে। ধর্ম্মার্জ্জন, অর্থার্জ্জন, যোগ্যবস্তুর উপভোগ বা মোক্ষলাভ, সমস্তই সুস্থদেহকে অপেক্ষা করে। দেহ যদি অপটু হয়, রুগ্ন হয়, তবে সে ধর্ম্মাদি অর্জ্জন করিবে কিরূপে? নিয়ত রোগের যন্ত্রণায় যে কাতর, অস্বস্তিভোগে যে নিয়ত অস্থির, ধর্ম্মাদি সাধনে সে চিত্তকে কখনই স্থির রাখিতে পারে না। আয়াসসাধ্য ধর্ম্মার্জ্জন ত দূরের কথা, ভোগবিলাসের বস্তু সকলও তাহার অতৃপ্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া মনে হয়। অতুল ঐশ্বর্য্য, অসাধারণ মানসম্ভ্রম ও প্রভূত প্রতিষ্ঠা, সকলই তাহার বৃথা, সকলই তাহার শোকাবহ বলিয়া মনে হয়। অতএব সর্ব্বপ্রথমে শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য শারীরিক সদাচারের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শারীরিক তপস্যা বা সদাচারের ভিতর দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও জ্ঞানীজনের পূজার উল্লেখ থাকায়, বর্ত্তমান ইংরাজীশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, উক্ত দেবতাব্রাহ্মণাদির পূজা অর্চ্চনার সহিত স্বাস্থ্যের কি সম্বন্ধ? দেবতাব্রাহ্মণের পূজা করিলে দেবতা-ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সে তুষ্টির জন্য আমার দেহ নীরোগ বা হৃষ্টপুষ্ট হইবে ইহা কি সম্ভব? অবশ্য সম্ভব; কেন সম্ভব,—তাহার সমাধানে আমরা বলি,—আত্মতত্ত্বের তলস্পর্শী অতলস্পর্শজ্ঞানগম্ভীর আর্য্যশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্রের একটীমাত্র বাক্যবিম্বও অকারণ উত্থিত নহে। অনন্তকাল ধরিয়া মানব এই সংসারে গমনাগমন করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান জন্মই মানবের প্রথম জন্ম বা বর্ত্তমান জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানবের সব শেষ হইয়া যায় না, জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্মতরঙ্গের উত্থানপতন লইয়াই যে মানবজীবনের উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটিয়া থাকে, পরন্তু উক্ত কর্ম্মতরঙ্গের ভিতর সুকৃতি দুষ্কৃতির যে প্রভাব বিদ্যমান থাকে, সুখ দুঃখ আরোগ্য অনারোগ্য যে তাহারই ফল, কেবল যে ঐহিক কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলই সুখদুঃখের কারণ, তাহা নহে। জন্মান্তরীয় সুকৃতি দুষ্কৃতিও তাহার অন্যতম কারণ। এবং তজ্জন্যই আত্রেয়াদি পূজনীয় মহর্ষিগণ প্রণীত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ও দৈবব্যপাশ্রয় নামক দ্বিবিধ চিকিৎসাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। অযৌক্তিক আহার-বিহারাদি-জনিত যে সকল রোগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহজন্মে অস্বাস্থ্যের কারণ হয়, সেই সকল রোগের প্রতিকারকল্পে যুক্তিযুক্ত কারণ ও দ্রব্য বিচার করিয়া যে সকল চিকিৎসা আরব্ধ হয়—তাহাই যুক্তি-ব্যপাশ্রয় চিকিৎসা। আর যে সকল ব্যাধি পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্মের পরিণতিতে উৎপন্ন, পরন্তু যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসার ভূয়ঃ প্রয়োগেও অপ্রতিকার্য্য ও অনিবার্য্যবীর্য্য, দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা সেই সকল ব্যাধি প্রতিকারের প্রশস্ত উপায়।

পূজ্যপাদ মহর্ষি আত্রেয় জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতিজনিত উৎপন্ন দুরারোগ্য জ্বরাদি রোগের প্রতিকার প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়াছেন,—

সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরং।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥

ভক্ত্যা মাতাপিতৃণাঞ্চ গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেন তপসা সত্যেন নিয়মেন চ।
জপহোমপ্রদানেন বেদানাং শ্রবণেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধূনাং দর্শনেন চ॥

অর্থাৎ দুরারোগ্য জ্বরের আরোগ্যকামনায় নন্দি প্রভৃতি অনুচরবর্গ, ষোড়শমাতৃকা ও জগদম্বা অম্বিকার সহিত ভগবান ভবানীপতির পূজা করিলে অচিরাৎ বিষমজ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এবং ভক্তিপুরঃসর মাতাপিতা ও গুরুজনের পূজা, ব্রহ্মচর্য্য, তপশ্চর্য্যা, সত্যপরতা ব্রতনিয়মাদি পালন, ইষ্টমন্ত্রাদি জপ, হোম ও দানাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বেদাদি শ্রবণ ও সাধুসজ্জনের দর্শনাদিতেও সত্বর বিষমজ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও জ্ঞানীব্যক্তির পূজারূপ সদাচার যে স্বাস্থ্যলাভের একান্ত অনুকূল তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

সদাচারের ভিতর শৌচ অর্থাৎ বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি অতীব প্রয়োজনীয়। স্নান, মার্জ্জন ও অসংসর্গ, বাহ্যশুদ্ধির অন্তর্গত; আর প্রাণায়াম, বাসধৌতি, অন্তর্ধৌতি প্রভৃতি অন্তঃশুদ্ধির অন্তর্গত। বাহ্যশুদ্ধি বিধান জন্য বাহিরের কোন সংক্রামক ব্যাধি সহসা শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং অন্তঃ-শুদ্ধি হেতু শরীরান্তর্গত বায়ু পিত্ত কফ ও রজস্তমোগুণের সমতা জন্য শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ সহসা প্রাদুর্ভূত হইয়া শরীর বা মনকে বিকৃত করিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যসমাজে এই যে আশু প্রাণহানিকর বহুবিধ নূতন নূতন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, শৌচবিমুখতা ও সংসর্গদোষই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্যজ্ঞানদৃপ্ত আধুনিক নব্যসম্প্রদায়, শৌচাচারে আস্থাশূন্য ত বটেই পরন্তু সংসর্গদোষকেও তাহারা দোষ বলিয়া মনে করে না; অধিকন্তু ধৃষ্টতার সহিত তাহাকে আর্য্য মনীষীদিগের সঙ্কীর্ণতামূলক স্বাতন্ত্র্যেচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়া থাকে। তাহাদের মতে আর্য্যসমাজের এই যে উচ্চ-নীচত্বজ্ঞাপক জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদের ব্যবস্থা, ইহাও অতিশয় স্বার্থপরতা দ্যোতক। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্তপ্রকার কুচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে কখনও এইরূপ চিন্তার উদয় হয় না যে, গুণকর্ম্মের বিশিষ্টতাবশতঃ বা শুভাশুভ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম

কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য প্রত্যেক মনুষ্যশরীরে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন রোগ-বীজাণু বাস করে এবং সেই সকল রোগবীজাণুর আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যে তত্তৎ সমকর্ম্মী ও সমধর্ম্মী লোকদিগের পরস্পর কল্যাণ ও সংসর্গদোষ পরিহার কামনায় উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ভেদে তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগও নিতান্ত আবশ্যক এবং সেই শ্রেণীবিভাগই যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদের মূল। পরন্তু সেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট জাতি ও বর্ণের সমবায়রূপ সমাজকে নির্ব্বিবাদে পালন করিবার জন্যই যে প্রত্যেক জাতি ও বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তি ব্যবস্থিত। যাহা হউক, এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইল।

পরস্পর সংসর্গ জন্য কেবল যে রোগবীজাণু পরস্পরে সংক্রমিত হয় তাহা নহে; পরন্তু পরস্পরাশ্রিত পাপপুণ্যও পরস্পরের শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। জলগত তৈলবিন্দু যেমন পতিত মাত্র চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে, পাপীজনসংসর্গে অর্থাৎ পাপীর সহিত একত্র পানভোজন, এক শয্যায় শয়ন বা একাসনে উপবেশনাদি দ্বারাও তদাশ্রিত পাপ, সংসর্গকারীর শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে (খ)। এজন্য আর্য্যজাতি স্বজাতি বা স্বজন হইলেও অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী ব্যক্তিকে সমাজে পতিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া থাকে। এমন কি তাহার মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কেহ তাহার দহন বহনে স্বীকৃত হয় না। কারণ অকৃতপ্রায়-শ্চিত্তের তদাশ্রিত পাপের ক্ষয় না হওয়ায় দহন বহনে উহা তাহাদের শরীরে সংক্রামিত হইবে। অতএব এরূপস্থলে নব্য সম্প্রদায়ের বুঝা উচিত যে, স্বজাতি ও স্বজনের পক্ষে আর্য্যদিগের যখন এরূপ ব্যবস্থা বিহিত, তখন উহা সমাজের কল্যাণকর ব্যতীত কখনও তাঁহাদের ঈর্ষাদ্বেষমূলক স্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থসম্ভূত হইতে পারেনা।

আর্য্যজাতি পাপীর সংসর্গকে যেমন ভয় করেন পুণ্যবানের সংসর্গকেও

(খ) আসনাৎ শয়নাদ্যানাৎ সম্ভাষাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

(খ) অপ্যেক পংক্ত্যা নাশ্নীয়াৎ সংবৃত স্বজনৈরপি।
কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ॥

সেইরূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। পুণ্যবান সাধুব্যক্তি যে কোন জাতি হউক, যে কোন বর্ণ হউক না, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া, অবিচারিত-চিত্তে তাঁহার সংসর্গকামনায় আর্য্যেরা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহার সংসর্গজন্য, তদাশ্রিত পুণ্য, সংসর্গকারির শরীরে সংক্রমিত হইয়া তাঁহার শরীর পবিত্র ও তদাত্মাকে কৃতার্থ করে। অতএব অসংসর্গরূপ শৌচাচার কখনই কোন অংশে উপেক্ষার বস্তু নহে। কায়িক সদাচারের ভিতর উল্লিখিত ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নীতে যথাকালে সন্তান কামনায় যে বিহিত মৈথুনের বিধান, ইহাও স্বাস্থ্য ও আরোগ্যলাভের উৎকৃষ্টতর উপায়। মহর্ষি পুনর্ব্বসু বলিয়াছেন—

তস্মাদ্যত্নেন সংরক্ষ্যম্ শুক্র মারোগ্যমিচ্ছতা।

অর্থাৎ আরোগ্যকামী অতি যত্নের সহিত শরীরস্থ শুক্রধাতুকে রক্ষা করিবে।

ক্ষুধা বা তৃষ্ণার উদ্রেক হইলে, যেমন স্থান অস্থান বিচার না করিয়া, যেখানে সেখানে, যাহার তাহার হাতে প্রস্তুত, যাহাতাহা অন্ন পানীয়, পশুর ন্যায় ব্যগ্রভাবে গ্রহণ করা অনুচিত, কামার্ত্ত হইয়াও, সেইরূপ পশুর ন্যায় অবিচারিত-চিত্তে, পরস্ত্রীতে উপগত হওয়া, অতীব অবৈধ ও অস্বাস্থ্যকর। ভগবান মনু বলিয়াছেন, অনায়ুষ্কর কার্য্যের ভিতর পরস্ত্রীগমন অতীব অনায়ুষ্কর। (গ) হায় বিলাসের দাস শিশ্নোদরপরায়ণ বর্ত্তমান বাবু সম্প্রদায়ের হৃদয়ে যদি এই সকল তত্ত্ব স্থান পাইত তাহা হইলে দেশে এত অকালমৃত্যুর তাণ্ডবলীলা দেখিতে হইত না। এতন্মধ্যে উল্লিখিত অহিংসাও, একটী সুবিচার্য্য সদাচার। হিংসাশীল মানব, হিংস্র পশু অপেক্ষাও অধম বলিয়া গণ্য। হিংসা অতীব তমোগুণের বর্দ্ধক, এবং সেই তমোগুণ অধঃপতনের প্রধান সহায়। অতএব সর্ব্বতোভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক হিংসা ত্যাগ করিয়া প্রীতিপ্রদ সারল্য প্রদর্শনে সকলের প্রিয় হইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

ত্রিবিধ সদাচারের ভিতর উক্ত কায়িক সদাচার ব্যতীত যাহা অনুদ্বেগকর

(গ) নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনং॥

অর্থাৎ যে বাক্যপ্রয়োগে কাহারও মনে ভয় বা শোক উপস্থিত না হয়, যে বাক্য প্রকৃত সত্য (অর্থাৎ ছলানুবিদ্ধ সত্য নহে) অথচ প্রিয় এবং পরিণামে হিতকর, যে বাক্য নিত্য স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি মোক্ষধর্ম্ম বাচক শাস্ত্রাভ্যাসে উচ্চারিত, তাহাই বাঙ্ময় সদাচার বলিয়া কথিত।

কায়িক, বাচিক সদাচারের উল্লেখ করিয়া, ভগবান মানসিক সদাচারের প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন. তাহার অর্থ,—

সদা মানসিক নির্ম্মলতা (বিষয়স্মৃতিবিহীনতা) ও সৌম্য (অর্থাৎ অক্রূরতা বা সার্ব্বজনীন সুখেচ্ছা), মৌন, আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয় ও সুখ দুঃখাদি বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করা এবং ভাবসংশুদ্ধি অর্থাৎ কাপট্যশূন্য ব্যবহার, এইগুলি মানসিক সদাচার।

এই ত্রিবিধ সদাচার আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে, ব্রহ্মভাব লক্ষ্য করিয়া যে সকল সদাচার অনুষ্ঠিত হয়. তাহা সাত্ত্বিক সদাচার নামে গণ্য। আর সাধারণের নিকট মান ও সম্ভ্রম, পূজা ও প্রতিপত্তিলাভের আশায়, দম্ভ ও অহংকার সহকারে যে সকল সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস, এবং মূঢ়তা-পরতন্ত্র হইয়া কঠোরভাবে আপনাকে পীড়ন করিয়া, অপরের বিনাশ বা অকল্যাণ কামনায় যে সকল সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক সদাচার নামে অভিহিত। এই ত্রিবিধ সদাচারের ভিতর সাত্ত্বিক সদাচারই ধর্ম্ম-রাজ্যের একমাত্র সোপানস্বরূপ। সাত্ত্বিক সদাচারের অনুষ্ঠাতা মানব হইলেও তিনি দেবতা; সাত্ত্বিক সদাচারের প্রভাবে তিনি অসীম আত্মবল লাভ হেতু, রজঃ ও তমোগুণকে অনায়াসে জয় করিয়া দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে, মোক্ষের পথে দৈনন্দিন অগ্রসর হইতে থাকেন, এবং অচিরকালমধ্যেই ধর্ম্ম-সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হন।

সাত্ত্বিক সদাচারের আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল কথা লিখিত হইল, তাহা আচারতত্ত্বের আলোচনায় পর্য্যাপ্ত নহে। আজীবন ইহার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিলেও, ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনার শেষ হয় না। সদাচারের ন্যায় ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃ কল্যাণকর বিষয় আর দ্বিতীয় নাই। সদাচারনিরত মানব, ইহজীবনে অনাময় ও অমোঘ আয়ু, অযাচিত সম্মান, নির্ম্মল যশ, স্বর্গীয়

সৌন্দর্য্য, অভাবনীয় প্রভূতা, ও অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যেমন সুখী হইয়া থাকেন, পারত্রিক অবস্থায় সেইরূপ, আত্মোন্নতি প্রভাবে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমেশ্বরের প্রিয় পার্শ্বদরূপে অবস্থানপূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য অপার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। অতএব ধর্ম্মরাজ্যের শান্তিনিকেতনে, মানবকে দেবতা করিয়া লইয়া যাইবার যাহা প্রধান সহায়, সেই সদাচার তত্ত্ব আপাতকষ্টকর হইলেও অবশ্য করণীয়।

ডাক দিয়ে কে গেল!

ডাক দিয়ে কে চলে গেছে প্রভাতে?
ছাপিয়ে গেছে আকাশ ধরা বিভাতে;
অরুণ আলোর বরণ ধরি
হরণ করি চেতনা;
বনে বনে ফুল ফুটায়ে,
জাগায়ে নব বাসনা
এসেছিল পূব গগনে,
উজল শ্যাম সভাতে,
ডাক দিয়ে কে চলে গেছে
চির নবীন প্রভাতে!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

দীক্ষা-মুখে।

প্রথম অধ্যায়।

সাধন-শৈল—বহিঃ প্রাঙ্গণ।

(রূপক)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

গুরু। তোমার এই সংশয়ে নূতনত্ব কিছুই নাই। সকল মানবের মনে এইরূপ সন্দেহ কখনও না কখন হইয়া থাকে। আমি প্রথমে তোমার এই দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিব। মনুষ্য প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মের শাসনের ভিতর বৈজ্ঞানিক পারম্পর্য্য দেখিতে পায় না; সে বুঝিতে পারেনা যে, ধর্ম্মনীতির আদেশ প্রকৃতির নিয়মানুসরণ করিবার অনুশাসন মাত্র। যখন মানুষ জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিত না, তখন প্রকৃতির প্রতি ঘটনা দেখিয়া সে ভীত, স্তম্ভিত ও অসহায় হইয়া মনে করিত যে, এগুলি স্বেচ্ছাচারিণী প্রকৃতির যথেচ্ছ অনুষ্ঠান। তাহার পর তাহার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিল যে, বহিঃপ্রকৃতির প্রতি ঘটনার ভিতর একটা অনুক্রম আছে; তাহার স্বৈরবৃত্ত কার্য্যের মধ্যেও একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণরূপ বিদ্যমান আছে। যে নিয়মের অধীন হইয়া প্রকৃতি কার্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহারই সাহায্যে মানব প্রকৃতিকে আত্মবশে আনয়ন করে, প্রকৃতিকে আপন অধীন করে। কিন্তু তুমি ত জান স্থূলজগৎ লইয়াই প্রকৃতির রাজ্য শেষ হয় নাই, তাহার একটা সূক্ষ্ম, তাহার একটী অন্তর্দিক আছে। সেই অন্তঃপ্রকৃতির বিষয় যিনি জানেন, যিনি বৈজ্ঞানিকের মত তাহার অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি সেই অন্তঃপ্রকৃতি-নিয়ামক বিধি অবগত হইয়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেন। শাস্ত্রীয়-বিধান, সেই অন্তঃপ্রকৃতিকে শাসন করিবার প্রণালী মাত্র। যাহা ব্যবস্থাহীন, বলিয়া মনে হইত, যাহার স্বৈরচার শাসনে স্রোতপথে ভাসমান তৃণের মত মানব অসহায় হইয়া চালিত হইত, সেই প্রকৃতিকে আত্মবশে

আনিবার নিয়ম, যিনি মহাযোগী, যিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, তিনিই শাস্ত্রীয় নীতির কার্য্যপ্রণালী জানেন, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না; এবং বুঝিতে পারেনা বলিয়াই তাহারা মনে করে যে, শাস্ত্র-নির্দ্দেশ শাস্ত্র কর্ত্তার স্বকপোল কল্পিত অসম্বন্ধ আদেশ। ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে করিতে সাধক অন্তঃপ্রকৃতিকে স্ববশে আনিতে সক্ষম হয়। মহাযোগীরা, তাঁহাদিগের আত্মজীবনের অভিব্যক্তির সময়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন; তাই তাঁহারা লোক-হিতার্থে সাধারণের আত্মানুভূতির মার্গ সুগম করিবার জন্য শাস্ত্ররূপে তাহা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পুত্র, পূর্ব্বে ত বলা হইয়াছে যে, মানব মাঝে মাঝে যে আধ্যাত্মিক জ্যোতির আভা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাতেই সে আপন জীবন নূতনভাবে বুঝিতে চেষ্টা করে। তাহাতে তাহার হৃদয় জীব করুণায় পূর্ণ হইতে থাকে। সে তখন আত্মপ্রীতির উপযোগী ক্রীড়া-সামগ্রী ত্যাগ করিয়া কিসে জগতের ও জীবের উন্নতি হইবে তাহার চেষ্টায় আত্মবিসর্জ্জন করে। সে দেখে যে তাহার ক্ষুদ্রশক্তি, তাহার অল্পজ্ঞান, তাহার আত্মপ্রীতি, তাহার অভিলষিত কার্য্যের অন্তরায় হয়। তাই সে ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া যাহাতে তাহার ক্ষুদ্রভাব তিরোহিত হয়, তাহার চেষ্টা করে। তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জীব-সেবা। জাতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায়। সে আত্মোন্নতির জন্য সাধন করে না; তাহার সাধনার উদ্দেশ্য কিসে জীবকল্যাণ সাধন করিতে পারিবে, তাহাই। সে একদিকে আত্মজীবন নিয়মিত করিতে চেষ্টা করে, অপরদিকে তাহার সহযাত্রীদিগকে সাহায্য করিতে থাকে। সে একদিকে ধর্ম্মের কঠিন শাসনে যেমন উন্নত হইতে থাকে, অপরদিকে তাহার পারিপার্শ্বিক অপর সকলকেই উন্নত করিতে থাকে। এইরূপে অপরকে প্রেম বিলাইয়া, অপরের সেবায় আত্মসুখ উৎসর্গ করিয়া, উঠিতে উঠিতে দেখে যে, তাহার সম্মুখে এক মহিমান্বিতা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। অবশ্য সেই মূর্ত্তির প্রথম দর্শন অতীব ভীষণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মানব যতই তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে, যতই তাহার নিকটবর্ত্তি হয়, সে বুঝিতে পারে যে, তাহা অতীব কমনীয়া, অতীব প্রেমময়ী; সেই মোহিনীমূর্ত্তি আর কিছুই নহে, তাহা জ্ঞানের মূর্ত্তি। তাহা

আসিয়া তাহার কর্ণে ধীরে ধীরে সেই পূর্ব্বকথিত সরল পথের পরিচয় এবং কিরূপে তাহার সাহায্যে পর্ব্বতারোহণ করিতে পারা যায় তাহার আভাস দিতে থাকে। তোমায় পূর্ব্বে যে ধর্ম্মনীতির কথা বলিয়াছি, তিনি এই পরাবিদ্যার ভগ্নি এবং জীবসেবাও তাঁহার অন্যা ভগ্নি। এই তিন ভগ্নি মিলিয়া, এখন তাহার জীবনের ভার গ্রহণ করেন। এইরূপে তাঁহাদিগের দ্বারা চালিত হইতে হইতে সে একদিন দেখে যে, তাহার হৃদয়ের গুহ্যপ্রদেশ হইতে একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে যে মোহিনী কমনীয়া বিভা মন্দির হইতে দীপ্তি পাইতেছে, সে দেখিয়াছিল, এখন তাহাই তাহার হৃদয় হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সে তাহা বুঝিতে পারে। এখন আর মানবের পূর্ণ অভিব্যক্তি তাহার নিকট কল্পনা বলিয়া মনে হয় না -তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহার অন্তরে যে বিমল জ্যোতিঃ এখন খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারই সাহায্যে সে বুঝিতে পারে, তাহার স্থান ও কার্য্য কি। যে অনন্ত করুণার উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় প্রতিষ্ঠিত— সেই করুণা কি—তাহার প্রকৃত অনুভব এখন তাহার হইয়াছে। এখন জীব-সেবাই তাহার মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। "মানবের উন্নতিকল্পে আমি আত্মজীবন নিবেদন করিলাম" এই প্রতিজ্ঞা তাহার অন্তরের নিভৃত-কন্দর হইতে অতি ধীরভাবে বাহির হইতে থাকে। ইহাই বিকাশোন্মুখী জীবের প্রথম অঙ্গীকার—"আমি মানবকল্যাণে আত্মবিসর্জ্জন করিলাম।" কিন্তু শিষ্য জানিত এই অঙ্গীকার সম্যকরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু বিলম্ব থাকিলেও এই প্রতিজ্ঞার ভিতর একটী-অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও দৃঢ় সংকল্প থাকে।

শিষ্য। আমার পূর্ব্ব সন্দেহ দূর হইয়াছে। কিন্তু ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আমার একটী জিনিষ জানিবার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। আপনি যে সাধকের আন্তরিক প্রতিজ্ঞার কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলেন, তাহা ঠিক কি প্রকারের এবং তাহার সহিত প্রকৃত দীক্ষার কিছু সম্বন্ধ আছে কি না?

গুরুদেব শিষ্যের আগ্রহে অতিশয় তৃপ্ত হইয়া, তাহার অন্তরের সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য অতি স্নেহভরে বলিতে আরম্ভ করিলেন--

গুরু। প্রিয় পুত্র, আমি একজন সর্ব্বজন পরিচিত মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তোমার এই কৌতুহল নিবারণ করিবার চেষ্টা করিব। তিনিও পূর্ব্ববর্ণিত ঋজু পথ সাহায্যে সাধনার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন; তিনি এরূপ নির্ভীকচিত্তে, আপনার উপর অনন্ত দুঃখরাশি স্বেচ্ছায় বহন করিয়া, কণ্টকাদিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, তুঙ্গপথাবলম্বনে গিরিচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহযাত্রীরা তাঁহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিলেন; বর্ত্তমান কল্পে যে মহান জনার্ণব, তাহারই প্রথম তরঙ্গরূপী

তিনি সর্ব্বপ্রথমে ঐ গিরিশিখরের গুহ্য গর্ভমন্দির স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি জন্মের পর জন্ম সংসারের দুর্ভর দুঃখভার অপরের দুঃখমোচনার্থে বহন করিয়া জীবহিতব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। শিষ্য তুমি নিশ্চয় বুঝিয়াছ, আমি কাহার কথা উল্লেখ করিতেছি। ইনিই পরে ভগবান্ বুদ্ধ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি এক মহাপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যতদিন একটী প্রাণীও সংসারজালে আবদ্ধ রহিবে, যতকাল জগতে একজনের উষ্ণশ্বাস বাহির হইবে, একটী জীবেরও নয়ন হইতে একবিন্দু দুঃখবারি পতিত হইতে থাকিবে, ততদিন তিনি অতিবাঞ্ছিত ও মহিমামণ্ডিত মুক্তিকে আলিঙ্গন করিবেন না। বৌদ্ধশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা জন্মে জন্মে সফল করিয়াছিলেন। এবং এখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন! এখন তিনি বুদ্ধ হইয়াছেন—পৃথিবীর সহিত আর তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই, তবে কি তাঁহার জন্ম জন্মের অঙ্গীকার ব্যর্থ হইল? না তাহা হইতে পারে না—তাই তিনি বৎসরান্তে ঠিক বৈশাখী পূর্ণিমার সময় এক নিমেষের জন্য পৃথিবীর দিকে করুণ নয়ন নিক্ষেপ করেন। সেই করুণার ধারা গ্রহণ করিবার জন্য, তাঁহার আশীষ মস্তকে ধারণ করিবার জন্য, হিমালয়ের এক গিরিনদীর তটদেশে নিভৃত পবিত্রস্থানে ঋষিবৃন্দ তাঁহাদিগের শিষ্যবর্গের সহিত সন্নিহিত হন। বৌদ্ধেরা যে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিন উৎসব করেন, তাহা এই সন্মিলনের ছায়া। এখন প্রথাস্বরূপ উৎসব প্রচলিত আছে, কিন্তু এটি যে মহতীঘটনার অনুকরণ তাহার বিষয় সাধারণ অজ্ঞাত।

সকল সাধকের আদর্শস্থল সেই মহাপুরুষ যে পরে চরম গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল ঐ প্রথম অঙ্গীকারের উপর, তাঁহার আন্তরিক মহান্ সঙ্কল্পের উপর। ইহাতেই তিনি দীক্ষামুখে প্রথম অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারাই তিনি তাঁহার অগ্রণী, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের পরিণত মহাপুরুষ সংঘের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধস্থাপনই দীক্ষালাভের আদি পূর্ব্বানুষ্ঠান। যাঁহার নিকট সাধক মহা উৎসর্গব্রত গ্রহণ করেন, যাঁহাকে সাক্ষী করিয়া তিনি এই প্রথম অঙ্গীকার করেন, তিনিই তাঁহার প্রকৃত গুরুদেব—যেমন পার্থিবদেহের জনক মানবের পার্থিব পিতা, তিনিও তাহার সেইরূপ আধ্যাত্মিক পিতা, এবং শিষ্য পুত্রস্থানীয়; এই অবস্থায় তাঁহার প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ হয়।

এখন হইতে উদ্যমশীল সাধক আর পর্ব্বতগাত্রের ভুঙ্গপথে অবস্থিত নহে; সে তাহার সাহায্যে এখন পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়াছে; এখন সে বহিঃপ্রাঙ্গণের সিংহদ্বার সম্মুখে দণ্ডায়মান; তাহার ভিতর প্রবেশ অধিকার লাভের প্রতীক্ষায় অবস্থিত। ——— (ক্রমশঃ)

সেবা-ধর্ম্ম।

ইহকাল পরকাল মধ্যে মহাপারাবার,
তীর নাই তরী নাই স্তব্ধমৌন অন্ধকার,
হতাশ জগন প্রাণে কাঁদে জীব অনিবার,
পারের নাহিক ভেলা কেমনে হইবে পার!
প্রকৃতির মোহময়ী যবনিকা অন্তরালে,
গুপ্ত সেই পথ-তত্ত্ব ব্যক্ত নাহি কোনকালে।
কে গো তুমি অজ্ঞ-জীব জিজ্ঞাস কি বারবার,
পারের অজ্ঞাত পথ? কে দিবে সন্ধান তার!

* * * * *

ঐ শুন মহাব্যোমে সে সঙ্গীত অনিবার,
সেবারূপী "নারায়ণ" করহে ভজনা তাঁর।
সেবাতরী সেবাভেলা ও পারের মহাপথে,
অনন্ত অর্ণব-যাত্রী গেছে চলে সেই রথে।
বিশ্বমাঝে বিশ্বনাথ আনন্দের মূলাধার,
বিশ্বের ভজনে হয় ভজন পূজন তাঁর।
বিশ্বারাধ্য ভগবান্ শঙ্কর শিবাবতার,
বেদান্ত-ভাষ্যেতে দিলা উপদেশ কত তার।
একাদশ দিন-ব্যাপী কুরুক্ষেত্রে সে সমরে,
নিয়োগ করিলা কৃষ্ণ পার্থে সেবা-ধর্ম্ম তরে।
অমৃত লাভের যদি সাধ তব থাকে ভাই,
সেবাতরী বেয়ে চল অনায়াসে পারে যাই।

শ্রীতারামোহন বেদান্ত-শাস্ত্রী।

সাময়িকী।

পরলোকে। বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ, বঙ্গবাণীর অকপট ও একনিষ্ঠ সাধক এবং বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবকবৃন্দের-গৌরবস্থল—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরলোক গমন করিয়াছেন। চরিত্র মাধুর্য্য, পাণ্ডিত্য ও বিনয় রামেন্দ্র-সুন্দরকে—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিল। অদ্বিতীয় মনীষি, প্রতিভার অবতার, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত,—রামেন্দ্র সুন্দরের হৃদয় বালকের ন্যায় সরল ও পবিত্র ছিল। একবারমাত্র যিনি তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ব্যবহার ও মধুর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উন্নতি, পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণ সাধনে তিনি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া-ছিলেন, তিনি একজন সুলেখক ছিলেন কেবলমাত্র এই কথা বলিলে পর্য্যাপ্ত হয় না। তাঁহার মত সরল বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার ক্ষমতা আর কাহারও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাঁহার "জিজ্ঞাসা," "প্রকৃতি" "মায়াপুরী" ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগের পরিচয় আমরা বহু-দিন পূর্ব্বে পরিষৎ প্রকাশিত ও তৎসম্পাদিত "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" দেখিতে পাই—তারপর গতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—"বৈদিক যজ্ঞ" সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিক ভাবে যে বাঙ্গালা বক্তৃতা দেন—তাহা তাঁহার বৈদিক জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করে। তাঁহাকে হারাইয়া কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বা বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবী নহে, সমস্ত হিন্দু-সমাজ একজন প্রকৃত একনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হারা হইলেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনা এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

শাস্ত্র-প্রকাশ-কার্য্যালয়। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমহোদয়গণের অনুরোধে, কলিকাতা ৭১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে, শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে এবং মণ্ডলের প্রচারক শ্রীমান পণ্ডিত তারামোহন বেদান্তশাস্ত্রীর

উপর উক্ত কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছে। এখন হইতে যাঁহারা স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজী মহারাজ প্রণীত পুস্তকাবলী ও মণ্ডল হইতে প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উপরিলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন। স্থানীয় কার্য্যের জন্য প্রত্যহ বেলা ১১ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কার্য্যালয় খোলা থাকে।

শাখা-সভা। স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজী মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম প্রচারকালে ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম. কুমিল্লা, ত্রিপুরা, কোটালীপাড়া, খুলনা ও সেনহাটী প্রভৃতি স্থানে মণ্ডলের শাখা-সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে ঐ সকল সভা সংস্থাপিত হইয়াছে. তাঁহাদের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে, যাহাতে ঐ সকল সভা হইতে দেশের দশের ও ধর্ম্মের অভ্যুদয়কর কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সযত্ন দৃষ্টি রাখিবেন।

নিবেদন। মণ্ডলের সহৃদয় সভ্যবৃন্দের কৃপা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই—আমরা বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সাধুকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন ও সহানুভূতির উপরই এই মহৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। একারণ আমাদের সানুনয় নিবেদন, যে সকল মহাপ্রাণ মণ্ডলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, আশাকরি তাঁহারা দয়া করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বঙ্গদেশের এই মহা ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

জগন্মাতা।

নব পর্য্যায়।
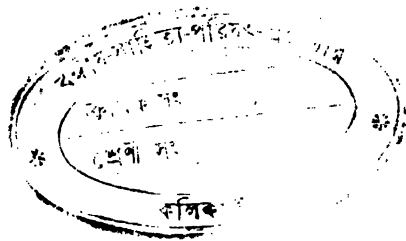
অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

১ম ভাগ | শ্রাবণ, সন ১৩২৬। ইং জুলাই, ১৯১৯। | ৪র্থ সংখ্যা।

কোথায়?

কোথায় এনেছ হরি?
এ পথে যে আমি চির পথ হারা:
চলিব কেমন করি?
ওই মহাকাশে চলে গ্রহ তারা
পথে পথে আপনার;
অনন্ত ও পথ, অনন্ত পথিক
ভ্রান্তি হীন অনিবার;
তারা আকাশের, আকাশ তাদের,
রয়েছে কি মিলি মিশি;
দিন দিন সেই মিলনের হাসি
ফুটে উঠে দিশি দিশি;
তারা যাহা চায় তারা তা পেয়েছে:
নহিলে হরষ কেন?
আপন অজনে সাধের খেলায়
অবাধে ধাইছে যেন;

অকণ্টক পথ, কুণ্ঠাহীন গতি,
নিশ্বাসে প্রাণের বায়ু,
জলেতে মীনের খগোলে খগের
বাড়ে যেন সুখে আয়ু;
আমি কোথাকার এসেছি কোথায়?
ভাবিতে জীবন গেল;
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে এ বায়ুতে প্রাণ
কণ্ঠাগত হয়ে এল;
প্রকৃতি তোমার চিত্রসম তার,
সকলি সকলে মেলে;
আমি বিশ্বমাঝে শুধু বিশ্বছাড়া;
জানি না কোথায় পেলে?
আমার নয়নে প্রশান্ত ও নীল
ভ্রূকুটি করিয়া চায়;
আমার পরশে শ্যামল অবনী
অনলে জ্বলিয়া যায়;
কুসুমের দল প্রস্তরের প্রায়
এ অঙ্গ করিছে ক্ষত;
প্রাণ জুড়াবার অনিলে সলিলে
সায়ক বিঁধিছে কত;
জীবের জীবন আমার জীবনে
বিরূপ করেছ হরি!
জীবের জীবন অন্তে দিও ফিরে
মরণের নাম করি।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র।

সংসার-অশ্বত্থ।*

(শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম, এ, বি, এল।)

এই অশ্বত্থ অব্যয়। ইহার আদি অন্ত বা স্থিতি নাই। নান্তো ন চাদি র্নচ সম্প্রতিষ্ঠা।" এসংসার অনাদি এবং ইহার কখনও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। তবে মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এসংসার থাকে না।

এই সংসারকে কেন অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা "ঊর্দ্ধমূলং অধঃশাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম" ইত্যাদি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদে এই সংসার কোথাও অশ্বত্থরূপে কোথাও বা বৃক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ জানিলে, তবে আমরা মুক্তির উপায় জানিতে পারি। অবিদ্যা-বশে ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞান হইতে এই সংসার-বৃক্ষ প্রবর্ত্তিত হয়।

"অহং বৃক্ষস্য রেরিবা" (তৈত্তিরীয়, ১।১০) এবং অবিদ্যা দূর হইলে ইহার নাশ হয়। শঙ্কর মতে যতদিন না এই অবিদ্যার নাশ হয়, তত দিন এই সংসার-অশ্বত্থ বৃক্ষ অব্যয়,—ততদিন আমরা তাহাতে বদ্ধ থাকিব।

সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে ব্রহ্মে সংস্থিত। তিনিই সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আদি কারণ। তাঁহা হইতে এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসকল প্রসৃত হয়। ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোক বা চতুর্দ্দশ ভুবন এই শাখাস্থানীয়। এই সকল শাখা মধ্যে কতকগুলি উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ মূলের নিকটে সংস্থিত, আর কতক-গুলি অধোদিকে অর্থাৎ মূল হইতে দূরে অবস্থিত। সপ্তলোক মধ্যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক নিম্নে অবস্থিত, আর তদূর্দ্ধে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য বা ব্রহ্মলোক অবস্থিত; এই নিম্নস্থ ত্রিলোক প্রধানতঃ সংসার নামে অভিহিত।

---

* অশ্বত্থ—যাহা "শ্ব" বা কল্যও থাকিতে না পারে অর্থাৎ যাহা ক্ষণধ্বংসী, তাহা অশ্বত্থ (শঙ্কর, গিরি, হনু)। প্রবাহরূপে বিনশ্বর (কেশব, স্বামী)। আশু বিনাশী বলিয়া কা'ল য়ে ইহা থাকিতে পারে, এইরূপ বিশ্বাসেরও অযোগ্য (মধু)। ' অশ্বত্থ নামক বৃক্ষের ন্যায় (রামানুজ, বলদেব, বল্লভ)। মায়াকার্য্য বলিয়া অনিত্য (শঙ্করানন্দ)।

এই ত্রিলোকই "ত্রৈগুণ্যবিষয়", ইহাতে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। সাধারণ জীব ভূলোকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এইখানেই জন্মগ্রহণ করে। আর মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী বা শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্মকারী, তাঁহারা মৃত্যুর পর পিতৃযান বা দেবযান প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে পিতৃলোকে বা দেবলোকে অর্থাৎ স্বর্লোকে গমন করেন। তাঁহারা কর্ম্মক্ষয়ে আবার এই লোকে জন্মগ্রহণ করেন; এবং পূর্ব্বের সংস্কার অনুসারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আবার সেই ঊর্দ্ধলোকে—স্বর্গলোক প্রাপ্ত হ'ন। এইরূপে জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই ত্রিলোক মধ্যে বার বার যাতায়াত করিতে থাকে। ভগবান বলিয়াছেন,—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥" (৯।২০)
"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" (৯।২১)

এই ত্রিলোকেই গতাগতি হয়। ত্রিলোক প্রতি কল্পান্তে বিধ্বস্ত হয় এবং কল্পারম্ভে আবার তাহার সৃষ্টি হয়। কিন্তু উক্ত ঊর্দ্ধতন চারিলোক সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র; তাহারা কল্প-ক্ষয়ে বিনষ্ট হয় না; কেবল মহাপ্রলয়ে তাহাদের ধ্বংস হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" (৮।১৬)

যে সকল জ্ঞানী সাধনাবলে এই ঊর্দ্ধতন লোক প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের আর সংসারে (ত্রিলোকে) যাতায়াত করিতে হয় না। তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরমগতি লাভ করেন। এজন্য এই ঊর্দ্ধতন চারিলোক এই অব্যয়-অশ্বত্থের ঊর্দ্ধ-শাখা আর নিম্নের ত্রিলোক ইহার অধঃশাখা।

এই সংসার-অশ্বত্থের মূল ঊর্দ্ধে স্থিত—পরিদৃশ্যমান অধোমূল অশ্বত্থ-বৃক্ষের

বিপরীতভাবে অবস্থিত। কিন্তু ইহার অবান্তর মূল জটাগুলি নিম্নশাখা (ত্রিলোক) হইতে নিম্নাভিমুখী হইয়া (ভূলোকে) ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ভূলোকই কর্ম্ম-ভূমি। বৃক্ষ যেমন মূলদ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভূলোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মরস দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষ জীবিত থাকে ও পরিবর্দ্ধিত হয়। অর্থাৎ এলোকে আমরা যে কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহারই সমষ্টিতে এ সংসার-বৃক্ষ পরিপুষ্ট হয়।

যাহা হউক, সত্ত্বঃ, রজঃ তমঃ, এই ত্রিগুণ দ্বারাই এই সংসার-বৃক্ষ বিধৃত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রবৃত্তিস্বভাব রজোগুণ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। রজোবিশাল এই মনুষ্য-লোককে এই জন্য কর্ম্মভূমি বলে। তাহাই সংসার-বৃক্ষের পরিপোষক; তাহাই কর্ম্মরূপ রসদ্বারা ইহাকে পরিপুষ্ট করে। এই ত্রিগুণের দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসকল লোকসমূহ বিধৃত ও প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়। ঊর্দ্ধলোক সকল সত্ত্বগুণের দ্বারা বিধৃত হয়; মধ্য-মনুষ্যলোক রজোগুণের দ্বারা বিধৃত হয়; আর অধোলোক যাহা মনুষ্য অপেক্ষা নিম্ন-জাতীয় জীবের স্থান, তাহা তমোগুণের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। ঊর্দ্ধলোক সত্ত্ববিশাল, মধ্যলোক রজোবিশাল। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,——

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥"

(১৪।১৮)

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমরা এই সংসার-বৃক্ষকে দেখিতে পাই না; কারণ তাহার কোন রূপ নাই। ইহার ঊর্দ্ধ বা অধোলোকের কথা সেইজন্য আমরা জানিতে পারি না। কেবল বেদ দ্বারাই তাহা জ্ঞেয় হয়; বেদবিদ্-গণই এই সংসারতত্ত্ব জানিতে পারেন। শ্রুতি প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ইহার তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-গম্য নহে। বেদ স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকের তত্ত্ব এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়-তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—বেদ ত্রৈগুণ্য-বিষয়।

ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, ছন্দঃ সকল—"বিভিন্ন" বেদসংহিতা সংসার-বৃক্ষের পর্ণস্বরূপ। ইহারা যে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকের বিষয় প্রকাশ করে, তৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে তদনুযায়ী কর্ম্মেও প্রচোদিত বা প্রেরিত

করে। সেই কর্ম্মের দ্বারা সেই সকল লোক বিধৃত হয়। এইজন্য এই সব কর্ম্মকে "ধর্ম্ম" বলে। লৌকিক বা বৈদিক সমুদায় বিষয়ের দ্বারা এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ আচ্ছাদিত থাকে। এজন্য ইহারা সংসার-অশ্বত্থের পত্র-স্বরূপ; সেই পত্র দুই প্রকার—নবীন ও প্রাচীন। যাহা প্রাচীন, তাহা সনাতন বেদ দ্বারা প্রকাশ্য বিষয়। তাহাদিগকে ভগবান্ পর্ণ বলিয়াছেন। আর যাহা নবীন—আমাদের সাধারণ জ্ঞানে প্রকাশিত লৌকিক বিষয়, তাহা আমাদের জ্ঞানে অজ্ঞান জড়িত হইয়াও রাগদ্বেষাদির দ্বারা নানারূপে রঞ্জিত হইয়া, নিত্য নূতনভাবে নানারূপে প্রকাশিত হয়। ভগবান্ তাহাদিগকে এই সংসার-বৃক্ষের প্রবাল (নবপত্র) বলিয়াছেন। এই বিভিন্ন বিষয়রূপ পত্রের আচ্ছাদন মধ্যে থাকিয়া আমরা এই সংসার-অশ্বত্থের ফলভোগ করি।

ভগবান্ এই সুবিরূঢ়মূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া পরে আমাদের পরম-পুরুষার্থ যে অব্যয় পদ, তাহা অন্বেষণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন এই অশ্বত্থের সুবিরূঢ় ঊর্দ্ধ-মূল ব্রহ্মে সংস্থিত, তখন আমরা কিরূপে ইহাকে ছেদন করিতে পারি? ইহার এক উত্তর এই যে, আমরা যে আসক্তি-হেতুক এই সংসার-বৃক্ষে অনাদি-কাল হইতে বদ্ধ আছি, আমরা সাধনাদ্বারা কেবল সেই বন্ধন-রজ্জুকে ছেদন করিতে পারি। যিনি এই বন্ধন-রজ্জুকে ছেদন করিতে পারেন, কেবল তিনিই এই সংসার হইতে মুক্ত হ'ন, তাঁহার নিকট আর এ সংসার থাকে না। এ সংসার-বৃক্ষ প্রকৃতিজ ত্রিগুণের দ্বারা বিধৃত ও বর্দ্ধিত হয়। কারণ গুণসঙ্গ ও গুণভাগই আমাদের সংসারবন্ধনের হেতু। ইহার ফলে যে সদসদ্‌যোনিতে আমাদের বারবার জন্ম হয়, এবং বারবার গতাগতি হয়, ইহাই আমাদের সংসার। এই ত্রিগুণ আমাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে। এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়; কিন্তু গুণাতীত হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না,—সংসারবন্ধন একে-বারে ছেদ করা যায় না; পরমপদও লাভ করা যায় না। তাহার জন্য অন্য সাধনার প্রয়োজন।

যাহা হউক, অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা এই অব্যয় অশ্বত্থ ছেদনের এই যে

লাক্ষণিক অর্থ উল্লিখিত হইল, ইহা এক অর্থে সঙ্গত নহে; কারণ যে স্থলে মুখ্যার্থ হইতে পারে, সে স্থলে গৌণার্থ যুক্তিযুক্ত নহে। এজন্য শঙ্কর আমাদের এই ভোগ্য সংসার-অশ্বত্থকে অবিদ্যামূলক বা অজ্ঞান-প্রসূত বলিয়াছেন। অজ্ঞাননাশে তাহার নাশ হইতে পারে। সংসার ছেদনের এই অর্থ বুঝিতে হইলে, এই অব্যয় অশ্বত্থরূপ—সংসারের তত্ত্ব আমাদিগকে প্রথমে বিশদ-রূপে বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,———

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। (৯।১০)
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ (৯।৮)
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" (৭।৬)

অতএব গীতা অনুসারে এই ঈশ্বর-সৃষ্ট—জগৎ অনাদি। সৃষ্টি ও লয়রূপ প্রবাহরূপে ইহা নিত্য। সুতরাং ভগবান্ যাহাকে এই অশ্বত্থ বলিয়া এস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহাকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ নহে। জীবের কি সাধ্য যে তাহা ছেদন করিবে! তবে এ অশ্বত্থ কি? ইহা সংসার; অর্থাৎ আমাদের কাছে জগৎ যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই আমাদের কাছে সংসার। ভগবান হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধভাবের উদ্ভব হইয়াছে। ভগবানের দৈবী গুণময়ী যোগমায়াই এই ত্রিবিধভাবের মূল। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা এই সমুদয় জগৎ মোহিত থাকে। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা আবৃত হইয়া আমাদের বাসনা কাম-সংকল্প দ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় জগৎ আমাদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই আমাদের সংসার।

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা আবৃত চিত্তে আমরা আমাদিগকে (Phenomenal selfকে) জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি করি। চিত্তের সাত্ত্বিক ভাব বা সাত্ত্বিক বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে আমাদের যে জ্ঞান, তাহাতেই আমরা আমাদিগকে জ্ঞাতৃস্বরূপে দর্শন করি। সেই জ্ঞানেই চিত্তের রাজসিক ও

তামসিক ভাব হইতে আমরা আমাদিগকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া জানি। নিত্য অবিকৃত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অজ্ঞান হেতু সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরে বদ্ধ হইয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে তাঁহার জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। ইহাই মায়ার মূল আবরণ। ইহা হইতে আত্মা ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, দেশকালনিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন "অহং" রূপে আপনাকে দর্শন করেন এবং এই "ইদং" বা জ্ঞেয় জগৎকে দেশকাল-নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া এক অবিভক্তকে বিভক্তের ন্যায় দর্শন করেন। এইরূপে এই জগতের নানাত্ব এবং নিয়ত-পরিবর্ত্তনত্ব আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানে এইরূপে জ্ঞেয় ভাবে যে আমরা জগৎকে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করি, ইহাই আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধে সংসার—Phenomenal world.

মূল অবিদ্যা হেতু আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়া. যেমন আপনাকে বা "অহং"কে (Phenomenal selfকে) জ্ঞাতা বলিয়া জানে, এবং তাহার জ্ঞেয় "ইদং"কে জগৎরূপে জানে, সেই প্রকার 'কাম' বা বাসনারূপ অজ্ঞানে বদ্ধ হইয়া আপনাকে 'অহং'কে ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া ধারণা করে, এবং সেই সঙ্গে এই "ইদং"কে ভোগ্যরূপে ও কার্য্যরূপে অর্থাৎ তাহার ক্রিয়ার কর্ম্ম উপাদান অধিকরণ প্রভৃতি কারকরূপেও গ্রহণ করে। এই জগৎকে এইরূপে আমাদের ভোগ্যরূপে ও কার্য্যরূপে যে ধারণা করা হয়, তাহাই ভোক্তা ও কর্ত্তারূপ আমার সংসার। জ্ঞান, মায়া হেতু অজ্ঞানযুক্ত হইয়া "অহং" "ইদং" রূপ দ্বৈতভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া "অহং"কে ও "ইদং"কে দেশকালনিমিত্ত উপাধিযুক্ত করিয়া প্রকাশ করে, আর অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত বাসনা বা কামদ্বারা অথবা রাজসিক ও তামসিক ভাবদ্বারা সেই জ্ঞান মলিন হইয়া সুখ-দুঃখ, রাগদ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব-মধ্য দিয়া এই "অহং"কে ও "ইদং"কে রঞ্জিত করে। এজন্য ভোক্তা হইয়া আমরা সংসারকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করি, আর কর্ত্তা হইয়া আমরা সংসারকে কার্য্যরূপে গ্রহণ করি। আমাদের এই ভোক্তৃভাব হইতে সুখদ বিষয়ের গ্রহণ জন্য ও দুঃখদ বিষয়ের ত্যাগ জন্য ইচ্ছা হয় এবং তাহা হইতে এই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হেতু আমাদের কর্ত্তৃভাব হয়। সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে আমরা সংসারকে কর্ম্মভূমিরূপে গ্রহণ করি—কর্ম্মের দ্বারা সংসারের সহিত সম্বদ্ধ হই এবং

সংসার ভোগ করি। ভগবান্ বলিয়াছেন প্রকৃতিজ গুণসঙ্গই ইহার কারণ। এইরূপে ভোগ হেতু কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে ভোগ প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই ভোক্তৃ ও কর্ত্তৃরূপে আমরা এই সংসারে সম্বদ্ধ হই।

এইরূপে কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃভাবে আমরা যে সংসারকে ভোগ করি, তাহাই এই অব্যয় অশ্বত্থ। এই ভোগ্য সংসার ব্রহ্মে বা ব্রহ্ম হইতে বিবর্ত্তিত জগতে আরোপিত বা আমাদের জ্ঞানে কল্পিত হয়। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।
সর্ব্বপ্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" (শ্বেতাশ্বতর ১।১২)

প্রেরয়িতা ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে আমরা ভোক্তা হইয়া ঈশ্বর সৃষ্ট এই জগৎকে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বা ভোগসাধনের জন্য উপযুক্তরূপে গড়িয়া লইতে চেষ্টা করি—তাহাকে আমাদের কর্ম্মের উপাদান করিয়া লই। এই যে মৃত্তিকা, ইহাদ্বারা আমরা যখন স্থালী, ঘট, শরাব, কলস ইত্যাদি এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া লই, তখনই ইহা আমাদের ভোগ্য হয়। সেইরূপ স্বর্ণ হইতে যখন আমরা বলয়, কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার, মুদ্রা ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া লই, তখন ইহা আমাদের ভোগের উপযোগী হয়। আমরা মরুভূমিতে মনোরম নগরী নির্ম্মাণ করিয়া, অরণ্যানীকে সুখভোগ্য উদ্যানে পরিণত করিয়া, ঊষরভূমিকে শস্যশ্যামল ক্ষেত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে ভোগের উপযোগী করিয়া লই। আমরা তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি নানাবিধ ভৌতিক শক্তিকে নানাবিধ যানাদি পরিচালন জন্য, আলোক প্রদান জন্য ও সংবাদ প্রেরণ জন্য নানাভাবে নিয়োজিত করিয়া লই। এইরূপে আমরা আমাদের কর্ম্মশক্তির দ্বারা বাহ্য জাগতিক উপকরণ সকলকে নামরূপদ্বারা কল্পনানুসারে ভোগের জন্য গঠিত করিয়া লইতে পারি। এই ভাবে জগৎ কার্য্য-জগৎ হয়।

শুধু তাহাই নহে, এই বাহ্য-জগৎ আমাদের জ্ঞানে যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বার্থ ও রাগদ্বেষাদি দ্বারা চালিত হইয়া তাহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার মধ্যে যাহা আমাদের ভোগ্য, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ ভোগ্যভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ যে হৃষ্ট মাংসল ছাগ-শিশু, উহার ভোগ্য উপাদেয় মাংসের প্রতি আমাদের লক্ষ্য

থাকে, উহার মধ্যে যে আত্মা আছে—উহার আত্মা আর আমার আত্মা যে একই—আমাদের ন্যায় উহারও যে সুখদুঃখানুভূতি আছে, মাংসের জন্য উহাকে বধ করিবার সময় ইহা আমাদের জ্ঞান হয় না। ভোগ্যবস্তুর যতটুকু ভোগ্য, প্রায় ততটুকুই আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়।

ইহা ব্যতীত জগতের বিভিন্ন বস্তুর সহিত আমাদের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। সেই সম্বন্ধভেদ হেতু আমাদের জ্ঞানও বিভিন্ন হয়। পিতার নিকট তাহার পুত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান যেরূপ, অপরের নিকট সেরূপ নহে। তুমি আমার শত্রু হইলে তোমাকে আমি সর্ব্বদোষের আশ্রয় মনে করিব; অথচ তুমি যাহার মিত্র সে তোমায় সর্ব্বগুণান্বিত বলিয়া ভালবাসিবে। একই নারীকে কেহ কন্যাভাবে, কেহ স্ত্রীভাবে, কেহ মাতৃভাবে এইরূপ নানাভাবে দর্শন করে এবং সেজন্য তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে,—

"ভার্য্যা স্নুষা ননান্দাচ যা তা মাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ॥"

(৪।২৩)

এইরূপে আমাদের জ্ঞানে কার্য্য-জগৎ ও ভোগ্য-জগৎ অভিব্যক্ত হয়; এতদ্ব্যতীত ভোক্তৃরূপে আমরা বিভিন্ন বাহ্যবস্তুতে সৌন্দর্য্য, কুৎসিতত্ব, মহত্ত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, বিশালত্ব, ভয়ানকত্ব প্রভৃতি ভাবের আরোপ করিয়া তাহাদিগকে নানারূপে উপভোগ করিয়া এবং সেই ভোগের জন্য তাহাদিগকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হইলে তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এক অর্থে আমাদের প্রত্যেকের নিকট এই কার্য্য-জগৎ ও ভোগ্য-জগৎ ভিন্ন হয়। তবে আমাদের পরস্পর ব্যবহারের জন্য ইহাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিয়া লই মাত্র। ইহাই আমাদের ব্যবহারিক-জগৎ। আমাদের জ্ঞানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যে জগৎ প্রতিভাত হয়, তাহা এক অর্থে আমাদের প্রাতিভাসিক জগৎ; তবে আমাদের বিপর্য্যয় বিকল্পবৃত্তি দ্বারা সে জ্ঞান রঞ্জিত হয়।

প্রমাণের দ্বারা বাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে, তাহার গ্রহণ

বা ত্যাগের জন্য আমাদের প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রবৃত্তি সফল হইলে প্রমা-জ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই জ্ঞানে জ্ঞেয় ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কার্য্য-জগৎ এক অর্থে আমাদের ব্যবহারিক জগৎ। এইরূপে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা আমাদের নিকট এ জগৎ জ্ঞেয় কার্য্য ও ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া আমাদের ব্যবহারোপযোগী হয়। আমরা প্রধানতঃ এই কার্য্য ও ভোগ্য-জগতে লিপ্ত থাকিয়া সংসারী হই এবং তাহাতে বদ্ধ থাকি। যদি আমাদের জ্ঞান এইরূপ ভোগ ও কর্ম্মবাসনাদ্বারা রঞ্জিত বা পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞেয়-জগৎ এরূপ বন্ধনের হেতু হয় না। যদি জ্ঞান নির্ম্মল হয়, তবে সেই নির্ম্মল জ্ঞানে জগৎ কার্য্যরূপে বা ভোগ্যরূপে মলিন আবরণে আবৃত হইয়া অভিব্যক্ত হয় না। এইজন্য নির্ম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয়-জগৎ আমাদের এরূপ বন্ধনের হেতু নহে।

আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে যে জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহা Phenomenal World হইলেও, তাহার মূল ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া তাহা সত্য। ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞানে মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ যেরূপে কল্পিত করিয়া সৃষ্টি করেন, আমাদের জ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ সেইরূপেই প্রকাশিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান আত্মার স্বরূপ, তাহা অপৌরুষেয়। পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকে Absolute impersonal transcendental Reason বলে। আমাদের চিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলিয়া, আমাদের বুদ্ধিও জ্ঞান-স্বরূপ হয়। কিন্তু আমাদের সে জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত ও পরিচ্ছিন্ন। তাহা হইলেও স্বরূপতঃ এ জ্ঞান ঈশ্বর-জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। তবে আমাদের অন্তরে ব্যষ্টিভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ও মলিন হইয়া সে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, আর ঈশ্বরে তাহা সমষ্টিভাবে অপরিচ্ছিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এই প্রভেদ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা "সর্ব্ব-বুদ্ধি-নিষ্ঠ"। এই জ্ঞেয় জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা কেহ ছেদন করিতে পারে না।

কিন্তু আমরা শুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে নির্ম্মল বৃত্তিজ্ঞান, কেবল তাহাতেই জ্ঞেয়রূপে এ জগৎ দেখিতে পারি না। আমাদের জ্ঞানে যখনই জগৎ প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা আমাদের মনের কাম-সংকল্প বিচিকিৎসা প্রভৃতিরূপ আবরণে আবৃত করিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক মনে

এক অভিনব ভোগ্য ও কার্য্য-জগৎ কল্পনা করিয়া লই। বলিয়াছি ত ইহাই প্রকৃত অর্থে সংসার—অব্যয় অশ্বত্থ। ইহাই আমাদের Phenomenal World। ইহারই স্থিতি আমার কাছে আমারই আসক্তির উপর, আমার কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। * অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা এজন্য ইহাকে ছিন্ন করা যায়।

এখানে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। অসঙ্গরূপ উপায়ে কাম ক্রোধ বা রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলে মনঃকল্পিত ভোগ্য ও কার্য্য-জগৎ বা সংসারের বিলয় হইলেও জ্ঞানে জ্ঞেয় জগৎ থাকে। যতদিন জ্ঞান অজ্ঞানরূপ দ্বৈতবদ্ধ থাকে, যতদিন জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ থাকে, যত দিন জ্ঞান দেশ-কাল-নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন জ্ঞানে এই জ্ঞেয় জগৎ এই ঈশ্বর-সৃষ্ট ঈশ্বর-জ্ঞানে কল্পিত জগৎ থাকে। শঙ্কর বলিয়াছেন, এ জগৎও মায়ামূলক; কেন না, ইহা অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিকল্প-জ্ঞানের মায়াশক্তি হেতু তাহার বিকাশোন্মুখ অবস্থায় পরিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা আদি বা পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে পুরাতনী প্রবৃত্তিরূপে প্রসৃত। এই জ্ঞেয়-জগৎ মায়ার সাত্ত্বিক গুণময় ভাবের দ্বারা

* সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্ট বলিয়াছেন যে, এই যে Phenomenal World আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, ইহার স্বরূপ কি? বা ইহার মূল কি? তাহা আমরা আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জানিতে পারি না। ইহার প্রকৃত স্বরূপ Thing in itself আমাদের দেশকাল ও নিমিত্তরূপ পরিচ্ছেদ দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া তাহা জানা যায় না। যখনই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়-রূপে কোন বস্তু প্রতিভাত হয়, তখনই আমরা তাহাকে দিক্‌কালের আবরণে আবৃত করি। তাহাকে একত্ব বহুত্ব প্রভৃতি সংখ্যার আবরণে আবৃত করিয়া এবং আরও কত প্রকারে আবরণ দিয়া তবে তাহাকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করি। ইহাই আমাদের জ্ঞানের স্বভাব। এজন্য আমাদের এ জ্ঞানে আমরা কোন বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারি না। "সপেন হর" বলেন যে, যাহার স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না, তাহার অস্তিত্বই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে? সুতরাং তাহার অস্তিত্ব-স্বীকারও নিরর্থক। অতএব বলিতে হয় যে, এই জগৎ আমারই জ্ঞান বা কল্পনা-প্রসূত। তবে ইহার মূলে আমাদের কাম বা সংকল্পের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাই এ জগৎ সংকল্প বা কাম (Will) এবং কল্পনা (Idea) মূলক। এই কাম বা বাসনা-নিবৃত্তিতে এই সংসার নিবৃত্তি হয়।

বা অজ্ঞান-যুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত থাকে; অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ইহার মূল উৎপাটন করা যায় না। এই জগৎ —এই ঈশ্বর-সৃষ্ট বা জ্ঞান-কল্পিত জগৎ ও মনঃকল্পিত জগৎ, উভয়ই মায়াময়—উভয়ই অবশ্য Phenomenal World। ইহা অতিক্রম না করিলে সেই Absolute Noumenon রূপ অব্যয়পদ (goal) লাভ হইতে পারে না। জ্ঞান-কল্পিত জগৎ অতিক্রমের উপায় মায়া বা মূল অজ্ঞান-নিবৃত্তি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণ মনন ও নিধিধ্যাসন দ্বারা অপরোক্ষানুভূতি-সিদ্ধিতে এই দ্বৈতভাণের নিবৃত্তি হয়। অথবা ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে তাহা সিদ্ধ হয়। এজন্য ভগবান্ অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা সংসার-অশ্বত্থ ছেদনপূর্ব্বক সেই প্রপঞ্চাতীত পরমব্রহ্মরূপ পরম-ধাম-প্রাপ্তির উপায় উপদেশ দিয়াছেন।

এই জ্ঞেয়-জগতের জ্ঞান আমাদের কিরূপে উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে "দর্শন শাস্ত্রের প্রমাণ" প্রবন্ধে (নব্যভারত ১৩০৮, পৌষ সংখ্যায়) যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"......জ্ঞান চৈতন্য এক নহে। চৈতন্য দ্রষ্টা বা প্রকাশক। ইহা অন্তঃকরণকে প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ তিনরূপ ধর্ম্মযুক্ত। এই তিনরূপ ধর্ম্ম প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন হয়,—ইহাও এক অর্থে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভোগ অন্তঃকরণের এই তিন ধর্ম্ম। এই জন্য চৈতন্য আশ্রয়ে অন্তঃকরণে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তাভাব উদয় হইতে পারে। চৈতন্য ইহাদের সাক্ষী বা প্রকাশক মাত্র। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তৃণ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত আর মানুষ হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা পর্যান্ত সকলেই জীব বা জীব-ধর্ম্মযুক্ত। কিন্তু সকলের এই জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তাভাব সমানরূপে অভিব্যক্ত হয় না। আর সকল মানুষের জ্ঞানও সমান নহে। জীবমাত্রেরই জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। তবে তৃণাদিতে তাহা অব্যক্ত বা লুপ্ত, পশুতে তাহা সামান্যরূপে পরিস্ফুট, মানুষেই তাহা কেবল সমধিক পরিস্ফুট। মানুষের মধ্যেও কাহারও জ্ঞান কর্ম্মবৃত্তির দ্বারা আবরিত, কাহারও জ্ঞান সুখ-দুঃখানুভূতির আধিক্য হেতু আবরিত। জ্ঞানও সকল সময়ে প্রকাশিত থাকে না। সুষুপ্তিতে আদৌ তাহার প্রকাশ হয় না। স্বপ্নে, শৈশবে,

বাতুলাবস্থায়, তাহা আংশিকরূপে পশু-জ্ঞানের ন্যায় কেবল সংস্কার হেতু প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই জ্ঞান নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল. এই জ্ঞান চৈতন্য। চৈতন্য কেবল জ্ঞাতা ভাবেই "অহং" "ইদং" রূপ ধারণ করে। কেবল ইচ্ছা বা বাসনায় অধিষ্ঠিত অবস্থায় চৈতন্যের এই জ্ঞাতা-ভাব থাকে না। তাহাতে "অহ" "ইদং" জ্ঞানভাব স্ফুরিত হয় না। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখন বাসনা অনিদ্রিত থাকিয়া দৈহিক কার্য্য সম্পাদন করে। প্রাণশক্তি বা জৈবশক্তি কখন নিদ্রিত হয় না, তাহা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত থাকে।..........."

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত জ্ঞান ও চৈতন্যের আর একরূপে অর্থ করেন। ইঁহারা বলেন, জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নহে, উহা চৈতন্যের ধর্ম্ম। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই জ্ঞাতা, তিনি ব্যতীত আর কেহই জ্ঞাতা নাই। জীব ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মস্বভাব বলিয়া ইহারও অন্তঃকরণে এই অনন্ত-জ্ঞানের বিম্ব বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়. এবং তাহা হইতেই জীব জ্ঞানলাভ করে। অন্তঃকরণ মলিন দর্পণের ন্যায় মলাবৃত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞান উপযুক্তরূপে প্রতিফলিত হয় না। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে জ্ঞান, চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"চৈতন্য-প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ব-বৃত্তিই জ্ঞান নামে অভিহিত।" তিনি আরও বলিয়াছেন, জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, ইহা অপরিচ্ছিন্ন হইলে সর্ব্ব-প্রকাশক হয়। এই সর্ব্ব-প্রকাশক জ্ঞান নিত্য। এই জ্ঞানই চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞান নিষ্ক্রিয়াবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে বিভক্ত হয় না। জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ই জ্ঞান কর্ম্ম বা জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। সেই-জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞেয় বিষয় তাঁহার মায়া নামক জগদ্বীজ। সুতরাং বলিতে হইবে যে, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; তাহা ব্রহ্ম-স্বরূপ। তাঁহাতেই বা তাঁহা হইতেই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুইটী ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ভাব জীবে উপহিত বলিয়া জীব এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুইটী ভাব আত্ম-চৈতন্য-জ্ঞানস্ফূর্ত্তিকালে বা যে কালে জ্ঞান ক্রিয়া আরও হয়, সেই কালে ধারণা করে। ব্রহ্ম

হইতে বাহ্য-প্রবাহ হেতু জ্ঞেয় জগৎ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয় আর আন্তর-প্রবাহ হেতু জ্ঞাতা সেখানে প্রতিফলিত হয়। অন্তঃকরণে এই দুই প্রবাহের সম্মিলনে এই উভয় প্রতিবিম্ব সংযোগেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব সম্মিলিত হয়,—আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমাদের অন্তঃকরণেই এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব একীভূত হয়। জ্ঞাতা এই অন্তঃকরণ পথ দিয়া বাহিরে আসিতে গিয়া মলযুক্ত হয়,—অজ্ঞানাবৃত হয়। এইজন্য এই আন্তর-প্রবাহ বা অন্তঃকরণ পথে জ্ঞান-প্রবাহ দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়। একটী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বা অতীতে অর্জ্জিত স্মৃতি বা সংস্কার ও বাসনাজাত প্রবৃত্তির প্রবাহ। আর একটি জ্ঞানের দেশকালনিমিত্ত সীমাবদ্ধ থাকা হেতু তাহার মূল অজ্ঞান বা মায়া-প্রবাহ। এই জন্য এই আন্তর-প্রবাহ-কালে জ্ঞাতা জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান লইয়া উপস্থিত হয় এবং সেই প্রবাহে যে বাহ্য-জগৎ প্রতিভাসিত হয়, তাহাকেই ইন্দ্রিয়পথে আগত, বাহ্য-প্রবাহে প্রতিফলিত বা তাঁহার সহিত একীভূত করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞেয়-জগৎ উপলব্ধি করে। অন্তঃকরণ পথে আসিতে জ্ঞান অজ্ঞান জড়িত হয় বলিয়া এই ব্যবহারিক জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। কিন্তু বাহ্য-জগৎ ব্রহ্মশক্তি-জাত বলিয়া তাহা অসত্যও নহে। তাহার কতক সত্য, কতক অসত্য, তাহা সদসদাত্মক।

এ বাহ্য জগৎ যে একেবারে অসত্য নহে, সে সম্বন্ধে দর্শন বলেন,—

"অবাধাদদুষ্ট কারণজন্যত্বাচ্চ জগতোঽপি নাবস্তুত্বম্।"

(১।৭৯)

এবং "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ॥" (১।৭৮)

এইরূপ বেদান্ত-সূত্রে আছে,—

"বৈধর্ম্ম্যাচ্চন স্বপ্নাদিবৎ" এবং "নাভাব উপলব্ধেশ্চ"।

এইরূপে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, এ জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ ঈক্ষিত বা কল্পিত হয়, এবং তাঁহারই পরাক্ষ মায়া বা প্রকৃতিরূপ শক্তির দ্বারা যেরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহা সত্য। আর সেই "জগৎ" যে ভাবে আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞান-মোহিত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেয় হয়, এবং রাগ-দ্বেষাদি-মূলক প্রবৃত্তি-চালিত কর্ম্মদ্বারা, নানারূপ সম্বন্ধের দ্বারা এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি

দ্বারা সেই জগৎ আমাদের যেরূপে ভোগ্য হয়, সেই জগৎ অসত্য, তাহা আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্য সংসার; তাহাই আমরা অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে পারি।

সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে আমরা এই সংসার-তত্ত্ব বুঝিতে পারি। এই সংসার-বৃক্ষের মূলে যে ব্রহ্ম, তাহা সমুদায় উপনিষদ্ হইতে জানা যায়।* কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্গুণ, নিরঞ্জন, প্রপঞ্চাতীত, অপরিণামী; সুতরাং তাঁহা হইতে এ জগৎ বা সংসার অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মায়া হেতু এসংসার তাঁহাতে বিবর্ত্তিত হয় মাত্র। সুতরাং এ সংসার ব্যবহারিক অর্থে সত্য হইলেও পরমার্থতঃ মায়িক মিথ্যা (অলীক)। মায়া নিবৃত্তিতে তাহার নিবৃত্তি হয়। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এ জগৎ সত্য, ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত। ইহাঁরা পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম সগুণ; তিনি পরমেশ্বর, অনন্তশক্তিমান; তিনি স্ব-শক্তিবলে একাংশে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, তাহাকে বিধৃত ও নিয়মিত করেন। গীতা হইতেও এ তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ভগবান্ তাঁহার বিভূতি বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন যে,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

(১০।৪২)

সুতরাং এ জগৎ ভগবানেরই অংশ—তাঁহারই বিভূতি; তিনিই বিশ্বরূপ। এই ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা যে ছেদন করা যায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শঙ্কর ইহা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি বলেন যে, সগুণভাবে ব্রহ্ম শুদ্ধ-মায়াতে উপহিত হইয়া যে জগৎ কল্পনা করেন—"আমি বহু হইব" এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ অভিব্যক্ত করিয়া তাহার মধ্যে আত্মার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধারণ করেন; জীব সেই মায়ার মলিন রূপ অবিদ্যা বশতঃ বা অজ্ঞান হেতু

---

* মূল উপনিষদে যে যে স্থলে এই জগৎ সৃষ্টি-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, পঞ্চদশীতে তদ্বিষয়ক যে সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

তাহার মলিন জ্ঞানে সেই জগৎকে যে ধারণা করিয়া ভোগ করে, তাহাই তাঁহার সংসার-অশ্বত্থ। ইহাই অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদ্য। অতএব এ জগৎ দুইরূপ—মায়োপাধিযুক্ত ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ, আর মলিন অবিদ্যোপাধিযুক্ত জীব-সৃষ্ট জগৎ। আমাদের জ্ঞেয় জগৎ বা সংসার আমাদেরই অবিদ্যা বা অজ্ঞানমূলক বলিয়া তাহা আমরা পরাবিদ্যা বা পরম জ্ঞান দ্বারা নাশ করিতে পারি। *

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা আমাদের ভোগ্য জগৎ, তাহা মনঃকল্পিত; তাহাই এই সংসার। আমাদের কর্ম্মের উপরই তাহার স্থিতি, তাহা ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন। আমরা এই কথা পঞ্চদশী হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব। দ্বৈত-বিবেক পরিচ্ছেদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

"ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।"

(৪।১)

জীবসৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে "সপ্তান্ন বিদ্যা" (বৃহদারণ্যক প্রকরণে ১। ৫ দ্রষ্টব্য) শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে:—

"সপ্তান্ন-ব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্।
অন্নানি সপ্তজ্ঞানেন কর্ম্মণাজনয়ৎ পিতা॥"

(৪।১৪)

---

* এই সংসার-তত্ত্ব শঙ্কর বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল;—

কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম বা ক্রিয়া সমূহ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ধর্ম্মনামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য। ধর্ম্ম যেমন গ্রহণের জন্য বিচার্য্য, অধর্ম্মও তেমনই পরিহারের জন্য বিচার্য্য। ধর্ম্ম যেমন যাগ, দান প্রভৃতির বিধানানুসারে লক্ষিত হয়, অধর্ম্মও তেমনই হিংসাদি নিষেধানুসারে নির্ণীত হয়; সুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ (কর ও করিও না, এতদ্রূপ অনুমতি) উভয়েরই লক্ষণ। ঐ দু'য়ের অর্থাৎ নিয়োগ-লক্ষণে লক্ষিত অর্থানর্থ নামক ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল—সুখ ও দুঃখ। সেই ফল বা সুখ দুঃখ সর্ব্বজীবে প্রত্যক্ষ। কেন না, শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা উহার ভোগ ও বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ দ্বারা উহার জন্ম বা আবির্ভাব হইতেছে। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই ঐ দুই ফল (সুখ ও দুঃখ) জাত আছে। শাস্ত্রেও শুনা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষে ঐ দু'য়ের তারতম্য হয়। সুখের তারতম্য থাকায় তাহার মূল কারণ ধর্ম্মেরও তারতম্য আছে, এবং ধর্ম্মের তারতম্য থাকায় তাহার উপার্জ্জক পুরুষেরও তারতম্য আছে। যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করে, উপাসনা করে, জ্ঞানের বা উপাসনার (চিত্ত-স্থৈর্য্যরূপ সমাধির) প্রভাবে তাহারা উত্তর মার্গ লাভ করে। আর যাহারা কেবল ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্ম করে, তাহারা ধূমাদি-

এই অন্ন সকল শব্দাদিরূপে ঈশ্বর-সৃষ্ট হইলেও, জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা তাহাদের অন্নত্ব বা ভোগ্যত্ব স্থাপিত হয়,—

"ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ।
তথাপি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জীবোঽকার্ষীত্তদন্নতাম্॥"
(৪।১৭)

অতএব এই জগৎ ঈশ্বর-কার্য্য ও জীব-ভোগ্য, এই দুই ভাবে অন্বিত,—

"ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্দ্বাভ্যাং সমন্বিতম্।"
(৪।১৮)

মায়োপাধিক ঈশ্বর-সংকল্প হইতে এ জগৎ সৃষ্ট বলিয়া ইহা ঈশ-কার্য্য। আর মনোবৃত্ত্যাত্মক জীব-সংকল্প হইতে এ জগৎ জীবভোগ্য হয়। তাহা প্রিয়, অপ্রিয় বা উপেক্ষ্য হয়। জীব-সংকল্প হইতে যে জগৎ ভোগ্য-রূপে কল্পিত ও সৃষ্ট হয়, সে জগৎ মনোময়। এইরূপে বিষয় সকল দুই প্রকার হয়। এক বাহ্য—ভৌতিক, আর এক আভ্যন্তরিক—মনোময়। বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলে, অন্তঃকরণ-বৃত্তি উৎপন্ন

ক্রমে দক্ষিণ মার্গে চন্দ্রাদিলোকে গমন করে। সেই সেই প্রাপ্য-লোকের সুখ ও তৎপ্রাপক কর্ম্মসমূহ যে অত্যন্ত তারতম্য-বিশিষ্ট, ইহা "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় (স্বর্গ-সুখের উৎকর্ষাপকর্ষ আছে; সুতরাং তৎপ্রাপক কর্ম্মেরও তারতম্য আছে)। মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চজীব, অধম নারকী জীব ও অত্যধম স্থাবর জীব, সকলেই—উক্তক্রমে অর্থাৎ অল্পাধিক প্রকারে কিছু না কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকে এবং তাহাদের সে সুখ বা সেরূপ সুখভোগ বৈধ কর্ম্মের ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কি ঊর্দ্ধলোক-বাসী, কি মধ্যলোক-বাসী, কি অধোলোক-বাসী, সকলেরই অল্পাধিক প্রকার দুঃখ আছে; পরন্তু তাহাদের সে দুঃখ বা তদ্রূপ দুঃখভোগ নিষেধচোদন-বোধ্য অধর্ম্মের (হিংসাদির) ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে (সিদ্ধান্ত হইল যে, সুখ-দুঃখের প্রভেদ থাকায়, একরূপতা না থাকায় তাহার মূল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ আছে) এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বা নানাত্ব থাকায়, তাহার উপার্জ্জক পুরুষের অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের প্রভেদ আছে। কথিত প্রকারে অবিদ্যাদি-দোষ-দূষিত দেহধারী জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য বা প্রভেদ-থাকাতেই তাহাদের দেহের বা সুখদুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিচিত্র প্রভেদ যুক্ত সুখদুঃখমোহ-ভোগ হওয়ার নাম সংসার।

[শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত ভাষ্যানুবাদ]

শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, বিধিনিষেধ-মূলক বেদাদি সমুদয় শাস্ত্র অবিদ্যাপর। জীব যতদিন সংসারী থাকে, ততদিন এই সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই সকল শাস্ত্র-প্রণোদিত কর্ম্মের দ্বারা যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ অপূর্ব্ব লাভ হয়, তাহার দ্বারাই আমাদের ঊর্দ্ধাধোগতি হয়। এজন্য বেদাদি শাস্ত্রকে সংসার-বৃক্ষের আচ্ছাদক পর্ণ স্বরূপ বলা হয়।

হয় ও মন সেই বস্তুকে গ্রহণ করিয়া তদাকারে পরিণত হয়; এইরূপে বাহ্য-বস্তু মনোময় হয়। এইরূপে বাহ্য মৃণ্ময় ঘট, অন্তঃকরণে মনোময় ঘটরূপে প্রকাশিত হইয়া, মনের ভোক্তৃত্বাদির দ্বারা তাহাকে রঞ্জিত করে। এই মনোময় ঘট জীবসৃষ্ট। এইরূপে এই মনোময় জগৎ জীবসৃষ্ট হইয়াই বন্ধনের কারণ হয়। পঞ্চদশীতে এজন্য উক্ত হইয়াছে,—

"অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃৎ মানসং জগৎ ॥"

(৪,৩৫)

এই বন্ধন-কারণ জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈতপ্রপঞ্চ দ্বিবিধ,—শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়।

"জীবদ্বৈতন্তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা" (৪।৪৩)। শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা আমাদের মনে যে জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তাহা শাস্ত্রীয় জগৎ।

আর অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দ্বিবিধ—তীব্র ও মন্দ। যাহা কাম-ক্রোধাদিযুক্ত, তাহা তীব্র, আর যাহা অজ্ঞান-মোহাদিযুক্ত, তাহা মন্দ।

"অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি দ্বিধা।
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরৎ ॥"

(৪।৪৯)

অতএব এ স্থলে ভগবান্ যে "এই অব্যয় অশ্বত্থের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈত-প্রপঞ্চ। পরমপদ লাভের জন্য দৃঢ়-অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছেদন করিবার জন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চদশীতেও উক্ত দুই প্রকার জীবসৃষ্ট দ্বৈত-প্রপঞ্চকে নিবারণ করিবার উপদেশ আছে,—

"উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।
বোধাদূর্দ্ধঞ্চ তয়েয়ং জীবন্মুক্তি প্রসিদ্ধয়ে ॥"

(৪।৫০—৫১)

এইরূপে আমরা বেদান্ত শাস্ত্র হইতে এই অব্যয় সংসার-তত্ত্ব জানিতে পারি। এস্থলে সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ আবশ্যক। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। সুতরাং ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতের অস্তিত্বও সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত নহে। ব্রহ্মে যে জগৎ কল্পিত হয়, তাহাও সাংখ্যদর্শন স্বীকার করেন না। সাংখ্যদর্শন

অনুসারে বিভিন্ন বদ্ধপুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থ স্বাধীনা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বতঃপরিণাম হয় এবং সেই পরিণাম হেতু প্রকৃতি হইতে তাহাদের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ এবং তাহাদের ভোগ্য স্থূল শরীর ও বাহ্যজগৎ অভিব্যক্ত হয়। অবিবেক হেতু পুরুষ প্রকৃতি-বদ্ধ হয়। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হইলে, প্রকৃতির সহিত সেই পুরুষের সংযোগ বা বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, এবং তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতি আর পরিণত হয় না। এজন্য সেই বিবেকী পুরুষের নিকট আর তাহার জগৎ থাকে না। কারিকায় আছে,—

"তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপনিবৃত্তাম্।

(৬৫)

সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥"

(৬৬)

যাহাহউক, সাংখ্যদর্শন হইতেও লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য সৃষ্টি এই দুইরূপ সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ।

লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥ (৫২)

এই লিঙ্গাখ্য সৃষ্টির নামান্তর তন্মাত্র সৃষ্টি, আর ভাবাখ্য সৃষ্টির নামান্তর বুদ্ধিসর্গ। এই ভাবাখ্যসর্গের দ্বারা আমাদের লিঙ্গশরীর অধিবাসিত থাকে। সাংখ্যমতে ভাব বা প্রত্যয়সর্গ চতুর্ব্বিধ,—

"এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ॥"

(কারিকা ৪৬)

বিবেক জ্ঞান দ্বারা এই ভাবসর্গ ছেদন করিতে পারিলে, তবে আমাদের কৈবল্য-মুক্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই ভাবসর্গই অব্যয় অশ্বত্থ। যাহা তন্মাত্র বা লিঙ্গসর্গ, তাহা ইহা দ্বারা ছেদন করা যায় না। কোন কোন সাংখ্য-পণ্ডিতের মতে তাহা মূলপ্রকৃতি হইতে সিদ্ধপুরুষ হিরণ্যগর্ভাদির সান্নিধ্য হইতে বা অধিষ্ঠাতৃত্বে স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয়। তাহা আমাদের বিবেক-জ্ঞান-নাশ্য নহে। এইজন্য সাংখ্যমতে এ জগৎ সত্য। ইহাকে এক অর্থে ঈশ্বর সৃষ্ট জগৎ বলা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ দর্শনে মাধ্যমিক

ও যোগাচার মতে বাহ্যজগৎ স্বীকৃত হয় নাই। এ জগতের মূল শূন্য বা অভাব মাত্র হইলেও আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার হেতু আমাদের বাসনা; তাহা হইতে এ জগৎ আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্যরূপে কল্পিত হয়। আমাদের বিজ্ঞানে ইহা প্রতিষ্ঠিত ও বাসনামূলক অবিদ্যা হইতে ইহা প্রসূত। তাহার পাঁচ স্কন্ধ যথা—রূপ, সংজ্ঞা, বেদনা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। যখন বাসনানাশে ইহাদের নাশ হয়, তখন আর এ সংসার থাকে না। এইরূপে আমরা নানা শাস্ত্র হইতে নানাভাবে এই সংসার-অশ্বত্থ-তত্ত্ব বুঝিতে পারি।

এই প্রকার নানা বাদবিবাদের মধ্য দিয়া "অস্তি" "নাস্তি" "সদসৎ" প্রভৃতি বাদের মধ্য দিয়া আমরা জগৎ-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি এবং এই সকল পরস্পর-বিরোধি-বাদের সমন্বয় বা মীমাংসা করিয়া জগতের স্বরূপ বুঝিতে যত্ন করি। বেদান্ত শাস্ত্র, আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় জগতের তত্ত্ব যতদূর প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত জগৎ সত্য হইলেও, আমাদের জ্ঞানে অবিদ্যা, কামকর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত হইয়া, তাহা যে ভাবে প্রতিভাত হয় ও ব্যবহারোপযোগী হয়, তাহা মিথ্যা মায়িক। আমাদের অবিদ্যা-কল্পিত এই জগৎ আমাদের সংসার, ইহাই আমরা ভোগ করি, ইহাতেই আমরা বদ্ধ থাকি। আমাদের ত্রিগুণজ ভাব দ্বারা রচিত এই সংসারকে ভগবান্ অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সংসার-মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

ব্যতিক্রম।

খৃষ্ট মাসে বন্ধ, ভরা ম্যালেরিয়ার দেশ,
এক ভাড়াতে যাওয়া আসা সুবিধাও বেশ।
মা লিখেছেন গ্রামে যেতে নাইক তাঁহার জ্ঞান,
বৈদ্য-বিহীন গ্রামে যাওয়া হস্তে করে প্রাণ।
মাঝে মাঝে কাস্‌ছে খোঁকা নভেম্বরটা ভোর,
সন্ধ্যাকালে চক্ষু জ্বলে শরীর খারাপ ওঁর।

এ সময়ে দেশে আমার হবেই না ত যাওয়া,
স্বাস্থ্যকর ও উপকারী শুন্‌ছি কাশীর হাওয়া।
অধিকন্তু দর্শন পাব অন্নপূর্ণা মার,
তীর্থকরা উচিত, ক্রমে বয়স হ'ল আর।
সুখে পত্নী পুত্র লয়ে এলেন কাশীধাম,
মায়ের দেশে মাকে মনে পড়্‌ছে অবিরাম।
বলেন "খরচ অধিক নহে, মস্ত মোদের বাসা,
উচিত ছিল বৃদ্ধ মাকে সঙ্গে করে আসা।"
পত্নী বলেন "বুদ্ধি তোমার দেখ্‌ছি আমি ভারি,
একলা আমি, ঝঞ্ঝাট তাঁর সামলাতে কি পারি?"
পরদিন অশ্বমেধের ঘাটেই করে স্নান,
বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শনেতে যান।
অঞ্জলি দেন প্রণাম করেন দেখেন চারিধার,
মনটা বাবুর কেমন কেমন, প্রাণটা যেন ভার।
দুইজনেতে ঠাকুর দেখি এলেন যবে ফিরে,
স্বামীর তখন বদন মলিন ভাস্‌ছে আঁখি নীরে।
বলেন "আমি দেখ্‌তে পেলাম মন্দিরেতে হায়,
শুষ্ক ভাত ও খড়ের রাশি দেবীর বেদিকায়।
দেবত. কোথায়, দেবতা কোথায়, দেখাও আমায় রে,"—
বল্‌তে আমি কাণে কাণে বল্‌লে যেন কে—
"মাতারে তুই দিস্‌নে খেতে, গোধন উপবাসী,
পাপিষ্ঠ তুই কোন্ সাহসে এলি মোদের কাশী?"
শুনে অবাক্ পত্নী, তাঁরও নয়ন ছলছল,
চিন্তিত ও কাতর, স্মরি স্বামীর অমঙ্গল।
পরদিবস ভোরে উঠেই ভক্তিভরা বুকে,
রওনা হলেন মায়ের লাগি গ্রামের অভিমুখে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,।

প্রতিমাপূজার আবশ্যকতা।

(স্বামী দয়ানন্দ।)

প্রতিমা পূজার তত্ত্ব না জানিয়া অজ্ঞানী লোকে অনেক প্রকার শঙ্কা ও কটাক্ষ করিয়া থাকে। সেই সকল শঙ্কাস্পদ বিষয়কে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—যথা (১) আজকাল মন্দিরে নানা প্রকার পাপাচার অনাচারাদি হইয়া থাকে ; এজন্য প্রতিমার পূজা উঠাইয়া দেওয়াই উচিত। (২) যদি প্রতিমার মধ্যে শক্তি থাকিত, তবে মুসলমানাদির আক্রমণ হইতে প্রতিমা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না কেন? (৩) যদি আবাহনেই প্রতিমার মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান হয় তবে প্রতিমাতে চৈতন্য পরিদৃষ্ট হয় না কেন এবং এইরূপে মৃতব্যক্তির মধ্যে জীবন-সঞ্চার করা যায় না কেন? উপর্য্যুক্ত শঙ্কাগুলির ক্রমশঃ সমাধান করা হইতেছে।

(১) মন্দিরে অনাচার পাপাচার হওয়া বড়ই ঘৃণার্হ কার্য্য। ইহাতে যে কেবল দৈবীশক্তির অবমাননা হয়, তাহাই নহে, অধিকন্তু এরূপ পাপাচরণের স্থানে প্রতিমার দৈবীশক্তি থাকিতেই পারে না। সাধকের শ্রদ্ধা, ক্রিয়া ও বিশ্বাসের শক্তির দ্বারাই প্রতিমাতে দৈবীশক্তি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যেখানে শ্রদ্ধা ক্রিয়াদির পরিবর্ত্তে বেশ্যানৃত্য, পাপাচার রূপ তামসিক কার্য্য হয় সেখানে আকর্ষণশক্তির অভাবে প্রতিমার দৈবীশক্তি কখনই পুঞ্জীভূত হইতে পারে না এবং পূর্ব্বাধিষ্ঠিত দেবীশক্তিও পাপাচারাদির প্রভাবে প্রতিমা হইতে পৃথক্ হইয়া ব্যাপক মহাশক্তিতে মিশিয়া যায়; তাহাতে মূর্ত্তি কেবল প্রস্তর বা মৃত্তিকা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। উহা আর শক্তির আধাররূপে থাকিতে পারে না। অতএব মন্দিরে কোন প্রকার অনাচার বা পাপাচার হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। মন্দিরের পূজারি যাহাতে পূজার অরি না হইয়া যথার্থই ভক্তিমান্, ক্রিয়ানিষ্ঠ, কর্ম্মকাণ্ড-কুশল পুরোহিত হন, মন্দিরে দর্শক নরনারীগণের প্রতিমা-দর্শনের সুব্যবস্থা হয়, আবশ্যকতানুসারে মন্দিরের সম্পত্তির কিয়দংশ হইতে পুরোহিত-

বিদ্যালয় স্থাপন এবং দরিদ্রকে অন্নদানাদির ব্যবস্থা হয়, এ বিষয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ও স্থানীয় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। এজন্য মন্দির নষ্ট করা বা প্রতিমা-পূজা উঠাইয়া দিবার কোনই প্রয়োজন না। মস্তকে স্ফোটক হইলে স্ফোটকের চিকিৎসা করাই উচিত, মস্তকচ্ছেদন করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য হয় না। এস্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

(২) প্রতিমাপূজন বিষয়ে দ্বিতীয় শঙ্কা এই যে, প্রতিমার শক্তি থাকিলে মুসলমান আদির আক্রমণ সময় প্রতিমার আত্মরক্ষা করা উচিত ছিল। বিষয়টি বিচার্য্য বটে। প্রতিমায় যে শক্তি আকৃষ্ট হয়, তাহার প্রকৃতি কি, এই বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই এই শঙ্কার নিরসন হইবে। শ্রীভগবানের যে শক্তি প্রতিমা অথবা অবতারাদির দ্বারা প্রকট হয়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত,—স্বতঃ ক্রিয়াশীল ও পরতঃ ক্রিয়াশীল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে এই দুই শক্তিকে kinetic ও potential অথবা active ও passive শক্তি বলা হইয়া থাকে। স্বতঃক্রিয়াশীল শক্তি অবতারের মধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে সময়ে অবতারের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ের জীবের সমষ্টি কর্ম্মের সংস্কার লইয়া অবতার প্রকট হন। এজন্য ঐ কর্ম্ম-সংস্কার অনুসারে শ্রীভগবানের শক্তি অবতাররূপ কেন্দ্র-মধ্য দিয়া স্বতঃই ক্রিয়াশীল হইয়া ধর্ম্মের রক্ষা এবং অধর্ম্ম ও অধার্ম্মিকের বিনাশ করে। এইরূপ শক্তিকে স্বতঃক্রিয়াশীল শক্তি বলে। প্রতিমার মধ্যে কিন্তু এরূপ কোন শক্তির ক্রিয়ার কারণ উপস্থিত হয় না। যেহেতু সমষ্টি-জীবের কর্ম্মসংস্কার লইয়া প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয় না। প্রতিমার শক্তি পরতঃ ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাধকের শ্রদ্ধা ও পূজার শক্তির দ্বারা প্রতিমাতে দৈবীশক্তি আকৃষ্ট হয় এবং সাধকের ভাবানুসারেই উহার মধ্যে ক্রিয়া হইয়া থাকে। উহাতে স্বতঃ ক্রিয়া হয় না। যেমন অগ্নির মধ্যে দাহিকা শক্তি থাকিলেও অগ্নি স্বয়ং দাহন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না, দাহকের প্রেরণায় তবে উহার দ্বারা দাহন-কার্য্য বা অন্নপাক-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত দৈবীশক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অভিসম্পাত বা বর-প্রদান করে না; কিন্তু ভাব ও পূজার দ্বারা সাধকের আত্মার আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে, সেই আনুকূল্যানুসারে প্রতিমাস্থিত দৈবী-

শক্তির দ্বারা সাধকের কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ কল্যাণলাভে সাধকের ভাবই কারণ, প্রতিমাগত শক্তির কোন প্রকার স্বতঃপ্রবৃত্তি কারণ নহে। এই হেতু মন্দিরের মধ্যে পাপাচার হইলে অথবা ম্লেচ্ছাদির আক্রমণ হইলে, অবতারের ন্যায় কোন প্রকার স্বতঃক্রিয়া মূর্ত্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, এরূপ অত্যাচারির সহিত উক্ত প্রতিমার ভাবরাজ্যে কোনই সম্বন্ধ থাকে না এবং অবতারের ন্যায় উহাতে সমষ্টি জীবের কর্ম্মসংস্কারও থাকে না। এই জন্য ম্লেচ্ছাদির আক্রমণে প্রায়ই এরূপ ফল হয় যে, যেরূপ জল-সংযোগে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া ব্যাপক অগ্নিতে মিশিয়া যায় অথবা অগ্নিময় লৌহ-গোলককে ভগ্ন করিলে তন্মধ্যস্থিত অগ্নি ব্যাপকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ প্রতিমাস্থিত দৈবীশক্তি ম্লেচ্ছাদির আক্রমণে প্রতিমারূপী কেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপক মহাশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। পরন্তঃ-ক্রিয়াশীল শক্তির পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। কেবল দৈবীশক্তির অবমাননা করার দরুণ অত্যাচারীর ঘোর পাপ ও তজ্জন্য ইহলোকে বা পরলোকে দণ্ডভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে শক্তিবিকাশের বিজ্ঞান উপলব্ধি করিলে প্রতিমাগত শক্তির নিষ্ক্রিয়তাবিষয়ে শঙ্কার সমাধান হইয়া থাকে।

(৩) প্রতিমা-পূজন বিষয়ে তৃতীয় শঙ্কা এই যে, আবাহনে প্রতিমার মধ্যে চেতনা ও চেতন-বৎ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না কেন? এবং এইরূপে মৃত জীবের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করা যায় না কেন? শাস্ত্রানুকূল আবাহনে প্রতিমার মধ্যে চেতনা আসে এবং প্রতিমা হাসে, কাঁদে, নাচে; এবিষয়ে বেদেও বহু প্রমাণ আছে। অতএব এরূপ সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তবে ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা যথার্থ শাস্ত্রসম্মত ও শ্রদ্ধাভক্তির সহিত হওয়া চাই; পুরোহিতের ভক্তিযুক্ত কার্য্যনিষ্ঠতা এবং যজমান ও ভক্তগণের ঐকান্তিকতা, প্রতিমায় প্রাণশক্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয় না। ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রাণময়ী ভক্তির বলেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কালীমাতার জাগরণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতিমাতে চেতনবৎ ক্রিয়ার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, উহাতে মনুষ্যের মত ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। কারণ মনুষ্য-শরীর প্রাক্তন কর্ম্মবশে ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রতিমায় এরূপ কোন প্রাক্তনের সম্বন্ধ না থাকায় ঐপ্রকার ক্রিয়াও

হইতে পারে না। উহাতে কেবল ব্যাপক-শক্তি নিষ্ক্রিয়ভাবে পুঞ্জীভূত হয় মাত্র। অবতারে সমষ্টি-কর্ম্মের সম্বন্ধ থাকায় ক্রিয়া হইয়া থাকে। তবে প্রতিমাতেও পরন্তঃ-ক্রিয়া ভক্তের ভাবানুসারে হইতে পারে। ভাবুক অনুরক্ত ভক্ত, ভক্তির বলে প্রতিমায় ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারেন, একথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। আর মৃতশরীরে চেতনা আনিবার বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রারব্ধ অনুসারেই জীব শরীরে জীবাত্মার প্রবেশ ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। যতদিন প্রারব্ধ শেষ না হয়, ততদিন স্থূলশরীর জীবিত থাকে এবং ক্রিয়া করে। প্রারব্ধ শেষ হইলে সূক্ষ্ম-শরীর ও জীবাত্মা স্থূল-শরীর ত্যাগ করিয়া যায়। কারণ তখন আর ঐ শরীর জীবাত্মার ভোগায়তন থাকিতে পারে না। এইজন্য মৃত শরীরে জীবাত্মার সন্নিবেশ করিয়া উহাকে ভোগায়তন করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং সাধারণতঃ সম্ভবপর নহে। তবে যোগী অসাধারণ যোগশক্তিবলে নিজের কর্ম্ম-সন্নিবেশ করিয়া মৃতশরীরকেও ভোগায়তন ও চেতনাযুক্ত করিতে পারেন। এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে অনেক পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র লোকলীলা গুরু সান্দিপনী মুনির মৃত পুত্রের মধ্যে এইরূপে জীবাত্মার সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রীর সহিত শাস্ত্রার্থ বিচারকালে অমরক রাজার মৃত শরীরে নিজের আত্মাকে সন্নিবেশিত করিয়া উহাকে জীবিত ও ক্রিয়াবান্ করিয়াছিলেন। সতী সাবিত্রীও নিজ তপোবলে এইরূপে মৃত পতিকে জীবিত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তান্ত্রিক শব সাধনেও শবের মধ্যে চেতনার উদয় করার বিধি আছে; যাহা দ্বারা শবদেহ চেতন জীবের ন্যায় পান, ভোজন ও বাক্যালাপ করিতে পারে। অতএব প্রতিমায় চেতন-ক্রিয়োৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রকার শঙ্কারই কারণ নাই। শব-সাধনার বিজ্ঞান গ্রন্থান্তরে বর্ণিত হইবে। অধুনা প্রতিমাপূজনের উপকারিতা বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) যে জীবনে উপাসনার অমৃতধারা প্রবাহিত হয় না, তাহা শুষ্ক ও দগ্ধ কঙ্করময় মরুভূমি মাত্র। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের মধ্যেই উপাসনা সঞ্জীবনী-শক্তি প্রদান করিয়া উভয়কেই প্রাণময় করে। এ কথা পুরাণতত্ত্বে বহুস্থানে আলোচিত হইয়াছে। উপাসনা ভিন্ন কর্ম্মে

অহংভাব এবং জ্ঞানে শুষ্ক অভিমান উৎপন্ন হইয়া উভয়কেই মুক্তিপথে বাধা প্রদান করে। অতএব সকল যোগের সহিত উপাসনা-যোগের সম্বন্ধ রাখা, সাধনপথে নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উপাসনা সাধনার প্রাণস্বরূপ হইলেও একবারে ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধির অতীত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রথম অধিকারের সাধককে সাকার প্রতিমা-পূজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে নিরাকার রাজযোগের সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই সাধন-রাজ্যে প্রতিমা-পূজনের প্রথম আবশ্যকতা।

(২) চাঞ্চল্যই বন্ধন এবং ধৈর্য্যই মুক্তির হেতু। জীবের মধ্যে সেই চাঞ্চল্য চারি ভাবে উৎপন্ন হয়। যথা বীর্য্য, বায়ু, মন এবং বুদ্ধি। বীর্য্য স্থূল, বায়ু সূক্ষ্ম, মন কারণ এবং বুদ্ধিকে তুরীয় বলা যাইতে পারে। এই চারিটীর চাঞ্চল্যেই জীবাত্মা চঞ্চল হইয়া সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হ'ন। এই জন্য শাস্ত্রে এই চারিপ্রকার চাঞ্চল্য নিবারণের উপায়ভূত চারিপ্রকার যোগের উপদেশ করা হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ থাকিলেও, সাধারণতঃ মন্ত্রযোগের সাধনায় বীর্য্যের চাঞ্চল্য-নিরোধ, হঠযোগের সাধনায় বায়ুর চাঞ্চল্য-নিরোধ, লয়যোগের সাধনায় মনের চাঞ্চল্য-নিরোধ এবং রাজযোগের সাধনায় বুদ্ধির চাঞ্চল্য-নিরোধ হইয়া জীব শিবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে বীর্য্য, বায়ু ও মনের পারম্পর্য্যসম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত, ইহাদের মধ্যে একটির চাঞ্চল্যরোধ হইলে আপনা আপনি অন্য দুইটির চাঞ্চল্য নিবারিত হয়। অর্থাৎ বীর্য্যের চাঞ্চল্যরোধে বায়ু ও মনের চাঞ্চল্যরোধ, বায়ুর চাঞ্চল্যরোধে বীর্য্য ও মনের চাঞ্চল্যরোধ; এইরূপে মনের চাঞ্চল্যরোধে বীর্য্য ও বায়ুর চাঞ্চল্যরোধ হইয়া থাকে। এই জন্য যোগশাস্ত্রে মন্ত্র, হঠ ও লয়যোগের মধ্যে কোন একটির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অথবা তিনটিরই সম্মিলিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, তবে রাজযোগ সাধনার ব্রত অবলম্বন করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। তবে সংসারের রূপই প্রধান এবং রূপের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি অধিক থাকায় রূপোপাসনা দ্বারা বীর্য্যের চাঞ্চল্যরোধ করা প্রথম অবস্থায় সকল সাধকেরই কর্ত্তব্য। প্রতিমা-পূজন দ্বারা

শ্রীভগবানের অলৌকিক রূপে চিত্ত বিলীন করিয়া মুমুক্ষু জীব সংসারের রূপ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে। এই অবস্থায়, রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার বীর্য্যনাশের আর কোনই সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই বীর্য্য-ধারণ দ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-বিষয়ে প্রতিমা-পূজনের দ্বিতীয় এবং পরম উপকারিতা।

(৩) আনন্দময় পরমাত্মার আনন্দসত্তা সমস্ত জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকায় জীব স্বভাবতঃ পরস্পরের প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রেম করা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কারণ অন্তর্নিহিত আনন্দসত্ত্বাই জীবগণকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। পরন্তু প্রকৃতি পরিণামিনী এবং জীব-শরীর নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় লৌকিক প্রেম পরিণামে অবশ্যই দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। মায়ামুগ্ধ জীব এইরূপে প্রেম না করিয়াও থাকিতে পারে না, আবার প্রেম-পাশবদ্ধ হইয়াও অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই উভয় সঙ্কট হইতে জীবের নিস্তার তখনই হইতে পারে, যখন জীব প্রেম করিবার এমন কোন কেন্দ্র পায়, যাহা কখনও নষ্ট হয় না, পরিণামে দুঃখ উৎপন্ন করে না এবং যাহার প্রতি ন্যস্ত প্রেমধারা কল্যাণবাহিনী হইয়া ক্রম-বর্দ্ধমান আনন্দ-সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। প্রতিমার প্রেমময় মনোরম রূপই জীবের এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে। সাধক শ্রীভগবানের ত্রৈলোক্য-সুন্দর মূর্ত্তিতে চিত্তবৃত্তিকে ভৃঙ্গায়মান করিয়া, সংসারের নশ্বর, পরিণাম-দুঃখপ্রদ সমস্ত মূর্ত্তি হইতে হৃদয়নিহিত প্রেমধারাকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখীন করিতে পারে। আর এইরূপ করিলেই ভাবশুদ্ধির সাহায্যে তাহার মন হইতে কামাদি সমস্ত বৃত্তি বিদূরিত হইয়া ক্রমশঃ নির্ম্মল সাত্ত্বিক ভগবৎ প্রেমের বিকাশ হয় এবং প্রেম-মকরন্দপূর্ণ তাহার হৃদয়, শতদল-কমলের মত প্রফুল্লিত হইয়া পরম-প্রেমময় ভগবানের চরণ-কমলে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গীকৃত হয়। সে কখন সখা রূপে, কখন দাসরূপে, কখন বা প্রাণারাম মধুর রসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইতে পারে। এবং এইভাবে ভাবিত হইয়া, ভাব-সমাধি লাভ করিয়া, তাহার সংসার-দুঃখের নিবারণ ও পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন বিষয়ে প্রতিমা-পূজনের তৃতীয় উপকারিতা।

(৬) "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" সংসারে মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন, সাংসারিক বিভিন্ন বস্তুর আশ্রয়ে চঞ্চল হইয়া জীবকে সদাই অশান্তির সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে। ইহা এক বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য কথা যে, বিষয়ের মধ্যে কোন প্রকার সুখের সত্তা নাই। যদি তাহা হইত, তবে একই বস্তু একজনের রুচিকর কিম্বা অন্য ব্যক্তির অরুচিকর হইত না। আমরা দেখিতে পাই যে, বাল্যজীবনে যাহা পরম সুখকর বলিয়া বোধ হয়, যৌবনে আর তাহার মধ্যে সুখ দেখা যায় না; আবার যৌবনের সুখোন্মাদকর বস্তু অনেক সময় বার্দ্ধক্যে দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠে। যে বস্তুতে ভোগী সুখ পায়, ত্যাগী তাহাতেই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। অতএব বুঝা গেল যে, কোন বস্তুর মধ্যে বস্তুগত সুখসত্তা নাই,—সুখসত্তার সম্বন্ধ অন্তঃকরণের সঙ্গে বর্ত্তমান। যে বস্তুর প্রতি অন্তঃকরণের অনুকূল অভিমান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই জীব সুখ বোধ করে এবং যাহাতে প্রতিকূল অভিমান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই দুঃখ বোধ করে। এখন বিচার্য্য এই যে, অন্তঃকরণের মধ্যে এই সুখের সত্তা কোথা হইতে আসিল? বিচার করিলে সিদ্ধান্ত হয় যে, সুখরূপ আত্মা সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় প্রত্যেক অন্তঃকরণেই আত্মার সুখসত্তা বিদ্যমান আছে। বিষয় জীবকে সুখ দেয় না, জীব বিষয়ের অবলম্বনে অন্তঃকরণকে কেবল একাগ্র করে মাত্র; এবং সেই একাগ্র-চিত্তে সুখরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব লাভ করিয়া জীব আনন্দ বোধ করে। যেমন চঞ্চল জলে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্থির না হইলেও, স্থির-জলে প্রতিবিম্ব বেশ ভাসমান হয়, ঠিক সেই প্রকার চঞ্চল চিত্ত বিষয়ের অবলম্বনে যখন ক্ষণকাল শান্তভাব ধারণ করে, তখন সেই শান্ত চিত্তে আনন্দময় আত্মার আনন্দময় প্রতিবিম্ব ভাসমান হয়। জীব ভিতরে ভিতরে সেই আনন্দই লাভ করে এবং ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে, বিষয় তাহাকে সুখ দিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের একাগ্রতাই সুখের কারণ এবং চাঞ্চল্যই দুঃখের কারণ। অতএব মনকে যদি নিত্যানন্দে মগ্ন করিতে হয়, তবে উহাকে এমন বস্তুতে একাগ্র করা উচিত, যাহার কখনও নাশ না হয় এবং যাহার পরিণামে দুঃখের উৎপত্তি না হয়। বিষয়ে এরূপ একাগ্রতা কখনই সম্ভবপর নহে; কারণ বিষয় ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিণাম-দুঃখপ্রদ। নিত্য-শাশ্বত-সুখময়

ব্রহ্মই অন্তঃকরণের একাগ্রতার একমাত্র আধার হইতে পারে। এরূপ একাগ্রতায় আধার নষ্ট হয় না এবং পরিণামে দুঃখেরও উৎপত্তি হয় না। পরন্তু ব্রহ্ম নিরাকার হওয়ায়, একবারে নিরাকারে মন একাগ্র হইতে পারে না। রূপোন্মত্ত মন প্রথমাবস্থায় রূপেই বেশ সহজে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে। অতএব মনকে একাগ্র করিয়া ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন হইতে হইলে, প্রতিমাপূজনেরই প্রথমতঃ পরমাবশ্যকতা হইয়া থাকে। ইহাই আধ্যাত্মিক পথে প্রতিমাপূজনের চতুর্থ উপকারিতা।

(৫) মনুষ্য ভাবের দাস। সেই ভাব যদি রাজসিক বা তামসিক হইয়া ইন্দ্রিয়পর হয়, তাহা হইলে জীবের বন্ধন-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবং সেই ভাব যদি শুদ্ধ-সাত্ত্বিকতার সহিত ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হয়, তবে তাহা হইতেই মুক্তির উদয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের প্রতিমা এমনই অপূর্ব্ব বস্তু যে, তাহার সহিত সাত্ত্বিকভাবে মন বাঁধিলে, মনের সমস্ত দুর্ব্বিলাস অচিরে নষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপে ঘোর তামসিক ব্যক্তিও কিছুদিনের মধ্যে পরম সত্ত্বগুণময় সাধক হইতে পারে। তুমি কামপিপাসু—হউক না কেন কাম; তাঁহার মধুর মূর্ত্তির সঙ্গে রতি কর; তুমি ক্রোধী—ইন্দ্রিয়-দমনে ক্রোধের প্রয়োগ কর; তুমি লোভী—তাঁহার চরণারবিন্দের মকরন্দ পানে লোভ কর; তুমি মোহান্ধ—তাঁহাকে পুত্র ভাবিয়া তাঁহাতে মোহ সমর্পণ কর; তুমি মদান্ধ—ভগবৎপ্রেমমধু পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া যাও; তুমি অহঙ্কারী—ভগবান তোমারই, তোমার চিত্ত তিনি ভিন্ন আর কোথাও যাইবে না; এইরূপ ভক্তির অহঙ্কার লাভের চেষ্টা কর; দেখিবে যে, কিছুদিনের মধ্যেই অগাধ সমুদ্রে বিলীন চঞ্চল নদীর ন্যায়, তোমার রিপুগুলি তাঁহাতেই লয় হইয়া সব শান্ত হইয়াছে এবং তুমি এইরূপে ভাবশুদ্ধির দ্বারা রিপু-তাড়না-বিহীন পরম সাত্ত্বিক ভক্ত হইয়াছ! ইহাই শুদ্ধভাবের আশ্রয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। এইরূপ ভাবশুদ্ধির অবলম্বনে সাত্ত্বিক সাধক পত্র-পুষ্প-ফল অর্পণ করিয়াও মোক্ষলাভ করিতে পারে এবং রাজসিক সাধক ভাবশুদ্ধির অবলম্বনে ভগবানকে রাজসিক বস্তু সমর্পণ করিয়া প্রসাদরূপে উহা ভক্ষণ করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। কারণ প্রসাদ-বুদ্ধির উদয় হইলে, লোভ-বুদ্ধির অপগম হয় এবং সমর্পণ ও পূজার সাত্ত্বিক প্রভাবে রাজসিক

পূজার লালসাও কিছুদিনের মধ্যে তিরোহিত হইয়া ভক্তের হৃদয়ে সাত্ত্বিক পূজা ও সাত্ত্বিক ভাবের নির্ম্মল বিকাশ হয়। এইরূপে ভাবশুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ এবং তামসিক ক্রিয়াতেও সাত্ত্বিক-ফল-প্রাপ্তি প্রতিমা-পূজনের অবলম্বনেই সম্ভব হইয়া থাকে। কারণ স্থূল অবলম্বন ভিন্ন মানসিক ভাবের সেরূপ স্ফূর্ত্তি হয় না। ইহাই ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত প্রতিমা-পূজনের পঞ্চম উপকারিতা।

(৬) প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও অধিকারানুসারে সংসারে সকাম নিষ্কাম উভয় প্রকারেরই সাধন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের স্থূল-মূর্ত্তি পূজা দ্বারা সকাম সাধক অনেক প্রকার অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। গীতায় উক্ত হইয়াছে;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"।

যে ভাবে তাঁহার উপাসনা করা হয়, তিনি সেই ভাবেই সাধককে ফল দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সকামবাসনায় দেবতায় প্রতিমার পূজা করিলেও অনেকপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যথা,—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

কর্ম্মসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিয়া মানুষে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তাহাতে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ হয়। নিষ্কাম সাধক প্রতিমা-পূজন দ্বারা প্রথমতঃ ভাবসমাধি প্রাপ্ত হন, তৎপশ্চাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা নির্ব্বিকল্প-সমাধি লাভ করিয়া মুক্ত হ'ন। আর যদি প্রতিমাপূজনের সিদ্ধি অবস্থাতেই মৃত্যু হয়, তবে সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার ইষ্ট-দেবলোকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত বাস হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের ভাবময়ী মূর্ত্তির উপাসনা দ্বারাই উপাসক ক্রমশঃ এই সকল ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে প্রতিমাপূজন পরম প্রয়োজনীয় ইহাই প্রতিমাপূজনের ষষ্ঠ আবশ্যকতা।

(ক্রমশঃ)

যাত্রী।

এত দিনে আজি বরষের পথ
ফুরা'ল বুঝি রে ফুরা'ল!
ঐ যে অদূরে মন্দির-চূড়া
হেরিয়ে নয়ন জুড়া'ল!
এত দিন করি কঠোর সাধন,
সারা-জীবনের মরম দাহন
ওইখানে আজি হবে সমাপন,
সব ব্যথা আজি ঘুচা'ল!
এত দিনকার আঁখিজল মোর
নিমেষে বুঝি রে মুছা'ল!

ঐ যে তাঁহার করুণার ধারা
ভাসিছে মুগ্ধ গগনে।
স্নিগ্ধ তাঁহার শীতল পরশ
কাঁপিছে শান্ত পবনে।
আরতির ধ্বনি ওই শোনা যায়,
পূজার পুষ্প গন্ধ বিলায়,
কে যেন ডাকিছে,—আয় চলে আয়
চলে আয় শুভ লগনে,
শ্রান্ত পথিক, আর কেন চেয়ে
অশ্রু-সজল নয়নে!"

তবে চলে আয়, ক্লান্ত পথিক,
কেটেছে দীর্ঘ রজনী;
ওই যে অদূরে কনক বরণে
ভাসিছে আশার তরণী!

হউক শ্রান্ত অবশ চরণ,
নিদ্রা-জড়িত কম্প্র নয়ন,
এত দিন পরে ফুরাবে যখন,
দীর্ঘ কঠিন সরণি।
সম্মুখে আজি ভাতিছে শান্তি
স্নিগ্ধ সবিতা-বরণী!

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

দীক্ষা-মুখে।

প্রথম অধ্যায়।

সাধন-শৈল—বহিঃ-প্রাঙ্গণ।

(রূপক)

(শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শিষ্য।—পিতঃ, উদ্যমশীল সাধক অমিতবিক্রমে দুরারোহ সুউচ্চ শৈল অতিক্রম করিয়া সিংহদ্বার সম্মুখে কি কার্য্য করেন? তিনি যে ব্রত এখন গ্রহণ করেন, তাহার প্রকৃতি কি? এখন কি তাঁহার সাধনার প্রণালীর কোনও পরিবর্ত্তন হয়? তিনি যে দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান হ'ন, তাহা কি তাঁহার জন্য মুক্ত রহিয়াছে এরূপ দেখিতে পা'ন এবং তিনি কি অবলীলাক্রমে প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করেন, অথবা তাঁহাকে তথায় কাহারও আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়? তিনি যে জীব-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, জন্মে জন্মে নূতন ভাবে যে প্রতিজ্ঞা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, অবশ্য সে ব্রত তিনি সম্যভাবে আচরণ করিতে থাকেন

অথবা হয়ত তৎসঙ্গে কঠিনতর অন্য সাধন-প্রণালী গ্রহণ করেন। আর তাহাই যদি হয়, তবে সেগুলি কি ?

শিষ্য এই প্রশ্ন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। পরম-কল্যাণশীল দয়াধার ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

গুরু।—পুত্র, তুমি যথার্থই বলিয়াছ যে. সাধক জীব-সেবাব্রত ত্যাগ করে না ; তবে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন তাহার প্রাণের প্রতিজ্ঞাটি অতি অস্ফুট-ভাবে, ধীরে ধীরে অন্তর মধ্যে প্রবুদ্ধ হইত, এখন সেরূপ হয় না। এখন ইহা অতি স্পষ্টভাবে, উদাত্তস্বরে ধ্বনিত হইতে থাকে ; অস্পষ্ট, সংশয়ান্বিত চিত্তের সন্দিহ্যমান অঙ্গীকারটি এখন অটল, প্রাণের সংকল্পরূপে প্রকাশ পায়। এখন এই সংকল্পই অন্তরের আদেশবাণীরূপে তাহাকে চালিত করে। সে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া জীব-সেবার জন্য বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশলাভ করিবার ইচ্ছায় অর্গলবদ্ধ সিংহদ্বারে দৃঢ়ভাবে করাঘাত করে। কে এখন তাহার ইচ্ছার প্রতিহনন করিতে পারে ? এখন যে শক্তিতে সাধক দ্বারে আঘাত করে, তাহা আত্মার শক্তি, সে বীর্য্য আধ্যাত্মিক বীর্য্য। সাধক এখন বুঝিয়াছে, যে ব্রত সে গ্রহণ করিতে যাইতেছে তাহা কিরূপ কঠোর, তাহা কিরূপ বিশাল। এটা কেহ তাহাকে বলিয়া দিয়াছে বলিয়া যে সে বুঝিতে পারিয়াছে,—তাহা নহে ; অথবা কোন পুস্তক পাঠ করিয়া এ জ্ঞান তাহার যে গৌণভাবে হইয়াছে,—তাহাও নহে। এটি তাহার প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বাস, ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। সে এখন অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে যে জীবপুঞ্জের সহিত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়া, তাহাদিগেরই অভিব্যক্তি-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্যই তাহার এই ব্রত-ধারণ। সে এই জন-স্রোতের অগ্রযান স্বরূপ। তাহার অধিকাংশ পূর্ব্ব সহযাত্রীকে যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প ধরিয়া অনন্তকাল সাধন-শৈলের ঘূর্ণায়মান পথ দিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইবে। যে পথ অতিক্রম করিতে তাহাদিগের লক্ষ লক্ষ জন্ম অতিবাহিত হইবে, সেই পথ সে কয়েক জন্মেই অতিক্রম করিতে বদ্ধপরিকর। যে অভিব্যক্তি সাধারণের লক্ষ লক্ষ জীবনে সাধিত হইবে, তাহা সে দুই দশ জীবনেই লাভ করিবে! এই সাধনা কি কঠিন!

এই ব্রত কি কঠোর! ইহা চিন্তা করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, প্রাণ দুরু দুরু করে। কিন্তু এই সময় সাধকের মনোমধ্যে উপযুক্ত বল ও বীর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। কারণ সাধক এখন বুঝিয়াছে যে, সে ব্রহ্মেরই অংশ—"মমৈবাংশঃ",—তাহার শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি; তাই সে নির্ভীক, তাই অটল, স্থির। সে অচিরে, কয়েক জন্মে সেই বহিঃ-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মন্দির-দ্বারে উপনীত হইবে। এই মার্গের নাম "পরীক্ষা-মার্গ"—Probationary Path; দীক্ষা-গ্রহণের উপযোগী হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা এইখানে হইয়া থাকে। পুত্র, বুঝিলে কি, যে, পরীক্ষামার্গ উত্তীর্ণ হওয়া নিতান্ত সহজ-ব্যাপার নহে? নানা ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইয়া উগ্রতেজে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, এবং কত কত জীবনের সুদৃঢ় কর্ম্মবন্ধন, তাহাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে; এ সময়ে হৃদয়ের তপ্ত-রুধির উৎসারিত হইতে থাকিবে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলে চলিবে না! কেবল লক্ষ্য করিতে হইবে, একটি বস্তুর উপর—জীবসেবা; তাহাতে নিজের কি হইবে,—সুফল, কিম্বা কুফল—তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে না। ইহাতে যে সাহস আবশ্যক, যে বীর্য্যের প্রয়োজন,—তাহা মনুষ্যের কি—দেবতারও বাঞ্ছিত! সাধক সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে—ইহার অর্থ কি, তাহা কি বৎস বুঝিতে পারিলে? ইহার অর্থ—মানবের অন্তরে যে ঈশ্বর-স্ফুলিঙ্গ বর্ত্তমান, তাহা মহান্ অগ্নিতে পরিণত হইতেছে—অংশ পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতেছে!

যাহা হউক, এই সময় ধীরভাবে দ্বারে আঘাত করিবামাত্র, তাহা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তখন সাধক দেখিতে পায় যে, সে বহিরঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছে। এই প্রাঙ্গণ মধ্যে পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিতে দিতে, স্তরের পর স্তর ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে—অবশেষে মন্দির-দ্বারে উপনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরান্তর্গত যে চারিটি প্রাঙ্গণ আছে,তাহাদিগের সর্ব্ব বহিস্থ প্রাঙ্গণ-দ্বারে উপনীত হয়। বহিঃস্থ হইলেও, ইহাতে প্রবেশ করিলেই মন্দিরে প্রবেশ করা হইল এবং যে একবার প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছে, সে আর বাহিরে আসে না—সেই বাঞ্ছনীয় স্থান হইতে সে আর কখনও নিষ্ক্রান্ত হয় না। এই প্রথম দ্বার উত্তীর্ণ হওয়ার নাম **প্রথম দীক্ষালাভ**। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সাধনা দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে বিস্তৃত আরও ঐরূপ তিনটি দ্বার ও তিনটি প্রাঙ্গণ অতিক্রম

করিতে পারিল শেষে গর্ভমন্দিরে স্থান হয়। তখনই মানব জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হ'ন। এই চারিটি দ্বার উত্তীর্ণ হওয়ার নামই যথাক্রমে চারি প্রকার দীক্ষালাভ—পরিব্রাজক, কুটীচক, হংস ও পরমহংস। এই চারি প্রকার দীক্ষার পর সাধক শেষ দীক্ষা,—পঞ্চম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করেন—জীবন্মুক্ত হন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই চারি প্রকার দীক্ষার কথা আছে। বৌদ্ধ তাহাদিগের নাম দিয়াছেন,—স্রোত আপত্তিঃ, সকৃদাগমনং, অনাগমনং ও অর্হত্বং।

শিষ্য।—গুরুদেব, আপনি এই মাত্র বলিলেন, যিনি একবার মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ মন্দিরান্তর্গত প্রথম প্রাঙ্গণেও উপনীত হইয়াছেন, তিনি কখনও সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হ'ন না। ইহার অর্থ কি? তাঁহার মৃত্যুর পর, পুনর্জ্জন্ম হইলে কি হয়? কোনরূপে তিনি কি এই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হ'ন না? আপনার বাক্যসুধার প্রকৃত মর্ম্ম আমায় গ্রহণ করাইয়া দিন, গুরুদেব!

গুরু।—হাঁ পুত্র, দীক্ষালাভের বিশেষত্ব ইহাই। প্রথম-দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কখনও কোনও অবস্থায় আর লুপ্ত হইতে পারে না। মৃত্যু এবং পুনর্জন্মও সে জ্ঞান ধ্বংস করিতে পারে না; পরজন্মে ইহা পাইবার জন্য আর নূতন করিয়া উদ্যম ও চেষ্টা করিতে হয় না—উহা স্বতঃই লব্ধ হইয়া থাকে। তাহার কারণ বলিতেছি শুন। "দীক্ষা"—বহিঃশক্তি-সাহায্যে শিষ্যের চিত্তের অস্বাভাবিক বিকাশ নহে। ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং নির্দ্দিষ্ট শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে, স্বাভাবিক উপায়ে স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হইলে তবে এইরূপ অবস্থা হয়। অসময়ে, বাহ্য উপায়ে, অস্বাভাবিক ভাবে আত্মচৈতন্যের প্রসার হইলেও উহা ক্ষণিক ও ভ্রমমল-দূষিত থাকে। দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিলে যেমন প্রকৃত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন হয় না, দূরবীক্ষণ সরাইলা নিলে যেমন তাহা আর দেখা যায় না, সেইরূপ অস্বাভাবিকভাবে চিত্তের দৃষ্টতঃ প্রসার হইলেও, সেই অবস্থা স্থায়ী হয় না। স্বভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে প্রকৃত আত্ম-প্রসার লাভ হয় না। আমি যে দীক্ষার কথা বলিতেছি, ইহা স্বাভাবিক স্ফুরণ। প্রথম দীক্ষায় কি হয়, বলিতেছি শোন।

যাহার "অসতের" মোহ পূর্ণরূপে নাশ হইয়াছে, এবং যে চিরতরে পূর্ণরূপে "সতে" অবস্থিত,তাহারই পরিব্রাজকত্ব দীক্ষালাভ হয়,—উক্ত অবস্থাপ্রাপ্তির অপর নামই পরিব্রাজকত্ব। পরিব্রাজকের অর্থ ইহা নয় যে, সাধক, নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকিবে না, বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ত বাস করিবে না। ইহা গৌণ আদেশ। পরিব্রাজকের প্রকৃত, মুখ্য অর্থ হইতেছে—পরিব্রাজক সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, আর তাঁহার দৃষ্টিতে সংসারের বস্তু-মাত্রই সমানভাবে প্রতীয়মান হয়; বাহিরের কোন স্থান বা অন্তরের কোন ভাব তাহাকে আবদ্ধ বা আসক্ত করিতে পারে না। এই দীক্ষা প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাধককে দুইটি দোষ হইতে মুক্ত হইতে হয়। প্রথম অস্মিতা দোষ, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদিতে যে "অহংভাব" প্রকাশিত,তাহাকে অসত্য বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়; তাহার ভেদাত্মক অস্মিতা জ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে হয়। আত্মা যে উপাধি হইতে ব্যতিরিক্ত অনির্দ্দেশ্য পদার্থ এবং আমিত্বের ব্যক্তভাব যে নাম, দেশ ও রূপের অধীন,—অতএব অলীক, এই তথ্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে হয়। দ্বিতীয় দোষ অভিনিবেশ অর্থাৎ ভয়, সংশয় ত্যাগ করিয়া যে সংশয়-রহিত হয়। সে স্থূলভাব ত্যাগ করিয়া আত্মায় সূক্ষ্মভাবে স্থিতি, প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছে, অতএব তাহার আর দেহের মোহ থাকে না। এই যে বলা হইল, ইহা দেহের গুণ নয়, জীবাত্মার এক প্রকার অবস্থা-প্রাপ্তি, এক প্রকার "পরিণাম"—ইহা অভিব্যক্তি। অতএব দেহের পরিবর্ত্তনে এই ভাবের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

এখন একথা থাক। তোমার দীক্ষার পরের অবস্থা শুনিবার ও বুঝিবার এখনও সময় হয় নাই। যত দিন না অধিকারী হইবে, ততদিন ইহার প্রকৃত গুহ্য-রহস্য বুঝিতে পারিবে না। দীক্ষাদ্বারে উপনীত হইতে হইলে কিরূপ সাধনার প্রয়োজন, তাহার আলোচনা করিতেছিলাম, এখন তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর। কিরূপ সাধন-প্রথা অবলম্বন করিয়া এই বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থিত সাধক, ক্রমের পর ক্রম অতিক্রম করিয়া সপ্ত-সোপান-সমন্বিতা অধিরোহিণী সাহায্যে অবশেষে মন্দিরদ্বারে উপনীত হয় এবং তদভ্যন্তরে প্রবেশলাভের প্রত্যাশায় তথায় অপেক্ষা করে, এই রহস্য জানিবারই তুমি

যথার্থ অধিকারী। কিরূপে জীবনযাপন করিলে, শিষ্য মন্দিরদ্বারে অচিরে আঘাত করিবার যোগ্য হয়,—ইহারই ধারণা এখন তোমার আবশ্যক। এ রহস্যও সাধারণের কৌতূহল উদ্দীপন করিতে, সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম নহে—এমন কি অনেকের বিরক্তি উৎপাদনই করিবে। তুমি দেখিয়াছ--এই বহিঃপ্রাঙ্গণের দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইলেও কি কঠোর সাধনার প্রয়োজন। যাহারা এখনও সাংসারিক ধূলিখেলা লইয়া আছে, যাহারা এখনও মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বুঝে নাই, তাহাদিগের নিকট ঐ সাধন-প্রণালী আকর্ষণীয় হইতে পারে না। কারণ, তুমি ত দেখিয়াছ, যাহারাই বহিঃপ্রাঙ্গণ-প্রদেশের অধিকারী হইয়াছে, তাহারা সকলেই অসতের প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে সদাই সচেষ্ট; সকলেই "প্রেয়" পদার্থ হইতে চিত্তকে নিরোধ করিতে এবং শ্রেয়ঃ ধ্যানে সদাই নিরত থাকিতে বদ্ধপরিকর; তাহারা সকলেই অন্তরস্থ দেবতাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—"আমরা, জীবসেবা জীবনের ধর্ম্ম করিলাম, আমরা পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনব্রত গ্রহণ করিলাম"; তাহারা পূর্ব্বেই পুষ্প-শোভিত, সহজগম্য, ঘূর্ণায়-মান, পর্ব্বত-বেষ্টনকারী পথ পরিত্যাগ করিয়া, স্বেচ্ছায় দুর্গমগিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইয়া, ক্ষতবিক্ষত হইয়াও এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের ধর্ম্ম—কেবল সেই প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের বাঞ্ছনীয় ও পালনীয়। যাহারা সংসারের ছেলেখেলায় আত্মহারা হইয়া আছে, তাহাদিগের এই কঠোর সাধন-প্রণালী ভাল লাগিবে কেন? সকল হৃদয়গ্রন্থিগুলিকে ছিন্ন করিতে হইবে; এশিক্ষা—এ আদর্শ—তাহাদিগের ভাল লাগিবে কেন? কিন্তু তোমার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। তুমি বার বার আকুলচিত্তে এই সাধন-প্রণালী জানিবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিয়াছিলে। তাই তোমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়াছি। তুমি তাহা হৃদয়ে ধারণা করিবার চেষ্টা কর।

এই বহিঃ-প্রাঙ্গণে যে সাধন-প্রণালী আছে, তাহা পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া বলিব;—সংশুদ্ধিকরণ, চিন্তাসংযম, চরিত্রগঠন, আধ্যাত্মিক-রসায়ন ও দীক্ষা দ্বারে। এই পঞ্চবিধ বিভাগে যে যে সাধনার বিষয় নির্দ্দেশ করিব, তাহার সকল গুলিতে সিদ্ধি প্রাপ্ত যখন হইবে, যখন সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তখন তুমি দীক্ষালাভের উপযুক্ত হইবে, তোমার পরীক্ষা-মার্গে

বিচরণ করা শেষ হইবে, তখন তোমার শিরোপরি বহু ঊর্দ্ধে মহাগুরুর সম্মতিব্যঞ্জক সে এক অপার্থিব-জ্যোতিঃ-সমন্বিত শ্বেত-তারকা আকাশপটে দেদীপ্যমান হইবে। তখন তোমার যিনি গুরু, তোমাকে যিনি এতদিন কখনও পরোক্ষে, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে দুর্গম পথে পথ প্রদর্শন করাইতে-ছিলেন—তিনি প্রকৃত শিষ্যরূপে তোমাকে গ্রহণ করিবেন।

শিষ্য।—পিতঃ, আপনার বদননিঃসৃত সুধাবাণী যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার প্রাণ উৎফুল্ল হইতেছে, ততই দীক্ষা ও জীবন্মুক্তি বিষয়ক গুহ্য রহস্য জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেছি। এতৎসম্বন্ধীয় সামান্য আভাস কি চিত্তাকর্ষক! কবে আমার সে দিন আসিবে যখন ঐ পথের অধিকারী হইতে পারিব, পূর্ণভাবে ভগবানের সেবা করিতে সক্ষম হইব। কিন্তু, এখন ঐ বিষয়ে কৌতুহলী হওয়ায় কোনও ইষ্টলাভ নাই। বরং অযথা কুতুহল মনের দুর্ব্বলতা হইতেই উৎপন্ন হয়। আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গণের সাধনা-রহস্যের পরিচয় দিন। ইহাই আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। আপনার বিশেষ করুণা আছে, তাই আশা হইতেছে, আপনার অনুগ্রহে তাহা ধারণা করিতে সক্ষম হইব। পিতঃ, আপনি যে সাধন-পঞ্চকের উল্লেখ করিলেন, সে গুলির অনুষ্ঠান কি যুগপৎ করিতে হইবে, না একটির পর আর একটি, এইরূপে পর পর সব গুলিকে আয়ত্ত করিতে হইবে? একটি একটি করিয়া পঞ্চবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তবে কি দীক্ষাদ্বারে উপনীত হওয়া যায়?

গুরু।—না পুত্র, একটীতে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া অপরটির অভ্যাস করিতে হইবে—এরূপ নহে। সকল গুলির যুগপৎ সাধনা ও অভ্যাস প্রয়োজন। যে বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থিত, সে জন্মের পর জন্ম এই সাধনব্রত গ্রহণ করিয়া অটলভাবে অবস্থিত থাকে। অবশ্য এই অবস্থায় তাহাদিগের সম্পূর্ণ সিদ্ধি অসম্ভব। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হইলে, গর্ভমন্দিরে প্রবেশলাভ হয়। তখন সাধক ইহামুত্র-ফলভোগবিরত হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করে। এই বহিঃপ্রাঙ্গণে যতদিন অবস্থিত থাকিবে, ততদিন অতীব যত্নশীল হইয়া, উদ্যম ও আয়াসের সহিত তাহাদিগের অভ্যাস প্রয়োজন। তাহাদিগের সম্যক সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে, এরূপ বুঝিও না।

(ক্রমশঃ)

নিবেদন।

আজিকার এ সুখদ প্রভাতের মত
সকল সুখের ওগো পরম আশ্রয়!
দেখা দাও তুমি মোর অন্তর মাঝার
পূর্ণ করি তৃপ্ত করি সব কামনার
সকল পিপাসাটুকু! ব্যাকুল হৃদয়
হোক্ শান্ত নিরখিয়া! হ'ল অপগত
গভীর তমিস্রা রাতি,—মুক্ত পূর্ব্বাশার
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ পসরা লইয়া
বিচিত্র তোরণখানি! হে প্রিয় আমার!
একান্ত বাহুর পাশে তোমারে লভিয়া
প্রগাঢ় নিবিড়তর, সব জ্বালা আজ
ভুলে যাব মুহূর্ত্তেকে! বিহঙ্গ-সঙ্গীতে
বিকশিত পুষ্পদলে মোর সারা চিতে
উৎসর্গ করিব তোমা, প্রেম-অধিরাজ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সন্ধ্যারহস্য।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সন্ধ্যার পূর্ব্বোক্ত দশবিধ ক্রিয়া-সিদ্ধাংশ যথা—১ম মার্জ্জন, ২য় প্রাণায়াম, ৩য় আচমন, ৪র্থ পুনর্মার্জ্জন, ৫ম অঘমর্ষণ, ৬ষ্ঠ সূর্য্যোপস্থান, ৭ম গায়ত্রীদেবীর আবাহন, ধ্যান ও জপ, ৮ম আত্মরক্ষা, ৯ম রুদ্রোপস্থান, ১০ম সূর্য্যার্ঘ্য।

সন্ধ্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে যথারীতি বাহ্য-শৌচাদি সম্পাদন করিয়া, কাশকুশোত্তর বা কম্বলাজিন কুশোত্তরাদি * কোনও ত্রিতয় আসনোপরি স্ব স্ব অভ্যাসমত স্বস্তিকাসন বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন, জলশুদ্ধি ও আসনশোধনাদি পূর্ব্বকৃত্যগুলি সম্পাদন করিবে। পরে গুরুপূজা, গুরুপাদুকা চিন্তা ও গুরুমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া, নিম্নলিখিতরূপে সন্ধ্যার ক্রিয়াসমূহ যথাক্রমে সম্পন্ন করিবে।

১ম। **মার্জ্জন**—দেহ-মনের শুদ্ধি সম্পাদন। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধিই ইহার তাৎপর্য্য। শুদ্ধি ব্যতীত ঈশ্বরোপাসনা অবৈধ। ইহাই ষোড়শাঙ্গ মন্ত্রযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ "শুদ্ধিক্রিয়া।" পরম-পাবন স্নিগ্ধ ব্রহ্মবিভূতি জলতত্ত্বেই বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান আছে বলিয়া উপাসনাকালে প্রথমে জলসংস্পর্শে এই মার্জ্জন বা মান্ত্র-স্নানের ব্যবস্থা শাস্ত্রনিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মন্ত্রযোগের সপ্ত-স্নান-বিধির † অন্যতম। অবগাহন স্নান করিলেও এই মান্ত্র-স্নানে দোষ নাই। বিশেষতঃ সকলের পক্ষে চারি সন্ধ্যায় অবগাহন স্নানও অসম্ভব।

এই মার্জ্জন বা স্নানক্রিয়া উপলক্ষে যে সহযোগী পাপমার্জ্জন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় তাহাতেও স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, যে জল শরীরের মলিনতা ক্ষালন করে, তাহাই স্নেহময়ী জননীর ন্যায় শরীরের পোষণ করে। এই

---

* মৎপ্রণীত "সাধনপ্রদীপে" আসন অংশ দেখ।

† গুরুপ্রদীপ ও জ্ঞানপ্রদীপে স্নানবিধি ও শুদ্ধিক্রিয়া দেখ।

জল আবার পরম শিবতম রসের প্রতিরূপ। তাহাতে আমাদিগকে সংযোজিত করণে সমর্থ। অতএব এই মান্ত্র-স্নানের ক্রিয়া অন্তর্বাহ্য সর্ব্ববিধ পাপক্ষালনে সহায়ক। এতদুপলক্ষে প্রাদেশ-পরিমিত সাগ্রকুশগুচ্ছ সহযোগে যথাক্রমে মস্তকে, ভূমিতে ও আকাশে; অনন্তর আকাশে, ভূমিতে ও মস্তকে; তৎপরে ভূমিতে, মস্তকে ও ভূমিতে জলাভিষিঞ্চন করিতে করিতে "ওঁ শন্ন আপো" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। কুশের অভাবে এদেশে কনিষ্ঠ অনামা ও বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র করিয়া বিন্দু বিন্দু জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা বিশিষ্টকল্প নহে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"দর্ভাঃ পবিত্রমিত্যুক্তমতঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মণি।
সব্যঃ নোপগ্রহঃ কার্য্যোদক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ॥
রক্ষয়েদ্বারিনাত্মানং পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ।
শিরসো মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ॥

কুশ অতি পবিত্র তৃণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। অতএব সন্ধ্যাদি কার্য্যে বামহস্ত উপগ্রহযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্র বা কুশযুক্ত করিবে। চারিদিকে জলক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে এবং কুশগৃহীত জলবিন্দু দ্বারা শিরোমার্জ্জনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।

২য়। **প্রাণায়াম**—ইহা মন্ত্রাদি যোগের একপ্রকার প্রধান অঙ্গ। * সাধনাকাঙ্ক্ষীর সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়ামের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এস্থলে দুই এক কথা বলিবার আছে। যথা, পূরক কুম্ভক ও রেচক। কিন্তু সাধারণ বা সহিত-প্রাণায়াম-বিধি ইহার অনুষ্ঠেয় নহে। অর্থাৎ ১।৪।২ মাত্রায় ইহার ক্রিয়ানির্দ্দেশ কোথাও উল্লেখ না থাকিলেও, ভ্রমক্রমে প্রায় সকলেই এই সন্ধ্যাক্রিয়ার সময়েও সেইরূপ ভাবে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা কেবল নাসিকায় হাত দিয়া মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া থাকেন। প্রাণায়ামের কর্ত্তব্য সকলের জানিয়া রাখা আবশ্যক। যাহা হউক, ইহার প্রাণায়াম-বিধি পূর্ব্বরূপ

* "গুরুপ্রদীপে প্রাণায়ামের বিস্তৃত আলোচনা আছে প্রত্যেক সাধকের তাহা কহিলে দেখিয়া রাখা ভাল।

১।৪।২ নিয়মে হইবে না, ইহা সম পরিমাণ বিশিষ্ট। সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়ামকালে ত্রিবিধ ধ্যেয়-বস্তুর রূপ-চিন্তা সহ, সমপরিমাণকালে যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ সময়ে পূরক হইবে, ততক্ষণ সময়ে কুম্ভক এবং সেই পরিমিত সময়েই রেচক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

প্রাণায়াম করিবার পূর্ব্বে পুটাঞ্জলি হইয়া "ওঁকারস্য" আদি ঋষ্যাদি ন্যাস-মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। তাহাতে দেবতার প্রতি অটলভক্তি জন্মে ও দেবপ্রসাদ সহজে লাভ করা যায়। কি কারণে কি কার্য্যে কোন্ ঋষি দ্বারা প্রথম পরিদৃষ্ট হইয়া কোন্ কার্য্যোপলক্ষে তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা জানা না থাকিলে ধর্ম্মহানি হয়। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে ওঁকার (প্রণব) যুক্ত হইলে সকল মন্ত্র চৈতন্য লাভ করে ও মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। সন্ধ্যোপাসনার মধ্যে তাহা সুস্পষ্টভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূরক অর্থাৎ প্রাণকে অন্তরে আকর্ষণ করা ইহাই আত্মসৃষ্টি ক্রিয়া। সেই কারণ "ব্রহ্মগ্রন্থি" বা ব্রহ্মার স্থান রক্তবর্ণ দশদল-কমলরূপ মণিপুরেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার (রক্তবর্ণ চতুরানন দ্বিবাহু, তাঁহার একহস্তে রুদ্রাক্ষমালা ও অন্যহস্তে কমণ্ডলু, তিনি হংসের উপর উপবিষ্ট) ধ্যানসহ অতি ধীরে ধীরে ঈড়া নাড়িতে বা বামনাসাপথে বায়ু আকর্ষণ করিবে। সে সময়ে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পিঙ্গলা নাড়ী বা দক্ষিণ নাসাপথ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তখন বহির্দৃষ্টি নাভিদেশে আবদ্ধ থাকিবে বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি মণিপুর * পদ্মস্থিত সেই ধ্যেয়-বস্তুতে আবদ্ধ থাকিবে।

গায়ত্রী-কথিত এই প্রাণায়ামের পূরক কুম্ভক বা রেচক কালে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ব্রহ্মা বিষ্ণু বা শম্ভুর ধ্যানান্তে প্রত্যেকবারই এইভাবে সপ্তব্যাহৃতি ও সশিরস্ক গায়ত্রীরহস্য চিন্তা করিবে যে—" সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত ব্রহ্মতেজের প্রাণভূত সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়কারিণী শক্তিত্রয়ের অভিন্ন আধার-স্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি, যিনি আমাদের ভবদুঃখনাশের কারণ বলিয়া উপাস্য। তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ে

---

* "গুরুপ্রদীপে" মণিপুর চক্রের বিস্তৃত আলোচনা দেখ।

প্রেরণ করুন। তিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহো জন তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকে ব্যাপ্ত থাকিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত রহিয়াছেন। তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, মণিরত্নাদিতে জ্যোতি, বৃক্ষাদিতে রস এবং মানবাদির মধ্যে চেতনাত্মারূপে অবস্থিত। তিনিই ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ স্বরূপ ত্রিগুণাতীত ও পরব্রহ্ম।

কুম্ভকে প্রাণরক্ষা বা পুষ্টি অথবা প্রাণে স্থিতি করাই প্রথম কার্য্য। ইহাই আত্মস্থিতির ক্রিয়া। সেই কারণ "বিষ্ণুগ্রন্থি" বা বিষ্ণুর স্থান মেঘবর্ণ দ্বাদশদলকমলরূপ অনাহতেই বিশ্বপালন পুষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুর ধ্যান (নীলপদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধপ্রভাসমন্বিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজমূর্ত্তি, তিনি গরুড়ের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন) সহ কুম্ভকক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। সপ্তব্যাহৃতি ও পূর্ব্ববর্ণিত গায়ত্রীরহস্যও চিন্তা করিবে। এই সময় অর্থাৎ পূরকের পর এবং কুম্ভকের প্রথমেই উড্ডীয়ানবন্ধের ও জালন্ধরবন্ধের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ নাভিদেশের উপর ও নিম্ন অংশ পশ্চিমতান করিবে বা পিছনে মেরুদণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবে। ইহাই সাধারণ উড্ডীয়ান বন্ধ। ইহা দ্বারা প্রাণবায়ু সহজে সুষুম্নারূপ আকাশে গমন করে, এইজন্যই শাস্ত্রে ইহা উড্ডায়ন বা উড্ডীয়ানবন্ধ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধক কণ্ঠ আকুঞ্চনপূর্ব্বক গলদেশের শিরাসমূহের চাঞ্চল্যরোধ করিয়া বক্ষঃপ্রদেশে দৃঢ়ভাবে চিবুক সংস্থাপন করিলেই জালন্ধরবন্ধ হইবে। ইহা দ্বারা বায়ু কুপিত হইতে পারে না।

পূরককালের ন্যায় সাধকের বহির্দৃষ্টি নাভিতে বিন্যস্ত থাকিলেও অন্তর্দৃষ্টি অনাহতের * ধ্যেয়-বস্তুতে নিবদ্ধ থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

* অনাহত পদ্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গুরুপ্রদীপে দেখ।

বাঙ্গালার শঙ্কর-মঠ প্রতিষ্ঠাতা

স্বামী পরমানন্দ পুরী।

সাময়িকী।

(ধর্ম্মপ্রচার।)

কটক ও পুরী। শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্যতম পরিচালক ভারতপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ প্রান্তীয়সভা শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের পক্ষ হইতে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে সুললিত ধর্ম্মভাবময়ী বক্তৃতা প্রদানের পর, কলিকাতায় ফিরিয়া, পুনরায় গোবর্দ্ধন মঠাধীশ ১০৮ শ্রীমদ্ মধুসূদন তীর্থস্বামী শঙ্করাচার্য্য মহারাজের আহ্বানে ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অন্যতম প্রচারক শ্রীমান্ পণ্ডিত রাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী মহোপদেশককে সঙ্গে লইয়া পুরীধামে গমন করেন। সেই সময় রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে বঙ্গের সুসন্তান ভারত-ধর্ম্মভূষণ মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী প্রথমতঃ কটকবাসীর সাদর আহ্বানে—কটকে "উপাসনাতত্ত্ব ও কৃষ্ণলীলা" বিষয়ে —সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। দুই দিনই কাসিমবাজারাধিপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পুরীধামে "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জগন্নাথতত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা হইয়াছিল। একদিন গোবর্দ্ধন মঠাধীশ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মহারাজ ও একদিন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সুমধুর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উভয়স্থলেই বহু জনসমাগম হইয়াছিল। পুরী এবং কটক্‌বাসী সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ও তাঁহার সরল ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত ও গুণমুগ্ধ হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুণ্যস্রোত স্থায়ীভাবে প্রবাহিত করিবার নিমিত্ত সকলেই স্বামীজীকে বৎসরে বৎসরে উড়িষ্যায় শুভাগমনের জন্য তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উড়িষ্যার উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ মহোদয়গণ বঙ্গমণ্ডলের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতারও পরিচয় দিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের ধর্ম্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

বহরমপুরে বক্তৃতা—স্বামীজী পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অতঃপর বঙ্গমাতার সুসন্তান, স্বধর্ম্মপরায়ণ, জনহিতব্রতধারী কাসিম-

বাজারাধিপতির সাদর আহ্বানে বঙ্গমণ্ডলের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়-লাল দত্ত ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বৈষ্ণবরত্ন মহাশয়দ্বয় এবং ভারতধর্ম্ম-মহা-মণ্ডলের অন্যতম মহোপদেশক শ্রীহরিবংশ সাংখ্যশাস্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কাসিম-বাজারে গমন করেন। তথায় এক সপ্তাহ কাল স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই মহা-রাজার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মহারাজা বাহাদুরের উদ্যোগে তাঁহার বহরমপুরস্থ কলেজিয়েট্ স্কুল গৃহের প্রশস্থ হলে স্বামীজী মহারাজ পরপর "ধর্ম্মজীবনের উপযোগিতা, সুশিক্ষা ও সদাচার এবং উপাসনা" বিষয়ে তিনটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবময়ী বক্তৃতা শ্রবণের জন্য প্রতিদিনই সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। প্রথম দিন দেশপূজ্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও শেষ দুই দিন বঙ্গের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা পূজনীয় শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়দ্বয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে বহরমপুরবাসী সকলেই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম দিন বক্তৃতারম্ভের প্রথমে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় নাতিদীর্ঘ সুললিত বক্তৃতা দ্বারা বঙ্গমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা, সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি সমাগত জনসংঘের নিকট প্রকাশ করেন এবং শেষদিন কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বৈষ্ণবরত্ন মহাশয় বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের পক্ষ হইতে কাসিমবাজারা-ধিপতি মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র, দেশপূজ্য বৈকুণ্ঠনাথ, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ও বহরমপুরবাসীকে তাঁহাদের এই ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে "এই প্রদেশবাসীগণ আজ দিবসত্রয় ধরিয়া ত্যাগী পুরুষের নিকট ধর্ম্মামৃতপূর্ণ যে উপদেশাবলী শ্রবণ করিলেন, তাহার একমাত্র হেতুভূত—মহারাজা কাসিমবাজারাধিপতি বাহাদুর। তাঁহারই আমন্ত্রণে স্বামীজী এখানে আসিয়াছেন। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সকলেই আপনারা মহারাজা বাহাদুরের নিকট ঋণী। আমার মনে হয়, এই কয়দিন আপনারা যে সমস্ত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার ফলে আপনারা আপনাদের জীবনে নৈতিক-সংশুদ্ধি ও অতীত-পারম্পর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া মহারাজা বাহাদুরের এই ধর্ম্মকার্য্যে সফলতা প্রদান করিয়া উক্ত ঋণের কতকটা পরিশোধ করিতে কৃতপ্রযত্ন হইবেন এবং আপনাদের মধ্যে পুনরায় সেই

সনাতন হিন্দুভাবের সম্পূর্ণরূপে পুনরভিব্যক্তি দেখিতে পাইলে শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডল তাহার চেষ্টা ও যত্নের সফলতার জন্য কৃতার্থ হইবে। মহারাজা বাহাদুরের কথা অধিক আর কি বলিব। তাঁহার এই সমস্ত দেশহিতকর কার্য্যাবলী বাঙ্গালার ইতিহাসে—ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। বাঙ্গালী যুগযুগান্ত ধরিয়া তাঁহার এই ধর্ম্মপ্রাণতার কথা ঘোষণা করিবে। তাঁহার ন্যায় সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বঙ্গমাতা আজ মহিমময়ী। আমরা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি, মহারাজা বাহাদুরকে ধর্ম্মময় নিরাপদ্ দীর্ঘজীবনে আহ্বান করুন।" এই দিন বহু ধর্ম্মপ্রাণ বহরমপুরবাসী বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

লালবাগে বক্তৃতা।—অতঃপর মুর্শিদাবাদ লালবাগ্ নিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ তত্রত্য হরিসভার পক্ষ হইতে স্বামীজীকে তথায় বক্তৃতা-প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। তাঁহাদের আন্তরিক অনুরোধে স্বামীজী মহারাজ লালবাগ্ জুবিলীহলে "সনাতন ধর্ম্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান" সম্বন্ধে এক প্রাণস্পর্শী সুমধুর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, নসীপুর প্রভৃতি স্থানের ভদ্রমহোদয়গণের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। উপস্থিত জনসংঘ স্থির-মুগ্ধভাবে স্বামীজীর উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই দিন মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্বামীজীর অভিভাষণের পর শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর বক্তৃতায় বঙ্গমণ্ডলের পক্ষ হইতে উপস্থিত ধর্ম্মপ্রাণ ভদ্রমহোদয়গণকে মণ্ডলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন মহাশয় হৃদয়গ্রাহিণী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মণ্ডলের এই সাধুকার্য্যে সহায়তা প্রদানের জন্য করুণ-কাতর প্রার্থনা করিলে, বহু ভদ্রমহোদয় মণ্ডলের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার সরস ও সরল ভাবপূর্ণ মধুর আহ্বানে সভাস্থ সকলকে স্বামীজী মহারাজের অভিভাষণে কথিত ধর্ম্মমার্গের অনুগামী হইতে অনুরোধ করিলে, উপস্থিত সভ্যগণ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে মহারাজের সারগর্ভ

অনুরোধের সমর্থন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ও স্বামীজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানের পর হরিধ্বনি সহকারে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। এতদুপলক্ষে রচিত দুইটী ভাবপূর্ণ সংগীত সভাস্থলে শ্রীযুক্ত তারাদাস বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অতীব মধুরভাবে গীত হইয়াছিল। উক্ত সংগীত দুইটী সকলের অবগতির জন্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

জীর্ণোদ্ধার। উত্তরাখণ্ডের অন্যতম প্রধান তীর্থ শ্রীশ্রীকেদারনাথের প্রধান মন্দির সংস্কারাভাবে বহুদিন হইতে অতীব জীর্ণ এবং সভামণ্ডপ সম্পূর্ণ-রূপে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। অতীব আনন্দের বিষয় যে, ভারতে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকল্পে সংস্থাপিত প্রধান ধর্ম্মসভা শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের চেষ্টা ও যত্নে হিন্দু-রাজকুল-সূর্য্য উদয়পুরাধিপ, শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দিরাদির সর্ব্বপ্রকার জীর্ণোদ্ধারের ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সমগ্র হিন্দুজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের উপদেশানুযায়ী প্রধান মন্দিরের সংস্কার, সভামণ্ডপ, পরিক্রমা ও সিংহদ্বারাদির পুনর্নিম্মাণ প্রভৃতি জীর্ণোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরা শ্রীবিশ্বনাথের নিকট এই সাধু-কার্য্যপরায়ণ হিন্দুনরপতির ধর্ম্মময় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। মহারাজা কাশিমবাজারের নিমন্ত্রণে বহরমপুরে স্বামী দয়ানন্দজীর যে বক্তৃতা হয়, তাহার অনুষ্ঠানবিষয়ে মহারাজা বাহাদুরের সেক্রেটারী ও কর্ম্মচারীবৃন্দ, মুর্শিদাবাদ লালবাগের সভার অধিবেশনের জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত অনন্তলাল রায়, শ্রীযুক্ত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ নাগ, শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও কটকের অধিবেশনের জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার; শ্রীযুক্ত বিভাস চন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ নন্দী ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সুর মহাশয়গণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদিগকে এই ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা প্রদানের জন্য, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীবিশ্বনাথের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, তিনি এই সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে নিরাময় ধর্ম্মজীবন প্রদান করুন।

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

১ম ভাগ | ভাদ্র, সন ১৩২৬। ইং আগষ্ট, ১৯১৯। | ৫ম সংখ্যা।

এস মা।

ধূসর পিঙ্গল মেঘ রুদ্র জটা সম
শরতের শুভ্রাকাশ ফেলেছে ঢাকিয়া,
নীরব নিঝুম আজি শূন্য গৃহ মম
অন্তরে বাহিরে আছে তমঃ আবরিয়া!
বরাভয়া রূপে তুমি শারদা-জননি!
একদা আসিতে হেথা কি মহা উৎসবে,—
আজি শুধু ব্যথা ভরা তামসী রজনী
ঘেরেছে সে জীবনের আনন্দ গৌরবে।
তবু বড় সাধ যায় হাসিছে যেমতি
নীরদের ফাঁকে ফাঁকে বাল রবি-কর,
তেমতি মা, এস প্রাণে তিমির-বসতি
পলে পলে করি আজি উজল সুন্দর!
নিরখি ও মুখ পানে নিখিল ভুলিয়া
রাতুল চরণতলে রহি মা, ডুবিয়া!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

সন্ধ্যারহস্য।

[স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

রেচকে লয়ক্রিয়াই বা চিত্তের লয়সাধনই ইহার প্রধান কার্য্য। ইহাই আত্মার লয়াভাসন। সেই কারণ "রুদ্রগ্রন্থি" বা রুদ্রের স্থান শ্বেতবর্ণ দ্বিদলকমলরূপ লয়স্থান আজ্ঞাচক্রেই লয়কর্ত্তা শম্ভুর ধ্যান-(শ্বেতবর্ণ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী, দ্বিভুজ, অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত শম্ভুদেব, তিনি বৃষের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন) সহ রেচক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। এই সময় পূর্ব্বোক্ত সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রীরহস্য চিন্তা করিবে। কুম্ভকের পর রেচক-ক্রিয়া আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের উড্ডীয়ান ও জালন্ধরবন্ধ শিথিল করা প্রয়োজন। এই সময় বক্ষ সংলগ্ন চিবুক উঠাইয়া ধীরে ধীরে বায়ুরোধ করিতে হইবে। সাধক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আজ্ঞাচক্রে ধ্যেয়-বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে।

প্রাণায়াম সাধনায় সাধকের অন্তরের অজ্ঞাত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "যথা পর্ব্বতধাতূনাং দোষান্ দহতি পাবকঃ। এবমন্তর্গতং চৈনঃ প্রাণায়ামেন দহ্যতে॥" অর্থাৎ যেমন পার্ব্বত্য ধাতু সাধারণতঃ মলিনতা দোষ সংযুক্ত থাকিবার কারণ তাহাকে অগ্নিদ্বারা বিশুদ্ধ করিতে হয়, তেমনই সাধকের অন্তর্গত পাপ বা অন্তর রোগাদি প্রাণায়াম প্রক্রিয়া দ্বারা বিদগ্ধীকৃত হইয়া থাকে। এইভাবে শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "নিরোধাজ্জায়তে বায়ু বায়োরগ্নি প্রজায়তে। অগ্নেরাপো ব্যজায়ন্তঃ তৈরন্তঃ শুধ্যতে ত্রিভিঃ॥" অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা বায়ুনিরোধ করিতে পারিলে সেই বায়ুর সংঘর্ষণে অগ্নির উদ্ভব হয়, আবার অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সমস্ত বিধৌত ও বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়াম ক্রিয়ায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-চিন্তায় বিরাটের সহিত পিণ্ডের বা এই দেহের অভিন্নতা প্রতিপাদক চিন্তা দ্বারাও পাপের বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে।

৩। আচমন—ইহাকে মুখাদি অঙ্গের মাত্রাপ্রক্ষালন বলা যাইতে পারে। অহোরাত্রের কৃত স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গজাত পাপসমূহকে মন্ত্রসহযোগে আহুতিদ্বারা দগ্ধ করণানন্তর আত্মচৈতন্যরূপ জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশিত পরমাত্মারূপ সূর্য্যে জীবাত্মাকে বিশোধিত করাই ইহার তাৎপর্য্য। মন্ত্র-যোগের অঙ্গন্যাসের ন্যায় বাহ্য অঙ্গের শান্তি ও স্থিরতাও ইহা দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাতর্মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালভেদে ইহার মন্ত্রও বিভিন্নবিধ।

প্রাতঃকালের আচমনমন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই,—"জলতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি অতি সূক্ষ্মভাবে স্থূল জলতত্ত্বের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন, তাঁহারই নিকট তাঁহার স্থূল-স্বরূপ জলতত্ত্ব সহযোগে সাধক দক্ষিণ করে এক গণ্ডূষ জল লইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "সূর্য্যশ্চ মা ইত্যাদি" মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা জল, আচমনকার্য্যে ইহার বিনিয়োগ। হে সূর্য্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার নিত্যকর্ম্মের অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ অর্থাৎ ক্রোধাদিজনিত বা ইন্দ্রিয়সকলকৃত কোনরূপ কুকার্য্য হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত, পদ ও শিশ্নদ্বারা যে পাপ করিয়াছি বা যদি করিয়া থাকি—হে দিবসাভিমানী দেবতা তাহা নাশ করুন এবং আমার অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীরের আরও যদি কোন অজ্ঞাত পাপ থাকে, সে সমুদায় আমার এই করতলে রক্ষিত জলে সংক্রান্ত হউক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই জলে স্বীয় তীব্রদৃষ্টি সংন্যস্ত করিবে। অনন্তর হৃৎকমলমধ্যবর্ত্তী আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ পরমাত্মা বা সূর্য্যে সমর্পণ করিলাম, তিনিই ইহা সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করুন" বলিয়া সেইজলে আচমন করিবে।

মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার অনুষ্ঠানকালেও উক্তরূপ মন্ত্রাচমন সময়েও পূর্ব্বোক্তভাবে জলতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে স্মরণপূর্ব্বক এক গণ্ডূষ জল লইয়া তাহার উপর আত্মদৃষ্টি দৃঢ়ভাবে সংন্যস্ত করিয়া যে প্রার্থনামন্ত্র সাধককে পাঠ করিতে হয় তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—"আপঃ পুনন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, দেবতা জল, আচমনকার্য্যে ইহার বিনিয়োগ। হে আপোদেবতা পৃথিবীকে পবিত্র করুন, আমার এই পার্থিব-দেহকে পবিত্র করুন। এই ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে (জীবাত্মাকে) পবিত্র করুন এবং পরমাত্মাকেও পবিত্র

করুন। পরমাত্মা পবিত্র হইয়া আমার অন্তর-রাজ্য সর্ব্বাংশ পবিত্র করুন। প্রাতঃসন্ধ্যার পর উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্যভোজন, অসদাচরণ এবং অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত আমার যদি কোন পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে হে আপোদেবতা আমাকে তাহা হইতে পবিত্র করুন। এই পাপবিমোচক অভিমন্ত্রিত জল আমার সমস্ত পাপ বিনাশের জন্য অমৃত নামক হুতাশনস্থিত সত্যস্বরূপ চেতনাত্মাতে আহুতি প্রদান করিতেছি, সমস্তই ভস্মীভূত হউক"—বলিয়া সেই জলে আচমন করিবে।

সায়ংসন্ধ্যাকালেও দক্ষিণ হস্তে গণ্ডূষ পরিমাণ জল লইয়া তদুপরি স্বীয় তীব্রদৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া জলাধিষ্ঠাত্রী সেই দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—"অগ্নিশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি রুদ্র, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা জল, আচমনে ইহার বিনিয়োগ। অগ্নি, যজ্ঞদেব এবং যজ্ঞপতি অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ অসাঙ্গকৃত নিত্যকর্ম্ম বা যজ্ঞকৃত পাপ বিনাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। আমি সমস্ত দিবাভাগে মন, বাক্য এবং কায়দ্বারা অর্থাৎ হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নসহযোগে যে কোন পাপ করিয়াছি বা যদি করিয়া থাকি, তবে নিশাভিমানী দেবতা সেই সমস্ত পাপ নষ্ট করুন এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যদি অন্য কোনও পাপ থাকে তাহাও এই জলগণ্ডূষে সংক্রান্ত হউক। সেই জল এক্ষণে হৃদয়স্থিত অমৃতযোনি সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মায় সমর্পণ করিলাম। উহা নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যাউক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই জলে আচমন করিবে।

প্রাতর্মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যানুষ্ঠান প্রসঙ্গে এই প্রক্রিয়াদ্বারা যেমন নিশা, পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্নজাত পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধকের বাগযন্ত্রাদিও স্নিগ্ধ, নীরোগ এবং পরিতৃপ্ত হয়; তাহাতে মন্ত্রশক্তি উদ্বোধিত হয়। চিত্তের প্রসন্নতা ও সাধনায় বিশেষ উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪র্থ। পুনর্মার্জ্জন—ইহা মার্জ্জনেরই অনুরূপ। তবে ঋষ্যাদি স্মরণ দ্বারা দেহসহ জীবাত্মাকে অধিকতর পবিত্র করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই সময়ে কুশগুচ্ছ-সহযোগে পূর্ব্বোক্ত মার্জ্জন ক্রিয়ার অনুরূপ—ইহাতে প্রথমে প্রণব (ওঁ) পরে (ভূর্ভুবঃ, স্বঃ) তৎপরে (তৎসবিতুরাদি) গায়ত্রীর শেষাংশ

উচ্চারণ করিয়া মস্তকে তিন বার জলসিঞ্চন; অনন্তর—"আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা জল, মার্জ্জনকার্য্যে ইহার বিনিয়োগ। এইসঙ্গে মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোপদেশমত মস্তকে জলসিঞ্চন করিতে হইবে।

৫ম। **অঘমর্ষণ**—অর্থাৎ পাপবিনাশন। সুতরাং নাসিকামাত্র ধুইয়া ফেলাই, নাসিকার সম্মুখে গণ্ডূষমাত্র জল রাখাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে। ইহার ক্রিয়া প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন। নাসারন্ধ্র ঊর্দ্ধমুখ করিয়া দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণের ন্যায় করিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া বামনাসার মধ্যে প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর ঊর্দ্ধমুখ সহ মস্তকটী দক্ষিণ দিকে ক্রমে হেলাইয়া নাসিকারন্ধ্র নিম্নমুখ করিবে। সেই সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে ও চিন্তা করিবে যে, দেহাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপে এই জলের সহিত মিশিয়াছে, সেই কারণ এই জল উষ্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দক্ষিণ নাসা হইতে নিপতিত উষ্ণস্পর্শ বিন্দু বিন্দু জল গ্রহণ করিবে। তদনন্তর বাম হস্ততলে বা বামপার্শ্বে সেই জল সজোরে নিক্ষেপ করিবে। চিন্তা করিবে যেন সেই ভীষণ পাপপুরুষ প্রতিহত হইয়া বিনষ্ট হইল। ইহাই অঘমর্ষণ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা মস্তিষ্কমূল শীতল হয়। আজ্ঞাচক্র উদ্বোধিত হইয়া পাপস্মৃতি-সমূহ বিলয়প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণে সর্ব্বাঙ্গের পাপও বিনষ্ট হয়।

(ক)। বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় তান্ত্রিক সন্ধ্যাতেও অঘমর্ষণের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে বৈদিক অনুষ্ঠানই স্পষ্টতরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তান্ত্রিক সন্ধ্যায় মার্জ্জনাদি পূর্ব্বোক্ত প্রাথমিক চতুর্ব্বিধ অনুষ্ঠানের উল্লেখ নাই। তাহার কারণ আচমন, মন্ত্রাচমন, অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা সেই কার্য্য বিস্তৃতরূপে সাধিত হয়, সুতরাং তান্ত্রিক সন্ধ্যার উপাসনা মন্ত্রাবলীর মধ্যে তাহা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয় নাই। তবে বৈদিক সন্ধ্যার অনধিকারী যে কোন সাধক ইচ্ছা করিলে শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ বেদমন্ত্রের উচ্চারণ ব্যতীত কেবল ভাবচিন্তা সহ সমস্তই সম্পন্ন করিতে পারেন।

৬ষ্ঠ। সূর্য্যোপস্থান—ইহা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চৈতন্যময় ব্রহ্মের তেজঃসত্তার আরাধনামাত্র। ব্রহ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ আধিভৌতিক বিভূতি শ্রীসূর্য্যদেব। তাহারই মধ্যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নভেদে তাঁহারই আধিদৈবিক বা প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করিতে হয়। সেই কারণ সন্ধ্যোপাসনার মধ্যে সূর্য্যোপস্থানই শ্রেষ্ঠকার্য্য। মার্জ্জন হইতে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ অনুষ্ঠান সন্ধ্যার প্রথম ক্রিয়াসিদ্ধাংশ বাহ্যাভ্যন্তর-পরিশোধনঘটিত এবং ষষ্ঠ সূর্য্যোপস্থান হইতে পরবর্ত্তী পাঁচটী উপাসনা-ক্রিয়াঘটিত। সেই কারণ ক্রিয়োপাসনাবহুল তান্ত্রিক সন্ধ্যার মধ্যে প্রথম পাঁচটীর বিশেষ উল্লেখ নাই। কারণ তাহা তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি সাধারণ নিত্যক্রিয়া। যাহা হউক এই সূর্য্যোপস্থান আবার ব্রহ্মজ্যোতিঃ জ্ঞানেরও উপাসনা। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সন্দেহ নামক রাক্ষস অথবা সন্দেহরূপ পাপ অন্ধকার, যাহাতে আর দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃকে ম্লান করিতে না পারে, সেইজন্যই তাহার বাহ্যানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণ এখনও সেই আদি বৈদিকরীতি অনুসারে গায়ত্রীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলের অঞ্জলি বর্ষণ দ্বারা সূর্য্যজ্যোতিকে গ্রাসোদ্যত অন্তরীক্ষ নিবাসী সেই সন্দেহ-রাক্ষসকে দমন করিবার স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সন্ধ্যোপাসনায় জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যজ্যোতিকে অন্তরে স্থাপনারূপ অনুষ্ঠান সূর্য্যোপস্থানের অন্যতম অঙ্গ।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম-প্রচারক।

সরযূর তীরে যুবরাজ কভু, যোগী গোদাবরী তটে,
পাষাণ ভাসায়ে সাগর বাঁধিছ বধিতে রাবণ শঠে।
কখনো গোপনে বালীরে বিঁধিছ, অনলে সঁপিছ সীতা,
যুগে যুগে তুমি ভুবনে আসিছ, নিতি নব নব সাজে,
চিনিতে পারিলে, ধরিতে পারিলে, শেষে কাঁদি দুখে লাজে।

কখন ভীষণ সমরে ভ্রমিছ, সারথি সখার রথে,
কখন মধুর মুরলী বাজায়ে, ফিরিতেছ বন পথে।
কখনো ভকতে শিখাইছ যোগ, শ্রীমুখে কহিছ গীতা,
কখন বিপুল নাশি যদুকুল, নিজে সাজাইছ চিতা।
যুগে যুগে তুমি ভুবনে আসিছ, নিতি নব নব সাজে,
চিনিতে পারিলে ধরিতে পারিলে শেষে কাঁদি দুখে লাজে।

কভু আরবের ভীষণ মরুতে, কহিছ কোরাণ কথা,
হেরা পাহাড়ের গুহাতে কখনো, নিবেদিছ মনোব্যথা।
কখনো ভ্রমিছ জর্ডনের তীরে ক্রশেতে দুলিছ কভু,
অরির লাগিয়া করুণা মাগিছ, কাতর নয়নে প্রভু।
যুগে যুগে তুমি ভুবনে আসিছ নিতি নব নব সাজে,
চিনিতে পারিলে, ধরিতে পারিলে, শেষে কাঁদি দুখে লাজে।

দেখেছি তোমারে সেদিনও এসেছ নদীয়ার চাঁদ তুমি,
প্রেম আঁখি ধারে নদে ডুবু ডুবু প্লাবিত ভারত-ভুমি।
অপার কৃপায় পাতকী তরালে পতিতে করিলে কোলে,
বিশ্ব হৃদয় বিজয় করিলে প্রেমভরে হরিবোলে।
আবার এসোহে আবার এসোহে এ দীনা ধরণী মাঝে
দর্প-দম্ভ ঘৃণা-বিদ্বেষ ডুবে যাক্ প্রেমে লাজে।

শ্রীকুমদ রঞ্জন মল্লিক।

বিবেক-বাণী।

(ধর্ম্ম ও মুক্তি)

[শ্রীরাধারমণ সেন।]

মনুষ্যের মধ্যে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম হইতেই বর্তমান তাহারই প্রকাশকে ধর্ম্ম বলি।

ধর্ম্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞানের দ্বারা লাভ হইতে পারে না। তাহাই ধর্ম্ম, যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায়; আর এই ধর্ম্ম সকলেরই জন্য।

বেদ নিজে এ কথা বলিতেছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

বেদ পাঠের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে প্রাণ-ভরে ডাকিতে হইবে। তীর্থ বা মন্দিরেতে গেলে, তিলক ধারণ করিলে, অথবা বস্ত্র-বিশেষ পরিলে ধর্ম্ম হয় না।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে বৃক্ষের অপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর অপেক্ষা ভক্ত সাধু কে? প্রস্তর-খণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক-নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে?

শুধু ধর্ম্মের লম্বা চৌড়া কথা বলিলেই ধর্ম্ম হয় না; তোতা পাখীও লম্বা লম্বা কথা কয়, আজকাল কলেও কথা কয়। কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, যাহাতে ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা, তিতিক্ষা ও অনন্ত প্রেম বিদ্যমান; এই সকল গুণ থাকিলেই তুমি ধার্ম্মিক পুরুষ হইবে।

যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্ম্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক, মূর্খই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জানুক

বা না জানুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবর্ত্তী; আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এইটুকু লক্ষণ বলিয়া আমরা লোককে বিচারের উপর নির্ভর করিতে বলি। যাহাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাহাই পাপ বা অধর্ম্ম; আর যাহাতে তাঁর মত হইবার (ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ করার) সাহায্য করে তাহাই অধর্ম্ম।

যিনি সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাকে যিনি সর্ব্বভূতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি।

যে কেহ মুক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে; তবেই মুক্তিলাভ করিবে।

আর্য্য-হিন্দুর সমাজ-বন্ধন।

[শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।]

সূচনা।

নির্ব্বচন। সমাজ সংসারবন্ধের ও পরম-মোক্ষের মূল সূত্র;—ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; জগতের সুখ, শান্তি ও গৌরবের আদি প্রস্রবণ। একবার এই প্রস্রবণ উৎসারিত হইলে শত শত অমৃত-স্রোত আসিয়া মিলিত হয়;—সুখের সদন, শান্তির নিকেতন, গৌরবের দীপ্ত গগন তখন অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠে; লোকের অন্ধকার দূরীভূত হয়; অন্তর্ব্বহির্ভাগে অবিরত পূর্ণ-

প্রভা বিরাজ করিতে থাকে। সমাজেরই উৎকর্ষে সংসারের পুষ্টি ও কল্যাণ সাধিত হয়; সমাজই মহাপুরুষগণের অবদানের অমৃতময় ফল।

উপযোগিতা। সমাজ জাতীয় অভ্যুত্থান ও অধঃপতনের মানদণ্ড। কোন্ জাতি সুখসমৃদ্ধির ও সভ্যতার কিরূপ সমুচ্চ সোপানে সমাসীন অথবা অবনতির কতদূর নিম্নস্তরে নিপতিত, তাহা সেই জাতির সামাজিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সহজে বুঝা যাইতে পারে। অনেক সময়ে ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদিগের প্রধান সহায়। ভারতীয় আর্য্যগণ এক সময়ে যে, সমাজের সকল অংশেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন হিন্দুসমাজের অবস্থাবিষয়ক বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি।

ব্যাখ্যা। সৃষ্টি ও পুষ্টি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—সমাজ কি?—সমাজ একধর্ম্মান্বিত জাতি বর্ণ বা গণসমূহের নির্ব্যূঢ় সমষ্টি। ইহার বিরাট শরীর। সেই বিপুল দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ সুকৌশলে সংন্যস্ত,—এরূপ সুদৃঢ় সমবেদনাসূত্রে পরস্পরে গ্রথিত যে, একটী সামান্য প্রত্যঙ্গের কার্য্য-বিকারে সমগ্র সমাজ-শরীর সময়ে সময়ে বিক্ষুব্ধ—এমন কি কখন কখন বিপর্য্যস্তও হইতে পারে। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। বসিষ্ঠ, শ্বেতকেতু, মুসা, লাইকার্গাস, কন্‌ফিউশিয়স, মহম্মদ, রুশো প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অবদান-পরম্পরা ইহার এক একটী জীবন্ত নিদর্শন। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, ইঁহাদের ন্যায় এক একটী মহাবীরের উদ্যমে একটী সমাজের রূপান্তর সাধিত হইতে পারে, কিন্তু একটী নূতন সমাজ আমূল গঠিত হইতে পারে না। শিশু প্রসূত হইবামাত্রই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না; বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই কখনও ফলপুষ্পান্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয় না। মানবের শত চেষ্টা ও সহস্র সাধনা, একদিনে এক মুহূর্ত্তে এই অসম্ভব অবস্থান্তর ঘটাইতে পারে না। সংবেষ্টক অবস্থানিচয়ের আনুকূল্যে, উপযুক্ত পোষণ-দ্রব্যের সাহায্যে শিশুর শরীর ও মন যেমন ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে;—পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ, পরিজনবর্গের প্রগাঢ় যত্ন, গুরুর উপদেশ, দম্পতির সাহচর্য্য এবং দেশ ও কালের প্রভাব তাহার মনোবৃত্তিনিচয়কে

নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরিপুষ্ট করে; বিরাট মানবসমাজ সেইরূপ বিবিধ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক অর্থাৎ মানবীয় অবস্থা ও প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ক্রমান্বয়ে উন্নতিলাভ করিয়া থাকে। একটীমাত্র মানবের শরীর ও মানসিক বৃত্তির পরিস্ফুরণে, বাহ্য ও অন্তর্জগতের যতটুকু যত্ন ও আয়াস এবং কালের যে পরিমাণ প্রভাব আবশ্যক, তাহার সহস্রগুণ প্রযুক্ত না হইলে কখনও একটা বিশাল সমাজের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং মানবসমাজ ভিন্ন ভিন্ন মানবমাত্রের কার্য্য-পরম্পরার ফলসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে দেশের মানবীয় কার্য্য সমধর্ম্মান্বিত, সেই দেশের মানবসমাজ শীঘ্র শীঘ্র স্ফুরিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে দেশে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ যে দেশের মানবীয় কার্য্যাবলী পরস্পর বিসম্বাদী, তত্রত্য সমাজ শরীর নিত্য গঠিত ও ভগ্ন হইতে থাকিয়া অবশেষে জীবন-সংগ্রামের পর্য্যবসানে একপ্রকার স্থায়িত্ব লাভ করে। সেই স্থায়িত্ব শাশ্বত বা চিরন্তন নহে।

উদ্দেশ্য। সমাজ-শরীর কিরূপে স্ফুরিত হয়; কোন্ কোন্ বিষয় ইহার স্ফূর্ত্তিলাভে সহায়তা করে; কিরূপে সভ্যতার সূচনা, উন্নতি ও পরিণতি ঘটে; বাহ্য ও অন্তর্জগতের কোন্ কোন্ ধর্ম্ম ইহার প্রধান সহায়; তৎসমুদায়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষই আমাদের প্রধানতম প্রসঙ্গ। কিরূপ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বা মানবীয় প্রভাব ও কার্য্যপরম্পরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সুবিশাল আর্য্যসমাজের সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছিল, তাহারই আলোচনা আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাধা। এই উদ্দেশ্য অতীব দুরূহ; নানা কঠোর বিঘ্ন-বাধা ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎসমুদায়কে নিরাকৃত করিতে না পারিলে, সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। প্রধান ও প্রথম বাধা—ভারতীয় সভ্যতার ও আর্য্য হিন্দুসমাজের কালাতিগ প্রাচীনত্ব এবং উপযুক্ত ভারতেতিহাসের অসদ্ভাব। আজি আমরা যে ভারতীয় আর্য্যসমাজের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা জগতের মধ্যে আদিম। যে দিন তাহা পরিণতির চরমসীমায় পদক্ষেপ করিয়াছিল, সেইদিন হইতে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

কালের কুটিল প্রভাবে,—ভবিতব্যতার ভয়াবহ সাফল্যে আজি সেই সুপ্রাচীন আর্য্যসমাজের অনুপম সভ্যতার জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব। দ্বিতীয় বাধা—উপযুক্ত ভারতেতিহাসের অভাব। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণ যে সমস্ত গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন, যে গ্রন্থনিচয় আজি আমাদিগের প্রধান অবলম্বন, তৎসমুদায়ের অধিকাংশই রূপকালঙ্কারে আচ্ছন্ন,—অত্যুক্তিজালে জড়িত। অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে সেই অলঙ্কার উন্মোচিত এবং অত্যুক্তিজাল অপসারিত করিয়া ঐতিহাসিক সত্যনিচয়ের আবিষ্কার করিতে হইবে। আবার তৎসমুদায়ের সত্যের উপযুক্ত সমালোচনা না করিলে, ইতিহাসের অঙ্গ বিকৃত হইবার সম্ভাবনা; এইজন্য ভারতীয় আর্য্যবীরগণের প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক সত্যনিচয় সাবধানে সংগ্রহ করিয়া তৎসমুদায়ের সমালোচনা ও সমাবেশ করা আবশ্যক। এই সকল গ্রন্থের অনেকাংশ রূপকালঙ্কারে আচ্ছন্ন হইলেও, আজি ঐতিহাসিকের একমাত্র অবলম্বন,—অন্ধকারময় অতীতকালগর্ভে প্রবেশ করিবার একমাত্র আলোক। তাহাদিগের সেই নিবিড় রূপকালঙ্কার উন্মোচিত হইলে, তাহার অভ্যন্তর হইতে গূঢ় ঐতিহাসিক সত্য সঙ্কলিত হইতে পারে। যে সকল অবদান দ্বারা মানবগণ সভ্যতার সুবিস্তৃত পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তৎসমস্ত তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিলে তাঁহাদের সমসাময়িক রীতিনীতি ও শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়। ফলতঃ সেই সমস্ত অবদানই অনন্তকালের জন্য তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় আর্য্য, ইজিপ্‌শিয়ান, গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি সকল প্রাচীন জাতির পক্ষে এই প্রশংসাবাদ সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হইতে পারে। এই সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে, একমাত্র ভারতীয় আর্য্য ভিন্ন অবশিষ্ট সকলেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ তাহাদিগকে মহাকালের অনন্ত শ্মশানক্ষেত্রে স্তূপীকৃত চিতাভস্মের মধ্যেও অমর করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র ভারত,—সভ্যতার আদিম লীলাক্ষেত্র—পবিত্র ভারত, অতি প্রাচীনকাল অবধি নানাবিধ অসীম উপদ্রব ও উৎপীড়ন সহ

করিয়াও, শত শত প্রচণ্ড শত্রুর পাশব আক্রমণ হইতে আপনার ধর্ম্ম ও রীতিনীতি এখন পর্য্যন্ত প্রায় অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে। ভারত-সন্তান স্বাধীনতা হারাইয়াছে, তথাপি পিতৃপুরুষগণের পবিত্রতম প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার হইতে এখনও বিচ্যুত হয় নাই।

কারণ।—এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—কোন্ মহীয়সী শক্তির প্রভাবে কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তন এবং শত শত ভীষণ শত্রুর আক্রমণ হইতেও ভারত-সন্তানগণ আপনাদের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন;—কোন্ মহামন্ত্রের মোহিনী শক্তি আধুনিক অধঃপতিত হীনবীর্য্য আর্য্যহিন্দুসন্তানদিগকেও সেই সকল প্রাচীন আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় নাই? একতা ও স্বাধীনতা বহুকাল পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইলেও, ইহাদের অস্তিত্ব যে এখনও লোপ পায় নাই, ইহাদের দৃঢ় স্থিতিশীল প্রকৃতির যে অত্যাপি সম্পূর্ণ শৈথিল্য ঘটে নাই, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণই পাওয়া যায় না।

হিন্দুবীরের প্রভাব।—আর্য্য হিন্দুবীর স্বভাবতঃ গম্ভীর ও সহিষ্ণু। এই দুইটী প্রকৃষ্ট গুণ দ্বারা তাঁহার কার্য্যবত্তা ও তেজস্বিতা নিয়মিত হয় বলিয়াই, তিনি কঠোরতম অত্যাচার সহ্য করিয়াও অভ্যুত্থিত হইবার নিমিত্ত ধীরভাবে উপযুক্ত কালপ্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার জাতীয়-জীবন ও সমাজবন্ধন অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকে।

বীরের মহিমা।—আমি প্রথমেই বলিয়াছি, সমাজ মহাপুরুষ-গণের অবদানের অমৃতময় ফলসমষ্টি। মহাপুরুষমাত্রেই ধর্ম্মবীর। প্রত্যেক ধর্ম্মবীরের জীবন কতকগুলি কঠোর সমস্যার ও তত্ত্বসমুদায়ের মীমাংসার সমষ্টি মাত্র। যখন মানব অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন, পাশব-প্রবৃত্তির স্রোতে নিয়ত ভাসমান, আত্মসংযমে অপারগ, আত্মচিন্তায় অসমর্থ, আত্মরক্ষণে ক্ষমতাহীন; যখন সমাজবন্ধন সুদূরপরাহত, রাজশাসন কল্পনায় পর্য্যবসিত, বহির্জগতের প্রভাবে মানব বাহ্য-প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়নকরূপে অবস্থিত;—আদিম মানবের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা

দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, মনুষ্যসমাজ একদিন উন্নত হইয়া দেবতারও সমকক্ষ হইবে? একদিন মানব বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিরও উপর স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিবে? জগতের চক্র চালিত করিতে পারিবে? অবশ্য এই সকল দুরূহ প্রশ্ন একদিনে এক সময়ে একজনের মনে উত্থিত হয় নাই; এক ব্যক্তিও এই সকলের মীমাংসা করেন নাই। অভাব ও আবশ্যকতা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত বা গঠিত হইয়া এক একটী সমস্যা, কালে কালে এক একটী মহাপুরুষের মনোমধ্যে উদিত এবং তৎকর্তৃকই কিয়দংশে মীমাংসিত হইয়াছে। যেখানে অভাব গুরুতর ও অধিকতর অপ্রতিকার্য্য; বাহ্য-প্রকৃতির প্রভাব যেখানে ঘোরতর প্রতিকূল; সেইখানে সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মানবকে তাহার সহিত প্রচণ্ড সমর করিতে হইয়াছে;—সেইখানেই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। একটী প্রশ্নের সমাধানে—একটী অভাবের দূরীকরণে, কোন কোন ব্যক্তি চিরজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হয়ত দুই তিন পুরুষ ধরিয়া সেই চেষ্টা চলিয়াছে; শেষে কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্যার সমাধানপূর্ব্বক সমাজকে উচ্চতর ও দৃঢ়তর স্তরে স্থাপিত করিয়াছেন। ভারতে মনু, শ্বেতকেতু, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বাল্মিকী, ব্যাস,শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ ঐরূপ মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রকৃতির-প্রভাব।—কিরূপে কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ শক্তির আনুকূল্যে ও প্রতিকূলতায় ঐ সকল মহাপুরুষের চরিত্র কি প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, ভারতীয় আর্য্যসমাজের সৃষ্টি, পুষ্টি ও আধুনিক দীন-দুরবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মানব অবস্থার দাস। জগতের সমুদায় ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতা কতকটা উপলব্ধ হইবে। অবস্থা আবার মানবের বাহ্য ও অন্তঃ-প্রকৃতির প্রভাব-ফল। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির ঐ অবস্থারই প্রভাবের উপর মানবের চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সেই অবস্থা চতুর্ব্বিধ;—জল-বায়ু, খাদ্য, আবাসভূমি ও নিসর্গ। এই অবস্থা-চতুষ্টয় স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, মূলে অভিন্ন; কারণ জল-বায়ুর অবস্থানুসারে আবাসভূমির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়; এবং আবাসভূমির প্রকৃতি অর্থাৎ উচ্চতা ও নিম্নতা অথবা

শুষ্কতা ও আর্দ্রতা অনুসারে খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি সংঘটিত হয়। আবার জল, বায়ু ও খাদ্য আবাসভূমির বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ অবস্থানিচয়ের সমবেত প্রভাবই নিসর্গ। কেহ কেহ বলেন পৈতৃক সংক্রমণ ও প্রাক্তন কর্ম্মদ্বারাও মানবের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। এই সকল সমস্যা নিতান্ত দুরূহ; সেই জন্য ক্রমে ক্রমে এইগুলির বিশদীকরণ ও মীমাংসা-দ্বারা ভারতীয় আর্য্য-সমাজের অবস্থাগত বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

আবাহন।

আজি, মঞ্জুল মধু মুগ্ধ শরতে স্নিগ্ধ অরুণ কিরণে।
এস, মঙ্গলময়ী কল্যাণ-দেবি, মন্দ-মেদুর চরণে।
এস, সুন্দর-কম-গন্ধ-কুসুম সজ্জিত নব কাননে।
এস, বন্দনা-গীতি ঝঙ্কৃত প্রীতি পূর্ণ মর্ত্ত্য ভুবনে।
এস, নির্ম্মল-নীল, অরুণ দীপ্ত, মুক্ত উদার গগনে।
এস, গন্ধ মোদিত সান্ধ্য সমীরে সান্দ্র-শ্যামল কাননে।
আজি, এস মা আমার মানস পদ্মে বাঞ্ছিত চির চরণে।
আজি, পুণ্য পরশে জাগ্রত কর সুপ্ত শিথিল মরমে॥

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য।

প্রতিমাপূজার আবশ্যকতা।

[স্বামী দয়ানন্দ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭) জীবসত্তা দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় উহার শক্তিও পরিচ্ছিন্ন। এই জন্যই স্বল্পশক্তি জীব সংসারসংগ্রামে নিস্পেষিত হইয়া থাকে। সংসারের প্রত্যেক ক্রিয়াতেই, জীব, শক্তির ক্ষয় করিয়া থাকে। কারণ কোন ক্রিয়াই বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম ভিন্ন উৎপন্ন হয় না। পরিচ্ছিন্ন-শক্তি জীবের, সামান্য বল এইরূপে সত্বরই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জীবের আয়ুঃক্ষয়, সুখনাশ ও শক্তিনাশ হইয়া থাকে। অতএব যদি সংসারসংগ্রামে জয়ী হইয়া দীর্ঘায়ুঃ, সুখ ও শক্তি পাইতে হয়, তবে কোন অলৌকিক অসীমশক্তির আধারের সহিত জীবের মানসিক ও আত্মিক সম্বন্ধ রাখা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিমাই এইরূপে শক্তির আধার হইয়া জীবকে পরম-কল্যাণের অধিকারী করিতে সমর্থ হয়। শ্রীভগবানের ব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন-শক্তি, প্রতিমারূপী আধারে কিপ্রকারে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ঐরূপে পুঞ্জীভূত দিব্য-শক্তির সহিত মন বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধ থাকিলে, জীব দিব্যশক্তি লাভ, নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ, দীর্ঘায়ুঃ ও নৈরোগ্য এবং দুঃখাবলেশহীন সুখ-লাভ করিতে পারে। জগতের জীবন-সংগ্রাম তাহাকে ব্যথিত ও পরাজিত করিতে পারে না। সে বীরের মত ধর্ম্মক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া, মাতার মুখোজ্জ্বল ও মানবজীবনের কর্ত্তব্য পূর্ণ করে এবং অন্তে নিজের পরিচ্ছিন্ন সত্তাকে সর্ব্বতোব্যাপ্য অপরিচ্ছিন্ন ভগবৎসত্তার মধ্যে বিলীন করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করে। ইহাই প্রতিমাপূজনের দ্বারা শক্তি ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি-রূপ সপ্তম উপকারিতা।

(৮) শ্রীভগবানের ভাবময়ী মধুর মূর্ত্তিতে, পরম প্রেমের সহিত ধ্যানমগ্ন হইলে এবং তীব্রসংযোগ সহকারে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিলে, ধ্যানের

পরিণামে, শ্রীভগবান্ অনন্তলাবণ্যময়ী মধুরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনে ভক্তের হৃদয়কমল উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সমস্ত শরীর পুলকিত হয়, দরদরিত ধারায় অশ্রু বিগলিত হয় এবং ভক্তহৃদয়ের অনন্ত-ভাব, সহস্র-মন্দাকিনী-ধারায় শ্রীভগবানের আনন্দসমুদ্রের দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া থাকে। প্রেমের ধারায় তাহার চিত্তের অনন্ত-মলিনতা চিরকালের জন্য বিধৌত হইয়া যায়। হৃদয়ের অন্ধকার, হৃদয়শশির বিমল-কিরণ-চ্ছটায় তিরোহিত হইয়া যায়। বিষয়ের পিপাসা, প্রেমসুধাপানে চিরকালের জন্য মিটিয়া যায় এবং ভক্ত, চকোরের মত শ্রীভগবানের রূপ-সুধা পান করিতে করিতে ভাবসমাধি লাভ করে। এইরূপ ভাবসমাধি-লাভ প্রতিমাপূজন ভিন্ন অন্য কোন উপাসনাতেই সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কর্ম্মমীমাংসাদর্শন বর্ণিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন,—

"বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।"

অর্থাৎ যদি কর্ম্ম-যজ্ঞের বিষয়ে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, একসময়ে একদেবতা অনেক যজ্ঞে কিরূপে উপস্থিত হইতে পারেন, তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দেবতাগণের একই সময়ে বহু রূপ ধারণ করিয়া অনেক যজ্ঞে উপস্থিত হইবার শক্তি আছে। অতএব ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণানুসারে শ্রীভগবানেরও দেবতার রূপ ধারণপূর্ব্বক দর্শন দেওয়া সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই প্রতিমাপূজনের অষ্টম উপকারিতা।

(৯) সংসারে রাগদ্বেষই অনন্ত অশান্তি, দ্রোহ এবং দুঃখের কারণ। মায়ামুগ্ধ জীব আত্মার অনুকূল বস্তুর প্রতি রাগ এবং প্রতিকূল বস্তুর প্রতি দ্বেষ করিয়া, সংসারে অনন্ত দ্রোহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের মধুর মূর্ত্তিতে মনোভৃঙ্গ যখন দিবানিশি রত হইয়া যায়, তখন তাহার হৃদয় হইতে বৈষয়িক বস্তুর প্রতি রাগ একেবারেই তিরোহিত হয় এবং সাধক সমস্ত সংসারকে তাঁহারই রূপ বলিয়া যতই মনে করিতে থাকে, ততই তাহার হৃদয় হইতে পরকীয় দ্বেষ-বুদ্ধি বিগলিত হইয়া, তাহারই প্রিয়ধনের রূপবোধে জগজ্জনের প্রতি পবিত্র প্রেম-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানংকৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

শ্রীভগবান ভূতাত্মারূপে সর্ব্বভূতে নিবাস করিয়া থাকেন ইহা জানিয়া, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া, সম্মান এবং মৈত্রীভাবযুক্ত ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বরই জীবরূপে প্রতি ঘটে বিরাজমান। এজন্য মনে মনে বহুমানের সহিত সকল জীবকে প্রণাম করা উচিত। সাধনার উচ্চসোপানে আরোহণ করিলে, উপাসকমাত্রেরই হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বপ্রেমের প্রস্রবণ ফুটিয়া উঠে। তখন তাহার সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত, আমি-তুমি আত্ম-পর ভেদ-জ্ঞান আর থাকে না। সে সর্ব্বভূতে ভগবান ও সকল ইষ্টে নিজের ইষ্টজ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্রই প্রেম ও পূজাপরায়ণ হয়। ইহাই প্রতিমাপূজনের মধুরিমাময় চরম ফল এবং নির্ব্বিকল্প-সমাধি-প্রাপ্তির সোপানস্বরূপ। যে গৃহে এইরূপ প্রতিমাপূজন হয় এবং উপাসক শিরোমণি বিরাজমান হন, সে গৃহ দেবতার মন্দির হইয়া উঠে। তথায় অশুচি, অসদ্ব্যবহার, অশান্তি, অপ্রেম আদি আসুর-ভাবের কোন লক্ষণই প্রকাশিত হইতে পারে না। পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিই সম্মুখে জ্বলন্ত আদর্শ দেখিয়া পরস্পর প্রীতিপরায়ণ হয়। গৃহের বালকবালিকাগণ উপাসনার অনুষ্ঠান দেখিয়া, বালককাল হইতেই বিনা উপদেশে আস্তিকতা, ভগবদ্ভক্তি, শীলতা ও ভ্রাতৃপ্রেম আদি সদ্বৃত্তি সকল অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের কোমলহৃদয়ে অঙ্কিত উপাসনার বীজ কখনই নষ্ট হয় না। প্রতিমাপূজনের এই সকল অমূল্য উপকার কে অস্বীকার করিতে পারে? ইহাই প্রতিমাপূজনের নবম উপকারিতা।

(১০) সগুণ পঞ্চোপাসনার ন্যায় অবতারোপাসনার দ্বারাও সাধক অশেষকল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণাদি ভগবদবতারের মনোহারিণী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহাতে প্রাণ-মন সমর্পণ করিলে, সাধক অচিরে ভাব-সমাধি লাভ করিতে পারেন এবং ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, শক্তিলোক আদি দিব্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হ'ন।

এবং এইরূপে ভাবসমাধির পরিণামে নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স পদবীতেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অবতার-সমূহের প্রতি ভক্তি ও প্রেম, তাঁহাদের মধুর আদর্শ চরিত্রের শ্রবণ ও মনন দ্বারা, মানবচরিত্রের পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি, অলৌকিক চরিত্রাদর্শ, গৃহস্থজীবন-ক্ষত্রিয়জীবন-নৃপতি-জীবনের পরাকাষ্ঠা, একপত্নীব্রত, মর্য্যাদাপরায়ণতা, প্রজাবৎসলতা, ধর্ম্মভাব, সর্ব্বজীবহিতৈষিতা, ভ্রাতৃপ্রেম এবং সর্ব্বতোমুখিনী মধুরিমা উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক মনুষ্য, আদর্শ গৃহস্থজীবন লাভ করিতে পারে। ভগবতী সীতার লোকোত্তর চমৎকার মধুর চরিত্র, অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য এবং কঠোর তপস্যার দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রত্যেক নারীর হৃদয় দেবদুর্ল্লভ সতীত্বভাবে পূর্ণ হইতে পারে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণচরিত্র, অলৌকিক লোকলীলা, দিব্য-বিভূতির বিকাশ, অপূর্ব্ব ধীরতা, অদ্ভুত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মযোগের পূর্ণতা এবং সকল ব্যাপারেই নির্লিপ্ততা উপলব্ধি করিয়া, জীব পূর্ণতার দিকে অনায়াসেই অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপে শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহের উপাসনা দ্বারা জীব সকলপ্রকারে কল্যাণভাজন হয়। ইহাই প্রতিমাপূজনের দশম উপকারিতা।

(১১) দৈবী ও আসুরীশক্তি পরস্পরবিরোধিনী হওয়ায়, যে গৃহে শ্রীভগবানের দৈবীশক্তি প্রতিমার অবলম্বনে প্রকটিত হয়, তথায় আসুরী-শক্তি নিজের কুটিল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এজন্য দৈবীশক্তি-সম্পন্ন স্থানে প্রেত পিশাচাদির অত্যাচার এবং মহামারীর প্রকোপ হইতে পায় না। দৈবীশক্তির সাত্ত্বিকভাবের প্রভাব, উক্ত পরিবারের অন্তর-হৃদয়ে বিরাজিত থাকায়, পরিবারস্থ নরনারী সকলেই সচ্চরিত্র ও কুকর্ম্ম-রহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রতিমাকে জাগ্রত-দেবতা ও অন্তর্য্যামী মনে করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হন। উহাঁদের সঙ্কল্পের সহিত গৃহদেবতার সত্তা ও ভাবের সম্বন্ধ থাকায়, তাঁহারা প্রায়ই সকল কার্য্যে সফলমনোরথ হইয়া থাকেন। অনেক দৈবী বাধা ও বিপদ হইতে তাঁহারা রক্ষা পান। অনেক দুঃখকে তাঁহারই দেওয়া ও পরিণামে সুখকর মনে করিয়া তাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে শিখেন। গৃহে নিত্য ধূপ, দীপ ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির

প্রজ্বলন, হবন ও পুষ্পাদির দ্বারা গৃহের স্থূল বায়ু বিশুদ্ধ হয়; এজন্য রোগাদিও সেই গৃহে কম হইয়া থাকে। এইরূপে ঘরে ঘরে দেবমন্দির স্থাপিত হইলে, দেশের সমস্ত ধনধান্যাদি সম্পত্তি-সুষমার বৃদ্ধি, মহামারী নাশ ও নৈরোগ্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমষ্টিগত কুকর্ম্মজনিত কোনপ্রকার মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইলেও, দেশব্যাপী পূজার দ্বারা সুসংস্কার উৎপন্ন হইয়া, ঐ সকল দুঃখ ও ব্যাধিকে অচিরে ধ্বংস করিয়া থাকে। এইরূপে প্রতিমাপূজনের মহিমার অন্ত পাওয়া যায় না।

(১২) পরস্পর প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না ইহা একটী বিজ্ঞান-প্রতিপাদিত সত্য বিষয়। প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল দুই শক্তির সংঘর্ষে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং প্রকৃতির অনুকূল শক্তির আধিক্যে ক্রিয়ার স্থিতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। শাস্ত্রে প্রকৃতির অনুকূল শক্তিকে দৈবী-শক্তি এবং প্রতিকূল শক্তিকে আসুরী-শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইজন্য দেবতার জয়ে সংসারে শান্তি এবং অসুরের জয়ে অশান্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার পৌরাণিক অনেক বর্ণনা আছে। কূর্ম্মাবতারের সময়, দেবতা ও অসুর, উভয় শক্তির সংঘর্ষে সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল বলিয়াই লক্ষ্মী ও অমৃত আদির উৎপত্তি হইয়াছিল এবং কূর্ম্মরূপী ভগবানের সহায়তায় দেবতার জয় হইয়াছিল বলিয়াই সংসারের শান্তি রক্ষা হইয়াছিল। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি আমরা সংসারের সকল ব্যাপারের মূলেই দেখিতে পাই। এইজন্য মহর্ষিগণ ব্যষ্টি বা সমষ্টি জগতের যে ক্রিয়াতেই অপ্রাকৃতিক আচরণ হেতু আসুরীশক্তির বল অধিক দেখিতেন, সেই ক্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃতির অনুকূল ক্রিয়ার সংযোগ করিয়া দৈবী-শক্তির সহিত সামঞ্জস্যবিধান ও দৈবী-শক্তির বলবৃদ্ধির উপায় করিতেন এবং ঐরূপ করাতেই আসুরীশক্তির প্রভাব নষ্ট হইয়া, দৈবী-শক্তির বর্দ্ধিতপ্রভাবে সংসারে শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত। এখন বিচার করা যাউক যে, কি কি উপায়ের দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জগতে অপ্রাকৃতিকী আসুরীশক্তির বল বৃদ্ধি হয় আর কোন প্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা দৈবীশক্তির বল বৃদ্ধি করিয়া সেই আসুরী-প্রভাবকে নষ্ট করিতে পারা যায়। ব্যষ্টিদেহের স্বাস্থ্য ও নীরোগিতা কিরূপে সিদ্ধ হয়, এতদ্বিষয়ে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয়ে জীব-শরীর উৎপন্ন

হয়,এবং তাগাতে যে তত্ত্ব যে পরিমাণে থাকে, তাহার লাঘব-গৌরবে শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট এবং সামঞ্জস্যে নৈরোগ্য সিদ্ধি হয়। শরীরে জলীয় উপাদান যতটুকু থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, অধিক স্নানাদি দ্বারা যদি তাহার আধিক্য হয়, তবে কফ, জ্বর আদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ অগ্নির অংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, পিত্তের আধিক্য হইয়া নানাপ্রকার পিত্তজ-ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্বের সামঞ্জস্যেই বায়ু পিত্ত ও কফের সমতা হয় এবং তাহাতেই শরীর নীরোগ থাকে। পঞ্চতত্ত্বের বৈষম্যই বাত-পিত্ত-কফের বৈষম্য উপস্থিত করিয়া শরীরকে রোগগ্রস্ত করে। এতদ্ব্যতিরিক্ত যে প্রাণশক্তির দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সঞ্চালন এবং শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া ও পঞ্চতত্ত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, সেই প্রাণশক্তি যদি ব্রহ্মচর্য্যনাশ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি বৃত্তির অধীনতাপ্রযুক্ত হীনবল হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও শরীরে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া শরীরকে অচিরে কাল-কবলে নিপতিত করে। ব্যষ্টি দেহের সামঞ্জস্য-বিরোধী সমস্ত ক্রিয়াই আসুরী-ক্রিয়া এবং এই আসুরী-ক্রিয়ার ফলেই শরীর রোগগ্রস্ত হয়। সামঞ্জস্যের অনুকূল ক্রিয়াই প্রাকৃতিক এবং তদ্দ্বারাই শরীর-মন নীরোগ ও বলশালী হয়। এই সিদ্ধান্ত ব্যষ্টি-জগতের মত সমষ্টি-জগতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তদনুসারে সমষ্টি-জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডশরীরে যে যে পরিমাণে পঞ্চতত্ত্ব আছে, যদি কোন অপ্রাকৃতিক উপায়ে তাহার ব্যতিক্রম হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডশরীরেও নানাজাতীয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন —

বিরাট্ ধাতুবিকারেণ বিষমস্পন্দনাদিনা।
তদঙ্গাবয়বস্থাস্থ জনজালস্য বৈষমম্।
দুর্ভিক্ষাবগ্রহোৎপাতমানয়তি ॥

বিরাট বা ব্রহ্মাণ্ডশরীরের ধাতুর মধ্যে বিকার ও তত্ত্বের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হইলে, তদন্তর্গত জীবসকলের মধ্যেও চিন্তা উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লেগ, ধূমকেতুর উদয় এবং অন্তর্জাতীয় মহাসমর সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে পঞ্চতত্ত্বের সমতা-নাশকারী এইরূপ অপ্রাকৃতিক উপায় পৃথিবীর মধ্যে

সংঘটিত হইতেছে এবং এইজন্যই আজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কোথাও দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ, কোথাও লোকক্ষয়কর মহামারীর ভীষণ আক্রমণ এবং কোথাও বা জাতিধ্বংসকর মহাসংগ্রাম দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আসুরী-শক্তির প্রভাবে জীবের অন্তঃকরণের শান্তি নষ্ট হইয়াছে, রাগ দ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সত্য ও ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া মিথ্যা ও অধর্ম্মের কর্ম্মনাশা ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। কেবল কি উপায়ে পরকে প্রতারিত করিয়া ছলকপটের অবলম্বনে ধন ও বিষয়লালসার তৃপ্তি হয়, সেই জন্যই সমস্ত মনুষ্য দিবারাত্রি ভীষণ চেষ্টা করিতেছে। বাসনারও সীমা নাই, অশান্তিরও সীমা নাই। বাসনার অতৃপ্ত অনলে সমস্ত প্রেম, পবিত্রতা ও দৈবভাব ঘৃতের মত আহুতি প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগে শোকে, অনাহারে, সকলেই অবর্ণনীয় ব্যথায় আকুল হইয়াছে। সেই সকল অপ্রাকৃতিক উপায় কি, কি জন্য সামঞ্জস্য বিকৃত হইয়া আসুরী-শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা একটু ধীর হইয়া অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারি। এই যে সমস্ত সংসারে ধর্ম্মহীন, আস্তিক্যহীন, ভৌতিক বিজ্ঞানের (Godless material Science) বর্ত্তমান সময়ে অতিশয় প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ডশরীরে তত্ত্বের সামঞ্জস্য ইহার দ্বারা কিছুতেই রক্ষা হয় না। ইহা সমষ্টি প্রকৃতির সহযোগিতা না করিয়া বিরুদ্ধতাই করিয়া থাকে। যেমন মাতার স্তন্যপানের দ্বারা সন্তানের কল্যাণ হয়, কিন্তু স্তনে দন্তাঘাত করিয়া মাতৃরক্ত পান করিলে সে কল্যাণ হয় না, বরঞ্চ অকল্যাণই হয়, ঠিক সেই প্রকার ভৌতিক বিজ্ঞান, ব্যাপক প্রকৃতিমাতার কার্য্যের সহযোগিতা না করিয়া উহার বিরুদ্ধাচরণ করে বলিয়া, উহার ফলে মাতা জগদম্বিকা, সেই সদানন্দময়ী মূর্ত্তি পরিহার করিয়া রণচণ্ডীর বেশে সংসারের শান্তি ও শ্রী সমস্তই গ্রাস করিয়া থাকেন। সেই রণরঙ্গিনী শ্যামা, তখন বদন-ব্যাদান-পূর্ব্বক রণোন্মত্তা হন; জগতকে রণোন্মাদে উন্মত্ত করেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকে সংহার করেন। অপ্রাকৃতিক ধর্ম্মহীন বিজ্ঞানোন্নতির ফলে, বর্ত্তমান সময়ে এই সমস্ত অনর্থ সংঘটিত হইতেছে। সামান্য চিন্তাতেই দেখা যায় যে, দেশময় জল ও পৃথিবীর যে সম্বন্ধ প্রাকৃতিক ভাবে থাকা উচিত, জগন্নিয়ন্তার নিয়ম অনুসারে দেশে দেশে সেইভাবে নদীর আবির্ভাব হইয়াছে। নদী দেশের ততদূরেই প্রবাহিত হয়, যতদূরে প্রবাহিত হইলে দেশের

স্বাস্থ্য ও শস্য-সম্পত্তি ভালরূপে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই নদীর প্রবাহের গতিরোধ অপ্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা করা হয়, এবং নানাপ্রকার প্রণালিকা (canal) উৎপন্ন করিয়া পৃথিবীতত্ব ও জলতত্বেও সামঞ্জস্য নষ্ট করা হয়, তবে কিছুদিনের জন্য শস্য-সমৃদ্ধি দেখা যাইলেও, অল্পকালের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হইবে এবং দেশে ম্যালেরিয়া প্লেগ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া দেশকে ছারখার করিয়া ফেলিবে। বর্ত্তমান আধিভৌতিক বিজ্ঞানোন্নতির দিনে, এইরূপে নদীর গতিরোধের অন্ত নাই, প্রণালিকারও অন্ত নাই এবং রোগ, অশান্তি, দুর্ভিক্ষেরও অন্ত নাই। কিন্তু আমরা এমন অন্ধ যে, এ সব দেখিয়াও দেখি না, পরন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া জ্ঞানের অপলাপ করি মাত্র। এইরূপে বিচার করিলে আরও দেখিতে পাই যে, যেরূপ ব্যষ্টিশরীরের প্রাণশক্তির ক্ষয় হইলে শরীরে বলক্ষয়জনিত নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার সমষ্টি-শরীরের স্থূল প্রাণশক্তিরূপ তড়িৎ-শক্তি যাহা ব্রহ্মাণ্ড-দেহের সামঞ্জস্য, নৈরোগ্য, বল, সমৃদ্ধি এবং শস্যোৎপাদিকা ও ঔষধোৎপাদিকা শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য জগন্নিয়ন্তা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছে, তাহা যদি অপ্রাকৃতিক উপায়ে আকর্ষণ করিয়া অন্যকার্য্যে ব্যয় করা হয় অর্থাৎ উহার দ্বারা গাড়ী চালান, সংবাদ প্রেরণ করা, পাখা চালান, আলোকের কার্য্য প্রভৃতি লওয়া হয়, তবে ঐ কার্য্য উহা অবশ্য করিবে; কিন্তু অন্য কার্য্যে উহা ব্যয়িত হওয়ার জন্য, ব্রহ্মাণ্ডের সামঞ্জস্য রক্ষা উহা আর করিতে পারিবে না। যাহার ফলে ক্ষীণপ্রাণ ব্রহ্মাণ্ডে নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি, শস্যের নাশ, বীর্য্যনাশ, ধর্ম্মনাশ আদি অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। এইরূপে অপ্রকৃতিক উপায়ের অবলম্বনে আসুরী-শক্তির বৃদ্ধি ও দৈবী-শক্তির হ্রাস হইয়া সংসারে অনন্ত অনর্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার স্থূল সংসার এইরূপ বস্তু যে, এরূপ আসুর-ভাব বৃদ্ধিকর ব্যাপার উৎপন্ন না হইয়াই পারে না। এইজন্য প্রাচীনকালে মহর্ষিগণ অবশ্যম্ভাবী আসুরী-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে দৈবীশক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দৈবীশক্তির প্রভাব পুষ্ট করিয়া, সংসারে ধনসম্পত্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখ-শান্তি এবং ধর্ম্মভাবেরও বৃদ্ধি করিতেন। তাঁহাদের জ্ঞানোজ্জ্বলা বুদ্ধিপ্রভাবে ধনের সহিত ধর্ম্ম,

সম্পত্তির সহিত শান্তি, আধিভৌতিকের সহিত আধ্যাত্মিকের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইয়া, সমস্ত পৃথিবীকে অমরপুরীতে পরিণত করিত। তাঁহারা ভৌতিক বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা সংসারে যেরূপ ধন-ধান্য এবং স্থূল-সম্পত্তি লাভ করিতেন, ঠিক সেই প্রকার অপ্রাকৃতিক ব্যাপ্যারের দ্বারা উৎপন্ন আসুরীশক্তিকে দৈবীশক্তির প্রভাবে পরাস্ত করিয়া, দৈবজগতের এমন এক সম্পত্তি লাভ করিতেন, যাহার দ্বারা শান্তি, প্রেম, ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং নিঃশ্রেয়সের পথ রুদ্ধ হইত না। যেমন ভৌতিকবিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থানের দ্বারা আসুরভাবের পরিপোষণ হয়, ঠিক সেইরূপ দেশের প্রধান প্রধান স্থানে ভগবৎপীঠস্থাপন, বিগ্রহস্থাপন, মন্দিরস্থাপন, দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান, মন্দির ও তীর্থের জীর্ণোদ্ধার, নৈমিত্তিক তীর্থসমূহের উৎপাদন আদি ক্রিয়াদ্বারা দৈবভাবের পরিপোষণ হইয়া থাকে। এইরূপে দৈবীশক্তির কেন্দ্র যতই দেশে স্থাপিত হয় এবং ঐ সকল পীঠের দ্বারা যতই দেশে ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়, ততই দেশে আসুরভাবের পরাভব হইয়া মনুষ্যের মনের মধ্যে পবিত্রতা, ধর্ম্মভাব, শান্তি, আস্তিকতা, উপাসনা আদি দৈবভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দৈবীশক্তির প্রভাবের দ্বারা দেশে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অপগ্রহের উদয় ও সংগ্রাম আদি হইতে পারে না। বর্ত্তমান আধিভৌতিক উন্নতির দিনে আমাদের উল্লিখিত দেবাসুর-শক্তির সামঞ্জস্য করা অতীব প্রয়োজনীয় এবং তাহাতেই ধন ধর্ম্ম, শান্তি-সম্পত্তি, ভোগ-মোক্ষ সকলই আমরা প্রাপ্ত হইব। অন্যথা ধর্ম্মহীন বিজ্ঞানোন্নতির ফলে, বাসনার বৃদ্ধি, রাগদ্বেষের বৃদ্ধি ও নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইয়া সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিলে, যথার্থ সুখ, সংসার হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং অন্তর্জাতীয় ভীষণ সংগ্রাম পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়া সমস্ত সংসারকে রসাতলে প্রেরণ করিবে। ইহাই বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধুর মিলনের দ্বারা মণিকাঞ্চনযোগের একমাত্র উপায়। প্রতিমাপূজন ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সহিত এই মিলনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া প্রতিমাপূজনের উপকারিতা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিমার দ্বারা দৈবীশক্তির অধিষ্ঠান হইলে কিরূপে উল্লিখিত অশেষপ্রকার কল্যাণসাধন ও আসুরী-শক্তির দমন হয়, সেই বিষয়ে অথর্ব্ববেদে একটী মন্ত্র পাওয়া যায়,—

"ন ঘ্রংসস্তুতাপ ন হিমো জঘান প্রনভতাং পৃথিবী জীরদানুঃ
আপশ্চিদস্মৈ ঘৃতমিৎ ক্ষরন্তি যত্র সোমঃ সদমিৎ তত্র ভদ্রম্‌।

ইহার অর্থ এই যে, যেখানে (যত্র) প্রতিমানিহিত দৈবীশক্তি (সোমঃ) থাকে, সেখানে (তত্র) সদাই (সদমিৎ) কল্যাণ (ভদ্রং) হইয়া থাকে। সেখানে শিলাবৃষ্টি (হিমঃ) আঘাত করেনা (ন জঘান)। পৃথিবী শীঘ্র অন্ন উৎপন্ন করে (জীরদানুঃ) জলও (আপশ্চিৎ) উপাসককে (অস্মৈ) ঘৃতই (ঘৃতমিৎ) প্রদান করিয়া থাকে (ক্ষরন্তি)। হে সোম! তুমি আসুরীশক্তির নাশ কর (প্রনভতাম্‌)। এই প্রকারে সগুণে উপাসনা দ্বারা অনন্ত কল্যাণ লাভ করিয়া মুমুক্ষু সাধক, পরিণামে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা স্বরূপোপলব্ধি করিয়া পরমানন্দময় ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

গান।

(লালবাগ (মুর্শিদাবাদ) হরিসভার আহ্বানে, তত্রত্য জুবিলি হলে, পূজ্যপাদ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের অভিভাষণ উপলক্ষে—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্য-পুরাণতীর্থ কর্তৃক রচিত ও শ্রীযুক্ত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গীত।)

(১)

বাহার—চৌতাল।

এস দেশবাসী রঙ্গে সাগরসঙ্গমে,
ঐ অতীতকালের মন্ত্রনাদ উঠে বেদান্ত ডিণ্ডিমে,
সেই সিদ্ধ সাধনা ধীর ধারা বহিয়া,
আগত-মত-উপল শত বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘিয়া॥
লইয়া যুগ যুগের প্রমা, ফেলিয়া দেশ দেশের সীমা,
চাহি আপন লক্ষপথে, ভ্রমের দুকূল ভাঙ্গিয়া,
এসেছে মঙ্গল বার্ত্তা লয়ে রস আবেশে মাতিয়া॥
ভারতবর্ষ ত্যাগীর দেশ, কিসের দুঃখ কিসের ক্লেশ,
জপ ত্যাগের মন্ত্র সদা প্রেমের নৈবেদ্য দিয়া,
রাজিবে আর্য্যাবর্ত্ত আবার শান্তি সুখ লভিয়া॥

(২)

গৌরী একতালা।

তার আগমনী কি মধুর।
(আহা) ধীর ললিত কল পল্লায়িত স্থির গম্ভীর সুর।
(বল) কোথা হ'তে গান আসেরে নামিয়া
গীত রসে ধরা দেয় ভাসাইয়া।
ভেসে যায় কত সাধের নদীয়া
কত ডুবে শান্তিপুর॥
উঠে কত রোল যমুনা পুলিনে
কত রবে বাজে কত বাঁশী বীণে ;
মেরু পঞ্চনদে কত তপোবনে
উঠে হাবু হাবু সুর।
(কত) রাজমুকুট লোটে পদতলে
রাজ রাজসুতা ভাসে অশ্রুজলে।
(ভাবি) কে শুনে কে বলে কার কর্ণমূলে
সে গান বঁধুর॥
হ'লে অবতীর্ণ আগমনী গান
কত আরব মরুতে বহে প্রেম বাণ,
গানে ভেসে যায় কত প্যালেষ্টান,
নগর কানন পুর।
(এস) এ সন্ধ্যায় আজ কে গাহিবে গান
কে দিবে জীবন কে বিলাবে প্রাণ ;
তোল শুনি তান কেবা বর্ত্তমান
আছে এ ভারতে শূর॥

———

পুস্তকালয় স্থাপনের প্রয়োজন।

[শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যাবিনোদ।]

লক্ষণ ঃ—পুস্তকালয় এই শব্দ হইতে, এই অর্থ উপলব্ধি হয় যে, মানব-জাতির সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তৃতির সহিত হস্তলিখিত ও মুদ্রিত সাহিত্য-সম্ভার সংগ্রহপূর্ব্বক সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার স্থান।

ইতিবৃত্তঃ—ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ তাঁহাদের জীবনের উন্মেষ হইতেই বিদ্যার্চ্চনা করিতেন। তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রথম সাহিত্য বেদ। এই বেদের কলেবর অত্যন্ত বৃহৎ। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারিটি তাহার প্রধান ভাগ ও তন্মধ্যে এক সামবেদেরই সহস্র শাখা; অন্যান্য বেদগুলির শাখাও নিতান্ত কম নহে। এই বেদের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা জগৎপতি নারায়ণ। সৃজনকর্ত্তা লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই বেদ, নারায়ণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জগতে এই অমূল্য রত্ন বেদের প্রচার হয়। ঋষিরাই প্রথমে এই প্রকাণ্ড শাখা-বিশিষ্ট বেদগুলি রক্ষা করেন। যিনি যে বেদ রক্ষা করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাঁহারাই সেই বেদাংশের রচয়িতা বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বৃহদায়তন বেদ, তৎকালে শ্রুতিতে রক্ষিত হইত; তজ্জন্য ইহার অন্যতম নাম শ্রুতি। বিচারালয়ের চিঠি পত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বা গান লইয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের আরম্ভ। কিন্তু আমাদের আদি সাহিত্যরূপ বেদ, যদিও প্রথমে মুখে মুখে থাকিত, তথাপি উহা ক্ষুদ্র কবিতা বা শুধুই গান নহে, উহা আদি অকৃত্রিম পূর্ণ-জ্ঞানময় ও সত্যস্বরূপ। আমাদের সাহিত্য সত্য-জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে উদ্ভূত। কালধর্ম্মে সম্ভবতঃ যখন ঋষিগণের স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা এই বেদ লিপিবদ্ধ করেন, কিংবা ইহা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বুঝিয়াই লিপিবদ্ধ

বেলিয়াঘাটা লাইব্রেরীর ৩য় অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

করিয়া থাকিবেন। ঠিক যে কোন্ সময়ে এই বেদ প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারগণ দানপত্রাদি প্রস্তরে,তাম্র বা স্বর্ণাদি ফলকে লিখিয়া রাখিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন। সংহিতা সত্যযুগ হইতেই আছে। অতএব লিখিবার প্রথা সেই সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। 'ধর্ম্মসূত্র' গ্রন্থের সময় হইতে অর্থাৎ জৈমিনি ঋষির প্রাদুর্ভাব কালে, সম্ভবতঃ দ্বাপর-যুগে লিপিকরের নাম বাঁধাধরার মধ্যে পাওয়া যায়। এই দ্বাপরযুগে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেন এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ, উপপুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রেতা-যুগে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন; কিন্তু উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। পাণিনির ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারি যে, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেও লিপিপদ্ধতি বা কোন গ্রন্থ পত্রস্থ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। পাণিনির পূর্ব্বেও পটল, কাণ্ড,পত্র, সূত্র ও গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত ছিল। তাহা হইতে অনুমান হয়, পাণিনির পূর্ব্ব হইতেই বৃক্ষের বল্কলে, কাণ্ডে বা পত্রে লিপিকার্য্য সম্পাদিত হইত। সেই জন্যই গ্রন্থবিশেষের অংশের নাম পটল, পত্র, কাণ্ড ইত্যাদি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। আবার ঐ সকল বিভিন্ন পটল বা কাণ্ড অনেকগুলি একত্র গাঁথিয়া রাখা হইত বলিয়া, মূল পুথির নাম গ্রন্থ হইয়া থাকিবে। তালপত্র, ভূর্জপত্র ও তুলট কাগজ প্রভৃতিতে লিখিত বহু প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে। এমন কি একহাজার বৎসরের পূর্ব্বের তুলট কাগজের পুথিও পাওয়া গিয়াছে। তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিখিবার রীতি আজও এদেশে প্রচলিত আছে! "পুথি" যে গৃহে রাখা হইত তাহাকে "গ্রন্থ-কুটী" বলিত।

ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় দেখিতে পাই যে, দেবতাগণের মধ্যে ব্রহ্মাই আদি কবি। তাঁহার দুহিতা সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ব্রহ্মার পৌত্র ভৃগুর পুত্র দৈত্যাচার্য্য শুক্র কবি বলিয়া প্রথিত। দেবগুরু বৃহস্পতি অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ও বাগ্মিতায় প্রধান ছিলেন। শুক্র ও বৃহস্পতি উভয়েই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু নারদ তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক ছিল; রাজনীতিশাস্ত্রে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই

ছিলেন না; ভাষাসম্বন্ধে তিনিই একমাত্র মীমাংসক ছিলেন; সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। যাবতীয় বিদ্যা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে এবং শিবলোক অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে যে, দেবলোকের পুস্তকাগার বা জ্ঞানভাণ্ডার এই দুই স্থানেই ছিল, ইহা সুনিশ্চিত।

আমাদের দেশে আজকাল যে পদ্ধতিতে পুস্তক সংরক্ষিত হয় ও পুস্তকাগার স্থাপিত হয়, ঠিক এই পদ্ধতিতে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে পুস্তকালয় ছিল কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া অবধারণ করা যায় না। তবে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, ঋষি ও মুনিগণের আশ্রমমাত্রই যে এক একটী বিদ্যাভবন বা সাহিত্যাগার ছিল, তদ্‌বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ রাজচক্রবর্ত্তিগণের পুত্রেরাও তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিয়া বেদ-স্মৃতি-নীতি-দর্শন-কাব্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান-অস্ত্রবিদ্যা-কলাবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এবং যিনি ঋষিকুলপতি হইতেন, তিনি দশহাজার শিষ্যকে আহার ও বাসস্থান দিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। যে জাতি বিদ্যাদেবীকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া বসন-ভূষণ বাহন এমন-কি শারীরিক সৌন্দর্য্যকেও শ্বেতময় করিয়া আবাহন করিয়াছে, অবিদ্যা-মলিনতার রেখামাত্রের স্পর্শও সহ্য করে নাই, জগতের সেই আদি ও শ্রেষ্ঠ-জাতির যে সাহিত্য-সম্ভার ছিল না বা থাকিলেও তাহা রীতিমত বিচক্ষণতার সহিত সুসজ্জিতভাবে রক্ষিত ছিল না, তাহা নহে। এ সমস্তই ছিল; কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশে কালের কুটিল ঝঞ্ঝাবাতে, সে বৃহৎ জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অঙ্গহীন অবস্থাতেও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার গ্রন্থনকৌশল, রচনাভঙ্গী ও মানবচিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া এই বিংশ শতাব্দির সভ্য বলিয়া সুপরিচিত জাতিমাত্রেই জ্ঞান-লোলুপনেত্রে সেই জ্ঞানালোকের উজ্জ্বলতায় ঝলসিয়া যাইতেছে। উপস্থিত কলিযুগের ৫০১৯ বৎসর চলিতেছে। ইহার মধ্যে ভারতের বক্ষের উপর দিয়া নানারূপ ঝড়-ঝাপ্‌টা বহিয়া গিয়াছে। এই কালে আর্য্য বা হিন্দু-রাজত্ব, বৌদ্ধ-রাজত্ব, যবন বা মুসলমান-রাজত্ব চলিয়া গিয়াছে; এখন ইংরাজদিগের

বা খৃষ্টীয় রাজত্বের অধিকার চলিতেছে। আমরা কলির পূর্ব্ব যুগত্রয়ের ও কলির প্রথম অবস্থায় আর্য্য রাজত্বের সময়কার বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-নীতি-ব্যাকরণ-কাব্য-জ্যোতিষাদি সাহিত্যের খণ্ডিতাংশ ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই পাই না। তজ্জন্য সেকালে কি কিরূপ ছিল, তাহাও সঠিক জানিতে পারি না। পরন্তু বৌদ্ধ-রাজত্বের প্রাদুর্ভাব সময়ে, সহযোগী ও তৎপরবর্ত্তী হিন্দু-রাজত্ব সময়ের, আমরা অসম্পূর্ণ হইলেও সম্পূর্ণ-ভাবাপন্ন, ইতিহাস ও নিদর্শন দেখিতে পাই। তদ্দ্বারা আমরা জ্ঞাত হই যে, ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ বাটীতে পুথি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং ঐ গ্রন্থ আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ্‌বর্গ ও শিষ্য ব্যতীত আর কেহ দেখিবার সুযোগ পাইত না। আর বৌদ্ধদিগের বিহার অর্থাৎ মঠ ছিল; নানাস্থানে বিহার স্থাপিত হইয়াছিল; বিহারাধ্যক্ষ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী হইতেন; এই সকল বিহারের অধ্যক্ষের অধীনে পুস্তক সঙ্কলিত ও সংরক্ষিত হইত। বৌদ্ধদিগের নালন্দা বিহারের পুস্তক সংখ্যা অন্যান্য বিহার অপেক্ষা অধিক ছিল। যাঁহারা বিহারে থাকিতেন তাঁহারাই তথাকার সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন। জৈনগণ তাঁহাদের মঠেও পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। জগৎগুরু শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য চারিধামে সারদা, শৃঙ্গেরি প্রভৃতি যে চারিটি মঠ স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও পুস্তক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল। রাজারা বিদ্যাশিক্ষা ও প্রচারের জন্য বহু অর্থব্যয় করিতেন। কিন্তু রাজভবনে বা রাজতত্ত্বাবধানে পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ হইত কিনা ঠিক জানা যায় না। তবে ইহা বেশ জানা গিয়াছে যে, কি হিন্দুদিগের, কি বৌদ্ধদিগের, কি জৈনদিগের পুস্তকাবলী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা গুরুস্থানীয় মঠাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত।

ভারতের বাহিরে চক্ষু ফিরাইলে দেখিতে পাই যে, যে সময় ভারত জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত, সেকালে ঐ সকল স্থান নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ছিল। কলির প্রারম্ভের অল্প পরবর্ত্তি-কাল হইতে বর্ত্তমান ইজিপ্ট বা মিশরদেশ অতি ধীরভাবে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসরের কিছু পূর্ব্বে অথবা কলিপ্রারম্ভের এক হাজার বৎসরের সময় এই মিশরদেশ-বাসী, হাইরোগ্লাফিক অর্থাৎ পশুপক্ষিলিখনরূপ অক্ষর ব্যবহার করিত। তাহার পর, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ শতাব্দিতে ইহারা প্যাপিরাস্ নামক চারাগাছ হইতে

একরূপ কাগজ তৈয়ারী করে। সম্ভবতঃ এই প্যাপিরাস্ হইতেই ইংরাজি "পেপার" শব্দের উৎপত্তি। এই কাগজ তৈয়ারীর সঙ্গে, প্রকৃতপক্ষে এদেশে পুস্তক লিখিবার যুগ আসে। দেবমন্দির ও রাজাদিগের "কবর খানায়" তাহারা গ্রন্থ রক্ষা করিত। দেবালয়ে পুস্তকাগার ও বিদ্যাচর্চ্চার স্থান ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪ শতাব্দিতে (Osymandas) ওসম্যানডস্ রাজার নামমাত্র পুস্তকালয়ই তৎকালের প্রধান পুস্তকাগার বলিয়া পরিচিত ছিল। পারসিক আক্রমণে এ দেশের সাহিত্যের একরূপ বিনাশ সাধন হয়।

এসিয়ার অন্তর্গত ব্যাবিলন প্রদেশের পুস্তকালয় অতি প্রাচীন। ইতিহাসে এই দেশের অস্তিত্ব খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ শতাব্দি হইতে পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৩৮০০ শতাব্দিতে এগাডির রাজা প্রথম সারগণের রাজত্ব কাল। খৃঃ পূঃ ২০০০ শতাব্দিতে সারগণের পুস্তকাগারের পুস্তকতালিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

অসুববনিপালের রাজত্ব সময়ে প্রকৃতপক্ষে (Assyria) এসিরিয়ার পুস্তকালয়ের উদ্ভব হয়। এই পুস্তকালয়ে যে সাহিত্য ছিল, তাহা মৃৎফলকে লেখা ; এবং প্রত্যেক মৃৎফলকে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া সুন্দররূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পুস্তকের পর পুস্তক সাজাইয়া রাখা হইত। খৃঃ পূঃ ৩০০০ শতাব্দি হইতে এসিরিয়ার নাম ইতিহাসে প্রকাশ।

এসিরিয়ার পর ইউরোপ খণ্ডে গ্রীক্-দেশের অভ্যুদয় হয়। গ্রীকদিগের মধ্যে (Pisistratus) পিসিস্ট্রেটাস্ সর্ব্বপ্রথমে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দিতে (Aulus Gellius) আউলাস্ গেলিয়স্ সর্ব্বপ্রথম সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। এ জনরব সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। ইহার পর রোম অভ্যুত্থিত হয়। রোমানগণ প্রথম আমলে যুদ্ধবিগ্রহই বুঝিত, বিদ্যাচর্চ্চা করিবার খেয়াল রাখিত না। এমন কি খৃঃ পূঃ ১৪৬ শতাব্দিতে কারথেজ' অধিকার করিয়া তাহারা তথাকার যে পুস্তকাগার পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল (mago) ম্যাগো লিখিত কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য রাখিয়া সমুদায় পুস্তক আফ্রিকার রাজাকে বিক্রয় করিয়াছিল। তৎপরে খৃঃ পূঃ ৬৭ বর্ষে (Lucullus) লুকুলাস পূর্ব্বদেশ হইতে জয়লব্ধ মূল্যবান গ্রন্থরাজি আনয়ন করিয়া স্বীয়

বন্ধুবর্গ ও পণ্ডিতগণকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। জুলিয়াস্ সিজারের বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রোমনগরে বহু সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন করা। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হইয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। (Pliny and ovid) প্লিনি ও ওভিড ইহারাই সাধারণের উপকারার্থ সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। খৃঃ পূঃ চতুর্থ বর্ষে রোমনগরে ২৮টি সারারণ পুস্তকাগার পরিদৃষ্ট হয়। ইহার পর রাজা কন্‌স্ট্যান্‌টাইন্ স্বীয় রাজত্বে কন্‌স্ট্যান্‌টিনোপল নগরে এক রাজকীয় পুস্তকালয় স্থাপন করেন। এইরূপে প্রতীচীতে ক্রমশঃ পুস্তকাগার স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সকল দেশে অনেকবার অনেক পুস্তকালয় অগ্নিমুখে ভস্মীভূত হইয়াছে। তজ্জন্য বহু পুস্তক নষ্ট হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলির একরূপ উদ্ধার সাধন হইয়াছে।

ব্যাবিলন্, আসিরিয়া ও মিশর প্রভৃতির অভ্যুদয় কালে মৃৎফলক ইষ্টক (অর্থাৎ পোড়ামাটি), ও প্যাপিরাস নামক গাছ হইতে প্রস্তুত কাগজে পুস্তকাদি লিখিত হইত। ইহা ব্যতীত প্রস্তরেও খোদিত হইত।

এই গেল প্রতীচীর প্রাচীন-যুগ। তার পর মধ্য-যুগ। এই যুগেও প্রকৃতপক্ষে পুস্তকালয় ইউরোপখণ্ডে সংস্থাপিত হয় নাই। এই সময়ে (monastary) ধর্ম্মমন্দিরে খৃষ্টান সন্ন্যাসিদিগের অধীনে লিপিবদ্ধ ও নকল করিয়া পুস্তক সংগৃহীত হইত; এবং কোথাও বা রাজকীয় পুস্তকাগার থাকিত; কিন্তু এগুলি সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিত না। ইহা ব্যতীত অনেকে নিজের সখে পুস্তকালয় রাখিতেন। তারপর নব্যযুগ। প্রতীচ্যখণ্ডে এই যুগেই প্রকৃত প্রস্তাবে পুস্তকালয় স্থাপিত হয়, এবং এই যুগই তাহার গৌরবের যুগ। খৃষ্টীয় ১৪ শতাব্দি ইউরোপখণ্ডে সাহিত্যালোচনার পুনর্জন্মকাল। ১৮৬৫ খৃঃ অঃ যে তালিকা বাহির হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে ফরাসা নগরীর সংগৃহীত পুস্তক অন্যান্যদেশ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। এক্ষণে কি ইউরোপ, কি আমেরিকা, কি গ্রেট্‌ব্রিটন্ পুস্তক সংগ্রহের জন্য লোলুপ। এক্ষণে কোন্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

এই প্রতীচীর নবীন যুগ ধরিয়া ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে

দেখিতে পাই যে, মরণোন্মুখ ভারতবাসী প্রাচীনকালের ন্যায় আজও ভারতীর আদর ভুলে নাই। এখনও পুস্তক তাহাদের উপাস্য দেবতা। আজও ভারতের নানাস্থানে কোন না কোন পুথির নিত্যপূজা হইতেছে। আর আজও সেই প্রাচীনভাবে ভাবিত হইয়া মাঘ মাসে সরস্বতীপূজার দিন কি ধনী কি দরিদ্র, গৃহস্থমাত্রেই তাহাদের সংগৃহীত পুস্তকগুলিকে বেদ-বিদ্যারূপিণী অজ্ঞানান্ধকারনাশিনী শব্দরূপিণী বীণাপাণীরূপে ভক্তিভরে অন্তরের সহিত পূজা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষের মঠগুলিতে ও নালন্দা প্রভৃতি বিহারের গ্রন্থ-কুটীতে ভারতবাসীর অসীম জ্ঞানরত্ন স্তূপীকৃত ছিল। মুসলমানের আক্রমণে বিহারগুলির সেই অমূল্য বৌদ্ধ গ্রন্থালয় ও হিন্দুদিগের গ্রন্থরাজি বিধ্বস্ত হয়। মুসলমানগণের করালগ্রাস হইতে যে সকল বৌদ্ধগণ পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণতুল্য ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া নেপালে পলাইয়াছিলেন। এখনও নেপালে সেই সকল প্রাচীন পুথি বর্ত্তমান। হিন্দুদিগের গ্রন্থরাজি কোথাও মুসলমানগণের হস্তে আর কোথাও বা পর্টুগীজ প্রভৃতি জাতির হস্তে ধ্বংস হইয়াছে।

মুসলমানদিগের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ভারতের ভারতীর যে কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 'তারিখই ফিরিস্তা' পাঠে জানা যায়, ফিরোজ তোগলকের নগরকোট আক্রমণকালে জ্বালামুখীর মন্দিরে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থকুটী ছিল। তন্মধ্যে ফিরোজ ১৩০০ হিন্দু পুথি পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে তিনি দর্শন, গণিত জ্যোতিষ ও জাতক সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। সম্রাট আকবর সাহের একটী বৃহৎ পুস্তকাগার ছিল ; তাহা সাত খণ্ডে বিভক্ত ছিল ; সেগুলি গদ্য, পদ্য, হিন্দি, পারসী, গ্রীক, কাশ্মীরী, আরবী ইত্যাদি পৃথক্ বিভাগে সজ্জিত ছিল। টিপু সুলতানেরও একটি গ্রন্থাগার ছিল। আধুনিককালে হিন্দু রাজারা প্রায় সকলেই এক একটি গ্রন্থকুটী রাখিয়াছেন। দেখা যায়, ইহাদিগের মধ্যে নেপাল রাজের গ্রন্থকুটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রন্থে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থাগার যেমন বৃহৎ ও প্রশস্ত তেমনই সুসজ্জিতভাবে গ্রন্থরাজি রক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে মহামহো-

পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই ; শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ প্রভৃতি ৪ জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি নেপালের ঐ গ্রন্থাগারের পুস্তকের তালিকা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ৫ মাস প্রত্যহ ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও অর্দ্ধেক পুস্তকের তালিকাও প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন নাই। এই পুথি সমস্তই তাল, তাড়ী প্রভৃতি পত্রের উপর হস্তে লিখিত।

উপস্থিত ইংরাজ রাজের অনুগ্রহে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই হয় রাজকীয়, অথবা স্থানীয় লোকচেষ্টায় স্থাপিত পুস্তকাগার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন-- কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরী, সাহিত্যপরিষদ্ প্রভৃতি। এই সকল সাধারণ পুস্তকাগার ব্যতীত গ্রন্থপ্রিয় অনেক ব্যক্তির নিজ নিজ ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তকাগার আছে। এক্ষণে পুস্তক মুদ্রিত হওয়ায় পুস্তক সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্য-মস্তিষ্ক প্রসূত হস্তলিখিত রাশি রাশি অমূল্য গ্রন্থরাশি প্রায় প্রতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পর্ণকুটীরে অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে।

গ্রন্থাগার-পুস্তকরক্ষা-পাঠক-গ্রন্থরক্ষক ও নিয়ম ঃ—

কি স্বকীয় কি সাধারণ পুস্তকালয় রাখিতে হইলে শুধু পুস্তক সাজাইয়া রাখিলেই যে কার্য্য শেষ হইল তাহা নহে, পাঠকের সুবিধা ও আরামের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। পুস্তকাগার বেশ প্রশস্ত, উত্তম আলোকযুক্ত এবং অবাধ বায়ু সঞ্চালনের উপযুক্ত হওয়া চাই। তাহাতে পাঠক আরামের সহিত বসিয়া নিজ কার্য্য করিতে পারেন এরূপ আসন থাকা আবশ্যক। স্বনামধন্য কৃতবিদ্য মহাত্মাগণের চিত্রাদি দ্বারা ভিত্তিগাত্র সুসজ্জিত করা উচিত। তাহাতে পাঠকের হৃদয়ে ঐ সকল মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত সৎমার্গে ধাবিত হইবার অভিলাষ জন্মিতে পারে। গ্রন্থাগার সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ প্রয়োজন। পুস্তকগুলিকে ধর্ম্ম, ইতিহাস বিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া ও প্রত্যেক পুস্তক সংখ্যাবদ্ধ করিয়া ভাল করিয়া বাঁধাইয়া খোলা বা বদ্ধ 'তাকে' (আলমারি প্রভৃতিতে) সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিতে হয় ও তাহাদের একটি তালিকা করিয়া রাখিতে হয় ; কারণ পাঠক কোন পুস্তক চাহিবা মাত্র গ্রন্থরক্ষক তালিকা দৃষ্টে অনতিবিলম্বে সেই পুস্তক

যেন পাঠকের হস্তে দিতে পারেন। পুস্তকগুলি এমনি সযত্নে রাখিতে হয় যেন উহা গুমিয়া না যায়, উই কিংবা অন্য কীট না কাটিয়া ফেলে; এই জন্য মাসে অন্ততঃ দুই বার পুস্তকগুলি ঝাড়া দরকার। গ্রন্থরক্ষক ও পাঠক উভয়েই সতর্ক থাকিবেন, যেন তাঁহাদের অনবধানে পুস্তক ছিঁড়িয়া না যায় বা কোনরূপে নষ্ট না হয়। গ্রন্থাগারে যে সকল পুস্তক থাকে উহার মধ্যে কি বিষয় আছে তৎসম্বন্ধে গ্রন্থরক্ষককে জানিয়া রাখিতে হয়; কারণ তাঁহার নিকট কোন আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রশ্ন করিলে তিনি যেন যথাযথ উত্তর দিতে পারেন; এই জন্য বিদ্বান ব্যতীত গ্রন্থরক্ষক হইতে পারেন না। সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী গ্রন্থরক্ষকই সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ। গ্রাহক বা পাঠককে অভিমত পুস্তক বাহির করিয়া দেওয়া তাঁহার প্রকৃত কার্য্য নয়; তাঁহার প্রকৃত কার্য্য, কোন্ পুস্তকে কি বিষয় আছে তাহাই বলিয়া দেওয়া। অকারাদিক্রমে পুস্তকের তালিকা রাখাই যুক্তিযুক্ত; যেহেতু তাহাতে অভিমত পুস্তক শীঘ্রই বাহির করা যায়।

সাধারণ গ্রন্থাগার রাখিতে হইলে উহার পরিচালনার জন্য একটি সভা রাখা আবশ্যক ও তাহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য কতকগুলি নিয়মের অধীন হইতে হয়। গ্রাহক ও সভ্যগণ যাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া গ্রন্থাদি পান ও নিয়মের বাধ্য থাকিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত পুস্তকালয়ের কার্য্য সমাধা করিবার উপযুক্ত সুযোগ পান, তদ্বিষয়ে পরিচালক সভার সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। সভ্যগণেরও যথাবিধি নিয়মিত সময়ে চাঁদা দেওয়া কর্ত্তব্য ও যাহাতে গ্রন্থাগারের উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে আগ্রহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

সাহিত্য সংগ্রহ ও রক্ষার প্রয়োজন ঃ—

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, সাহিত্য না থাকিলে জাতির উন্নতি থাকে না। যে কালের যে সাহিত্য, তাহা হইতে সেই সেই কালের সেই সেই দেশের রীতিনীতি ধর্ম্ম অবস্থা সমস্ত ঘটনা জানিতে পারা যায়। মানবজীবনের উন্নতি অবনতির ইতিহাস রাখিতে হইলে বা জানিতে হইলে, প্রাচীন সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। মানবজাতির ইতিহাস বা জগতের ইতিহাস জানিতে চাহিলে, সাহিত্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পৃথিবীতে কত জাতি উঠিয়াছে, কত জাতি গিয়াছে, কত 'ওলোটপালট'

হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের একমাত্র সাক্ষ্য সাহিত্য। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নব সাহিত্যের পুষ্টি করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি আমরা এই সাহিত্যরূপ ইতিহাস পূর্ণাঙ্গেই হউক বা খণ্ডিতাঙ্গই হউক না পাইতাম, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অমৃতময় কীর্ত্তিগাথা এবং অনার্য্যজাতিগণের ইতিহাস লইয়া আজ আলোচনা করিতে সমর্থ হইতাম; কিংবা আমরা কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছি তাহাই জানিতে পারিতাম? আর তাঁহাদের কাহিনী আলোড়ন করিয়া আমরা কতদূর অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছি ও হইতেছি তাহা কি বুঝিতে পারিতাম? ইহা ব্যতীত আধুনিক আর্য্যেতর জাতি, যাহারা এক্ষণে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া প্রভুত্ববিস্তার করিতেছে, তাহারা কি উপায়ে, কি নীতিতে, কি বিজ্ঞানবলে আজ প্রাচীনতম আর্য্যজাতির বংশধরগণকে অতিক্রম করিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে এবং স্ব-পদে দাঁড়াইতে হইলে তাহাদের সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এই আলোচনা করিতে হইলে তাহাদের সাহিত্য সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, কি স্বদেশের কি বিদেশের সকল স্থানের সাহিত্য-সংগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন। এই সংগ্রহ কার্য্য যেমন শ্রমসাধ্য, তেমনই অর্থসাধ্য। কর্ম্মাধীন জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জগতে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং মানবমাত্রেই ধনী হয় না। আবার ধনী হইলেই যে জ্ঞান অন্বেষণেচ্ছু হইবে তাহা নহে; কিংবা নির্ধনী হইলেই যে জ্ঞানার্জ্জনেচ্ছু হইবে না তাহা নহে। প্রবৃত্তি কর্ম্মমুখাপেক্ষী; অতএব মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি জ্ঞানসুধাপানেচ্ছু হইলেও অর্থাভাবে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে না; তাহাদের পক্ষে সাধারণ গ্রন্থকুটী বড়ই উপকারী। তাহারা অল্প অর্থব্যয়ে এক স্থানে নানা ভাবের বহু গ্রন্থ একত্র পাঠ এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার সুযোগ পান; তাহাতে তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; এবং ঐ জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক উপকার সাধন করিতে পারেন। যাঁহারা ধনী, তাঁহাদের পক্ষে সাধারণ পুস্তকাগার বিশেষ কোন আবশ্যক নাও হইতে

পারে, কারণ তাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থাগার করিতে পারেন ও নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধা দেখা যায়। তিনি যে ভাবের সাধক, সেই ভাবের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তিনি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিষয়ান্তরে তাঁহার দৃষ্টি অর্গলবদ্ধ হইয়া থাকে; আরও অল্প খরচায় যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত, সেখানে বহু ব্যয় হয়। ঐ অর্থেরি সাহায্যে আরও কত উপকার সাধিত হইতে পারিত। সাধারণ গ্রন্থাগারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভাবুকের সমাগম হয়। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট-বিষয়ে জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন; এবং পরস্পরের মধ্যে স্বকীয় বিষয়ের অবতারণা করেন। তাহাতে পরস্পরের ভাবের বিনিময় হয়, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়; এইরূপে একাধারে ভাবের সর্ব্বাঙ্গ-গঠন হইবার অনুকূল সুবিধা পাওয়া যায়। এস্থানে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য ভদ্র-মহোদয়গণের সমাগম হয়; তাঁহাদের ব্যবহারাদি দেখিয়া সাধারণ লোক সুসভ্য হইবার সুযোগ পায়। এখানে আর এক প্রকার সুবিধা আছে; সর্ব্বপ্রকার সংবাদপত্র একত্র পাওয়া যায়। সকলের পক্ষে, এমন কি বড়-লোকের পক্ষেও, সকল প্রকার সংবাদপত্র লওয়া সম্ভব হয় না। একজন ধনী একেলা কত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, তাঁহার ব্যয়ের সীমা আছে; কাজেই তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহ সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে স্থানে সাধারণের চাঁদায় পুস্তক সংগ্রহ হয়, সেখানে অর্থ সীমাবদ্ধ নহে। এখানে ধনীর ভাণ্ডার না হইলেও পাঁচজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ ধনীভাণ্ডারের অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে, এই জন্য অধিক পুস্তক সংগৃহীত হয়; সুতরাং সীমা আবদ্ধই থাকে। শাস্ত্রে বলে "গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ"; যাহার নিকট বহু গ্রন্থ আছে তিনি পণ্ডিত। প্রকৃতই যত অধিক গ্রন্থ পাঠ করা যায় তত জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। গ্রন্থাগারে নানাবিষয়ক পুস্তক থাকায় সকল প্রকার ভাবুকেরই উপকারে আসে। সাধারণ গ্রন্থাগার কৃতবিদ্য বিদ্বানগণের ও প্রত্নতত্ত্বানু-সন্ধানপরায়ণ ব্যক্তিগণের যে কত উপকারে আসে তাহা বলা যায় না। আর এক কথা, যদিও গ্রন্থাগারের সভ্যদিগের মানসিক বৃত্তি অনুসারে পুস্তক ক্রীত ও সংগৃহীত হয়, তথাপি পাঁচজন পণ্ডিতে বিচার করিয়া পুস্তক

সংগ্রহ করায় অশ্লীল ও নীতিশূন্য অসার নিকৃষ্ট পুস্তক উপেক্ষিত হয়; আর ধর্ম্মোদ্দীপক ও নীতিপূর্ণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি সংগৃহীত হয়। তাহার ফলে এই উপকার হয় যে, পাঠকবর্গ ঐ উত্তম উত্তম গ্রন্থরাজি পাঠ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তিগুলিরই স্ফুরণ হয় ও নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি স্বতই হীন হইয়া যায়, এবং জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় কলুষবৃত্তি কি তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাহা অসার বুঝিয়া বর্জন করিতে সমর্থ হয়। এস্থানে নব্য গ্রন্থকার বহুজনসমক্ষে শীঘ্র পরিচিত হইবার সুবিধা পান। আবার হয়তো কোন গ্রন্থকারের লুপ্তপ্রায় একখানি মাত্র গ্রন্থ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান; সে স্থলে সে গ্রন্থকারের পূর্ণ মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা; কিন্তু সেই গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকায় গ্রন্থকারের তো মৃত্যু হইল না পরন্তু পুনর্মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থকারের পুনর্জ্জীবনের আশা রহিল। এইরূপ সাধারণ পুস্তকাগারের আর এক উপকারিতা আছে। বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, অনেকে একত্র মিশিবার সুযোগ পান, এবং তাহাতে পরস্পরের মধ্যে মেলা মিশা হইয়া সৌহার্দ্দ্য জন্মায়। আর নানা প্রকৃতির লোকের সমাগম হওয়ায় প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য ও দোষ-গুণ পরিলক্ষিত হয়; তাহাতে মানব-প্রকৃতি বুঝিবার সুবিধা হয়, এবং নিজের দোষের সংশোধন হইবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় এইরূপে পুস্তকাগারের অভাবে স্থান-বিশেষে জনসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত জন্মায় এবং তজ্জন্য দেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এইরূপ গ্রন্থাগার থাকিলে বিদ্যাচর্চ্চার উৎসাহ বাড়ে এবং সাধারণের মধ্যে পুস্তক পড়িবার আগ্রহ জন্মায়। যতই লোক শিক্ষিত হইবে ততই জ্ঞানের বিস্তার হইবার আশা করা যায়, এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফল, দেশের উন্নতি সম্ভাবনা।

গ্রন্থই মানবের জ্ঞানভাণ্ডার। সাহিত্য জাতির বা মানবের প্রাণ। অতএব-সাহিত্য সংগ্রহ, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করা ও তাহা রক্ষা করাই মানবের মানবত্ব। এই সমস্ত আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থকুটী স্থাপনা অত্যাবশ্যক ও মহৎকার্য্য।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল কর্ত্তৃক উত্তরাখণ্ডে জীর্ণোদ্ধার।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মই একমাত্র প্রেয় ও শ্রেয়ঃ। হিন্দুর অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম-কার্য্য-সমূহের মধ্যে তীর্থপর্য্যটন অন্যতম প্রধান কার্য্য এবং হিন্দু-তীর্থ-সমূহের মধ্যে দেবতাত্মা হিমগিরির উত্তরাখণ্ডের তীর্থই, তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। অতীতযুগে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, "তীর্থযাত্রী ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, শেষে উত্তরাখণ্ডের তীর্থ দর্শন করিবে। যে পর্য্যন্ত সে উত্তরাখণ্ড দর্শন না করিবে, ততদিন সে তীর্থদর্শনের পূর্ণফল প্রাপ্ত হইবে না।" একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ঋষিদের এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। নগরাজ হিমালয় পৃথিবীর সকল পর্ব্বতের শিরোমণি। হিমালয়ের তুষার-শুভ্র গগনস্পর্শী তুঙ্গ-শৃঙ্গ, তাহার বিরাটবপু, তাহার বক্ষ-প্রবাহিত ত্বরিতগমনা নদীর কলকল সুমধুর নিনাদ, তাহার অমূল্য দিব্য ওষধি-সমূহ, ও সর্ব্বোপরি তাহার সেই মুনিমনোহারী স্বর্গীয় সুষমারাশি বিশ্বসৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। দৈবী-রাজ্যে শ্রদ্ধাবান আর্য্যসন্তান, পৃথিবীর মধ্যে হিমালয়কেই দৈবী-কেন্দ্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। উত্তরাখণ্ড সেই পবিত্রোজ্জ্বল হিমালয়ের হৃদয়-স্থান বলিয়াই তাহার এত পবিত্রতা।

ঐ উত্তরাখণ্ডের বহু তীর্থের মধ্যে, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদরীনাথ, এই তীর্থত্রয় প্রধান ও পবিত্রতম। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর অতি আদরের বস্তু এই তীর্থগুলির সংস্কার বড়ই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুর বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল ঐ তীর্থ কয়টির জীর্ণোদ্ধারের জন্য বহু যত্ন ও অদম্য পরিশ্রম করিয়াছেন।

তন্মধ্যে গঙ্গোত্রী তীর্থ টিহরী রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া উহার মন্দিরের সংস্কারের উদ্দেশ্যে শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সহিত টিহরী রাজদরবারের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। টিহরীর বর্ত্তমান মহারাজ বয়সে যুবক হইলেও, তাঁহার

পরলোকগত ধর্ম্মপ্রাণ পিতৃদেবের যোগ্য পুত্র। এই জন্য মহামণ্ডল তাঁহার নিকট হইতে ঐ সংস্কার কার্য্যে, সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা
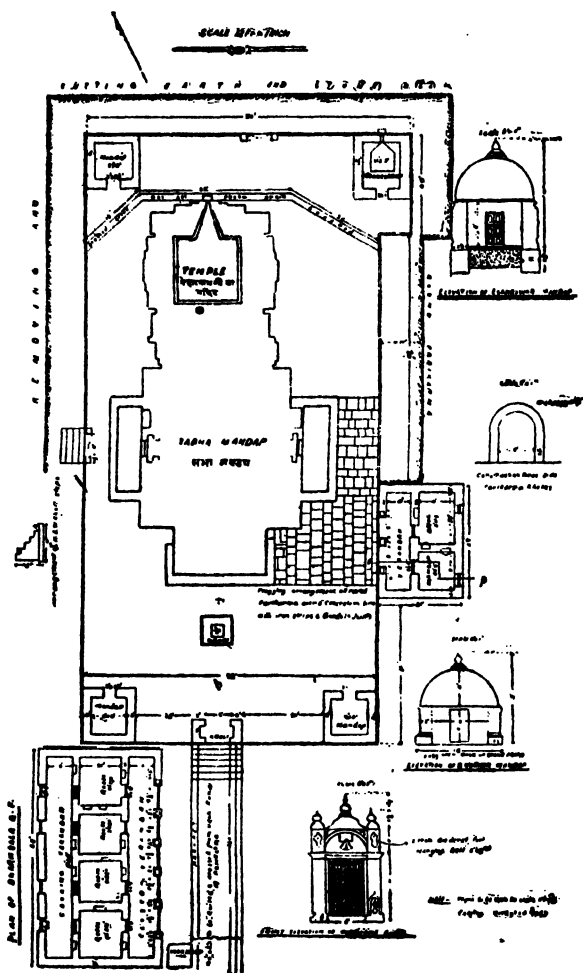
প্রথম চিত্র।

করেন। এতদ্ভিন্ন ঐ কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, মহামণ্ডল হইতে জয়পুর নরেশের নিকট এক "ডেপুটেশন" প্রেরিত হইয়াছিল।

তাহাতে গঙ্গাদেবীর পরমভক্ত-সন্তান জয়পুরাধিপতি ঐ ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে আশা হয় যে, আমাদের অতি আদরের পবিত্র-তীর্থ গঙ্গোত্রীর জীর্ণোদ্ধার কার্য্য অবিলম্বেই সুসম্পন্ন হইবে।
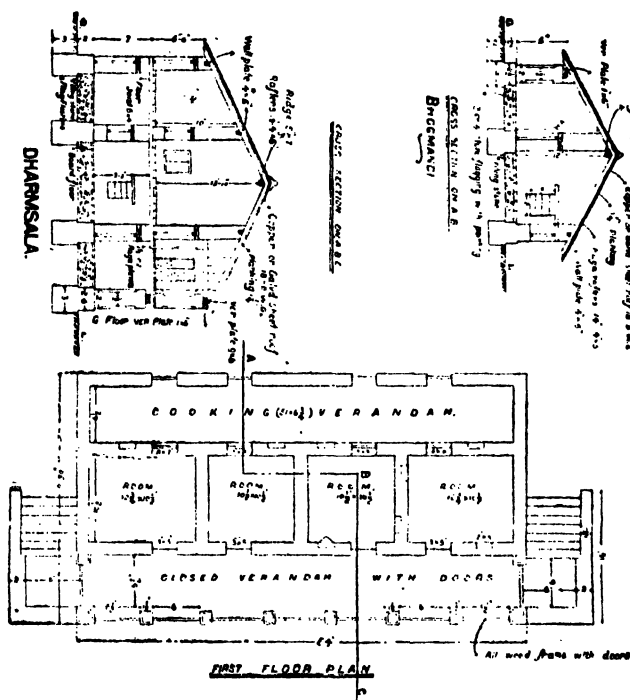
DHARMSALA.
ধর্ম্মশালা

দ্বিতীয় চিত্র।

শ্রীশ্রীকেদারনাথের প্রধান মন্দিরও সংস্কারাভাবে বহুদিন হইতে অতীব জীর্ণ এবং সভামণ্ডপ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হইয়াছে। অতীব আনন্দের বিষয় যে, শ্রীমহামণ্ডলের চেষ্টা ও যত্নে, হিন্দু-রাজ-কুল-সূর্য্য, উদয়পুরাধিপ, কেদারনাথের মন্দিরাদির সর্ব্বপ্রকার জীর্ণোদ্ধারের ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সমগ্র হিন্দুজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই

মহামণ্ডলের উপদেশানুযায়ী প্রধান মন্দিরের সংস্কার, সভামণ্ডপ, পরিক্রমা ও সিংহদ্বারাদির পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। *

শ্রীবদরীনাথতীর্থের সংস্কারের সুব্যবস্থার জন্য গাড়োয়ালের লোকপ্রিয় সুযোগ্য ডেপুটি কমিশনার মাননীয় জে, এম, ক্লে, আই-সি-এস, ও-বি-ই, মহোদয়ের অসীম অনুগ্রহে একজন সুযোগ্য ম্যানেজার মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে তথায় প্রেরিত হইয়াছে; তিনি সুন্দরভাবে দেব-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

শ্রীবদরীনাথক্ষেত্রে শীতের অত্যধিক প্রাবল্য বশতঃ বৎসরের সকল সময় তথায় লোক বাস করিতে পারে না বলিয়া, শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য উহার কিছু নিম্নদেশে "জোশীমঠের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক্ষণে যে স্থানে "জোশীমঠ গ্রাম", ঐ স্থান বদরীনাথের স্থায়ী আবাসভূমি। রাওল মহোদয় ও দেবপুরোহিতগণ শীতঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন, আবার গ্রীষ্মের উদয়ে বদরীক্ষেত্রে যাইয়া দেবমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া থাকেন। ঐ সময় বদরীক্ষেত্র, দেবলোকের লীলাস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যে সময় অত্যাচার, অনাচারের ঘনমেঘে ভারতের ধর্ম্মগগন আচ্ছন্ন, ভারতের বৈদিক ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া যখন হিন্দু নিজ জাতি-কুল-মান বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই দুর্দ্দিনে দৈবী-কৃপাবশে ধীরে ধীরে ভারতের ধর্ম্মাকাশে শিবাবতার ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারই অসীম কৃপাবলে ভারত-সন্তান এখনও তাহার জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভগবান শঙ্কর, অতীতের সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে আবির্ভূত না হইলে হিন্দু আর হিন্দু থাকিত না। তাহার অস্তিত্ব কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সেই অধর্ম্মাপসরণের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর ভারতের ধর্ম্মাকাশ নির্ম্মল উজ্জ্বল করিবার মানসে সমগ্র ভারতবর্ষকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার চারিপ্রান্তে চারিটী মঠ স্থাপন করেন। পূর্ব্বে জগন্নাথক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ; দক্ষিণে শৃঙ্গেরীক্ষেত্রে শৃঙ্গেরীমঠ; পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদামঠ ও উত্তরে দেবভূমি হিমালয় বক্ষে বদরিকাশ্রমে

* প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রে কোন কোন বিষয়ে জীর্ণোদ্ধার আরম্ভ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইবেন।

জোশীমঠ। এই চারিটী মঠের মধ্যে, জোশীমঠই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচীন ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন শঙ্করাচার্য্যদেব উত্তরাখণ্ডের বহুতীর্থের উদ্ধার ও সংস্কারসাধনও করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। উত্তরাখণ্ডে যে স্থানে ধর্ম্মবীর শঙ্কর জোশীমঠ পীঠের স্থাপনা করিয়াছিলেন, সেই স্থান এক্ষণে মনুষ্যের পরিবর্ত্তে হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি ও ভীষণ অরণ্যাণীতে পরিণত হওয়ায় তাঁহার স্থাপিত ঐ পবিত্র মহাপীঠের জ্যোতীশ্বর মহাদেব, পুণ্যাগিরিদেবী ও ভগবন্মন্দির দিনে দিনে ধ্বংস প্রায়। জোশীমঠের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না; জোতীশ্বর মহাদেব এক কুটীর মধ্যে অবস্থান করিয়া এখন পর্য্যন্ত নিজের স্বতঃ ক্রিয়াশীলতার ঘোষণা করিতেছেন। পূজক কখনও কখনও দয়া করিয়া তাঁহার পূজা করে। ঐ স্থানে নিরন্তরপ্রবাহিতা গোমুখ ও হস্তীমুখ বিশিষ্ট দুইটী নির্ম্মলসলিলা নির্ঝরিণী এখনও সেই অতীতযুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই পুণ্যপীঠের উদ্ধারের নিমিত্ত মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে যে ডেপুটেসন প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা বহু পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া, বহু অনুসন্ধানে এই লুপ্ত তীর্থক্ষেত্রের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। ঐ সময়ে তাঁহারা জ্যোতীশ্বর মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে শঙ্করের স্বহস্তরোপিত পূর্ব্ববিশ্রুত "বনস্পতি" দর্শনে অতীব চমৎকৃত হ'ন ও তাহাকেই অবলম্বন করিয়া অন্যান্য স্থানের সীমা স্থির করেন। ঐ বৃক্ষের কোটর এত গভীর যে, তন্মধ্যে কুড়ি পঁচিশ জন মনুষ্য অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে। বৃক্ষ এখনও ফলবান এবং উহার বিষয়ে বহু দৈবীঘটনামূলক কিম্বদন্তী নিকটবর্ত্তী স্থানে শুনা যায়। কালের কঠোর হস্তে পবিত্রপীঠ স্তব্দ-মৌন ধ্বংসের ক্রীড়াভূমিরূপে পরিণত হইলেও, এখনও শঙ্করের সেই স্বহস্তরোপিত বনস্পতি সগৌরবে অতীতের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া, তাহার ছায়াতলে শ্রান্ত-জীবের তৃষার্ত্ত-মুমূর্ষু আত্মাকে চিরশান্তি প্রদানের জন্য নিত্য আহ্বান করিতেছে। পঞ্চম চিত্রে ঐ দৈবী বৃক্ষের প্রতিকৃতি দেখান হইয়াছে।

শঙ্করজীবনীতে উল্লেখ আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই সময় বেদব্যাস তাঁহাকে কতকগুলি অমৃতায়মান উপদেশ দিয়াছিলেন ও নিজের আয়ু প্রদান করিয়া তাঁহাকে

দীর্ঘায়ু করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন যে, তুমি "প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যের প্রচার কর ও ভারতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় কর।"

অতঃপর শঙ্কর সেই বয়োজ্ঞানবৃদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষির উপদেশানুযায়ী ধর্ম্মরাজ্যের সুসংস্থাপনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে এই জোশীমঠের স্থাপনা করেন। ইহাই সেই ধর্ম্মবীরের প্রথম ধর্ম্মপ্রচারভূমি। এই স্থান হইতেই সেই শিবাবতারের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের প্রথম পুণ্যবাণী ভারতের গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাহার বহুদিন পরে, জোশীমঠের শেষ আচার্য্য যখন ব্রহ্মীভূত হন, সে সময় মঠাধিপ হইবার উপযোগী তাঁহার কোন শিষ্যাদি না থাকায়, যাঁহাদের উপর মঠের কর্ত্তৃত্ব ছিল, তাঁহারা অতীব দুরাচার-পরায়ণ হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহাদের সে অত্যাচার অনাচার বেশী দিন চলিল না। পাপের ভরে সেই পীঠাধিপের আসন টলিল; তাহার ফলে উপর্য্যুপরি সাতবার ঐ স্থান ব্রহ্মকোপানলে ভস্মীভূত হয়। পরিশেষে পীঠাধিপতি দেবতার মন্দির পর্য্যন্তও ভূমিসাৎ হইয়াছিল। সেই সময় হইতে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাচীন স্থান ছাড়িয়া বর্ত্তমান জোশীমঠ গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে। এই নূতন গ্রাম সেই প্রাচীন পীঠ হইতে অর্দ্ধ মাইল নিম্নদেশে অবস্থিত।

এতদিনে শ্রীভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের শুভ প্রযত্নে হিন্দুর এই পরম পবিত্র তীর্থের জীর্ণোদ্ধার আরম্ভ হইয়াছে। গাড়োয়ালের ধর্ম্মাত্মা ডিপুটীকমিশনার মহোদয় এই শুভানুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া হিন্দুজাতির ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। জ্যোতীশ্বর মন্দিরের প্রাচীন ভূমি, পূর্ব্ব হইতেই দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল; এক্ষণে উহার পার্শ্বস্থ জমীও কমিশনার মহোদয় মহামণ্ডলের নামে খরিদ করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় চিত্রে ঐ জমীর এবং তিনটী মন্দির ও মঠ কিরূপভাবে নির্ম্মিত হইবে তাহা চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্রে দেখান হইয়াছে।

ভগবান শঙ্করের ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতের সেই ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে শঙ্করের আবির্ভাব না হইলে—হিন্দুর ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমবিধি কোন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত। যদি শঙ্কর পরোপকারব্রতের অসাধারণ

দৃষ্টান্ত সন্ন্যাসীর সম্মুখে না ধরিতেন, যদি তিনি সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সম্মিলন করিয়া জ্ঞানমার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করিতেন, যদি সেই শিবাবতার
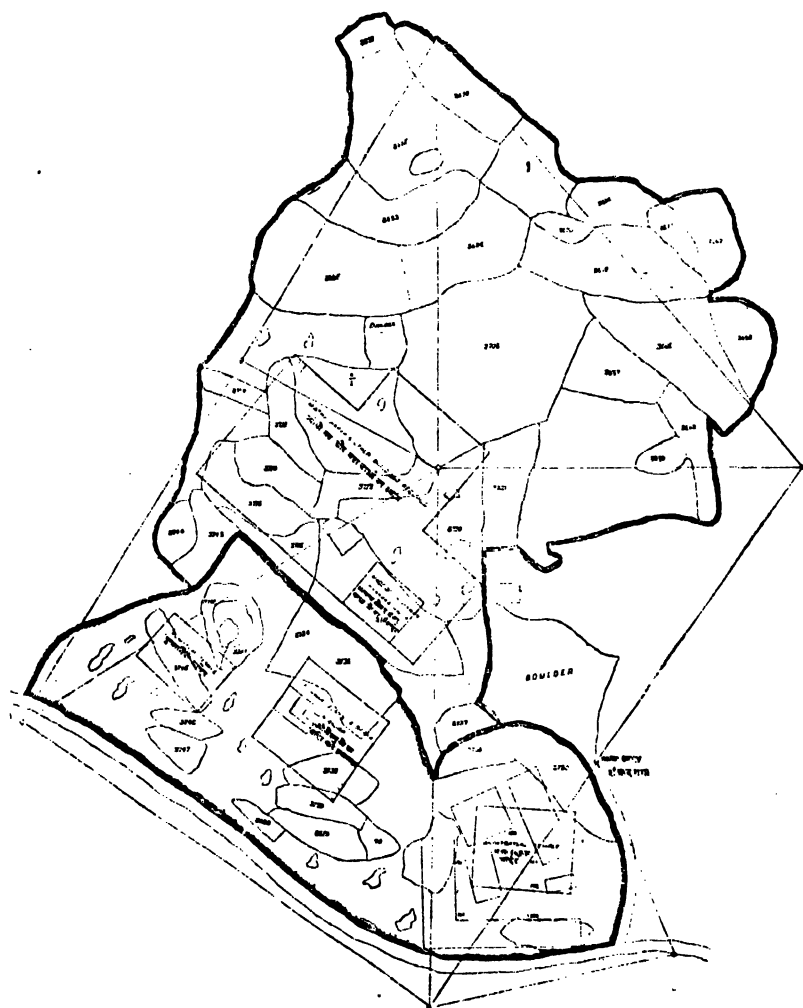
তৃতীয় চিত্র।

ভারতের প্রধান তীর্থসমূহের উদ্ধার দ্বারা ঋষি, দেবতা, পিতৃভক্তি এবং সগুণ পঞ্চোপাসনার পুনঃস্থাপনা না করিতেন, যদি তিনি ভারতকে চারি

ধর্ম্মরাজ্যে বিভক্ত করিয়া অনুশাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিবার জন্য মঠ চতুষ্টয়ের স্থাপনা না করিতেন এবং যদি তিনি হিন্দুর বর্ণাশ্রম মর্য্যাদার
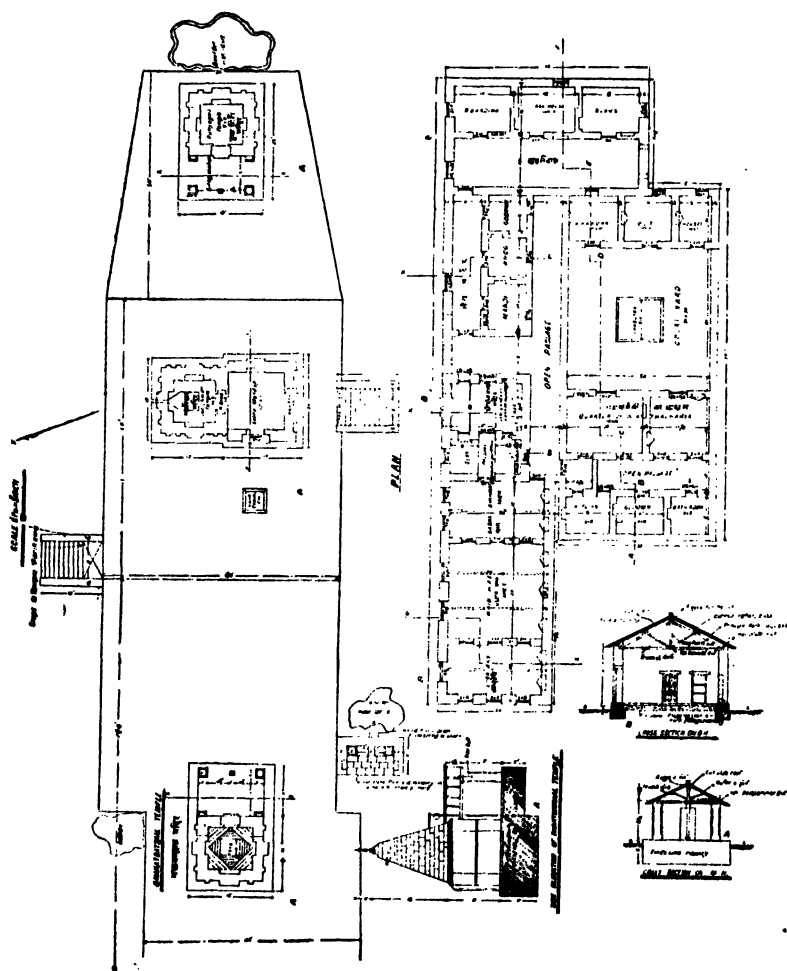
চতুর্থ চিত্র।

পুনসংস্কার করিয়া উহার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় না করিতেন, তাহা হইলে আজ জগৎগুরু আর্য্যজাতি, সর্ব্বগ্রাসী কালের অনন্তগর্ভে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন থাকিত।

গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ তীর্থের সংস্কার কার্য্যের জন্য আবশ্যক অর্থের সংগ্রহ মহামণ্ডল করিয়াছেন। কিন্তু জোশীমঠের সংস্কারের জন্য এখনও
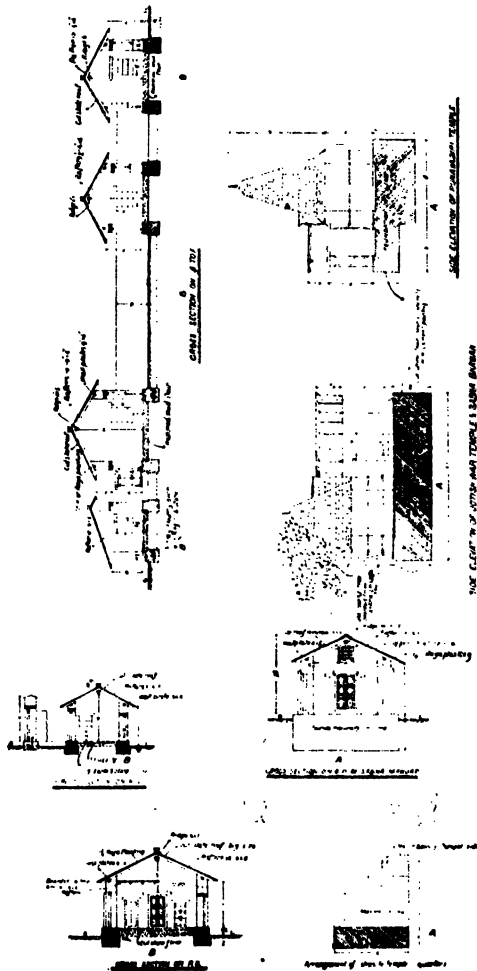
পঞ্চম চিত্র।

বহু অর্থের প্রয়োজন। কারণ এই তীর্থের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে, মন্দিরের সম্পূর্ণ জীর্ণোদ্ধার, মঠনির্ম্মাণ ও শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্য

অবশ্য করণীয় হওয়ায়, ইহাতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইবে। আজ পর্য্যন্ত এই কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র বিশ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এখনও আশী হাজার টাকার আবশ্যক। এই বৎসরেই জ্যোতীশ্বর মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভারতের চারি প্রান্তে উক্ত মঠ চতুষ্টয়ের স্থাপনা দ্বারা ভারতে জ্ঞান, ক্রিয়া ও অনুশাসন-শক্তির এক অপূর্ব্ব সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিলেন। হিন্দুজাতি ঐ শক্তির বলে নানাবিধ উপকার লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি সেই মঠসমূহের অন্যতম—জোশীমঠের উদ্ধারসাধন করিয়া অন্য তিন মঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যদিগের সম্মতিক্রমে কোন যোগ্য সন্ন্যাসীকে জোশীমঠের শঙ্করাচার্য্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া, চারি মঠের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে চারি মঠের বিদ্যাপীঠের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে উহাদের শাখামঠ হিন্দুর ধর্ম্মকেন্দ্র কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রকৃত উন্নতি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষা বিষয়ে বহু উপকার সাধিত হইতে পারে। এ কারণ আমাদের মনে হয় যে,শিবাবতারের ঐ প্রথম লীলাভূমির উদ্ধার সাধন প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমহামণ্ডল এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের প্রারম্ভ করিয়াছেন। হিন্দুমাত্রেরই মহামণ্ডলের এই শুভানুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা প্রদান একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিৎ। যাহাতে ঐ সংস্কার কার্য্য সুন্দররূপে সাধিত হয়, তজ্জন্য মহামণ্ডলের নির্ব্বাচনে গাড়োয়ালের ধর্ম্মাত্মা ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এক "সব কমিটী" স্থাপিত হইয়াছে। আরও একটী আনন্দের বিষয় যে, কমিশনার বাহাদুর দয়া করিয়া গাড়োয়ালের সরকারী ট্রেজারিতে উক্ত কার্য্যের জন্য প্রদত্ত অর্থ জমা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা এই পবিত্র কার্য্যে সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা "শ্রীমহামণ্ডল, উত্তরাখণ্ড জীর্ণোদ্ধার ফণ্ড", ডেপুটী কমিশনার, পৌড়ি, এই ঠিকানায় তাঁহাদের প্রদত্ত সাহায্য পাঠাইয়া দিতে পারেন।

হায় দুর্ভাগ্য হিন্দু! তোমার ধর্ম্মকাশে আবার কি সে পুণ্য-শুভ্র-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবে! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একবার চক্ষু উন্মীলন কর!

আবার তুমি তোমার সেই পূর্ব্বপুণ্যভাব স্মরণ করিয়া এই পুণ্য মঙ্গল-কার্য্যে তোমার প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া, সেই মঙ্গলময় শিবাবতারের নিকট তোমার হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা নিবেদন কর। মনে হয়, তাহাতে দেবতার আসন টলিবে; আবার তোমার ধর্ম্মাকাশ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে উদভাসিত হইয়া উঠিবে। *

তীর্থের আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

(শ্রীশীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি এম-এ)

হিন্দুদিগের তীর্থসংখ্যার ন্যায় আর কোন সম্প্রাদায়েরই তীর্থ-সংখ্যা নহে। তীর্থ পর্য্যটন হিন্দুদিগের ধর্ম্মের একটী বিশেষ অঙ্গ। এই তীর্থ পর্য্যটনে ধর্ম্মানুশীলন ও দেশ দর্শন এই উভয় উদ্দেশ্যই মিলিত হইয়াছে। আমাদের ধর্ম্মভাব সজীব রাখিবার জন্য তীর্থপর্য্যটনের ন্যায় আর কিছুই তেমন সহায়তা করে না। তীর্থের মাহাত্ম্য প্রচারিত করিবার জন্য তীর্থ-দর্শন-মাত্রেই শত শত পাপ দূরীভূত হয়—তীর্থদর্শনের এইরূপ ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সাধারণের মনে এরূপই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে যে, শত শত দুষ্কার্য্য করিয়াও একবার তীর্থদর্শনেই উদ্ধার পাইবে এইরূপ আশা করিয়াই তাহারা তীর্থদর্শনে যায়। তীর্থের পাণ্ডাদিগকেও দেখা যায় যে, তাহারা অর্থ লইয়া তীর্থযাত্রীদিগকে পুণ্য ও সফলতা বিক্রয় করিতেছে। তীর্থে এই প্রকারের কাণ্ডকারখানা দেখিয়াই তীর্থের প্রতি অনেকের যে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মিবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তীর্থদর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম যে ঐরূপ নহে, প্রত্যুত তীর্থফলের অধিকারী হইবার জন্য যে পার্থিব সম্পদের পরিবর্ত্তে

* শ্রীমদ্ স্বামী দয়ানন্দজী লিখিত হিন্দী বিবরণ হইতে মণ্ডলের অন্যতম মন্ত্রী—শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

বিশেষ অধ্যাত্ম-সম্পদসঞ্চয়েরই প্রয়োজন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পুরাণ-বাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
মনোবিশুদ্ধং পুরুষস্য তীর্থং
বাচং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ।
এতানি তীর্থানি শরীরজানি
স্বর্গস্য মার্গং প্রতিবোধয়ন্তি।
চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানৈর্নশুধ্যতি।
শতশোঽপি জলৈ র্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি।
ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি নচাশ্রমাঃ।
দুষ্টাশয়ং দম্ভরুচিং পুনন্তি ব্যুত্থিতেন্দ্রিয়ম্॥

ব্রহ্মপুরাণ ৫০শ অধ্যায়।

"যাঁহার বিদ্যা, কীর্ত্তি ও তপশ্চর্য্যা আছে. এবং যাঁহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত হইয়া রহিয়াছে, তিনিই তীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ-মন, বাক্যসংযম এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই কয়টীই পুরুষের শরীর-সম্ভূত তীর্থ। এই সকল তীর্থই স্বর্গ মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যাহার চিত্ত অবিশুদ্ধ বা দুষ্ট, জল দ্বারা শত ধৌত সুরাভাণ্ডের ন্যায়, তীর্থস্নানে তাহার শুদ্ধিলাভ কখনই হয় না। তীর্থ, দান, ব্রত বা আশ্রম, ইহার কিছু দ্বারাই ইন্দ্রিয়াসক্ত দাম্ভিক লোকের বিশুদ্ধি ঘটে না।"

আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা গৃহে বসিয়াও যে তীর্থফল লাভ করা যায়, পুরাণে তাহাও স্পষ্টরূপে উল্লিত হইয়াছে।

অগস্তিরুবাচ—
"শৃণুতীর্থানিগদতো মানসানি মমানঘে।
যেষু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম্॥
সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়াতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেবচ।
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে॥

ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা।
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্॥
তীর্থানামপি তৎতীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা।
এতৎ তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্॥

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কাশীখণ্ডম্॥

"অগস্তি বলিলেন, হে পুণ্যশীলে! আমার নিকট হইতে মানসতীর্থ সকলের কথা শ্রবণ কর, যে সকলে স্নান করিয়া মনুষ্য পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সত্য তীর্থ, ক্ষমা তীর্থ, ইন্দ্রিয়সংযম তীর্থ, সর্ব্বভূতে দয়া তীর্থ, সর্ব্ববিষয়ে সরলভাব তীর্থ, দান তীর্থ, দম তীর্থ, সন্তোষও তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য পরম তীর্থ, প্রিয়বাদিতাও তীর্থ; জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য ইহারা সকলেই তীর্থ। আবার মনের পরম বিশুদ্ধি, সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ। হে দেবি, এই তোমার নিকট মানসতীর্থের লক্ষণ কথিত হইল।"

"ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র যত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥

ব্রহ্মপুরাণ ৫০শ অধ্যায়।

"ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করিয়া নর যেখানেই কেন বাস করুক না, সেই সেই স্থানই তাঁহার পক্ষে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্করতীর্থস্বরূপ হয়।"

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ আপনার মনের মধ্যে এইরূপ তীর্থের দর্শন পাইয়া গাহিয়াছিলেন :—

"কাজ কি আমার কাশী—।
আমার মায়ের পদ গয়া গঙ্গা বারাণসী।।"

তীর্থসকল কেন যে বিশেষ পুণ্যস্থান হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও পুরাণে অতি সুন্দর যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। যথা :—

"যথা শরীরস্যোদ্দেশাঃ কেচিন্মেধ্যতমাঃ স্মৃতাঃ।
তথা পৃথিব্যামুদ্দেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ।।
প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা মতা॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত কাশীখণ্ডম্

"শরীরের প্রদেশ-বিশেষ যেমন পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, পৃথিবীর কোন কোন প্রদেশও তেমনই অতিশয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার আশ্চর্য্যপ্রভাব, জলের গুণ এবং মুনিদিগের নির্ব্বাচন প্রভৃতি কারণেই তীর্থসকলের পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে।"

এই প্রকারে তীর্থসকলের উৎপত্তিবিষয়ে যেমন জল, মৃত্তিকার উৎকর্ষরূপ প্রাকৃতিক কারণ দেখা যায় তেমনই ঋষিদিগের সংস্রবরূপ ঐতিহাসিক কারণও দেখা যায়।

তীর্থোৎপত্তির ঐতিহাসিক তত্ত্বের সামান্য মাত্র উল্লেখই আমরা এখানে পাইয়াছি। ব্রহ্মপুরাণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

ব্রহ্মোবাচ।—"চতুর্ব্বিধানি তীর্থানি স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দৈবানি মুনিশার্দ্দূল আসুরাণ্যারষাণিচ ॥
মানুষানি ত্রিলোকেষু বিখ্যাতানি সুরাদিভিঃ ॥
মানুষেভ্যশ্চ তীর্থেভ্য আসুরং বহুপুণ্যদম্।
আসুরেভ্যস্তথা পুণ্যং দৈবং তৎ সার্ব্বকামিকম্ ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবৈশ্চৈব নির্ম্মিতং দৈবমুচ্যতে।
ত্রিভ্যো যদেকং জায়েত তস্মান্নাতঃপরং বিদুঃ ॥
আর্ষানি চৈব তীর্থানি দেবজানি ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
আসুরৈরাবৃতান্যাসং স্তদেবাসুরমুচ্যতে ॥
দৈবেষ্বেব প্রদেশেষু তপস্তপ্ত্বা মহর্ষয়ঃ।
দৈবপ্রভাবাত্তপস আর্ষাণ্যপিচতান্যপি ॥
আত্মনঃ শ্রেয়সে মুক্তো পূজায়ৈ ভূতয়েহথবা।
আত্মনঃ ফলভূত্যর্থং যশসোহবাপ্তয়ে পুনঃ ॥
মানুষৈঃ কারিতান্যাহুর্মানুষানীতি নারদ।
এবং চতুর্ব্বিধো ভেদস্তীর্থানাং মুনিসত্তম ॥"

"ব্রহ্মা বলিলেন, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে চতুর্ব্বিধ তীর্থ বিদ্যমান। দৈব, আসুর, আর্ষ এবং মানুষ। তন্মধ্যে মানুষ তীর্থ হইতে আর্ষতীর্থ শ্রেষ্ঠ, আর্ষ হইতে আসুর বহুপুণ্যপ্রদ এবং আসুর হইতে দেবতীর্থ সার্ব্বকামিক

ও পবিত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কর্ত্তৃক দেবতীর্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং সেই দেবত্রয় হইতে যাহার জন্ম, তাহা হইতে অন্য কিছু প্রধান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কোথাও কোথাও আর্ষ ও দৈব-তীর্থগুলি আসুর তীর্থে আবৃত হইয়াছিল ; এইজন্য সে সকল আসুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহর্ষিগণ অনেক দৈবপ্রদেশে তপস্যা করিয়া দৈববলে ও তপঃসাহায্যে আর্ষ তীর্থ সকল নির্ম্মাণ করেন। হে নারদ! আত্মার মঙ্গল, মুক্তি ও ভূতি অথবা দেবার্চ্চনা এবং ফলকামনা ও স্বীয় যশোলিপ্সায় মানুষেরা যে সকল তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছে, ঐ সকল তীর্থই মানুষ তীর্থ নামে নিরূপিত। হে মুনিবর! এই ত তীর্থসমূহের চতুর্দ্ধা ভেদ ব্যাখ্যা করিলাম।”

তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তীর্থের দৃষ্টান্ত পুরাণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

“গোদাবরী ভীমরথী তুঙ্গভদ্রাচ বেণিকা।
তাপী পয়োষ্ণী বিন্ধ্যাস্য দক্ষিণেতু প্রকীর্ত্তিতা॥
ভাগীরথী নর্ম্মদাতু যমুনাচ সরস্বতী।
বিশোকা চ বিতস্তা চ হিমবৎ পর্ব্বতাশ্রিতাঃ॥
এতা নদ্য পুণ্যতমা দেবতীর্থান্যুদাহৃতাঃ।
গয়ঃ কোল্লাসুরো বৃত্রস্ত্রিপুরোহন্ধকাস্তথা।
হয়গ্রীবশ্চ লবণো নমুচিঃ শৃঙ্গকস্তথা।
যমঃ পাতাল কেতুশ্চ ময়ঃ পুষ্কর এব চ॥
এতৈরাবৃত তীর্থানি আসুরাণি শুভানি চ।
প্রভাসো ভার্গবোহগস্তির্নরনারায়ণৌ তথা॥
বশিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজো গৌতমোকশ্যপোমনুঃ।
ইত্যাদি মুনিজুষ্টানি ঋষিতীর্থানি নারদ॥
অম্বরীষো হরিশ্চন্দ্রো মান্ধাতা মনুরেব চ।
কুরুঃ কনখলশ্চৈব ভদ্রাশ্বঃ সগরস্তথা॥
অশ্বযূপো নাচিকেতা বৃষাকপি ররিন্দমঃ।
ইত্যাদি মানুষৈর্ব্বিপ্র নির্ম্মিতানি শুভানিচ॥

যশসঃ ফলভূত্যর্থং নির্ম্মিতানীহ নারদ।
স্বতোদ্ভূতানি দৈবানি যত্র ক্বাপি জগত্রয়ে।
পুণ্যতীর্থানি তান্যাহুস্তীর্থভেদো ময়োদিতঃ॥
ব্রহ্মপুরাণ ৭০ অধ্যায়।

"গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, বেণিকা, তাপী ও পয়োষ্ণী এই নদীগুলি বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত। ভাগীরথী, নর্ম্মদা যমুনা, সরস্বতী, বিশোকা ও বিতস্তা এই নদীগুলি হিমালয় হইতে নির্গত। এই সকল নদী পুণ্যতম। ইহারা দেবতীর্থ নামে নিরূপিত। গয়, কোল্লাসুর, বৃত্র, ত্রিপুর, অন্ধক, হয়গ্রীব, লবণ, নমুচি, শৃঙ্গক, যম, পাতাল কেতু, ময় ও পুষ্কর এই সকল অসুরগণ কর্ত্তৃক যে সকল তীর্থ আবৃত হইয়াছিল, তাহারা শুভ আসুরতীর্থ। প্রভাস, ভার্গব, অগস্তি, নর নারায়ণ ও বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, কশ্যপ ও মনু প্রভৃতি মুনিগণের সেবিত স্থানগুলি ঋষিতীর্থ বা আর্ষতীর্থ নামে নির্দ্দিষ্ট। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, মনু, কুরু, কনখল, ভদ্রাশ্ব, সগর, অশ্বযূপ, নাচিকেতা ও বৃষাকপি প্রভৃতি মানুষরাজগণ যে সকল তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তৎসমস্ত শুভ মানুষতীর্থ। হে নারদ! মানুষগণ যশোলাভের জন্যই তীর্থ নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু, ত্রিজগতে দৈবতীর্থগুলি আপনা হইতেই উদ্ভূত। ঐ সকল তীর্থ পুণ্যজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; এই আমি তীর্থভেদ বলিলাম।"

তীর্থ সকলের উপরি উক্ত বিবরণ হইতে নৈসর্গিক প্রভাবযুক্ত তীর্থই যে দৈবতীর্থ, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। আসুর ও আর্ষতীর্থও যে সবিশেষ নৈসর্গিকগুণযুক্ত স্থানেই সংস্থিত, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। মানুষ তীর্থগুলিও "শুভ" বলিয়া আখ্যাত হওয়ায় স্থান ও শোভাতে বিশিষ্টতাযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং তীর্থভ্রমণে আধ্যাত্মিক ফলের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশভ্রমণের ফলও হয়, তাহাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আসুরগণ কর্ত্তৃক দৈব ও আর্যতীর্থ কোন কোন স্থানে আবৃত হওয়ার যে কথা পাওয়া যায়, তাহাতে অসুরগণ এক সময়ে এই সমস্ত তীর্থ অধিকার করে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তীর্থ-মাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া তাহারা এই সমস্ত নষ্ট না করিয়া রক্ষাই করে। তাহাতেই অসুর-সংস্রবে উক্ত তীর্থগুলির প্রভাব

আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্য্যগণ যে অসুরদিগের তীর্থগুলির প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অশেষ উদারতাই প্রকাশ পায়। আসুরতীর্থ আর্য্যদিগের কেবল উদারতাই প্রকাশ করে না; কিন্তু অনার্য্য প্রতিপক্ষ অসুরদিগের উপর তাঁহাদিগের বিজয়ও ঘোষণা করে। এই প্রকারে তীর্থ আর্য্যদিগের কেবল চিরস্মরণীয় ধর্ম্মক্ষেত্র নহে, চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ক্ষেত্রও হইয়াছে। তীর্থের আধ্যাত্মিক ও নৈসর্গিক পবিত্র প্রভাব স্মরণ করিবার জন্যই স্নান-কালে প্রধান চতুর্ব্বিধ তীর্থেরই নাম করিতে হয়। যথা:—

"কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণিচ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ।"

ইহার মধ্যে গঙ্গা দেবতীর্থ, গয়া ও পুষ্কর আসুরতীর্থ, প্রভাস আর্ষতীর্থ, কুরুক্ষেত্র মানুষতীর্থ। প্রত্যেক প্রকারের এক একটী তীর্থের স্থলে আসুর দুইটী তীর্থের উল্লেখে আর্য্যদিগের অসুরবিজয়ের ঐতিহাসিক কীর্ত্তিও যেন বিঘোষিত বলিয়া মনে হয়। *

সাময়িকী।

দান-প্রাপ্তি। অযোধ্যা প্রদেশস্থিত খৈরীগড়ের হার হাইনেস ভারত ধর্ম্মলক্ষ্মী মহারাণী মহোদয়া, শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডলের সাহায্যার্থ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। এ কারণ বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষ ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। মণ্ডলের সূচনায় তাঁহার এই দানে, বঙ্গ মণ্ডলের অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহের সম্পাদন বিষয়ে যে কতদূর সাহায্য হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বেশী বলিবার কিছুই নাই; তবে ইহা

---

* "বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের আগরতলা শাখার প্রথম অধিবেশনে পঠিত॥

নিশ্চিত যে, এ সময়ে তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সাহায্য না পাইলে, বঙ্গ-মণ্ডলকে অর্থাভাবে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আমরা দয়াময় শ্রীভগবানের নিকট এই ধর্ম্মকার্য্যরতা মহীয়সী মহারাণী মাতার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ নরপতিবৃন্দ, অভিজাত সম্প্রদায় ও ভদ্রমহোদয়গণ মহারাণীর এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, বঙ্গমণ্ডলের সুপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে যত্নপরায়ণ হইবেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সংরক্ষক। মণ্ডলের সভ্যগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বঙ্গের ধর্ম্মপরায়ণ, দানশীল, হিতকর কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠানে অগ্রণী, গৌড়-রাজর্ষি কাসিমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, বঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডলের অন্যতম সংরক্ষক রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আরও আনন্দের বিষয় যে, মহারাজা বাহাদুর, বর্ত্তমান ইংরাজী আগষ্ট মাস হইতে মণ্ডলের সাহায্যার্থ মাসিক সাহায্য প্রদানেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, বিগত শ্রাবণ মাস হইতে তিনি মণ্ডলের কার্য্যা-লয়ের জন্য দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র “বেঙ্গলী” নিয়মিতরূপে প্রদান করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিকট ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজের নিরাময় দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়। ৭১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে, বঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয়ের জন্য যে শাখা কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে, তাহার কার্য্যপরিচালনভার গত শ্রাবণ মাস হইতে মণ্ডলের অন্যতর প্রচারক শ্রীমান্ পণ্ডিত রাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রীর উপর অর্পিত হইয়াছে। তিনি ঐ কার্য্যালয়ে প্রত্যহ বেলা ১১ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকেন। ঐ স্থানে মণ্ডল হইতে প্রকাশিত স্বামী শ্রীমদ্ দয়ানন্দজী মহারাজের প্রণীত ধর্ম্মকল্পদ্রুম গ্রন্থমালা ও অন্যান্য পুস্তকাবলী পাওয়া যায়।

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্ ।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥

১ম ভাগ { আশ্বিন, সন ১৩২৬। ইং সেপ্টেম্বর, ১৯১৯। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আবাহন

[বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন]

সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিজশক্তিপ্রভাবে এই সংসার ও তাহার অন্তর্গত ব্যষ্টি পদার্থসমূহের ক্রমানুসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। কল্পকালে তাঁহার সেই সমগ্র-শক্তির কিয়দংশমাত্র জাগ্রত বা কর্ম্মশীল হয়; অবশিষ্টাংশ প্রচ্ছন্ন, অপরিস্ফুট বা অব্যাকৃত থাকে। আবার প্রলয়কালে সেই কর্ম্মশীল অংশগুলিও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিশ্রাম করে। সেই কারণ কল্পকালে ব্রহ্ম কর্ম্মশীল বা জাগ্রত ও প্রলয়সময়ে তিনি নিশ্চেষ্ট বা যোগনিদ্রাগত।

কল্পকালে ব্রহ্মের শক্তিপ্রভাবে, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অসংখ্য ব্যষ্টি পদার্থের মধ্যে কখনও কাহারও আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। ইহাই সৃজন, পালন ও সংহার। কিন্তু সেই আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব বা তিরোভাবে মূল শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। তবে দৃশ্য-প্রপঞ্চরূপ সংসারে যেমন এক তেজঃপদার্থ রূপান্তরিত হইয়া, বেগ, তাপ

ও তড়িৎ প্রভৃতি উৎপন্ন করে, তদ্রূপ সেই মূলশক্তি হইতে নানাবিধ দৈবিক, আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক শক্তি ও তাহার অসংখ্য অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। কার্য্যকালে ঐ সমস্ত প্রস্ফুটিত হয়; আবার কার্য্যান্তে শক্তির ঐ অসংখ্য অভিব্যক্তি পুনরায় অস্ফুট হইয়া, সেই মূল বা সমষ্টি-শক্তিতে সংহৃত হয়। মূল বা সমষ্টি-শক্তির ঐ অসংখ্য অভিব্যক্তি পরস্পরাপেক্ষী; কিন্তু সেই মূল-শক্তি নির্ব্বিকল্পভাবে অবস্থিত। পাশ্চাত্য মনীষিগণ ইহাকেই—"Co-relation of Forces" এবং "Conservation of Energy" বলিয়াছেন।

আবার কল্পান্তে যখন ব্রহ্মের সেই ক্রিয়াশীল শক্তির অবসাদ প্রযুক্ত বিশ্রামের অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সেই শক্তি-প্রভাব-সৃষ্ট অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত ব্যষ্টি পদার্থসমূহ এবং তত্তৎপ্রকাশিত শক্ত্যভিব্যক্তি, সকলই বিলুপ্ত হয়। তখন কেবল চৈতন্যরূপী ব্রহ্মই স্বশক্তি সংহরণ করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহার যোগনিদ্রা।

শাস্ত্রাচার্য্য ঋষিগণ, ভিন্ন ভিন্ন পন্থাবলম্বনে ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্তবাদী ব্রহ্মকে মুখ্য ও শক্তিকে গৌণরূপে দেখিয়াছেন। আবার সাংখ্য-বাদী শক্তিকে প্রধান বা প্রকৃতি ও ব্রহ্মকে বীক্ষণকারী নিশ্চেষ্ট চৈতন্য বা পুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি, উভয়েই অনাদি, অনন্ত এবং পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ ও অবিচ্ছেদ্য। একের প্রকাশে অন্যের প্রকাশ; একের বিরামে অন্যের বিরাম। এই কারণ ব্রহ্মকে পুরুষরূপে ও শক্তিকে স্ত্রীরূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আবার ধর্ম্মবীর শিবাবতার শঙ্কর তাঁহার আনন্দলহরীতে শক্তি-স্তোত্র করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"গিরা মাহুর্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণী মাগমবিদো,
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরী মদ্রিতনয়াম্।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগম-নিঃসীম-মহিমা
মহামায়ে বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্ম-মহিষী॥"

এখানে আবার সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্ম স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়ে অভেদাত্মক একই পদার্থ; তবে ব্রহ্মের যে পুংস্ব বা স্ত্রীত্ব, তাহা কল্পনামাত্র। উপাসকের ভাবানুসারে, সেই এক পরব্রহ্মের কোথাও পুরুষরূপে, আবার কোথাও বা স্ত্রীরূপে; কোথাও নির্গুণভাবে, আবার কোথাও সগুণভাবে; কোথাও সমষ্টি গুণত্রয়ে, আবার কোথাও বা ব্যষ্টিগুণে, বিভিন্ন নামে পূজা হইয়া থাকে।

কল্পসময়ে জগতের নানাবিধ ঘটনায়, সগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধগত নানাপ্রকার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। সেই কারণ তাঁহার সেই সকল প্রভাবব্যঞ্জক নানাবিধ আখ্যাও কল্পিত হইয়া থাকে। সেই নামসমূহের মধ্যে "চণ্ডী" অন্যতম নাম।

আচার্য্য ভাস্কর রায়ের মতে "চণ্ড" শব্দের অর্থ—ইয়ত্তারহিত, অপরিমেয়, ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন। উপনিষদে চণ্ড শব্দের আমরা আর একটী অর্থ দেখিতে পাই। সে অর্থ—কোপযুক্ত ও রুদ্রভাববিশিষ্ট।

তাই উপনিষদে আছে,—

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"।

পাপীর পক্ষে তিনি অতীব ভয়ঙ্কর ও বজ্রস্বরূপ।

আবার,—

"ভীষা ঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

অর্থাৎ তাঁহার ভয়ে বা প্রভুত্বে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উদিত হইতেছে। সুতরাং "চণ্ড" শব্দে "দেশ-কাল-বস্তুতে ইয়ত্তারহিত, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিমেয়, অসাধারণ গুণশালী, রুদ্রভাবযুক্ত ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন" ব্রহ্মকেই বুঝায়।

স্ত্রীরূপে তাঁহার ঐ সকল গুণের প্রকাশক, মধুর-কোমল মাতৃভাবের উদ্যোতক নাম "চণ্ডী"। "জ্ঞানযোগে এই চণ্ডীদেবীকে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। কঠোর তপস্যা, বহু কষ্ট ও দুঃখে তাঁহাকে জ্ঞাত ও তাঁহাতে উপগত হওয়া যায়" বলিয়া তাঁহার অপর নাম "দুর্গা"। আসুন পাঠক, আজ আমরা শরতের এই প্রথম প্রভাতে, একবার সেই মাতৃরূপিণী, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, জগদম্বিকাকে স্মরণ করিয়া সমবেত কণ্ঠে বলি,—

বিদ্যুদ্দাম সমপ্রভাং মৃগপতি-স্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং,
কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্র-বরাহসিখেটবিশিখাং শ্চাপং গুণং তর্জ্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে॥

বেদান্তবাদীর মতে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ মায়াময়। তাই হিন্দুর সংসার—হিন্দুর পাতান সংসার, হিন্দুর পরিবারমণ্ডলী—সকলই মায়াময়। তাহার চারিদিকেই মায়া। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, তাহার সকলই মায়াময়। সে তাহার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারে না; জননীর স্নেহমাখা মধুর বাক্যে তাহার হৃদয় সুশীতল হয়। হিন্দুর স্ত্রী তাহার প্রাণসমা প্রিয়তমা। সকলেই তাহার হৃদয়ে মায়ার দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। পিতা-মাতা ভক্তি-প্রেমে, পত্নী প্রণয়বন্ধনে, আর তাহার স্নেহের পুত্তলী পুত্র-কন্যা স্নেহসূত্রে আবদ্ধ।

হিন্দুর এই সংসার যেমন মায়াময়, তেমনই ধর্ম্মময়। প্রাচীনযুগে আর্য্যহিন্দু গৃহী হইতেন—ধর্ম্ম-সাধনার জন্য। তাঁহাদের গৃহ—অতিথির আশ্রয়, আর্ত্তের রোগীনিবাস, গুরুজনের সেবা-মন্দির, দেবতার অর্চ্চনালয় ও ধর্ম্মের কর্ম্মভূমি ছিল। তখন ব্রহ্মচারী সংসারে প্রবেশ করিতেন—ধর্ম্মভাবের পরিণতি-সাধনের জন্য। গৃহাশ্রমে ধর্ম্মভাবের সম্যক্ বিকাশ না হইলে, সেই সংসারী পুরুষ, তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিবার উপযোগী বলিয়া গণ্য হইতেন না। তখনকার হিন্দুর সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ছিল। হিন্দুর গৃহ—দেবতার লীলাভূমি ছিল।

তখনকার গৃহী জানিতেন—তাঁহার সংসার, তাঁহার গন্তব্যস্থানে যাইবার পথ। তাঁহার গন্তব্যস্থান, মায়াময় সংসারের বহুদূরে। সেই অমৃতময় প্রদেশে যাইবার জন্য—তাঁহার সেই গৃহপুরে তিনি প্রস্তুত হইতেন। পুত্র-পরিবারবর্গের যে মায়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, তিনি সেই মায়াকে ক্রমশঃ ঈশ্বরে নিয়োজিত করিতেন। তখন তিনি ভগবানকে পিতৃরূপে পূজা করিতেন; জননীর উপর বিশ্বজননী আদ্যাশক্তির আরাধনা করিতেন। মাতৃভক্তির অন্তস্তরে এক মহিমময় ধর্ম্মভাবের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। একদিন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই ভক্তি-

মিশ্রিত মধুর ভাবের পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী সাধক রাম-প্রসাদ, একদিন বাঙ্গালার ধর্ম্মজগতে, এই মধুর-কোমল মাতৃভাবের পবিত্র উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাই বুঝি আজ আবার এই শরতের উষায়, সেই মাতৃরূপিণী, সারাৎসারা দুর্গার আবাহনে, বাঙ্গালার গগন-পবন ভরিয়া গিয়াছে। তাই বুঝি আজ বাঙ্গালী সাধকের মাতৃ-আবাহনের পুণ্যমন্ত্রে—আধিব্যাধিপ্রপীড়িত বাঙ্গালীর প্রাণ, কি যেন কোন অতীত ঘটনার অনুভূতির বিদ্যুৎ-স্পন্দনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই মধুর-তীব্র-স্পর্শে, সে তাহার সমস্ত দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া কাহার আবাহনে গাহিতেছে,—

"এস মা আনন্দময়ী এস মা গৃহে আমার,
রাঙ্গাপায়ে আলো করি মাগো অখিল সংসার।
কি আছে আমার ওমা, করিব পূজা তোমার,
লও তৃণ ফুল জল প্রেম অশ্রু উপহার,
লও সুখ লও দুঃখ চিরভক্তি পুষ্পহার॥"

এইরূপে বাঙ্গালা বহুদিন হইতে, সেই সর্ব্বদুঃখহরা পরমানন্দময়ীর আবাহন করিয়া আসিতেছে। এমন এক দিন গিয়াছে, যখন এই বাঙ্গালীর সাত্ত্বিক হৃদয়, দেবীর আগমনাকাঙ্ক্ষায় কাতর হইয়া উঠিত। সে সময়ে বাঙ্গালী তাহার আরাধনার দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন তাহার অন্তরে যে ভগবৎশক্তি জাজ্বল্যমান ছিল, তাহা সে ভগবতীতে অঙ্কিত করিয়াছিল; তাহার অন্তরের সকল ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মীতে দিয়াছিল; তাহার সেই উজ্জ্বল দিব্যজ্ঞান ও পবিত্রতা সরস্বতীতে প্রতিফলিত করিয়াছিল। তাহার বীরত্ব, যাহার অসীম-শক্তি-প্রভাবে পাপাসক্তিরূপ অসুর বিজিত হইত, যে সংযম বীরত্বের অপূর্ব্বপ্রভাবে কামক্রোধরূপী রিপুকুল বশীভূত হইত, ভগবৎশক্তির অঙ্গ, ভক্ত হৃদয়ের সেই পবিত্র-শুভ্র বীরত্ব, বাঙ্গালী কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান দেখিয়াছিল। আর তাহার ভগবৎশক্তি-প্রসূত বীরত্বজাত সিদ্ধি, গণেশের প্রতিমায় অগ্নির ন্যায় তেজোজ্জ্বল দেখিয়াছিল। এইরূপে বাঙ্গালী সাধক যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠান, ধ্যান ও ধারণায় তাঁহাকে হৃদয়ে মূর্ত্তিমান করিয়া, তাঁহারই

অর্চ্চনা-উৎসবে সে একদিন উন্মত্ত হইয়াছিল। সে দিনের কথা সে কি কখনও ভুলিতে পারিবে? কিন্তু বাঙ্গালী সাধকের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙ্গালী তাহার সর্ব্বস্বধন, তাহার সেই আদ্যাশক্তিরূপিণী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ভুলিতে বসিয়াছে; তাঁহাকে হৃদয়ের বহুদূরে রাখিয়াছে। আর কি এখন শত আবাহনেও সে তাহার সেই ইষ্টদাত্রী দশভূজা দুর্গাকে ধ্যানে আনিতে পারিবে?

যে সাধনার বলে সে একদিন ভগবৎশক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছিল, আজ তাহার সে সংযম-সাধনা কোথায়! যে তত্ত্বজ্ঞানের বলে—পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া, সে চিন্ময়ীকে মৃণ্ময় আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, আজ তাহার সে ভক্তি কোথায়! যদিও সে আজ তাহার সেই পূর্ব্বগৌরবের চিতাভস্মের উপর দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি মনে হয়, সে যদি আবার তাহার সেই সংযম, সেই ত্যাগ, সেই পরার্থপরতা, সেই ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতির স্মরণে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, তবেই আবার তাহার শুষ্ক মালঞ্চ পুষ্পিত হইবে, আবার তাহার গৃহে গৃহে সাধকের আবির্ভাব হইবে, আবার তাহার গৃহপুর দেবতার লীলাভূমি হইবে। তখন আবার তাহার আবাহনে, মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ীর আবির্ভাব হইবে। তাই বলিতেছিলাম, এ সফলতা লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মকেই তোমার একমাত্র আরাধ্য করিতে হইবে। তাঁহার আবাহনের জন্য হৃদয়-মন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে। তবেই তোমার সফলতা মূর্ত্তিমতী হইয়া, আবার বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস-মৃত্তিকা পবিত্র করিয়া, শব্দব্রহ্মময়ী, দুর্গম-ভব-সাগর-তরণী, শিব-সীমন্তিনী-রূপে আবির্ভূতা হইবে।

দুর্গে! আগম নিগমে আছে, যে বিপদে পড়িয়া একবার প্রাণ ভরিয়া "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া ডাকে, তাহার সকল বিপদ দূর হয়। মা! আজ বাঙ্গালী তাহার ধর্ম্ম, সংযম, ত্যাগ সমস্তই ভুলিয়া—রোগে, শোকে, অন্নাভাবে বিপদের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া, কাতরপ্রাণে তোমার আবাহন করিতেছে। একবার এস মা! যেমন প্রতিবৎসর বাঙ্গালার প্রতি গৃহে গৃহে আসিতে, আর একবার দয়াময়ী সেইরূপে আবির্ভূতা হও। তোমার মঙ্গলময় আগমনের আশায় তোমার দীন-হীন সন্তান

পথের কাঙ্গাল, হতভাগ্য বাঙ্গালী, তোমাকে কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছে, একবার এস মা!

মাগো! যাহারা তোমাকে বৈ আর কিছু জানে না, তোমাকে দেখিবে বলিয়া যাহারা রোগ, শোক, সকলই ভুলিয়া যায়, তোমার পূজা করিবে বলিয়া যাহারা পেটে না খাইয়াও সম্বৎসর ধরিয়া আয়োজন করে, তাহাদের আজ এ দুর্দ্দশা কেন মা? মহামায়া! এ তোমার কি মায়া? ভারতের সকল স্থানই দেখিয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন তোমার পূজার এত আয়োজন আর ত কোথাও দেখি নাই মা! বলিতে কি এই দুঃখ-দুর্দ্দশার দিনেও বাঙ্গালী তোমার নামে সকলই ভুলিয়া যায়। সেই মাতৃভক্ত বাঙ্গালীর আজি এ দুর্গতি কেন মা!

তাই বলিতেছিলাম, একবার এস মা! তোমার আগমন-সূচনায়—আজ সমগ্র বিশ্বসংসার, সুবিশাল প্রকৃতিরাজ্য, আশা-উৎফুল্ল হৃদয়ে তোমার আবাহন-গীতি গাহিতেছে। নিদাঘের কঠোর তাপ, বর্ষার প্লাবন, অপগত হইয়া, সুবিমল শারদাকাশ শশাঙ্কের মধুর হাস্যে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া, অমৃতকরস্পর্শে সকলকে সজীব করিতেছে। নদ-নদীর আর সে আবিলতা নাই; তরঙ্গ-ভঙ্গের সে উদ্দাম উচ্ছ্বাস নাই; সরোবর প্রাবৃটের মলদিগ্ধ শোকবাস ত্যাগ করিয়া, স্বচ্ছ ও বিমল বসন ধারণ করিয়াছে। কুমুদ-কহ্লার-কোকনদের অপূর্ব্ব শোভা, তাহার নির্ম্মল বক্ষ অলঙ্কৃত করিতেছে। কাননে, পথিপার্শ্বে, শুভ্রবর্ণ কাশকুসুম, তোমার আগমনের আশায় শ্বেত আস্তরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। সুমন্দ সমীরণ, আজ পদ্মগন্ধে বিভোর হইয়া, বিশ্ববাসীর কানে কানে তোমার আবাহন গীতি গাহিতেছে। আকাশ, পৃথিবী, সকলই যেন শান্তরসাস্পদ অনন্ত শুভ্রতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম কৈলাসবাসিনী! কৈলাস হইতে তিনদিনের জন্য এই দুঃখদুর্দ্দশাপীড়িত বঙ্গে একবার এস মা! আমরা আবার প্রাণভরিয়া তোমার কোমল-যুগল-চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া তোমাকে প্রণাম করিতে করিতে কাতরকণ্ঠে বলি,—

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তি-হারিণি।
ত্রৈলোক্য-বাসিনা-মীড্যো লোকানাং বরদা ভব॥"

অনসূয়া-সীতা-সংবাদ

[শ্রীপঞ্চানন মজুমদার]

ভরত প্রত্যাগমন করিলে রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতের আশ্রম ত্যাগ করিলেন। রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যচ্যুত রাজপুত্র বিশাল প্রকৃতির নির্জ্জন শ্যামল ক্রোড়ে যে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা সাম্রাজ্য অপেক্ষা তাঁহার নিকট কম মূল্যবান মনে হইল না। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ পূত-সলিলা মন্দাকিনীতে শেষ অবগাহন ও তর্পণ করিলেন। আশ্রমনিবাসী তাপস ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। রামচন্দ্র স্নেহপূরিত লোচনে সেই সৌন্দর্য্যশালী চিত্রকূটের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি অযোধ্যা ত্যাগ করিলে সেই বিশাল সাম্রাজ্য যেমন বিষণ্ণভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিল, আজ উচ্চশির চিত্রকূটও সেইরূপ স্তব্ধ, নীরব, বিষণ্ণ। আশ্রমপালিত ও বন্য মৃগশিশুগণ আর নির্ভয়ে বনে, কান্তারে, গিরিশিখরে বিচরণ করিতেছে না; বিচিত্র-বর্ণের অগণিত পক্ষীকুল সুমধুর সঙ্গীতে আর পর্ব্বত ও কানন প্রতিধ্বনিত করিতেছে না; কলনাদিনী মন্দাকিনীর নৃত্যশীল তরঙ্গভঙ্গ ও কলগীতি বন্ধ হইয়াছে; ষড়্‌জসংবাদিনী শিখীকুল নৃত্য বন্ধ করিয়া কাননান্তরে চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে ফল, লতায় লতায় পুষ্প, দিকে দিকে গন্ধ, শৈলে শৈলে মণিময় আভা, বনে বনে শ্যাম-পত্রের মর্ম্মর যেন স্তব্ধ, ম্রিয়মান, বিরহকাতর। গন্ধ, বর্ণ, শব্দ; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম; পত্র, পুষ্প, ফল; সরিৎ, নির্ঝর, তড়াগ; শৈল, ভূমি, আকাশ—শান্তিময়ী প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ হইতে রামচন্দ্র বেদনার কম্পন স্বীয় উদার হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে, সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে চিত্রকূট পর্ব্বতের, দক্ষিণ পাদমূলে এক মনোরম তপোবন মধ্যে মহামুনি অত্রির আশ্রম। রামচন্দ্র এক রাত্রি এই আশ্রমে বাস করিলেন।

মুনিবর তাঁহার যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং স্বীয় পত্নী অনসূয়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"আর্য্যে, ইনি জনকনন্দিনী সীতা। ইহাঁর উপযুক্ত সৎকার কর।"

অত্রিপত্নী অনসূয়া অতি বৃদ্ধা, জরা-বলিত দেহা, শুভ্রকেশা। ইনি স্বামীর ন্যায় তাপসী, শুদ্ধশীলা, ক্রোধ-বর্জ্জিতা, সর্ব্বজন-পূজ্যা। কথিত আছে, দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে দেশে যখন হাহাকার পড়িয়াছিল শস্যাভাবে প্রজা বিনষ্ট ও ঋষিগণের তপোবিঘ্ন হইতেছিল, দেবী অনসূয়ার উগ্র তপস্যার ফলে তখন সুবৃষ্টি হইয়া ফলভারে বৃক্ষ সকল অবনত ও ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হইয়াছিল। সীতা অগ্রসর হইয়া অনসূয়ার নিকট স্বীয় নাম উল্লেখ করিয়া সেই মহাভাগার চরণ বন্দনা করিলেন। অনসূয়া সীতার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কহিলেন—"বৎসে, তোমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু রাজনন্দিনী তোমার এ কষ্ট কেন?"

সীতার স্ফুরিত অধরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; অবনতমুখে কহিলেন,— "দেবী, কি কষ্ট? বনবাস?"

অনসূয়া—"তুমি রাজনন্দিনী, রাজরাণী। তুমি কি কখন বনে বিচরণ করিয়াছ?"

সীতা—"সত্য, কিন্তু দেবী, আপনি তাপসী হইলেও নারী। আপনি কি বুঝিবেন না আমি কেন এই কষ্ট স্বীকার করিয়াছি?"

অনসূয়া—"কল্যাণী, পতিসঙ্গ নারীর সর্ব্ব সুখের আকর। তুমি সেই সুখের কথাই স্মরণ করিতেছ। কিন্তু দেশ, কাল ও অবস্থার বিপর্য্যয়ে সে সুখের অন্তরায় আছে তাহা ভুলিও না। চতুর্দ্দশ বৎসর হিংস্র-জন্তু-সমাকুল নিবিড় অরণ্যে বাস করিয়া তুমি কি সুখ প্রত্যাশা কর?"

সীতা—আর্য্যে, কেবল মাত্র পতির সঙ্গসুখের প্রত্যাশায় আমি রাঘবের অনুগমন করি নাই। বস্তুতঃ তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া আমি দারুণ নির্ব্বাসন-দুঃখ ভুলিয়াছি। পর্ণশয্যা আমার নিকট সুখাসন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার একটী বড় সুখ আছে। অযোধ্যার রাজপুরীর অসংখ্য সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে আমি যাঁহার সুখভাগিনী ছিলাম, সঙ্কটসঙ্কুল,

জনশূন্য বনবাসেও তাঁহার সহচারিণী হইয়া, তাঁহার দুঃখ, দৈন্য, আপদের অংশভাগিনী হইতে পারিয়াছি ইহাই আমার বড় সান্তনা, বড় সুখ।"

অনসূয়া সীতার বাক্যে প্রীত হইয়া সাদরে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। তোমার কথায় আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তোমাকে আমি বর দিতে ইচ্ছা করি, প্রার্থনা কর।"

সীতা অনসূয়ার পাদস্পর্শ করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে কহিলেন,—"দেবী, আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইয়াছি, আমার অন্য প্রার্থনা নাই।"

অনসূয়া অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন,—"সুচরিতে, তুমি ত্যাগের দ্বারা লোভকে জয় করিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ লাভ করিয়াছ ইহাই প্রকৃত সুখের সোপান। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই আনন্দ ঐ মন্দাকিনীর পূতপ্রবাহের মত তোমার হৃদয় প্লাবিত করুক, তোমাকে অমোঘ শক্তি দান করুক, তুমি স্বামীর ধর্ম্মের সহায় হও।"

সীতা পুনরায় মস্তক অবনত করিয়া অনসূয়ার পদধূলি লইলেন।

অনসূয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৎসে, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বামীর অনুগমন করিও না, ধর্ম্মের জন্য তাঁহার সঙ্গে অসীম সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও সুখ বোধ করিও। ভোগলালসায় যে স্ত্রী স্বামীর অনুবর্ত্তন করে, তাহার সুখ অনিশ্চিত, ভোগ সীমাবদ্ধ, ধর্ম্ম তাহার বন্ধু নহে; প্রেম তাহার কণ্টকিত, দুঃখের নিদান। ধর্ম্মই মানুষের বন্ধু। প্রেম এই ধর্ম্মের স্বর্ণসেতু। এই জন্য পতিপ্রেম নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, পতী নারীর দেবতা।

সীতা—"আর্য্যে, আপনি সতী-শিরোমণি; আপনার মুখে সতীধর্ম্মের এই অমৃতোপম ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি। বাল্যে জননীর মুখে এই তত্ত্ব শুনিয়াছিলাম। অযোধ্যাপুরীতেও দেবী কৌশল্যার মুখে বহু বার এ তত্ত্বের আভাস শুনিয়াছি। কিন্তু তখন সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আজ আমার প্রাণ শীতল হইল, কর্ণকুহর পবিত্র হইল। হে রমণীকুলভূষণ, এ তত্ত্ব আরও পরিস্ফুট করিয়া আমাকে ধন্য করুন।"

অনসূয়া—"মধুরভাষিণী, তোমার বাক্য সফল হউক, তোমার বাসনা পরিপূর্ণ হউক। এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? নরনারীর জীবনের, মিলনের, তাহাদের মুক্তিপথের সম্বল এই তত্ত্ব। ইহা দুরূহ, তর্কের অতীত, অথচ সহজ, প্রাচীন, মানবজীবনের একমাত্র সত্য অবলম্বন। স্নেহের হিল্লোলে মানবের তরুণ কৈশোর যখন স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের নবানুরাগের চাঞ্চল্যে কম্পিত হইয়া উঠে, যখন জ্ঞানের পরিচিত ক্ষুদ্র গণ্ডীকে মথিত করিয়া, অতিক্রম করিয়া, বিশাল বিশ্বের অজ্ঞাত ভাণ্ডারে সত্যের অনুসন্ধানে, প্রেমের অনুসন্ধানে, অন্ধবেগে পরম অনুরাগভরে ছুটিতে আরম্ভ করে, তখনই জীবনের সেই মহা সন্ধিক্ষণে মানুষ নূতনকে অপার আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লয়, তখনই জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত বেদনা, সমস্ত প্রীতি দিয়া পুরুষ ও রমণী পরস্পরের অপরিচিত হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত যোগযুক্ত হইতে চায়। ভূমাকে প্রাপ্ত হইবার বা তাহার সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে মানবজীবনের এই প্রথম সংস্কারের নাম পরিণয়। ইহাই বিশ্বপ্রেমের তোরণস্বরূপ।"

সীতা বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে তাপসীর দিকে চাহিলেন। অনসূয়া রঘুকুল-বধূর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কল্যাণী, বিশ্বপ্রেমের সহিত বিবাহ সংস্কারের সম্বন্ধ কি, এই তোমার প্রশ্ন? আমার জ্ঞান, আমার পুণ্য, আমার তপোবল সমস্তই সাধুচরিত্র, দেবোপম, তপোসিদ্ধ, আমার স্বামী মুনিশ্রেষ্ঠ অত্রির আশীর্ব্বাদ। তাঁহার কৃপায় আমি যথাজ্ঞান উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর।"

সীতা করজোড় করিলেন। অনসূয়া বলিতে লাগিলেন,—"বৈদেহী, ব্রহ্মজ্ঞানী, পরম পণ্ডিত, তোমার পিতা জনকের মুখে অবশ্যই শুনিয়াছ যে, প্রেমেই জীবের জীবন, তাহার অমরত্ব—প্রেমের অভাবই মৃত্যু। মৃত্যুর অন্য লোকপরিচিত রূপ মিথ্যা কল্পনামাত্র। প্রেমের লক্ষণ প্রসার, ব্যাপ্তি। তাই জীবনের স্ফুরণে, যৌবনের প্রথম উন্মেষেই মানবহৃদয় নিহিত, জ্ঞানে, অনুরাগে প্রকম্পিত প্রেমের প্রস্রবণ, পুরাতনকে ভাসাইয়া বিশ্বের নব নব ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। এবং ত্যাগের দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, সংস্কৃত, পুষ্ট, ব্যাপ্ত মানব-প্রেম একদিন "অখণ্ডমণ্ডলাকারং

ব্যাপ্তং যেন চরাচরং" সেই ভূমা মহান্ বিশ্বদেবতার সহিত মিলিত হইয়া চরম সার্থকতা লাভ করে। এই চরম পরিণতির অনন্ত পথের প্রারম্ভে যে পরম কল্যাণকর প্রথম সোপান মানুষকে আবহমানকাল পথপ্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, বৎসে, মানুষ কি সেই বিবাহ সংস্কারকে কখন অবজ্ঞা করিতে পারে? যে দিন ক্ষুদ্র, গুপ্ত, হৃদয়স্থিত প্রেমের অমোঘ প্রেরণায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আত্মীয়তার ক্ষীণ অনুভূতি হৃদয়কে আশায়, আনন্দে, বেদনায় উদ্দাম করিয়া তোলে, সেই দিন বিস্ময়বিহ্বল, বেদনাপ্লুত, দুইটী সম্পূর্ণ অপরিচিত নরনারী পরস্পরকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত আলিঙ্গন করিয়া শপথ করে—'হে সুন্দর, হে সুন্দরী, এই অজ্ঞাত অপরূপ বিশাল বিশ্ব আমার প্রাণকে অনন্ত প্রেমরাশি দান করিবার জন্য কি যেন অস্পষ্ট, অথচ প্রবল আহ্বান করিতেছে। জানি না এ আহ্বান আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে—অমৃতে কিম্বা মৃত্যুতে। এই অনন্ত অজ্ঞাতের মধ্যে তুমিই পরম সুন্দর, পরম সুহৃদ্। তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করি। তুমি এই অনন্ত অজ্ঞাতের প্রতিভূ হও, তোমাকে পাইয়া যেন আমি অনন্তে পৌঁছিতে পারি, অনন্ত বিশ্ব প্রেমের অমৃতাস্বাদ পাই।' বৎসে, এই জন্যই বলিতেছিলাম বিবাহের দ্বারা সংস্কৃত প্রণয় বিশ্বপ্রেমেরই বাহক।"

সীতা—"আর্য্যে, সুধীগণ বলিয়া থাকেন প্রেমের একটী রূপ আনন্দ। জীবনে ইহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি না কেন আমাকে বুঝাইয়া বলুন।"

অনসূয়া—"জনকরাজপুত্রী, এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান তোমার পবিত্র চরিত্রেই নিহিত রহিয়াছে। আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মানুভূতি দ্বারাই জানিতে পারিবে যে, আর্য্যগণ সত্যেরই ঘোষণা করিয়াছেন। যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে প্রেম নাই। বৎসে, নিশ্চয় জানিও প্রেমই আনন্দ। ইহার ব্যভিচার নাই। যেখানে ব্যভিচার দেখিবে, বুঝিবে সেখানে প্রেমের দীনতা আছে, ভোগাভিলাষের আবিল আকাঙ্ক্ষা প্রেমকে মলিন, আনন্দহীন করিয়াছে। আনন্দ অপার্থিব, নিত্য বস্তু। তাহা সুখ দুঃখের অতীত। সসাগরা পৃথিবীশ্বরী তুমি, দীনা কাঙ্গালিনীর ন্যায় বনে বিচরণ করিয়াও তোমার আনন্দ অক্ষুণ্ণ। আর কৈকেয়ী? অপ্রমেয় ঐশ্বর্য্য ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারিণী হইয়াও আজ তাহার ন্যায় অনুকম্পার পাত্রী পৃথিবীতে বিরল। ইহার কারণ, প্রেম

তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া দুঃখ দৈন্যকে তুমি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া লইতে পারিয়াছ। তাহারা তোমার পবিত্র প্রেমের স্পর্শে অগ্নিসংস্কৃত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন 'সত্যং আনন্দরূপং।' যে রমণী প্রেমের নামে বাসনাকে সেবা করে, অনিশ্চিত, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ তাহার প্রেমকে মোহাবিষ্ট করিয়া সতত তাহার দুঃখেরই কারণ হয়। এই জন্য দশরথের ন্যায় সত্য-পরায়ণ, ধর্ম্মশীল স্বামী লাভ করিয়াও, কৈকেয়ী সত্যভ্রষ্টা, চির অযশভাগিনী। বৎসে, তুমি ভাগ্যবতী। তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, নিষ্কলঙ্ক পতিপ্রেম আছে। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রেরও তোমার উপর অগাধ, অপরিমেয় ভালবাসা আছে। কিন্তু বৎসে, যাহারা তোমার ন্যায় স্বামীহৃদয়ভাগিনী নহে, তাহাদেরও পতি-প্রেম পরাধর্ম্ম, পতি পরম দেবতা।"

সীতা—"আর্য্যে, প্রেমের পুষ্টি ও পরিণতি কি স্নেহাস্পদের স্নেহপ্রবাহের অপেক্ষা রাখে না? গঙ্গোত্রী হইতে উত্থিত ক্ষীণ সলিলধারা অনুকূল প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া অমিত কল্যাণরূপে সমস্ত ভূমিভাগে জীবন বিতরণ করিতে করিতে মহোল্লাসে সাগরগর্ভে পরিণতি লাভ করে। পক্ষান্তরে, কত নির্ম্মল নির্ঝর ঊষর ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া অকালে বিশুষ্ক হইয়া যায়।"

অনসূয়া—"চারুশীলে, ধর্ম্মের উদার দৃষ্টিতে প্রেম সত্যস্বরূপ, ধর্ম্মের দেশকালাতীত, সর্ব্বব্যাপী, তরল, আনন্দময় অভিব্যক্তি। ইহা বস্তুনিরপেক্ষ, মৃত্যুহীন, অনাদি মহা শক্তি। পার্থিব পণ্যের ন্যায় ইহা বিনিময় ধর্ম্মাবলম্বী নহে। বস্তুতে ইহার উৎপত্তি নহে। বরং পক্ষান্তরে বস্তুমাত্রই এই বিশ্বাধার প্রেমের দ্বারাই সঞ্জীবিত। ইহার ব্যভিচারের কল্পনা হইতেই আর্য্য মনস্বী-গণের কল্পিত জগতের মহামৃত্যু বা প্রলয়ের আশঙ্কা প্রসূত। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে গগনবিহারী অসংখ্য জ্যোতিষ্কমালা পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সেই অতীন্দ্রিয় প্রেমশক্তিবলে স্ব স্ব স্থলাভিষিক্ত, কর্ম্মযুত, সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ও জগন্ময় মঙ্গলবিধানের অন্তর্গত। প্রেমের অভাব হইলে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এক নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লোপ পাইবে। তখন দিনমনি সূর্য্য অংশুজালে যামিনীর অন্ধকার বিদূরিত করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদির

শরীরে নববলের সঞ্চার করিবে না, প্রলয়াগ্নি প্রহারে তাহাদের বিনাশ করিবে; ধরিত্রী আর পয়োনিধি হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শ্যামল ও শস্যপূর্ণ হইবে না, তাহার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমধ্যে নিমজ্জিত হইবে; গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি বিমানচারী অযুত লোক রুদ্রবেগে ধাবিত হইয়া প্রচণ্ড আঘাতে সৌরজগৎকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে! ভদ্রে, তুমি যে সুন্দর উপমার সাহায্যে প্রেমের আপেক্ষিকত্ব অনুমান করিতেছ, তদ্দ্বারাই উহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। যে স্বল্পসলিলা সরিৎ উষরক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় নাই—তদ্দেশীয় তৃণগুল্মাদিকে রসদান করিয়াই সে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সেইরূপ সতী স্ত্রীর প্রেম পরম কল্যাণরূপে স্বামীকে বেষ্টন করিয়া, সেবাদ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা স্বামীকে পরিশোধিত করিয়া যে পরাপ্রীতি লাভ করে, তাহাতেই তাহার সার্থকতা, তাহাতেই তাহার মুক্তি।"

সীতা—"দেবী, প্রেম হৃদয়ে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে মন্দাকিনীর স্রোতোধারার ন্যায় তাহার গতি অপ্রতিহত হয় সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রসোদ্গত পুষ্পকলিকা যেমন অনুকূল প্রভাকর-কিরণ ব্যতীত অথবা প্রচণ্ড ঝঞ্চা-প্রহারে বিশীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ কিশোরীর হৃদয়গত সদ্য অনুরাগোদ্ভিন্ন প্রণয়াবেশ স্বামীর হৃদয়দ্বারে প্রত্যাখ্যাত কিম্বা তদ্দ্বারা লাঞ্ছিত হইলে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে, কিরূপেই বা পুষ্ট, সংস্কৃত হইয়া বিশাল বিশ্বে আত্মসমর্পণ করিবে?"

অনসূয়া—"বৎসে, তুমি সত্যই বলিয়াছ অনুরাগের উন্মেষমাত্রেই প্রেম উদ্বুদ্ধ হয় না, জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনুরাগের প্রথম স্পন্দনে চিন্ময় মানবাত্মা ঈষৎ উদ্ভিন্ন তমোময় জড় আবরণ ভেদ করিয়া বিরাট্ অখণ্ড সত্যের আলোকে গতির জন্য, মুক্তির জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। সে চাঞ্চল্য অর্দ্ধস্ফুরিত, অর্দ্ধমুগ্ধ চৈতন্যের অসম্পূর্ণ বিকাশ মাত্র, তাহা প্রেমের অভিব্যক্তি নহে। সে অনুরাগ শিবির সন্নিহিত যুযুৎসু বিশ্ববিজয়িনী সেনার রণোন্মাদিনী শঙ্খধ্বনির ন্যায় কেবলমাত্র প্রেমের উদ্বোধনস্বরূপ। বিবাহ এই উদ্বোধনেরই পুণ্য অর্ঘ্য। কিন্তু পুরুষ যদি নারীর ন্যায় জীবন আহবের এই স্মরণীয় প্রথম দিনে প্রাণের সমস্ত আবেগ, সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত

নিষ্ঠার সহিত নারীকে তাহার অনুরাগ পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ না করে, তবে তাহাদের যোগ মোহ-কঠিন জড়ের সংহতি মাত্র, ক্ষুদ্রত্বের কাঠিন্যে বিরোধের সংঘাতে, সে একদিন বিপুল ব্যর্থতামণ্ডিত হইয়া মিলনের শান্ত উদার প্রেমকে উচ্চ পরিহাস করিবে। এরূপ যোগ পরিণয় নামের অযোগ্য, এ বিবাহ অসিদ্ধ। ইহার পরিণাম শোচনীয়। বৎসে, ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা দ্বিতীয় উদ্বাহ এই বিভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত। প্রথম অনুরাগের উদ্দাম চাঞ্চল্যকে সংহত করিয়া তাহাকে কর্ম্মপ্রেরণায় গতিশীল ও বিশ্ব-মুখীন সাফল্যে প্রবুদ্ধ করা এই ব্রহ্মচর্য্যের তাৎপর্য্য। অনাসক্ত কর্ম্মে প্রেমের অঙ্কুর স্ফুরিত হইলে, অনন্ত রহস্যময় নারীহৃদয় তখন প্রত্যাখ্যাত, লাঞ্ছিত অনুরাগের সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া পতিত বা মৃত স্বামীকেও আবার জীবনযজ্ঞের বরণীয় দেবতারূপে একান্ত নিষ্ঠার সহিত আহ্বান করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। বস্তুগত দৈন্য তখন বাসনাকে পীড়িত, সংক্ষুব্ধ করিয়া প্রেমের অনাসঙ্গ আনন্দকে মোহযুক্ত, খণ্ডিত ও মলিন করিয়া তোলে না। মৃত বা জীবিত, স্নেহবান বা অকরুণ, পামর স্বামী তখন নারীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহার আনন্দের উৎস। সতী আপন হৃদয়ের প্রেম নরাধম স্বামীতে অর্পণ করিয়া তাহাকে প্রেমময় করিয়া তোলে, আরাধ্য করিয়া তোলে। স্বামীর লৌহ-কঠিন প্রাণের নির্ম্মম আঘাত সতীর অনন্তমুখী, অরূপ প্রেমকে স্পর্শ করে না, বিচলিত করে না। পক্ষান্তরে, প্রজ্বলিত হুতাশন শুষ্ক কাষ্ঠের দ্বারা প্রহৃত হইলে যেমন তাহাকে দগ্ধ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, নিজে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সতীর প্রেম সেইরূপ নিষ্ঠুর স্বামীকে শ্রদ্ধার দ্বারা, সেবার দ্বারা, পরিশোধিত করিয়া গৌরবান্বিত হয়। স্বামীর মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া, মহান্ আত্মানু-ভূতির সার্থকতা লাভ করে। জননী যেমন স্নেহের দ্বারা অযোগ্য পুত্রের মধ্যে আপনাকেই লাভ করিয়া ধাত্রীরূপে, বিশ্বের চরম রক্ষণশক্তিরূপে সাফল্য লাভ করেন; ভক্ত যেমন নিজ প্রাণশক্তির দ্বারা জড় প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার করিয়া প্রেমের বন্যায় আপনাকে অনন্ত বিশ্বে হারাইয়া অমরত্ব লাভ করেন, সতীর প্রেমও সেইরূপ স্বামীর চরণে আত্ম-বলি দিয়া তাহার তমোমলিন হৃদয়দর্পণে আপনার উজ্জ্বল, স্বচ্ছ প্রেমের প্রতিচ্ছবি

প্রতিফলিত করিয়া সূক্ষ্ম, রহস্যময় পথে বিশ্বের বিরাট্ আনন্দসাগরোদ্দেশে ধাবিত হয়। দেবতা হউক, পামর হউক, স্বামীই তখন সতীর দেবতা, সতীর আনন্দের প্রস্রবণ, তাহার পূজাই সতীর সত্য পূজা, বিশ্বপূজা।"

রাত্রি একপ্রহর অতীত হইয়াছে দেখিয়া অনসূয়া নিরস্ত হইলেন। এবং সীতাকে বিশ্রামার্থ কুটীর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া স্বামী সন্নিধানে গমন করিলেন।

ভুল।

কটাক্ষেরি আলোয়, তোমার পাগল হ'ল প্রাণ,
মরম তলে পশ্‌লো তব, তাঁহার বাঁশী গান।
রূপ যে তাঁহার, ফুট্‌লো বুকে, লাগ্‌লো চোখে কস্,
অনুভবের অতীত তাঁহার পেলে পরশ রস।
যেতে তুমি চাইছ তাঁহার সিংহাসনের ছায়,
মালা তোমার পরিয়ে দিতে চাইছ তাঁহার পায়।
আকার জেনে, নামটী শুধু দিচ্ছ নিরাকার,
কেবল বৃথা আঙ্গিনাতে ঘুরছো কেন আর।
না রয় যদি প্রাণে তোমার নির্ব্বাণেরি সখ,
এসো হবে কুঞ্জে যুগল রূপের উপাসক।
দূর থেকে ওই ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধ হ'ল মন,
দীপের আলোক উঠ্‌ছে ফুটি, ঠাকুর উটি নন,
আতস বাজী দেখেই কেন ফিরবে তুমি ঘর,
ভিড় ঠেলে ভাই আগিয়ে এসো দেখ্‌বে কিবা বর!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বসিষ্ঠ-ঋষির পাপবোধ।

[শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।]

বসিষ্ঠ ঋষি ঋগ্বেদের একজন প্রধান ঋষি। তাঁহার রচিত সূক্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কোন সময়ে আপন দেহে পাপ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সেইকারণ তিনি নানা বেদজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পাপের কারণ জানিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহারা সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনি বরুণদেবের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছেন। এই পাপমোচনের জন্য তিনি বরুণদেবের যজ্ঞ করিয়া স্তব পাঠ করেন। (১) তাঁহার রচিত স্তোত্র হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, আর্য্য ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন, মানুষ যেমন নিজকৃত পাপের ফল ভোগ করে, সেইরূপ

---

(১) পৃচ্ছে। তৎ। এনঃ। বরুণ। দিদৃক্ষু
উপো। এমি। চিকিতুষঃ। বিপৃচ্ছম্।
সমানং। ইৎ। মে। কবয়ঃ। চিৎ। আহুঃ
অয়ম্। হ। তুভ্যং। বরুণঃ। হৃণীতে ॥ ৭।৮৬।৩

হে বরুণ! জানিতে ইচ্ছা করিয়া (আমি) সেই পাপের (কথা) জিজ্ঞাসা করি; জ্ঞানীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছি; কবিগণ আমাকে একই প্রকার বলিয়াছেন যে, এই বরুণ তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

কিং। আগঃ। আস। বরুণ। জ্যেষ্ঠম্
যৎ। স্তোতারং। জিঘাংসতি। সখায়ম্।
প্র। তৎ। মে। বোচঃ। দূদভ। স্বধাবঃ
অব। ত্বা। অনেনাঃ। নমসা। তুরঃ। ইয়াম ॥ ৭।৮৬।৪

হে বরুণ! (আমার) কি মহাপাপ হইয়াছে যে জন্য স্তবকারী সখাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? হে দুর্দ্দমনীয়! হে স্বধাবান্! আমাকে তাহা বল। নমস্কার দ্বারা অপাপ হইয়া তোমার নিকট শীঘ্র গমন করিব।

পিতৃপিতামহ হইতে আগত পাপের ফল ভোগ করিতেও সে বাধ্য। (২) বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন দেব-সেবা পাপের কারণ নয়; সুরা, ক্রোধ, পাশাখেলা ও অজ্ঞানতা মানবকে পাপে লইয়া যায়। পাপের মধ্যেও ছোট বড় আছে। নিদ্রাবস্থায় মানুষ পাপ করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহা মহাপাপ নহে। (৩) বৈদিক যুগ হইতে সুরা পান মহাপাপরূপে গৃহীত হইয়াছে। পাশাখেলার ভীষণ ফল, মহাভারতে সুন্দররূপে প্রদর্শিত দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের একটী সূক্তেও ইহার বিষময় ফল বিবৃত হইয়াছে। অজ্ঞানতা হইতে যে পাপের উৎপত্তি হয়, তাহাও প্রাচীনকালে ঋষিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালাভ দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য গুরুগৃহে বাস আর্য্য সকল সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

আর্য্য ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন দেবগণ তাঁহাদের সখা। তাঁহারা যজ্ঞে

---

(২) অব। দ্রুগ্ধানি। পিত্র্যা। সৃজ। নঃ
অব। যা। বয়ং। চকৃম। তনুভিঃ।
অব। রাজন্। পশুতৃপং। ন। তায়ুম্
সৃজ। বৎসং। ন। দাম্নঃ। বসিষ্ঠম্॥৭।৮৬।৫

পিতা হইতে প্রাপ্ত আমাদিগের দ্রোহ সকল মোচন কর; আমরা শরীর দ্বারা যে সকল (পাপ) করিয়াছি (তাহাও) মোচন কর। হে রাজন্! যেমন পশুতর্পণকারী চোরকে বা যেমন বৎসকে রজ্জুবন্ধন হইতে মোচন করে, বসিষ্ঠকে সেইরূপ (মোচন) কর।

(৩) ন। সঃ। স্বঃ। দক্ষঃ। বরুণ। ধ্রুতিঃ
সা। সুরা। মন্যুঃ। বিভী-দকঃ। অচিত্তিঃ।
অস্তি। জ্যায়ান্। কণীয়সঃ। উপারে
স্বপ্নঃ। চন। ইৎ। অনৃতস্য। প্রযোতা॥৭।৮৬।৬

হে বরুণ! সেই স্ব (অর্থাৎ সূর্য্য) ও দক্ষ (পাপের) কারণ নহেন; সেই সুরা, মন্যু, (অর্থাৎ ক্রোধ), পাশা, ও অজ্ঞানতা (পাপের কারণ)। অল্প (পাপের) নিকট মহা (পাপ) আছে; নিদ্রাবস্থাও পাপের প্রযোক্তা।

দেবগণকে আহ্বান করিয়া স্তব, পান ও ভোজন দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। যদি কোন পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিত, তাঁহারা দেব-সেবা দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হইতেন। (৪)

আর্য্য ঋষিগণ ইহাও বিশ্বাস করিতেন, পাপী স্বর্গ-গমনে অধিকারী নহে। তাহাকে নির্ঋতি লোকে যাইতে হয়। এই লোক মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত। ইহাই আনন্দহীন, মৃন্ময় গৃহ। বসিষ্ঠ ঋষি একটী স্তোত্রে এই লোক হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বরুণের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। এই লোকের এরূপ ভীষণত্ব আর্য্যগণ হৃদয়ে পোষণ করিতেন যে, তাঁহারা ঐ স্থানে যাইবার ভয়ে কম্পান্বিত হইতেন। (১) জলে বাস করিয়াও যে জন তৃষ্ণায় পীড়িত হয় তাহার অবস্থা যেমন অতি শোচনীয়, সেইরূপ পাপী নানা সুখদায়ক ভোগ্য বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও তাহার কিছুতেই সুখ হয় না। বসিষ্ঠ ঋষি আপনার এবম্বিধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

---

(৪) অরং। দাসঃ। ন। মীঢ়ুষে। করাণি
অহং। দেবায়। ভূর্ণয়ে। অনাগাঃ।
অচেতয়ৎ। অচিতঃ। দেবঃ। অর্য্যঃ
গৃৎসং। রায়ে। কবিতরঃ। জুনাতি ॥৭।৮৬।৭

ফলদাতা, (জগৎ) পাতা, দেবকে অপাপ হইয়া আমি দাসের মত অত্যন্ত সেবা করি। দাতা, দেব (বরুণ) অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিন। কবিশ্রেষ্ঠ (বরুণ) স্তোত্রকারীকে শ্রেষ্ঠধনে প্রেরণ করুন।

(১) মো। সু। বরুণ। মৃন্ময়ং। গৃহং। রাজন্। অহম্। গমম্।
মৃড়। সুক্ষত্র। মৃড়য় ॥৭।৮৯।১

হে বরুণ! হে রাজন্! আমি মৃন্ময় গৃহে যাইতেছি। হে সুক্ষত্র! রক্ষা কর, দয়া কর।

যৎ। এমি। প্রস্ফুরন্ ইব। দৃতিঃ। ন। ধ্মাতঃ। অদ্রিবঃ।
মৃড়। সুক্ষত্র। মৃড়য় ॥৭।৮৯।২

হে বজ্রবান্! ধমিত ভস্ত্রা সদৃশ, (ভয়ে) কম্পান্বিত লোকের মত (আমি) গমন করিতেছি। হে সুক্ষত্র! রক্ষা কর, দয়া কর।

(১) লোকের মনে পাপের দংশন যে ঠিক এইরূপ তাহাতে সংশয় নাই। বসিষ্ঠ ঋষি আপনার পাপ ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা বরুণদেবকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন; তাঁহার দৈব কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা, তিনি অশক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঘটিয়াছে। (২) অতএব দেবলোকের বিরুদ্ধে তাঁহার জ্ঞানত ও অজ্ঞানত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন।

একজন অতি প্রাচীন আর্য্য ঋষি পাপকে এইরূপ ভয় করিতেন। ইহা হইতে আমরা যদি অনুমান করি আর্য্য ঋষি-চরিত্র অতি পবিত্র ছিল, তাহা হইলে অন্যায় হইবে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ঋষি-চরিত্র বলিতে বৈষ্ণব বা খৃষ্টান্ চরিত্র ধরিয়া লইলে ভুল হইবে। কারণ বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন যাহারা বৈদিক যজ্ঞে অবিশ্বাসী তাহাদিগকে আর্য্যদিগের জন্য শাসন বা বধ করিবার ভার ইন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। একজন

---

(১) অপাম্। মধ্যে। তস্থিবাংসম্। তৃষ্ণা। অবিদৎ। জরিতারম্।
মৃড়। সুক্ষত্র। মৃড়য় ॥৭।৮৯।৪

জলের মধ্যে অবস্থিত স্তবকারী (আমাকে) তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সুক্ষত্র! রক্ষা কর, দয়া কর।

(২) ক্রত্বঃ। সমহ। দীনতা। প্রতীপমং। জগম। শুচে।
মৃড়। সুক্ষত্র। মৃড়য় ॥ ৭।৮৯।৩

হে পবিত্র! হে মহান্! কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনষ্ঠান ক্ষমতার হীনতা জন্য (আমি) প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুক্ষত্র! রক্ষাকর, দয়া কর।

যৎ। কিং। চ। ইদং। বরুণ। দৈব্যে। জনে
অভিদ্রোহং। মনুষ্যাঃ। চরামসি।
অচিত্তী। যৎ। তব। ধর্ম। যুযোপিমা
মানঃ। তস্মাৎ। এনসঃ। দেব। রিরিষঃ ॥৭।৮৯।৫

হে বরুণ! মনুষ্য (আমরা) দেব সম্বন্ধীয় লোকের বিরুদ্ধে যাহা কিছু দ্রোহ করিয়াছি, অজ্ঞানতা দ্বারা (আমরা) তোমার যে ধর্ম্ম কর্ম্ম অবহেলা করিয়াছি, সেই পাপ নিমিত্ত আমাদিগকে, হে দেব, বিনষ্ট করিও না।

শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃপূজা।

ঋষি বলিতেছেন 'অব্রত এবং কৃষ্ণত্বক্‌দিগকে ইন্দ্র মনুর নিমিত্ত শাসন ও বধ করিয়াছেন'। (১) ঋষি আরো বলিতেছেন "যে দেশে ইন্দ্রপূজা নাই সেই দেশের আর্য্য-শত্রুদিগকে আগি দহন করিব। (২) অতএব বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, দেব-সেবায় পরাঙ্মুখ ব্যক্তিমাত্রেই মহাপাপী ও বধ-দণ্ডার্হ।

মাতৃস্নেহ।

(গল্প)

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।]

রাজীবপুর বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কেন যে দুর্গাপুরে বিশুপাগ্‌লা আখ্যা পাইয়াছিলেন, সংবাদপত্রে সে কাহিনী প্রকাশিত না হইলেও, তাহার ধ্বংসোন্মুখ চণ্ডীমণ্ডপে মৃত্যুদেবতার অনবলেপনীয় অক্ষরে এখনো লিখিত আছে। আশঙ্কা হয় চিরদিন লিখিত থাকিবে।

ঘটনাটি এইরূপ। তখন রাজীবপুরে বিসূচিকা হইতেছিল। ২৭শে শ্রাবণ প্রাতঃকালে তাহার পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা বিন্দুবাসিনী বারঘণ্টার অসুখেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার সংকারের জন্য বিশ্বেশ্বর যখন শ্মশানে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছিল, তখন তাহার একমাত্র পুত্র সঞ্জীবকুমার অসুস্থ হয়। বলা অনাবশ্যক যে বিশ্বেশ্বর আজ ছয়মাস বিপত্নীক।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই বিশ্বেশ্বর দেখিল যে. সঞ্জীব মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; মাতৃহীন বালক গত ছয়মাস তাহার স্নেহশীলা দিদির

---

(১) মনবে। শাসৎ। অব্রতান্‌। ত্বচং। কৃষ্ণাং। অরন্ধয়ৎ।১।১৩০।৮

(২) দ্রুহঃ। দহামি। সং। মহীঃ। অনিন্দ্রাঃ।১।১৩৩।১

আদরে, যত্নে প্রতিপালিত হইতেছিল; বসুন্ধরার চিরন্তন মাতৃক্রোড়ে এখন শয়ন করিয়া মৃত্যু-লগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

মধ্যরাত্রিতে বালক মরিয়া গেল তাহার পিতার কোলে মাথা রাখিয়া। তাহাকে সংকার করিবার জন্য বিশ্বেশ্বর তাহাকে শ্মশানে লইয়া গেল,—

শ্রাবণমাস হইলেও আকাশে একখণ্ডও মেঘ ছিল না; জ্যোতিষ্কগণ স্থির-নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতেছিল।

শ্মশান হইতে বিশ্বেশ্বর সূর্য্যোদয় দেখিল। গত কল্য সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, একদিনের মধ্যেই তাহার এমন বিপদ হইবে। গৃহে যখন ফিরিয়া আসিল তখন,—

মানুষের চিরদুঃখময় সংসারের চারিপার্শ্বে আলোক গাছের পাতায়, নদীর তরঙ্গে, হরিৎক্ষেত্রের হিল্লোলে ঝলমল করিতে থাকে, বাতাস স্নিগ্ধহিল্লোলে বহিতে থাকে, প্রাঙ্গনে ফুল ফুটিতে থাকে, তরু-লতা মলিনতা মুক্ত হইয়া বিচিত্র বর্ণে জগৎ সুন্দর সুশোভিত করিয়া তোলে—ইহা যে প্রকৃতির একটা নিষ্ঠুর পরিহাস—বিশ্বেশ্বর তাহা ভাবিল না।

বিশ্বেশ্বর নীরবে, ধীরে ধীরে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, চাবি ঘুরাইয়া তাহার তোড়ঙ্গ খুলিয়া পরিষ্কার বস্ত্রে বাঁধা তাহার দপ্তরখানি খুলিল।

অন্যমনস্কচিত্তে পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। শিক্ষকতা করিত বলিয়া, তাহার চিত্ত যে আধুনিক সাংসারিক, সামাজিক বিপ্লবের বিষয়ে ভাবিত না তাহা নহে; বরং আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বিষয়লালসা, ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইত। যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখন সেইরূপ লিখিয়া রাখিত। দপ্তরের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল; আজ আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। একখণ্ড কাগজ বাতাসে উড়িয়া যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বর তাহা ধরিল; দেখিল, তাহাতে লিখিত আছে—

ভিড়ের মাঝে অচিন সাজে যেদিন দেখা দিবে হে,
চিনিয়া লব পরায়ে দিব গলায় মালা নাথ হে॥

কবিতাটির পানে একবার চাহিল। তাহার মনে পড়িল সঞ্জীবকুমারের অন্নপ্রাশনের দিন ঐ দুই ছত্র সে লিখিয়াছিল। তখন যৌবনের স্বাস্থ্য, আশা,

বিশ্বাস দেহমন পূর্ণ করিয়াছিল। তখন লোকারণ্যের মধ্যে লোকাতীতকে দেখিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ছিল। ঐ আকাঙ্ক্ষা কেমন স্বাভাবিক ছিল।

আর এখন নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে, অতীত জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। দুঃখকে বরণ করিয়া লইবার সাহসই বা আজ তাহার কোথায়? ভগ্নস্বাস্থ্যে রূপাতীতকে লাভ করিবার শক্তিই বা আজ তাহার কোথায়? নাই, নাই—কিছুই নাই; তাহার বিশ্বাস নাই, ভক্তি নাই।

আজ বিশ্বেশ্বর সংসারে যথার্থই একা।

অধিকক্ষণ দপ্তরের পাতা উল্টাইতে ভাল লাগিল না। বহির্জ্জগতের আলোক উজ্জ্বল শ্রীও তাহার শূন্যহৃদয় আনন্দিত করিতে পারিল না। আজ বিশ্বেশ্বর কোনপ্রকারেই তাহার জীবনের ভয়ঙ্কর অবস্থা বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না।

তাহার কারণ ত স্পষ্টই রহিয়াছে। জমিদারবাবুর দ্বারবান্ উচ্চনিনাদে প্রথমে নয়টা, তার পর ঢং ঢং ঢং—ঢং দ্রুত ঘণ্টাধ্বনি করিয়া শিক্ষক এবং ছাত্রগণকে মনে করাইয়া দিল যে, বিদ্যালয়ে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে ঠিক এই সময়েই তাহার কন্যা বিন্দুবাসিনী, রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া, তাহার সম্মুখে গামছা তৈলপূর্ণ কাঁচের বাটি রাখিয়া গিয়াছিল—

চিত্ত চঞ্চল হইবার কারণ—কেননা ঐ দ্রুত ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া সঞ্জীব-কুমার বইখাতা গুছাইয়া তাহার কাছে আসিত, তৈলের বাটি, গামছা হাতে করিয়া ঘাটে লইয়া যাইত।

তাহারা আজ কোথায়? আকাশের পরপারে, কোন্ জ্যোতির্ম্ময় অমরধামে? প্রভাতদীপ্তির অন্তরালে, প্রকৃতির কোন নিগূঢ়তম অসীম দুর্জ্জেয় প্রাণরাজ্যে?

বিশ্বেশ্বর যখন এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, তখন হরিশঙ্কর বাবাজি প্রথামত তাহার দ্বারে আসিয়া গাহিল।

নিভৃত হৃদয় মন্দিরে এসমা জগৎপালিকে,
উদয় অচল শিখরে এসমা অভয়দায়িকে
স্নেহময় করে পরশি
করুণার ধারা বরষি

উজল জগৎ মন্দিরে এসমা জননী অম্বিকে ;
সুখদে জয়দে বরদে এসমা ত্রিতাপনাশিকে ॥

হরিশঙ্করকে প্রাঙ্গণে আসিতে দেখিয়া তাহার চেতনা একটা আঘাতে জাগিয়া উঠিল। সঞ্জীবকুমার, বিন্দুবাসিনী আর ইহলোকে নাই ভিখারীকে বলিতে পারিল না ; একটা প্রবল চেষ্টায় মনকে জাগাইয়া সে বাঁশের আলনা হইতে গামছা টানিয়া লইয়া খিড়কী দরজা দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

(২)

একমাস কাটিয়া গেল। পুত্র-পরিবারহীন বিশ্বেশ্বরের স্তব্ধ গৃহের চারিপার্শ্বে আশ্বিনের আলোকে শারদোৎসবের প্রথম ঘণ্টা দিন কয়েক হইল, নিনাদিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; পুষ্করিণীতে রক্ত, নীল, শ্বেত-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বিদেশীয় শিক্ষকগণ দেশে যাইবার জন্য গাড়ির, নৌকার বন্দোবস্ত করিতেছে ; কেহ বা অগ্রিম 'বায়না' দিয়া রাখিতেছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিক পরীক্ষা মহালয়ার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় বন্ধ করা হইবে কি না, বালকগণ পরস্পর আলোচনা করিতেছে। গৃহিণীগণ রাজীবপুরের বিখ্যাত পিতল কাঁসার বাসন পছন্দ করিয়া কিনিতেছেন ; কেহ বা নিজেদের জন্য, কেহ বা কন্যাগণের জন্য।

শারদ প্রভাতে তাহার হৃদয় কি করুণসুরে আজ কাঁদিয়া উঠিয়াছে! তাহার বিন্দুবাসিনী আজ আর নাই, যাহাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার জন্য বিশ্বেশ্বর মাসে মাসে পাঁচটাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিয়াছে ; তাহার নয়নের তারা সঞ্জীবকুমার আজ কোথায়, যাহার জন্য তাহার দিদিমা কলিকাতা হইতে "রামায়ণ" কিনিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সেই "রামায়ণ" আজ একমাস টেবিলের উপর সেই রকমই বাঁধা পড়িয়া আছে ; সঞ্জীব যে মানচিত্র সম্মুখে খুলিয়া 'হরিদ্বার' দেখিতেছিল, সেই মানচিত্র এখনো সেইরূপই খোলা আছে। পবিত্র স্মৃতির ন্যায় বিশ্বেশ্বর, সঞ্জীব যেখানে যাহা সাজাইয়া ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে, সেইরূপই রাখিয়া দিয়াছে।

মৃত্যু মানুষকে এমনই পবিত্র করিয়া তোলে ; যাহা অত্যন্ত তুচ্ছ,

তাহাকেও এক বিশেষ মর্য্যাদাশালী করিয়া তোলে; যাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাও মানসপটে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখে।

তাহার স্তব্ধগৃহের, শূন্য হৃদয়ের চারিদিকেই আগমনীর গান বাজিয়া উঠিয়াছে;--আকাশের গাঢ় নীলিমায়, শারদ প্রভাতের নির্ম্মল জ্যোতিতে, তরু-লতার পবিত্র শ্রীতে, ধান্যক্ষেত্রের নয়নমনপ্রফুল্লকর শ্যাম-সৌন্দর্য্যে আগমনীর গান বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের হৃদয়ে আজ কি শূন্যতা; একটা অনির্দ্দিষ্ট বেদনায় তাহার চিত্ত অতি নিগূঢ়ভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে। এতদিন যাহাদের লইয়া সে উৎসব করিয়া আসিয়াছে,—পুত্র, কন্যা, পরিবার,—তাহারা আজ আর তাহার হৃদয়কে সবল, স্নিগ্ধ করিয়া তাহার সংসার আনন্দময় করিতেছে না।

বিশ্বেশ্বর আজ নিজেকে বিশ্ববিধানের অন্তর্গতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, বিশৃঙ্খল উৎপাতরূপে উপলব্ধি করিতেছে। জগৎ-সংসার যখন আনন্দময়ীর পবিত্র চরণস্পর্শের জন্য উদয়াচলের পানে চাহিয়া আছে, বিশ্বেশ্বর তখন অস্তাচলের পানে চাহিয়া আছে—মহাকালের প্রতীক্ষায়।

সেদিন প্রভাতে যখন নদীতে স্নান করিতেছিল, তখন লক্ষ্য করিল যে, ঘাটের রাণায় বসিয়া একজন যুবক পরম ভক্তির সহিত পূজা করিয়া ফুলগুলি স্রোতে ভাসিয়া যাইবার জন্য ফেলিয়া দিতেছিল। বিশ্বেশ্বরের মনে হইল তাহার জীবনও ঐরূপ,—স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ফুলের ন্যায়। তাহার মনোবৃত্তিসকল আকুল হইয়া যাহাদিগকে চাহিতেছে, তাহাদিগকে আর সে কখনও পাইবে না সত্য, কিন্তু হৃদয় ত সে সান্ত্বনা মানে না। স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, কখনও দুলিয়া, কখনও ডুবিয়া পূজার ফুল যেমন কোনও তীরে কিছুক্ষণের জন্য আট্‌কাইয়া যায়, আবার একটা স্রোতে ফুলটা যেমন সেখান হইতে সরিয়া যায়—কোন উদ্দেশ্য নাই, শৃঙ্খলা নাই; বিশ্বেশ্বরের জীবনও আজ একমাস ঐভাবে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় ভাসিয়া চলিয়াছে—সে যেন কয়েক বৎসরের জন্য সংসারের তীরে আট্‌কাইয়া ছিল—তাহাই তাহার চিরদিনের আশ্রয় বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল—

এখন আবার আর একটা আঘাতে সে আকুল হইয়া তাহার আত্মার চিরদিনের আশ্রয়কে চাহিতেছে!

পূজা হইয়া গেলেই ফুলের ক্ষুদ্রজীবন সার্থক হইল, পূজার পর সেই ফুল লক্ষ্যহীন হইয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিলেও তাহার অন্তর্বেদনা অন্ততঃ মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে না। কিন্তু আমাদের জীবনে তাহা হয় না। মানুষের হৃদয়ে 'অহং' নামে যে একটী দেবতা, অপ-দেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বময় প্রভু হয়েন, তিনি ত এত সহজে মাথা নীচু করেন না; যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, সবই মঙ্গলের জন্য, ইহা তিনি – সেই অহং অপ-দেবতা স্বীকার করেন না; ইনি চাহেন—যাহা কিছু সবই আমারই তৃপ্তির জন্য হউক্। সেইজন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, অর্থ-মান-প্রতিপত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি নশ্বর বন্ধনকে অবিনশ্বররূপে আত্মার সম্মুখে ধরিয়া, তাহাকে প্রতারিত করিয়া থাকে। এতদিন বিশ্বেশ্বর এই আত্মপ্রতারণায় বিমুগ্ধ ছিল।

সেই মোহ আজ তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না; তাহার খোড়ো রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে আজ মেঘমুক্ত নীল শারদাকাশের পানে চাহিতে চাহিতে ভাবিতেছে—

কি সুচারুরূপে তাহার পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা রান্নাঘরটীকে পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন করিয়া যেখানে যাহা রাখা কর্ত্তব্য সেইখানেই রাখিয়া দিত। মাটিতে ধূলা জমিত না, দেয়ালে ঝুল ঝুলিত না; ডালের হাঁড়ির মুখে সরা এখনও সেইরূপই ঢাকা আছে, মশলার হাঁড়ির মুখ শুভ্রবস্ত্রে বাঁধা রহিত। জগন্মাতা তাঁহার সংসার কি নিয়মে শাসন করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিশ্বেশ্বর তাহা কখনও ভাবিত না; সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজনও মনে করে নাই। গত ছয়মাস স্ত্রীবিয়োগের পর তাহার কন্যার গৃহিণীপনা, পবিত্র শ্রী, উজ্জ্বল শৃঙ্খলা দেখিতে দেখিতে ভাবিয়াছে—জগন্মাতা ঐরূপ নীরবে, ঐরূপ শান্তিতে, ঐরূপ সুন্দরভাবে তাঁহার জগৎ পালন করিতেছেন।

সেই রান্নাঘরে আজ বিশ্বেশ্বর কাঠের উনুনের সম্মুখে বসিয়া রন্ধন করিতেছেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া হয় ত কেহ ভ্রম করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কথা বিশ্বেশ্বর, তাহার সহধর্ম্মিণী এবং কন্যার রান্নাঘরে কোনরূপ

অপবিত্রতা স্পর্শ করে, এরূপ ইচ্ছা করিত না বলিয়া, পাচক নিযুক্ত করে নাই। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছে, দেখিতেছে—তাহাদের সৌন্দর্য্য-বোধ, শৃঙ্খলা-বোধ, দেবদেবীগণের প্রতি ভক্তি, শুচিতা রক্ষার জন্য কঠোর নিয়ম পালন।

তাহারা আজ কোথায়? মৃত্যুদেবতা যে একটা পবিত্র বিষাদ-মৌন উপলব্ধির ক্ষীণ আভাস এই একমাসে তাহার চিত্তে আনিয়াছে, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার ত এই শিক্ষা হয় নাই; সে সেখানে বিষয়লালসাই শিখিয়াছিল। আর সেইজন্য দেহমনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়া, জগৎকে,—যাহা চিরকালই নশ্বর, সেই জগৎকে শক্ত মুঠায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু এখন নীল আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে—মানুষের অহংকার, পিতার পিতৃস্নেহ, মনকে এতই মোহে আচ্ছন্ন করে!--

এমন সময়ে দুর্গাপুরের বাউল কৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বারে দাঁড়াইয়া রামপ্রসাদী সুরে গাহিল—

এসো মা নিস্তারিণী।
উদাস প্রাণে তোমায় ডাকি এসো মা জগৎপালিনী।
দুঃখ দিয়ে শতবার,
নুইয়ে দিলে অহংকার,
লুটিয়ে গেল তোর চরণে, এসো মা প্রসন্নহাসিনী।
সব হারিয়ে তোমায় পেয়ে,
দিন কেটেছে তোমার স্নেহে,
এবার, ভবের মায়া দাও ঘুচিয়ে, ধরেছি তোর চরণখানি॥

কি সরল বিশ্বাস ঐ বাউলের প্রাণে! যখন সে বার বার "ধরেছি তোর চরণখানি" গাহিতেছিল, তখন বিশ্বেশ্বর যে অশ্রু আজ একমাস বুকের মধ্যে জ্ঞানের বাঁধ দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর পাগলের ন্যায় বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া বাউল কৃষ্ণপ্রসন্নকে আলিঙ্গন করিল; তাহার কণ্ঠস্বরের সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গাহিতে লাগিল "ধরেছি তোর চরণখানি"; অশ্রুতে আনন্দময়ীর আবির্ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত, বিহ্বল, উন্মাদ হইল। পাগলের ন্যায় ভিখারীর সহিত—

এসো মা নিস্তারিণী

গাহিতে গাহিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে 'বিশুপাগ্‌লা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

(৩)

এক বৎসর কাটিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর দুর্গাপুরের কালীমন্দিরে বাস করিতেছে। সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া, রুগ্নকে সেবা করিয়া, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়া, দুর্ব্বলকে সাহায্য করিয়া, উৎপীড়িতকে স্নেহময় বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার দিন কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া বিশ্বেশ্বর এখন জনসমাজের দুঃখবেদনার মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়া, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাইয়া দিয়াছে।

কৃষ্ণপ্রসন্নের স্নেহে বিশ্বেশ্বরের মনের উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা যদিও অপসারিত হইয়াছে, তথাপি সে আর পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষকতার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই; ভদ্রাসনের অংশ তাহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে দান করিয়া, অস্থাবর সম্পত্তি দীনদুঃখীকে বিলাইয়া দিয়া, সঞ্জীবকুমারের পোষাক পরিচ্ছদ গ্রন্থ এমন কি তাহার কলম পেন্‌সিলটি পর্য্যন্ত পোঁচ্‌কায় বাঁধিয়া চিরদিনের জন্য বাস্তভিটা ত্যাগ করিয়া, দুর্গাপুরের কালীমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

তাহার মনে সর্ব্বদাই এই একটা আক্ষেপ জাগিয়া আছে যে,—তাহার জীবন, দেবতার চরণে কোন দিনই উৎসর্গীকৃত হয় নাই। তাহার মাঝে মাঝে মনে পড়ে অতীত জীবনের কথা,—জগৎকে সুন্দর করিয়া সংসারবৃন্তের উপর যৌবন উন্মেষের প্রথম উজ্জ্বল উপলব্ধির কথা!

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল; কিন্তু অনেকটা অচৈতন্য অবস্থায়। একটা 'আমি'র চারিপার্শ্বে ঠুলি-বাঁধা বলদের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার দিন কাটিয়াছিল; সংসার, সমাজ, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি কেমন তাহার সতেজ বৃন্তের উপর নববিকশিত অহংকারকে মৃদু মৃদু আঘাত দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—সেই প্রথম দিনের উপলব্ধিও তাহার মনে আছে। তাহার পর—

সেই কালরাত্রির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে,—যখন তাহার সঞ্জীব,—

তাহার একমাত্র পুত্র, বংশধর, ভবিষ্যতের আশা সঞ্জীবকে ঘিরিয়া চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! আর আকাশের নক্ষত্রগণ নির্নিমেষ নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিয়াছিল!

সেইদিন সে স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জগতের সহিত, সমাজের সহিত, তাহার আর অন্তরের যোগ নাই; সেদিন সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল, নিখিল যৌবনকে বুকের মধ্যে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুষিয়া লইবার ব্যগ্রতাও আর নাই, আবশ্যকতাও ফুরাইয়াছে।

এই সকল কারণে তাহার অন্তরে একটা মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ জাগিয়া আছে যে, তাহার জীবন আনন্দময়ীর পূজার কাজে কখনও আসে নাই। এ কি সামান্য আক্ষেপ! এই আত্মবিস্মৃতি, জগন্মাতার চির-স্নেহময় ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াও এই অন্ধতা, কেমন করিয়া তাহার আসিয়াছিল! অহংকারকে কি এমনই করিয়া দুর্ব্বল মানুষের ক্ষীণদৃষ্টির সন্মুখে ধরিতে হয়? সেই জন্যই কি তোমার সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম মহামায়া—হে বিশ্বজননি!

(৪)

আশ্বিনের নির্মেঘ আকাশে সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। বিশ্বেশ্বর চিত্তকে সংযত করিবার জন্য কালীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গাহিতেছে—

ত্রিদশ-পালিনী খর্পর-ধারিণী বরাভয়দায়িনী জননী,
ত্রিতাপহারিণী অসুর-নাশিনী এস মাতঃ প্রসন্নহাসিনী।
এসো মা জননী মঙ্গলদায়িনী ঘোরা বিভাবরী মাঝারে,
জয় জয় মাতঃ শান্তি-প্রদায়িনী দেহ পদতরী আমারে।

খেয়া পার হইবার জন্য রূপগঞ্জের ধনবান্ পত্তনিদার শ্রীমৃণালকান্তি নদীতীরে উপস্থিত হইল। ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল বটে, কিন্তু মাঝিকে না দেখিয়া বিস্মিত হইল, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নদী পার হইতে হইবে; বোধনের পূর্ব্বেই তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে। মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে, উকিলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এপারে আসিয়াছিল।

তীরে অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, মৃণালকান্তি বিশ্বেশ্বরকে

এক প্রকার আদেশ করিয়াই বলিল "তুই আমাকে পার ক'রে দে—তোকে পুরস্কার দেব।"

বিশ্বেশ্বর যুবকটির পানে চাহিল, বলিল "কে তুমি? নদী পার করা আমার ব্যবসায় নয়। আমি নিজেই পার হবার জন্যে আকুল হয়ে—ঐ আমার মায়ের রাঙা চরণ দুখানির পানে চেয়ে আছি।" বিশ্বেশ্বর মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গাহিতে লাগিল—

ঘোর রণরঙ্গে মাতি শিবা সঙ্গে শিবহৃদি-বিলাসিনী চণ্ডিকে,
অট্ট অট্ট হাসি অরিদল-নাশি' মনোমাঝে এস মাতঃ অম্বিকে।
পাপ-বিনাশিনী পঙ্কজবাসিনী জয় জয় শুভঙ্করী বরদে,
জয়-প্রদায়িনী দুর্গতি-নাশিনী এসো মাতঃ ক্ষেমঙ্করী সুখদে॥

মৃণালকান্তি ক্রমশঃই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সূর্য্য পশ্চিমগগনে ক্রমশঃই হেলিয়া পড়িতেছিল। নদীর পরপারে উৎসবসজ্জায় সুশোভিত আনন্দপুরীতে যাইবার জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এক প্রহরের মধ্যেই পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে বুঝিয়া, আজ ষষ্ঠীর বোধন-রাত্রি তাহাকে এপারের জনহীন, আশ্রয়হীন নদীতীরে বুঝি বা যাপন করিতে হয়!

অধীরচিত্তে বিশ্বেশ্বরকে বলিল "তুই আমাকে পার ক'রে দে', তোকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিব।"

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিল। বলিল "তুমি কি আহাম্মুক! তুমি এ পারে দাঁড়িয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে কাণ্ডারীকে ডাক্‌ছো? তা হয় না, তা হয় না!" বিশ্বেশ্বর আবার গাহিল--

জয় জয় শান্তি-শক্তি-প্রদায়িনী, ভব-বন্ধ-বিনাশিনী কালিকে,
নমামি তারিণী, মাতঃ করালিনী দীনজনে দয়া কর অম্বিকে।

বিশ্বেশ্বরের কি মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে? হইতে পারে; কেন না, আজ দুই দিন হইল, নদীতে একজন দশ বৎসর বয়স্ক বালককে স্নান করিতে দেখিয়াছিল, যাহার মুখাবয়ব তাহার সঞ্জীবের ন্যায়। সেই অবধি তাহার অনাবিল চেতনায় আবার অহংএর কালিমা পড়িয়াছে। সেবাব্রত ধারণ করিয়া যে শান্তি বিশ্বেশ্বর পাইয়াছিল, আবার সেখানে আবর্ত্ত উঠিয়াছে।

যাহা বিস্মৃত হইতে চাহে, আবার তাহা এক বালককে দেখিয়া মনে পড়িয়াছে। আজ বিশ্বেশ্বর একটা স্মৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেছে।

এদিকে মৃণালকান্তি ক্রমশঃই অস্থির হইয়া উঠিতেছে। ষষ্ঠীর ক্ষীণ চন্দ্র, সন্ধ্যার ধূসরগগনে ক্রমশঃই স্পষ্ট হইতেছে। মৃণালকান্তির মনে হইল, নদীর তরঙ্গ সকল ফুলিয়া ফুলিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

বিশ্বেশ্বর মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গাহিতেছে --

কাল-প্রবাহিনী ভীষণনাদিনী নাহি তরী আশাময়ী আজিকে,
নমামি জননী অসুরনাশিনী দয়া করি মুক্তি দেহি চণ্ডিকে।

মৃণালকান্তি আতঙ্কে সত্যই শিহরিয়া উঠিল। তাহার সম্মুখে প্রবাহিতা ভৈরবী নদী বৈতরণীর রূপ ধারণ করিল। আত্মধিক্কারে তাহার মন জর্জ্জর হইয়া উঠিল। সে ত মুক্তির জন্য মহামায়ার পূজা কখনও করে নাই! অর্থ, মান, প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য সমারোহের সহিত পূজা করিয়া আসিতেছে, এবং এ বৎসর বিশেষভাবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। মৃণালকান্তি সত্যই শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময়ে তাহার গুরুদেব শ্রীরামপ্রসাদ সাংখ্যতীর্থ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনিও নদী পার হইয়া শিষ্যালয়ে যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন এবং গ্রাম হইতে মাঝি, দাঁড়ি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও বিষয়ীলোক।

গুরুদেবকে দেখিয়া মৃণালকান্তি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিল "আমায় কৃপা করুন, আমি মহাপাপী; বিষয়লালসায় আমি দেবীকে পূজা করিয়া আসিতেছি, আমায় দয়া করুন; আমায় জ্ঞান দান করুন।"

শিষ্যের কাতরতা দেখিয়া গুরুর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন; বিশ্বেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই সর্ব্বস্বত্যাগী সাধককে অনুনয় করিয়া তোমার গৃহে লইয়া যাও। ইনি তোমাকে বন্ধুভাবে যাহা করিতে বলিবেন, তুমি তাহাই নিষ্ঠার সহিত করিও, দেবী প্রসন্না হইবেন।"

সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল। গোধূলির রক্তিমচ্ছটায় নদীর তরঙ্গসকল অপূর্ব্ব-

সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছিল। তিনজন যাত্রীকে লইয়া মাঝি নৌকা খুলিয়া দিল। ওপারের মৃণালকান্তির অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে উজ্জ্বল উৎসবালোক জ্বলিয়া উঠিল—দূর হইতে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি, নৌকা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী বিশ্বেশ্বরকে মৃণালকান্তি একাগ্রচিত্তে দেখিতেছিল,—আহা! তাহার প্রশস্তললাটে কি শান্তি,—যোগে অভ্যস্ত হৃদয়ে কি স্তব্ধতা,—নয়নে কি প্রসন্ন স্নিগ্ধ দিব্য বিভা বিরাজ করিতেছে!

(৫)

পরদিন সপ্তমীর ঊষা আর্য্যসন্তানের হৃদয়দ্বারে নূতন আশার, নূতন বিশ্বাসের বাণী যখন আনয়ন করিল, তখন বিশ্বেশ্বর দালান-আলো-করা জগন্মাতার প্রতিমার পানে চাহিয়া কুশাসনে বসিয়াছিল। তাহার চিত্তের সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা আর নাই। বিশ্বেশ্বর আজ দেবীকে দর্শন করিবার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিয়াছে; নদীতে স্নান করিয়া, আনন্দময়ীকে আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিবে এই আশা লইয়া প্রতিমার সম্মুখে কুশাসনে যোগীর ন্যায় উপবেশন করিয়া আছে। তাহার বিশ্বাস, এ বৎসর আনন্দময়ীর পূজা সত্য হইবে, সফল হইবে।

জগজ্জননীর কি ঐশ্বর্য্যময়ী প্রতিমা আজ তাহার সম্মুখে! সিংহের পৃষ্ঠে জগৎপালিনী নতনেত্রে, স্মিতাননে তাঁহার সৃষ্টির প্রতি করুণা, স্নেহ বর্ষণ করিতেছেন, আবার অপরদিকে শাণিত প্রহরণে শত্রু সংহার করিতেছেন। তাঁহার একপার্শ্বে ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মী, অপরপার্শ্বে জ্ঞানপ্রদায়িনী সরস্বতী, একপার্শ্বে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, অপরপার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গণেশ—এবং উপরে এই জগৎপালনকার্য্যের দ্রষ্টা তেত্রিশকোটী দেবতা।

যে মহাশক্তির তরঙ্গে এই বিশ্বজগৎ জন্মমৃত্যুর আঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই দোদুল্যমান, যে মহাশক্তির ক্ষীণতম এক ধারা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াই মানুষ "আমি আছি এবং আমি চিরকালই থাকিব" এইরূপ অহংকারে আত্মজ্ঞানহারা হইয়া পড়ে,—সেই মহাশক্তিকে মৃণালকান্তি এতদিন তাহার সাংসারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই পূজা করিয়া আসিতেছিল। এতদিন কি বিড়ম্বিতই হইতেছিল! আজ আর তাহার সেই অহংকার নাই, মৃণালকান্তিও দেবীর চরণে কাতর কণ্ঠে,—

"ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি" বলিয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। মৃণালকান্তি বিষয়লালসার প্রবঞ্চনা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, ধন্য হইয়াছে।

প্রতিমা দর্শন করিবার জন্য প্রাঙ্গণে যে জনতা হইয়াছিল, তাহা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের কিম্বা জাতিবিশেষের নহে। দেবীকে দর্শন করিবে বলিয়া জ্ঞানী, অজ্ঞানী, দরিদ্র, ধনবান্, আহূত, অনাহূত সকলেই উপস্থিত ছিল। তাহাদেরও সকলের নয়ন প্রতিমার পানে নিবদ্ধ ছিল, দেবীর চরণে মস্তক প্রণত হইয়াছিল। একই প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, দরিদ্র, ভিক্ষাদাতা এবং ভিক্ষুক সম্মিলিত হইয়া দেবীর আরতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহারা সত্যই দেখিতে পাইল—প্রতিমার নয়নে প্রসন্নহাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে! শঙ্খঘণ্টার উচ্চনিনাদে বিপুল জনতার চেতনা জাগিয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর আর কিছুই নিরীক্ষণ করিতেছিল না। মৃণ্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী জগন্মাতার মূর্ত্তিতে তাহার গৃহ-হারা উদাস চিত্তে আজ আবির্ভূতা হইয়াছেন; সে কি দিব্যালোক উদ্ভাসিত অপরূপ-মূর্ত্তি!

দেবীর পানে চাহিতে চাহিতে বিশ্বেশ্বরের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইল; কোনও শব্দই সে আর শুনিতে পাইল না; ধূপ ধূনার চিত্ত-প্রফুল্লকর সৌরভও সে আর আঘ্রাণ করিতে পারিল না; এমন কি কাহাকেও নয়নে দেখিতে পাইল না। সকল ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে; চিদাকাশে আনন্দময়ী জগন্মাতার অসুর-বিনাশিনী দশপ্রহরণধারিণী মূর্ত্তি প্রতিভাসিত হইয়াছে। বিশ্বেশ্বর অটল অচল স্থাণুর ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন। বিশ্বজননী তাঁহার আশ্রয়হীন সন্তানকে স্নেহচ্ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়া শান্তি, সান্ত্বনা জ্ঞানালোক প্রদান করিতেছেন।

এত দিনের পর গৃহহারা বিশ্বেশ্বর মাতৃদর্শন করিয়া ধন্য হইলেন।

বলিরহস্য।

[স্বামী দয়ানন্দ]

বিঘ্ন শান্তি ব্যতীত ইষ্টোপাসনাতে সফলতা লাভ হয় না। এ জন্য বিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত শাস্ত্রে বলিদানের বিধি আছে। সাধকের অধিকার অনুসারে বলিদান কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আত্মবলিই সর্ব্বোত্তম। পূজার অন্তে শ্রীভগবানে আত্মাকে নিবেদন করিতে পারিলে, জীবভাব-মূলক অহঙ্কার আমূল নাশ প্রাপ্ত হয় এবং সাধক অনুত্তম সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন। বলিদান প্রক্রিয়ায় কাম ক্রোধাদি রিপুর বলিদান দ্বিতীয়-স্থানীয়। এইরূপ বলিদানের দ্বারা সাধক শীঘ্রই সংযতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত হইয়া উন্নত যোগমার্গের অধিকারী হন। ইহা ব্যতীত পূজার অন্তে অবশিষ্ট দ্রব্যাদির দ্বারাও বলিদানের বিধি আছে। এই বিধিমতে ইষ্ট-দেবতার প্রীত্যর্থ উত্তম ফলমূলাদির বলি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিধিপূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে বলি সমর্পণ করিয়া পরে অন্য দেবতা ও পিতৃগণের প্রীতির জন্য বলিদান করা উচিত। পরে ভূতগণ ও পশুপক্ষী-গণের তৃপ্তির জন্য ভূমির উপর অন্ন রাখা উচিত। এইরূপে প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে বলি বৈশ্বদেবের বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন সম্প্রদায়ে ছাগাদি যজ্ঞপশুর বলিদানেরও বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। কালচক্রে প্রক্রিয়ার উপর এরূপ অজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, লোকে পশু বলির উদ্দেশ্য ও অধিকার না জানিয়া পশুহিংসার প্রশ্রয় মাত্র প্রদান করিতেছে। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে পশুহিংসার বিধি পরিদৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু উহা হিংসার প্রশ্রয়দানের জন্য নহে, প্রত্যুত হিংসা বিদুরিত করিবার জন্য। উহা যজ্ঞীয় হিংসা দ্বারা কিরূপে হইতে পারে তাহা বর্ণিত হইতেছে। প্রত্যেক মনোবৃত্তির স্বভাবই এই যে, উহাকে কোন নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত না করিলে ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনর্গল ভোগের

দ্বারা ভোগ-সংখ্যা বাড়িয়াই থাকে, উহার কখনই হ্রাস হইতে পারে না। এই জন্য যাহারা একেবারে ভোগ ত্যাগ করিতে পারে না এইরূপ মধ্যমাধিকারীর ক্রমশঃ ভোগ ত্যাগের জন্য শাস্ত্রে ভাবশুদ্ধিপূর্ব্বক নিয়মিতভাবে ভোগের বিধান করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি প্রত্যেক পুরুষের যে নৈসর্গিক ভোগলালসা, তাহাকে নিয়মবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিবার জন্য বিবাহ-সংস্কারের বিধান শাস্ত্রে করা হইয়াছে। বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পুরুষ নিজের স্ত্রীভিন্ন অন্য স্ত্রীর প্রতি মাতৃবুদ্ধি করিতে শিখেন এবং স্ত্রীও এইরূপে পাতিব্রত্যের মধুরাস্বাদ পান। এইরূপে সমস্ত সংসার হইতে কামপিপাসা প্রত্যাহৃত করিয়া এক স্ত্রীতে অর্পণ করা হয় এবং তাহাতে নিয়ত কামবৃত্তি পালন না হইয়া ঋতুকালগমন, গর্ভাধানসংস্কার, নিষিদ্ধ-দিন-প্রতিপালন আদি সংযমের বিধি অনুসারে ভোগ বাধা দূরীকৃত হইলে কিছুদিনের মধ্যেই পুরুষ প্রাক্তন কামসংস্কারের প্রবাহে প্রবাহিত না হইয়া, সমুদয় প্রাক্তন কামসংস্কার নষ্ট করিতে পারেন এবং এইরূপে নিবৃত্তিভাবের উদয় হইলে, তিনি ব্রহ্ম-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করেন। যজ্ঞীয় পশুহিংসাবিধি এইরূপ সদুদ্দেশ্য লইয়াই বেদাদি শাস্ত্রমধ্যে বিহিত হইয়াছে। সমস্ত যজ্ঞ ত্রিগুণানুসারে ত্রিধা বিভক্ত। শাস্ত্রে লেখা আছে,—

> সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
> রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
> সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
> বিনামন্ত্রৈ স্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা॥

জপ, যজ্ঞ এবং নিরামিষ নৈবেদ্য দারা পূজাকে সাত্ত্বিক পূজা বলে। মাংসাদি আমিষ দ্রব্য দ্বারা পূজাকে রাজসিক পূজা বলে। জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্রহীন সুরামাংসাদি উপহার দ্বারা পূজাকে তামসিক পূজা বলে। এই তামসিক পূজা কিরাতগণের অভিমত। যাঁহাদের প্রকৃতি সত্ত্বগুণময় তাঁহারা স্বভাবতই অহিংসাপরায়ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে সাত্ত্বিক পূজাই বিহিত। কিন্তু হিংসাপরায়ণ রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত সাধককে সহসা সাত্ত্বিক

পূজা করিতে বলিলে অধিকার বিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি ত তাহা পারিবেন না। এই জন্য যাহাতে তিনি ধীরে ধীরে হিংসাপূর্ণ রাজসিক পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া, হিংসারহিত সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হন, এই জন্যই শাস্ত্রে বৈধ-হিংসার বিধান করা হইয়াছে। হিংসাপরায়ণ, যথেচ্ছ মাংসভোজী পুরুষকে প্রথমতঃ বলা হইল যে তুমি মাংস খাইতে পার, কিন্তু যথেচ্ছ মাংস খাইও না। নির্দ্দিষ্ট দিনে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া তাঁহাকে মাংস সমর্পণ করিয়া প্রসাদরূপে উহা ভক্ষণ কর। এইরূপ আজ্ঞা করিলে ফল এই হইবে যে, উল্লিখিত মাংসভোজী নিত্য মাংস ভোজন করিতে পারিবে না, মাসের মধ্যে অল্পদিনই মাংস খাইতে পাইবে। দ্বিতীয়তঃ পূজার জন্য অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে অর্থব্যয় হওয়ায় মাংস-ভোজনের নিমিত্ত ব্যয়সঙ্কোচ করিবারও সম্ভাবনা বাড়িবে। তৃতীয়তঃ ইষ্টদেবতার উপাসনায় চিত্ত আকৃষ্ট ও আনন্দযুক্ত হইতে থাকিলে হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের বৃদ্ধি হইবে, যাহার দ্বারা রাজসিক হিংসাদি ভাব কমিয়া আসিবে। চতুর্থতঃ, সমর্পিত মাংসকে প্রসাদরূপে গ্রহণের অভ্যাস বাড়িয়া ভোগলালসা ও মাংসলোভ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। এই সকল কারণেই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।"

যজ্ঞশেষ ভোজন করিলে পাপনাশ হয়। এইরূপে রাজসিক প্রকৃতির সাধক যদি মাংস ভোজনকে সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া নিয়মিতভাবে মাংস-প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সত্বর তিনি হিংসামূলক রাজসিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া হিংসাহীন সাত্ত্বিক পূজার অধিকারী হইবেন। তাঁহার মাংসভোজনেচ্ছা অচিরে বিদূরিত হইবে এবং তিনি পরম সাত্ত্বিক জীবন লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়সের অধিকারী হইবেন। গীতায় আছে,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাৎ কর্ম্মসঙ্গিনাম্"

এই কথা বলিয়া অনধিকারীর যে বুদ্ধিভেদ নিষেধ করা হইয়াছে আর তাহার অধিকারানুসারে ধর্ম্মবিধি বলিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপরিলিখিত ধর্ম্মবিজ্ঞানই তাহার মূল কারণ। এইরূপে বেদ ও বেদানুমোদিত শাস্ত্রসমূহে রাজসিক প্রকৃতি সাধকগণের কল্যাণ ও

আত্মোন্নতির নিমিত্ত যজ্ঞীয় হিংসার বিধান করা হইয়াছে। উহা হিংসার প্রশ্রয়দানের জন্য নহে, কিন্তু প্রাক্তন হিংসা-সংস্কারের ক্রমশঃ নাশের জন্য। অতএব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে, ঐরূপ বিধি বেদাদি শাস্ত্রের পূর্ণতারই পরিচায়ক, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, যে শাস্ত্র সকল অধিকারীরই কল্যাণ করিতে পারে তাহাই পূর্ণ শাস্ত্র। আর যে শাস্ত্র উন্নত অধিকারীরই কল্যাণ করে, অবনতকে ঘৃণা করে, তাহা অপূর্ণ শাস্ত্র। পরম সাত্ত্বিক হইতে মহা তামসিক প্রকৃতি পর্য্যন্ত সকল সাধকেরই কল্যাণকারিণী শক্তি আর্য্যশাস্ত্রের দূষণ নহে, পরম ভূষণ। এই কারণেই স্বভাব-সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণের জন্য পশু-যাগবিধি বর্জ্জিত হইয়াছে। চণ্ডীতে বৈকৃতিক রহস্যে আছে,—

"বলিমাংসাদি পূজেয়ং বিপ্রবর্জ্জ্যা ময়েরিতা।
তেষাং কিল সুরামাংসৈর্নোক্তা পূজা নৃপ ক্বচিৎ॥"

ব্রাহ্মণগণ বলিমাংসাদি সমন্বিত পূজার বর্জ্জন করিবেন। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সুরমাংসাদি দ্বারা পূজা কুত্রাপি বিহিত হয় নাই।

ধর্ম্ম-প্রচারক।

প্রেম পুলকিত কুসুম কুঞ্জে
ঢালিয়া মধুর সুধার ধার।
মাতা'ও মধুপে করিয়া মুগ্ধ,
জাগুক বিশ্ব আজি আবার।
জাগ্রত করি নূতন ছন্দে,
নীরব রাগিণী ধরিয়া তান্।
গা'ও পুনঃ আজি মোহিয়া বিশ্ব,
বীণার নিনাদে শ্রুতির গান

উজল কিরণে হইয়া দীপ্ত,
উঠুক গগনে তারকাচয়।
মরম মাঝারে ধরম কীর্ত্তি
গ্রথিত বিশ্বে যেন গো রয়॥
তিমির রজনী হউক অন্ত
পুলকে আলোক পরশ পেয়ে।
মোহের মহিমা টুটিয়া বিশ্বে
জ্ঞানের গরিমা ছুটুক ধেয়ে॥
রবির কিরণ করিয়া মন্দ
যাউক গরজি গগন ভেদি।
থাকুক বিশ্বে তোমারি কীর্ত্তি
নাচুক তুফানে প্রেমের নদী॥
বহিছে জগতে শতেক ধারা
লইয়া তাদেরে জলধি সম।
মিশায়ে সকল আপন বক্ষে
গরজ, গভীর নাশিয়া তম॥
ক্ষীণ জ্ঞানালোক যে দিন বিশ্বে
তামস কলুষ কালিমা ভরা।
"ধর্ম্ম প্রচারক" সে দিন হর্ষে
তব জাগরণে মগন ধরা॥
পথ হারা হ'য়ে যে দিন ভ্রান্ত
শ্রান্ত পথিক পিয়াসে ধায়।
লভিয়া তোমার করুণা বিন্দু
সুখের সলিলে ভাসিয়া যায়॥
কভু বা বুদ্ধ, শঙ্কর, তুমি
কভু গৌরাঙ্গ বিবেকানন্দ।
জাগ নব সাজে নূতন রঙ্গে
ভারত কলুষ করিতে মন্দ॥

আজি পুনঃ তব ভারতবর্ষে
হউক ঘোষিত বিজয় গর্ব্ব।
তব জাগরণে জাগুক বিশ্ব
মোহের স্বপন করিয়া খর্ব্ব॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্ত শাস্ত্রী।

শান্তি কোথায় ?

(শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বেদান্তবারিধি।)

অনন্ত করুণাকর পরাৎপর পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব কল্পনাচাতুর্য্যের বিলাসভূমি দৃশ্যমান বিশ্বচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মনস্বী মানবমাত্রই দেখিতে পাইবেন যে, সমস্ত জগৎ যেন কোন এক অবিজ্ঞেয় বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি, সমস্ত বল ও সমস্ত সাধনার বিনিয়োগ করিতেছে এবং যোগিজনের ন্যায় একমনে তাহারই ধ্যানে দিনযামিনী যাপন করিতেছে। কিন্তু সে জানে না যে, যাহা পাইবার জন্য এত ক্লেশ, এত আয়াস, এত শক্তি ও সময় ব্যয় করা হইতেছে, তাহা কি, এবং কিপ্রকার বা কোথায় আছে; কোথা গেলেই বা তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। জানে না বলিয়াই যত গোল; জানে না বলিয়াই আজ বিশ্বমানব উন্মত্তের ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পথহারা পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; নিজে অনন্ত রত্নের অধীশ্বর হইয়াও সামান্য কপর্দ্দকের আশায় পরের দ্বারস্থ হইতেছে, এবং অনন্ত আনন্দের অক্ষয় আকর হইয়াও ক্ষুদ্র আনন্দের অন্বেষণে বহির্মুখে ধাবিত হইতেছে; পার্থিব পদার্থ পাইবার প্রত্যাশায় পর্য্যায়ক্রমে স্ত্রী-পুত্র-ধন-জন প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতেছে; আর প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া অতৃপ্তমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছে, এবং দুর্ল্লভ মানবজীবনকেও অপার দুঃখভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বহ মনে করিয়া কাতর হইতেছে।

জীবের যে এত লাঞ্চনা, এত বিড়ম্বনা ও আশাভঙ্গ, তাহার কারণ কি? তাহার একমাত্র কারণ জীবের অজ্ঞতা বা সংসার-ব্যামোহ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জীব যাহা চাহে, প্রকৃতপক্ষে সে তাহার কোন খবরই রাখে না; আপামর সাধারণ জীবমাত্রেই চাহে অনাদি অনন্ত ভূমা আনন্দ-শান্তি-সুখ; যাহা একবার অধিগত হইলে পর, কস্মিনকালেও আর বিয়োগের ভয় থাকে না. এবং জগতে যাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু লাভযোগ্য আছে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং মনের সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া যায়; মন তখন কষিত কাঞ্চনের ন্যায় নির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল, এবং নির্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ধীর হইয়া কৃতার্থতা লাভ করে। ভগবান ইহাকেই সর্ব্ববিধ দুঃখসম্পর্কশূন্য যোগবিশেষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং যতঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।
তং বিদ্যাৎ দুঃখসংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্॥"

জীবগণ ইহারই অনুসন্ধানে উন্মত্ত, ইহারই বিমল রসাস্বাদলোভে ব্যাকুল হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছে। বিশ্ববিশ্রুত ফল্গুনদীর অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে স্বচ্ছ-শীতল সলিলরাশি প্রবাহিত থাকিলেও, অনুসন্ধান পরাঙ্মুখ বহির্দ্দর্শী মূঢ় লোকেরা যেরূপ তাহাতে নীরস বালুকারাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না. তদ্রূপ যাহারা অন্তর্দৃষ্টিবিহীন, ইহলোকসর্ব্বস্ব, তাহারাও, জীবের অন্তরে, যে নিত্য-নিরাময় পরমানন্দঘন পরমাত্মাভিমুখে শান্তিসহচর প্রেমরসের পরম পবিত্র প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিয়াও ধরিতে পারে না। এবং যে পথে গেলে আপনার চিরবাঞ্ছিত বস্তু পাইতে পারা যায়, সে পথে পদার্পণ করে না; কাজেই আজীবন যাহা কিছু করে, সমস্তই পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

"অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥"

অর্থাৎ জীব অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ানিদ্রায় বিমোহিত হইয়া বিশ্ব-

বৈচিত্র্য বিষয়ে নানা প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া আপনাকে কখনও সুখী, কখনও বা দুঃখী বলিয়া মনে করিতেছে ; এই মায়া-নিদ্রা যে কত দিনের, তাহা নির্ণয় করা যায় না ; ইহা অনাদি। জীব সৌভাগ্যবলে যে সময় এই মায়া-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হইবে—প্রবোধ লাভ করিবে, তখনই সে বিশ্বরহস্য বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং নিত্য-সত্য অদ্বিতীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার লাভ করিবে। এই অপূর্ব্ব অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে, শান্তি-সুধার মহনীয় রসাস্বাদের যোগ্যতাও আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয় ; তখন জীব সেই দুর্লভ শান্তিসুধার রসাস্বাদে আত্মহারা হইয়া বিশ্ব-বৈচিত্র্যের কাল্পনিক রমণীয়তার কথাও ভুলিয়া যায় ; জীব চিরদিনের জন্য কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে।

উল্লিখিত শান্তি-সুধা আস্বাদন করিতে হইলে, অপরাপর সাধনের ন্যায় প্রধানতঃ 'প্রত্যাহার' সাধনার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। প্রত্যাহার অর্থে—বাহ্যবিষয়াসক্ত বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়নিচয়কে সাধনক্রমে অন্তর্ম্মুখ করা—আত্মাভিমুখী করা। কঠোপনিষদে কথিত আছে,—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূং তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"

অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই বহির্ম্মুখ বাহিরের বিষয় দর্শন করিতেই ভালবাসে ; ইহা যে, ইন্দ্রিয়গণের স্বকৃত ব্যাধি, তাহা নহে, স্বয়ং পরমেশ্বরই উহাদিগকে ঐরূপ প্রবৃত্তিসহযোগে সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই কারণেই উহারা সতত বাহিরের দূরবর্ত্তী বিষয়রাশিও দর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু অতি সন্নিহিত—অন্তর্য্যামীরূপে হৃদয়ে অবস্থিত মহান্ আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু তা' বলিয়া নিশ্চেষ্ট উদাসীন থাকিলে চলিবে না ; ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা যে বস্তুশক্তির বিপর্য্যয় ঘটান যায়, ইহা সর্ব্বসম্মত কথা। এই সনাতন নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, মুমুক্ষু ধীরপুরুষেরা এই প্রত্যাহারের সাধনায় আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন, এবং বহুজন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যবলে যাঁহারা ইন্দ্রিয়নিচয়ের বহির্ম্মুখীবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারেন, তাঁহারাই কেবল এই সদানন্দমূর্ত্তি পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন ; কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প—নিতান্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতই ভোগলম্পট ভোগলিপ্সায় সর্ব্বদা ব্যাকুল ; সেই ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই নিরন্তর বাহিরে ছুটিয়া থাকে ; পেটুক শিশুগণ যেমন নিজের ঘরে উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে, বাহিরে পরের বাড়ী যাইতে বাধ্য হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ ; ইন্দ্রিয়গণ নিজগৃহে শরীর মধ্যে ভোগযোগ্য আনন্দের কোনও

কিছু দেখিতে পায় না; অথচ অনাদিকাল সঞ্চিত ভোগলিপ্সাও সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না; পেটুক ছেলেদের মত ইন্দ্রিয়গণকেও যদি তুমি নিজের দ্বারে (শরীরে) ভোগযোগ্য আনন্দদায়ক কোন কিছু দিতে পার, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাহারা ক্ষণকালের জন্যও বহির্গমন হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনীষিগণ সর্ব্বশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়প্রধান মনকে আত্মোন্মুখ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন; কারণ, আত্মাই আনন্দস্বরূপ; শ্রুতি বলিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," ব্রহ্ম ও আত্মা একই পদার্থ। পিত্তবিকারে যাহার জিহ্বা কলুষিত হইয়াছে, সে যেমন মধুর রস শর্করাতেও তিক্ত রস আস্বাদন করে, তেমনি অবিদ্যা-দূষিত চিত্ত ব্যধি আনন্দ-আত্মাতেও আনন্দের পরিবর্ত্তে বিরসভাব অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু সেই পিত্তরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি যদি সুযোগ্য চিকিৎসকের উপদেশ মান্য করিয়া প্রত্যহ নিয়মিতরূপে শর্করা সেবন করে, তাহা হইলে ক্রমে যেমন তাহার পিত্তরোগ বিদূরিত হইয়া যায়, এবং শর্করায় মাধুর্য্যও উপলব্ধি করিতে থাকে, তেমনি অবিদ্যাভিভূতচিত্ত ব্যক্তিও যদি ভবব্যাধির একমাত্র চিকিৎসক আর্য্য আচার্য্যগণের উপদেশ কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক, নিতান্ত বিরস বোধ হইলেও, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে এই আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার সেই দুরুচ্ছেদ্য অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং আত্মার আনন্দস্বভাব আস্বাদন করিতে পারিবেন; অধিকন্তু, তখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন যে, এতদিন যে, শান্তি পাইবার প্রত্যাশায় দিগ্‌দিগন্তে ছুটাছুটি করিতেছিলেন, সেই 'শান্তি' কোথায়—সেই শান্তি বাহিরে নয়, ভিতরে. প্রবৃত্তিমার্গে নয়, নিবৃত্তিমার্গে। তাই ভীষ্মদেব বলিয়াছেন—

শান্তিশ্চেদিষ্যতে তাত, নিবৃত্তিমার্গমাশ্রয়।
দুঃখায়ৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, নিবৃত্তিশ্চাভয়প্রদা ॥"

কল্পনা-বর্জ্জন

বশিষ্ঠের উক্তি:—

বলিলেন মুনি রঘু-শিরোমণি!
কল্পনার পরিহার।

---

* যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে।

ইহার মরম, পারনি বুঝিতে ?
বলিতেছি এইবার।
জীবন দেহেতে, থাকিতে থাকিতে,
কল্পনা ত্যজিতে হয়।
দেহ যে ত্যজেছে, তাহা তার কাছে
সম্ভব কভু ত নয়।
সুধী সাধু যত, আছে অবগত,
কল্পনা বলিতে "আমি"।
ব্রহ্মাকাশ সেই, শিব সনাতন.
সসাগরা-ধরা-স্বামী।
"আমি" ভাবিতেই, ব্রহ্মের ভাবনা,
কল্পনা ত্যজন অই।
বাহ্য পদার্থের অনুভব যাহা,
কল্পনা তারেই কই।
শরীর তোমার, বস্তু যত আর.
নয়নে প্রত্যক্ষ হয়।
আপন বলিয়া, আছ যা ভাবিয়া,
কল্পনা সে সমুদয়।
যাহা অনাগত, অথবা অতীত,
তাহাকেই স্মৃতি বলে।
সেই স্মৃতিকেও, জানিবে কল্পনা,
প'ড়না তাহার ছলে।
স্মৃতির অভাব, শিব ব্রহ্মভাব,
অতএব মহামতে!
ভূত অনাগত, অথবা আগত,
কিছুতেই কোন মতে,
ভুলনা ভুলনা, ওসব ছলনা,
ব্রহ্মাকাশে হও লীন।
সুস্থির সুজন, দারুর মতন,
চিত্ত-চপলতা-হীন।
হ'ক তব রূপ. বিস্মৃতি স্বরূপ.
নিত্যকর্ম্ম আছে যত,
কর সম্পাদন, অর্দ্ধ-নিদ্র-শিশু
স্পন্দন ক্রিয়ার মত।

কুম্ভকার-চক্র, ঘুরিছে সদাই,
সে শুধু অভ্যাস তার।
কল্পনা ত নাই, তুমি ঠিক তাই,
কর দেখি, একবার।
পূর্ব্বের সংস্কার, আছে যা তোমার,
কেবল তাহারি বলে।
নিত্যকর্ম্মচয়, যা করিতে হয়,
ক'রে যাও যেন কলে।
মন বিদ্যমান, নাহি ত তোমাতে,
বাসনা-বিহীন চিত।
কেবল তাহার, রয়েছে সংস্কার,
ক্ষীণভাবে অবস্থিত।
সেই সংস্কার, প্রবাহে তোমার,
করম পড়িবে যেই।
তাহাই করিবে, তাহাতে নড়িবে,
নহে অন্য কিছুতেই।
এই শুভময়, কল্পনা বর্জ্জন,
মোহ এর অন্তরায়।
হৃদে চিন্তামণি, তারে ত্যজে নর,
এই মোহ-মহিমায়।
এই সুবচন, শ্রেয় যে কেমন,
দেখ না চিন্তিয়া চিতে।
অন্তরে অন্তরে, ভাব ভাল করে,
অনুভব বিধিমতে।
সাম্রাজ্য-সম্ভোগ, তৃণবৎ ছার,
পরম পদের কাছে।
শুধু মৌনী হ'লে, যদি তাহা মেলে,
না হয়, হেন কে আছে?
বিদেশে যাইবে, বলিয়া পথিক
করে পদ সঞ্চালন।
পদের চালনে, নাহিক কল্পনা,
তেমনি রগু-রতন!
বিনা কল্পনায়, করহ করম,
আকাঙ্ক্ষা রেখনা চিতে।

বুদ্ধির স্থাপনা, কর'না কর'না,
ভুলিওনা কোন মতে।
কর বুদ্ধিযোগ, অদ্বিতীয় একে,
চিদাকাশ সীমাহীন।
বুদ্ধির ভাজন, শুধু সেই জন,
যেনে রেখ' চিরদিন।
তৃণ যথা নড়ে, পাতা যথা পড়ে,
বায়ু বা অপর বলে।
তোমারো তেমন, হইবে স্পন্দন,
শুধু সংস্কারের ফলে।
কাঠের পুতুল, নাচে সে কেমন,
দেখে যে, আমোদ পায়।
অপরের বলে, করে সে নর্ত্তন,
রস-বোধ নাহি তায়।
তুমিও যখন, কর্ম্ম সম্পাদন
করিবে, পুতুল প্রায়
করম করণে, যেন তব মনে,
রস নাহি উপজয়।
হেমন্ত সময়, যথা তরুচয়,
নীরস হইয়া পড়ে।
তোমারো করণ, হউক তেমন,
রসহীন চিরতরে।
সৌরাতপে লতা, রসহীনা যথা,
তরু বিজড়িত তার।
লতার মতন, তরুও যেমন,
নিজেও শুকায়ে যায়।
তুমিও তেমনি, জ্ঞান-দিন-মণি-
কিরণে, বিশুষ্ক প্রাণ,
সহ বৃত্তি চয়, কাষ্ঠ পুত্তলিকা
সম, কর অবস্থান।
বাহিরে নীরস, ভিতরে সরস,
শীতে যথা তরুবর।
ইন্দ্রিয় তোমার, চিৎ রসে মাখি,
সিক্ত রাখ নিরন্তর।

বাহিরের রসে, কভু যদি রসে,
তোমার ইন্দ্রিয়গণ।
অর্থ বা অনর্থ, কর্ম্ম অকরম,
হইবে না নিবারণ।
বায়ু বা অনল, কিম্বা যথা জল,
সংকল্পবিহীন হয়ো'।
স্পন্দিত রহিয়ো, তা হ'লে তুমিও,
লভিবে অনন্ত শ্রেয়।
বাসনা বিনাশে, অভ্যাসের বশে,
নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন।
সে মহা ধৈরজে, চরমে উপজে,
জন্ম জ্বর নিবারণ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সরকার

সাহিত্য-সমালোচনা।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য। ইহা ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়, অতি প্রাঞ্জল, সরস ও সুন্দরভাবে বঙ্গভাষায় এই দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া, বঙ্গজননীর ভাণ্ডারে এক অমূল্য নিধি প্রদান করিয়াছেন। আজকাল পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহমদিরার অচিন্ত্যপ্রভাবে সংস্কৃতের চর্চ্চা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে; তদুপরি দর্শনগ্রন্থ সমূহ অতি দুর্ব্বোধ বলিয়া তাহার পাঠক অতীব বিরল। এমন কি সাধারণের মধ্য হইতে উহার প্রচলন লুপ্ত হইতে চলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে দর্শনগ্রন্থ ও তাহার ভাষ্যাদির এইরূপ সরল বঙ্গানুবাদ বিশেষ প্রয়োজন। তর্কবাগীশ মহাশয় এই অভাব পূরণে উদ্যোগী হইয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, বাঙ্গালী পাঠককে এইরূপ অমূল্য দার্শনিকগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ উপহার দিয়া, বাঙ্গালীর ও বঙ্গভাষা জননীর উপকার ও শ্রী বর্দ্ধন করুন।

প্রজাপতি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু, বি, এ প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। আমরা সত্যেন্দ্রবাবুর এই পুস্তকখানি পাইয়াই, মনে মনে সন্দেহ করিয়াছিলাম "প্রজাপতি" কি? ইহা কি প্রজাপতি ব্রহ্মার চরিত-কথা বা

মাহাত্ম্য? কিন্তু পুস্তকের ক্ষুদ্র ভূমিকাটুকু পাঠ করিয়া সে সন্দেহ দূর হইয়াছিল, ইহা বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার আদরের উপন্যাস। কিন্তু তখনও বুঝি নাই, রসসাহিত্যে এ বিভ্রমকারী শিরোনামের তাৎপর্য্য কি। পরে দুই চারি পরিচ্ছেদের পরই, অসিতকুমারের পিসীর বাড়ীর ভোজে, যখন দেখা গেল, গাড়ী, জুড়ি, মোটর হাঁকাইয়া, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, উকীলের বিরাট্ সমাগম হইল এবং তাহাতে কেবল নব্যশিক্ষিতদলের সৌখীন পুরুষ ও স্ত্রী সাজের ও বাক্যের চাকচিক্যে মজলিস্‌টাকে প্রাণের মিলনক্ষেত্র না ক'রে, আড়ম্বরের লীলাস্থল করিয়া তুলিল, তখনই বুঝা গেল গ্রন্থের ইঙ্গিত কোন দিকে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা এইখানেই বিরক্ত হইয়া পুস্তক বন্ধ করিতে পারেন। এবং অরুণার ন্যায় তাঁহারাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন যে, নারীর সম্মান যে লেখক জানেন না, তাঁ'র পুস্তক নিশ্চয়ই কীটদষ্ট হইবে তাঁহারা স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু আমরা অনুরোধ করি, পাঠিকা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, সত্যেন্দ্রবাবু সাধারণ লেখকের ন্যায় পাঠিকাগণের অন্ধভক্ত না হইলেও, তাঁহাদের পরমহিতৈষী বন্ধু। তিনি চা'ন বঙ্গনারী শুধু তার রূপের ডালি ছড়িয়ে, বিলাস, বিভ্রম ও আলস্যের নেশায় জীবনটাকে পঙ্গু করে না তোলে, বোঝে জীবনটা একটা মহা-সমস্যা, যা' দিন দিনই জটিল হইয়া উঠিতেছে—হৃদয়ঙ্গম ক'রে জীবনসংগ্রামে তাহারা বাঙ্গালী পুরুষের যথার্থ সঙ্গিনী। তাঁ'রা মানুষ হ'লে, তবেই বাঙ্গালী মানুষ হ'বে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে। এইজন্যই লেখক অরুণার চরিত্রে, দেখাইয়াছেন যে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে, কেমন করিয়া চিন্তাশূন্য, লঘুচিত্ত, সৌখীন মেয়েটীও, তা'র গুপ্ত আত্ম-শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে এবং বিলাস ও ঐশ্বর্য্যে পদাঘাত করিয়া কর্ম্মের নিষ্ঠায়, নিজের অজ্ঞাতে প্রেমের যজ্ঞে কেমন আত্মবলি দিতে পারে। সত্যেন্দ্রবাবুর এ উদ্দেশ্য অরুণার চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই পুস্তকের মুখ্য তাৎপর্য্য। দুইটী চরিত্র অবলম্বন করিয়া এই তাৎপর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—অরুণা ও অসিত। দু'টী চরিত্রেরই উপাদান সহৃদয়, উদার, গম্ভীর মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের আকর্ষণেই উভয়ের মিলন, উভয়ের প্রেমের সার্থকতা। পাশ্চাত্যশিক্ষিত হইলেও এই সকল গুণেই অসিতের চরিত্র মানুষের মত, বাঙ্গালী যুবকের অনুকরণীয়। সত্যেন্দ্রবাবুর ভাষা সরস, প্রাঞ্জল, ও সাধারণতঃ গ্রাম্যতা-দোষ-শূন্য। আজ কয়েক বৎসর হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা তাঁহার গুণ ও শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ কারণ তাঁহার নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ যে, তিনি তাঁহার এই শক্তিকে কেবল পাশ্চাত্য-প্রথার রসরচনায় নিযুক্ত না রাখিয়া, আমাদের আর্য্যকীর্ত্তি অবলম্বনে সদ্ভাব-

পরিপুষ্ট সাহিত্যের রচনায় নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালীর যথার্থ উপকার সাধন করুন। তাহাতে বাঙ্গালী ধন্য হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহার "প্রজাপতি" সর্ব্বত্র সমাদৃত হউক ও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ হউন।

সাময়িকী

দেবীপূজার সময়। দুর্গাষষ্ঠী :—১৩ই আশ্বিন ঘণ্টা ৯।৫১।৫৫ সেকেণ্ড পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। ১৪ই আশ্বিন :—দিবা ঘণ্টা ৯।৫১।৫৪ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ন; কিন্তু পূর্ব্বাহ্ন এবং কালবেলানুরোধে ঘণ্টা ৮।৫২।২৯ সেকেণ্ড মধ্যে শ্রীশ্রীশারদায়া দুর্গাদেবীর পত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন এবং সপ্তমীবিহিত পূজা আরম্ভ। পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্ত ও পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ। ১৫ই আশ্বিন :—ঘণ্টা ৯।৫১।৫৩ সেকেণ্ড পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে, মহাষ্টমী পূজা প্রশস্ত। রাত্রি ঘণ্টা ১০।৩৯।৩৯ সেকেণ্ড গতে সন্ধিপূজা আরম্ভ। রাত্রি ঘণ্টা ১১।৩।৩৯ সেকেণ্ড গতে ঘণ্টা ১১।২৭।৩৯ সেকেণ্ড মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপূজা সমাপনীয়। ১৬ই আশ্বিন :—পূর্ব্বাহ্ন ও বারবেলানুরোধে ঘণ্টা ৮।৫২।৩৯ সেকেণ্ড মধ্যে মহানবমী পূজা প্রশস্ত। ১৭ই আশ্বিন :— কালবেলা ও পূর্ব্বাহ্নাদির অনুরোধে ঘণ্টা ৭।২৪।৮ সেকেণ্ড গতে ৯।২৪।৫ সেকেণ্ড মধ্যে চরলগ্নে ও চরনবাংশে দশমীবিহিত পূজাসমাপনান্তে দেবীর বিসর্জ্জন। দেবীর নৌকায় আগমন, ফল শস্যবৃদ্ধি; ঘোটকে গমন, ফল ছত্রভঙ্গ।

সৎকার্য্যে দান। হিজ্ হাইনেস ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীমান রেওয়া নরপতি, হিন্দুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের জীর্ণোদ্ধারের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ, শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল যে সব কমিটী গঠন করিয়াছেন, তাহার হস্তে ইতিমধ্যেই মহারাজা বাহাদুর পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। পুণ্যকার্য্যতিলক মহারাজের উপর, দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কার্ত্তিকের ধর্ম্মপ্রচারক। আনন্দময়ীর আগমনে প্রেস ও বঙ্গমণ্ডলের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে বলিয়া, কার্ত্তিকের পত্রিকা প্রকাশে একটু বিলম্ব ঘটিবে। আমরা কার্ত্তিকের পত্রিকা মণ্ডলের সভ্য ও গ্রাহকবৃন্দের নিকট কার্ত্তিকের ৩য় সপ্তাহে পাঠাইব।

নব পর্য্যায়।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্ ।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥

১ম ভাগ { কার্ত্তিক, সন ১৩২৬। ইং অক্টোবর, ১৯১৯। } ৭ম সংখ্যা।

অষ্টক।

ত্যাগে ধর্ম্ম নাহি হয়
নাহি হয় ভোগে ;
ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয়
উভয়ের যোগে।
ত্যাগে ভোগে অনাসক্ত
রহিবে যে জন,
সে পারে করিতে ভবে
ধর্ম্ম উপার্জ্জন ॥
বাসনার নাশে হবে
জ্ঞানের উদয় ;
তখনই যাইবে দূরে
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়।
এ তিন থাকিতে দেহে
পড়ে রবে মন

কেমনে হইবে তবে
ধর্ম্ম উপার্জ্জন ॥
সর্ব্ব জীবে সম দয়া
করিতে যে পারে,
সকলেই মিত্র তার
জানিবে সংসারে।
দয়াতে করিবে আর্দ্র
হৃদয় তোমার
তখন হইবে তাহে
ভক্তির সঞ্চার ॥
বিশ্বাসে স্থাপিত ধর্ম্ম
জানিবে নিশ্চয়
বিশ্বাস হইলে দৃঢ়
ধর্ম্ম দৃঢ় হয়।
শত তর্ক যুক্তি যারে
টলাইতে নারে
তার মত ভাগ্যবান্
কে আছে সংসারে ॥
বাজে কাজে ঘুরে মরি
আমি দয়াময়,
তোমারে ডাকিতে শুধু
হয় না সময়।
উপায় না দেখি আর
তুমি বিনা হরি,
ফিরাও মনের গতি
তুমি দয়া করি ॥
বড় যদি হতে চাও
ছোট হও তবে,

যে পারে হইতে ছোট
সেই বড় ভবে।
বিনয়ে যাহার মাথা
নীচু হয়ে আছে.
পারে কি দাঁড়াতে দম্ভ
কভু তার কাছে?
সবার অন্তরে যদি
বিরাজেন হরি;
আত্মপর ভেদ করে
কেন তবে মরি?
এই ভেদ জ্ঞান হ'তে
অহমিকা আসে
দিনে দিনে হয় জীব
বদ্ধ মায়াপাশে।
যত দিন মন তব
বশ নাহি হয়,
ততদিন আছে জেনো
পতনের ভয়
বশীভূত হ'লে মন
যেখানেই থাক
শত প্রলোভনে মন
আর ভোলে নাক।

শ্রী———

———

মুমুক্ষুত্ব—জ্ঞানের প্রথম সোপান।

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এ,।]

শাস্ত্রে যে জ্ঞানের সপ্তভূমিকার কথা লিখিত হইয়াছে, মুমুক্ষুত্বই তাহার প্রথম ভূমিকা। মুমুক্ষা শব্দের অর্থ মুক্তির ইচ্ছা। ভূমিকা অর্থে সোপান বা স্তর বুঝিতে হইবে।

হে ভ্রাতঃ! সংসারে অনন্ত প্রকার সুখের উপকরণ থাকিতে আজি কেন তোমার মুখে মুক্তির কথা শুনি? তবে কি তুমি মুক্ত নহ? তবে কি তুমি বদ্ধ, পরাধীন! বদ্ধ ব্যক্তিরই মুক্তির প্রয়োজন; যাহার বন্ধন নাই, তাহার আবার মুক্তি কোথায়? অধুনা তুমি মুক্তি মুক্তি করিয়া ব্যস্ত হইয়াছ। মুক্তির পন্থা কি? মুক্তি কত প্রকারের? এই সমস্ত বিষয় লইয়া কতই গবেষণা, কতই বাগ্‌বিতণ্ডা! হায়! তোমার কি রোগ হইয়াছে তাহা অগ্রে সুচারুরূপে অবগত না হইয়া কেবল কোন্ ঔষধের কিবা গুণ, তাহার বিচারেই কালক্ষেপণ করিতেছ! প্রকৃত রোগ নিরূপণ না করিয়া অগ্রে ঔষধের ব্যবস্থা, ইহাকে বিকারগ্রস্ত রোগীর লক্ষণ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? প্রকৃত রোগের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, সকলেই ঔষধের কথা লইয়াই ব্যস্ত!

হে ভ্রাতঃ! তুমি প্রকৃতপক্ষে কখনই বদ্ধ নহ; তুমি পূর্ণভাবে মুক্ত। তুমি পরাধীন নহ; তুমি পূর্ণস্বাধীন। তুমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হও কেন? তোমার আবার মৃত্যু কোথায়? তুমি অবিনশ্বর, তুমি অমর। তুমি কখনই জড়ভাবাপন্ন নহ; তুমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। তুমি অতি স্বচ্ছ, তোমাতে কিছুমাত্র কালিমা নাই। তুমি সুখময়—অনন্ত, অবিচ্ছিন্ন সুখের উৎসস্বরূপ। তোমাতে প্রকৃতপক্ষে দুঃখের লেশ মাত্র নাই। তুমি অভয়; তোমার আবার ভয় কিসের? তবে কেন আজি ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর করাল ছবি দেখিয়া ভয়ে, ত্রাসে, আকুল হইয়া পড়িলে? তবে কেন আজি দুঃখশোকে জর্জ্জরিত, চিন্তাক্লেশে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ?

আত্মবিস্মৃতিই তোমার সমূহ দুঃখদুর্দ্দশার একমাত্র কারণ। তুমি তোমার স্বরূপ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। অনন্ত অসীম তুমি, আজ শান্ত সসীম হইয়া পড়িয়াছ। তুমি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ হইয়া আজ অজ্ঞান অন্ধকারে পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি শুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইয়াও আজ আপনার তুচ্ছ জড়দেহকেই "আমি" ভাবিতেছ। তুমি বিমল আনন্দস্বরূপ হইয়াও দুঃখ-ক্লেশে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছ। তোমার অমরত্ব ভুলিয়া গিয়া আজ মৃত্যু-ভয়ে অসার হইয়া পড়িতেছ। তুমি নিরাময় হইয়াও আজ নানাবিধ ব্যাধির তাড়নে ছট্‌ফট্‌ করিতেছ। অহো! আত্মবিস্মৃতির কি দুঃখময় পরিণাম! বিস্মৃতিবশে আজ তুমি স্বরূপাবস্থা হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছ!

আজ তুমি ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় কখনও হাঁসিতেছ, কখনও কাঁদিতেছ, চলিতেছ, খেলিতেছ; কত যে কি করিতেছ, তাহার অন্ত নাই, অবধি নাই। অথবা তুমি সংসার রঙ্গভূমে নট সাজিয়া নিত্য নূতন অভিনয় করিতেছ। কখনও পুত্র সাজিতেছ, কখনও পিতা সাজিতেছ, শিক্ষক সাজিতেছ, ছাত্র সাজিতেছ, প্রভু সাজিতেছ, ভৃত্য সাজিতেছ, আর সেইরূপই অভিনয় করিতেছ। তোমার আর সাজার শেষ নাই। জন্মাবধি তুমি অনবরত সাজিতেছ, সাজ বদলাইতেছ, আবার নূতন সাজে সজ্জিত হইতেছ। যখনই চিত্তে যেরূপ সাজার বাসনা জাগে, তখনই তুমি সেইরূপে সাজিতেছ আর সেইরূপেই অভিনয় করিতেছ। তুমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, প্রভু, ভৃত্য সাজে অভিনয় করিলেও তুমি যে প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত কিছুই নহ, তুমি যে এ সমস্ত ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু, তাহা একটীবারও তোমার মনে আসে না। কারণ অভিনয়েই একেবারে তন্ময় হইয়া রহিয়াছ।

তোমার চিত্ত অবিরত বাহ্য-বিষয়ের পিছু পিছু ছুটিতেছে। "তুমি কে", তাহা ভাবিবার এক মুহূর্ত্তও অবসর পাইতেছ না। জন্মাবধি চিত্তের এক মুহূর্ত্ত চিন্তার বিরাম নাই। একটী তরঙ্গের পর আর একটী তরঙ্গের ন্যায় চিন্তাস্রোত অনন্তকাল একভাবে ছুটিয়াছে। তোমার চিত্তমৃগ, জলের আশায়, শান্তির আশায়, মায়ামরীচিকায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে। অথবা তোমার চিত্ত পক্ষীর ন্যায় অনন্তকাল অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া একটীবার বিশ্রামলাভের আশায় ব্যাকুল হইতেছে। কিন্তু তুমি

কি চিত্তকে বিশ্রাম লাভ করিতে দিবে ? তোমার চিত্ত সর্ব্বদাই বাহ্যবিষয়ে ডুবিয়া রহিয়াছে ; সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখীন। একটিবারও অন্তর্মুখীন হইবার অবসর পায় না। একটিবারও প্রকৃত বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পায় না। অসত্যের মধ্যে থাকিয়া অসৎভাব প্রাপ্ত হইয়া সত্যের জ্যোতির ক্ষীণ আলোকটুকুও তাহার লক্ষ্য হয় না। সর্ব্বদাই বাসনারূপ জলদজালে আচ্ছন্ন হইয়া সত্য-সূর্য্য দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

চিত্ত তোমার বাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাসনাই চিত্ত। বাসনাই চিত্তের প্রাণ। যতদিন বাসনা, যতদিন আশা, ততদিন চিত্ত থাকিবেই থাকিবে ; ততদিন চিত্ত চিন্তার পর চিন্তায় জর্জ্জরিত, শ্রান্ত, ক্লান্ত হইবেই হইবে, ততদিন তোমার আত্মবিস্মৃতি থাকিবেই থাকিবে। ততদিন তুমি দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবে না ; তোমাকে পরম সুখলাভ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। যদি কখনও তোমার চিত্ত-বিশ্রান্তি ঘটে, যদি ভাগ্যবশাৎ তোমার চিত্ত লয় প্রাপ্ত হয়, তবেই তোমার সম্মুখে সত্যের দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিবে, সেইদিন তোমার দুঃখ কষ্টের চিরকালের মত অবসান হইবে। তুমি আপনার—চিৎঘনস্বরূপ, আনন্দঘনস্বরূপ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিবে। তখন তোমার আর সুখের সীমা থাকিবে না।

যদি চিত্তবিশ্রান্তিই তোমার প্রকৃত সুখের কারণ হয়, তবে তাহা ঘটিবে কি প্রকারে ? চিত্ত বাসনাত্মক। যদি কখনও বাসনার শেষ হয়, তবেই তুমি এই অনন্ত অবিচ্ছিন্ন সুখের আশা করিতে পার, নতুবা নহে। তুমি সংসারে আসিয়া অবধি, যেদিন হইতে প্রথম তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে, সেইদিন হইতে অবিরত বিষয়ের পিছু পিছু ছুটিতেছ। ছুটিয়া ছুটিয়া অনেক সময় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছ। তথাপি তোমার ছুটাছুটির বিরাম নাই, অন্ত নাই। একটী বস্তুর কামনা করিলে। যাদৃশীভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যাহা কিছু ভাবনা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। তুমি ভাবনাবলে কাম্যবস্তুটী প্রাপ্ত হইলে। তোমার সুখ হইল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কাম্য বস্তুটী প্রাপ্ত হও নাই, ততক্ষণ শুধু ঐ বিষয়ের ভাবনা, যত্ন, চেষ্টা করিতেছ। ততক্ষণই দুঃখ, চিন্তা, ক্লেশ। বস্তুটী যেমনই প্রাপ্ত হইলে, অমনি তোমার সুখ হইল। কাম্যবস্তু প্রাপ্তিতে তোমার সুখ হইল কেন,

তাহা কি একবার লক্ষ্য করিয়াছ? লক্ষ্য কর, দেখিবে বস্তুটীর প্রাপ্তিতে কামনাটী ত্যাগ হইল। যতক্ষণ আশা, যতক্ষণ কামনা, ততক্ষণ দুঃখ; আশা মিটিয়া গেলে, কামনা ত্যাগ হইলে দুঃখ দূরে পলায়ন করিবে, তোমার অবশ্যই সুখ হইবে। আর তুমি স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিবে যে কামনা করাই দুঃখ; কামনা ত্যাগই সুখ। একটীবার কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি ঘটিলে, একটীমাত্র কামনা ত্যাগ করিলে, যখন তুমি এতটুকু সুখের অধিকারী হও, তখন সমস্ত কামনা ত্যাগ করিলে তুমি যে অনন্ত অবিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হইতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর কামনা ত্যাগ হইলেই চিত্তবিশ্রান্তি ঘটে। চিত্তবিশ্রান্তিতে বা চিত্তনাশে সংসারও লয় প্রাপ্ত হইবে, মায়ামেঘ কাটিয়া যাইবে, বিষয়মদের নেশাটুকু ছুটিয়া যাইবে। তুমি তখন বিকৃতভাব পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবে। নিরাময় হইবে, সংসাররোগ হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ হইবে।

সংসারে যদিও প্রকৃতপক্ষে সুখ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, তথাপি সুখের মত দেখায় এরূপ কোনও বস্তু আছে, যাহা নিরবধি তোমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে, যাহা সর্ব্বদাই মনোহর রূপ দেখাইয়া বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহা তোমাকে অনবরত ছুটাইয়া ছুটাইয়া মারিতেছে। উজ্জ্বল আলোক দর্শনে পতঙ্গের ন্যায় মানবকুল ক্রমাগত সুখরূপ আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে, কিন্তু মহা ক্ষোভের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ ঐ সুখের সন্ধান পায় নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, সংসারে বিন্দুমাত্র প্রকৃত সুখ নাই; এখানে সুখের কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিও না; নিশ্চয় প্রতারিত হইবে। এখানে দূর হইতে যাহা অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, প্রকৃতপক্ষে তাহা সুখ নহে; দুঃখের সহিত সদাই জড়িত, একটীকে গ্রহণ করিতে গেলে অপরটী অবশ্যই আসিয়া পড়িবে। এ কারণ সংসারে বিষয়সুখ দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। মনীষিগণ তোমাকে এইরূপে সাবধান করিয়া দিলেও, শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বিষয়-সুখের অসারত্ব ঘোষণা করিলেও, তুমি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিবে না। এমনই তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে যে, তুমি তোমার মঙ্গলের কথাও

শুনিতে পাও না, অন্ধ বধির হইয়া শুধু বিষয়সুখের দিকে ধাবমান হও। তুমি এমনই মোহাচ্ছন্ন, বিবেকশূন্য হইয়া পড়িয়াছ যে, শাস্ত্র ও পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে রাজী নহ। তুমি ভাবিতেছ—মানিলাম সংসারে এ পর্য্যন্ত কেহই প্রকৃত সুখের অধিকারী হয় নাই, তাই বলিয়া কি আমি নিরস্ত থাকিব, চেষ্টা করিব না? আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সংসারে বিষয়ভোগের মধ্যে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় কিনা। বলা বাহুল্য, এই প্রকার চেষ্টার ফলেই নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, বিষয়সুখের উপকরণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণ সংসারে সুখ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দুঃখে পতিত হইয়াছে, তুমিও সংসারে বিষয়সুখের পিছনে পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া নিশ্চয় মহা দুঃখে পতিত হইবে। কারণ তুমি "দেখে শেখা অপেক্ষা ঠেকে শেখাই" পছন্দ করিয়া লইয়াছ।

বেশ, তুমি যে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সুখ সুখ করিয়া বেড়াইতেছ, একটীবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমার সুখলাভ হইয়াছে কিনা। তুমি প্রত্যহই শয্যাত্যাগ করিয়া অবধি, শৌচাদিক্রিয়া, স্নানাহার, জীবিকা উপায়ের জন্য কর্ম্ম, আত্মীয়গণের প্রতি কর্ত্তব্য পালন প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছ। প্রতিদিন সেই একরূপ কার্য্য, প্রতিবৎসর সেই সমস্ত কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান, সমস্ত জীবন সেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, একরূপই কাজের অনুষ্ঠান। একইরূপ কার্য্য প্রতিদিন করিয়া করিয়া তোমার কিছুমাত্র বিরক্তি আসিল না? এখনও কি তোমার আশা মিটিল না। এখনও কি সুখের আশায় চিরকাল সেই একইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? এখনও কি তোমার চক্ষু ফুটিল না? এখনও কি তোমার মোহ-নিদ্রা কাটিল না? এখনও তোমার বিষয়মদের নেশা ছুটিল না। এখনও সংসার তোমার নিকট অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, সুখের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যখন তুমি অসুস্থ হও, কোন প্রকার রোগা-ক্রান্ত হও, আর অপরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য কাতর চিৎকার করিতে থাক, বল দেখি, তখন তোমার নিকট সংসারের চিত্র রমণীয় বলিয়া বোধ হয় কিনা? যখন দেখ তোমার পিতামাতা, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-

বান্ধব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছে; বল দেখি, তখন সংসারের চিত্র তোমার নিকট মধুর বলিয়া বোধ হয় কিনা? তখন তুমি সংসারের স্বরূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পার। তখন তোমার মনে বিষয়সুখভোগ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়; কিছুক্ষণের জন্য একটু বিরক্তিও আসে।

কিন্তু তোমার সেই বিরক্তি ক্ষণস্থায়ী। এমনই মোহের শক্তি যে, পর-মুহূর্ত্তেই সংসারের সেই ভীষণ চিত্রখানি তোমার চিত্তপট হইতে মুছিয়া যাইবে, সংসার আবার নূতন রূপে, নূতন সাজে সাজিয়া উঠিবে, আবার তোমাকে লক্ষ্যহীন করিয়া কোথায় লইয়া যাইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়াও তুমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইতেছ না। সংসারে থাকিয়া তুমি ঠিক কুক্কুরের ন্যায় আচরণ করিতেছ। অস্থিখণ্ড চর্ব্বণ করিতে কুক্কুরের মহা সুখ অনুভব হয়। অস্থিখণ্ড চর্ব্বণ করিতে গিয়া তাহার মুখের স্থানবিশেষ ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং সেই স্থান হইতে—নিজ দেহ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, আর কুক্কুর সেই রক্ত অস্থিখণ্ড হইতে নিঃসৃত হইতেছে ভাবিয়া মহাসুখে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করে। তোমার বিষয়সুখভোগ কি অবিকল এইরূপ নহে?

সংসারে আর এক প্রকার লোক আছে, তাহারা শকুনি ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা সংসারে অনেক দুঃখক্লেশ ভোগ করিয়া, কথঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বিষয় সুখের প্রতি সন্দিহান হয়। সংসারের প্রকৃত চিত্র দেখিলেই, একটু বিরক্ত হইলেই, মানুষের আত্মবিস্মৃতি অনেকটা আলগা হইয়া আসে, মানুষ স্ব স্ব রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করে, প্রবুদ্ধ হইবার জন্য অগ্রসর হয়। এইরূপ উচ্চস্তরে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ যদি কোনও বিষয়সুখবিশেষ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারে না; বিষয়সুখভোগ আশায় পুনরায় অধঃপতিত হয়। শকুনিগণও উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত নীলনভস্তলে চক্রাকারে ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ ভূপৃষ্ঠে গবাদির শবদেহ দেখিলেই তাহারা আর স্থির থাকিতে পারে না; তৎক্ষণাৎ তড়িতবেগে শবদেহ ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে। এখন বুঝিয়া দেখ, মানুষ ঠিক শকুনির ন্যায় আচরণ করে কিনা।

হে ভ্রাতঃ যখন দেখিতেছ, আত্মবিস্মৃতি কাটিয়া না গেলে তোমার প্রকৃত সুখলাভের কোনও আশা নাই, চিত্ত থাকিতে আত্মবিস্মৃতি নাশের কোনও সম্ভাবনা নাই, বাসনা ত্যাগ ব্যতীত কখনও চিত্ত নাশ হইতে পারে না, আর বিষয়সুখে বিরক্ত না হইলে বাসনার ক্ষয় হইবে না, তখন একবার সংসারের স্বরূপ চিন্তা কর; বিষয়সুখের প্রতি অনুরক্তির পরিবর্ত্তে বিরক্তি আসিবে। বিরক্তি না আসিলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় বা মুমুক্ষা আসিবে না। যতই তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার করিতে থাক, যতই তুমি ধার্ম্মিক সাজিয়া অপরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতে থাক, যতদিন সংসারের প্রতি তোমার প্রকৃত বিরক্তি বা বৈরাগ্য না আসিবে, যতদিন তোমার মুক্তির তীব্র ইচ্ছা না আসিবে, ততদিন তোমার জ্ঞানলাভের কোনও আশা নাই, ততদিন তোমার প্রকৃত সুখলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। সেই কারণেই বলিতে-ছিলাম—মুমুক্ষুত্বই জ্ঞানের প্রথম সোপান।

সংসারের প্রতি বিরক্তি বা কামনা ত্যাগ করাকে কদাচ কর্ম্মত্যাগ বলিয়া মনে করিও না। তুমি সর্ব্বদা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যাও। তুমি যখন তোমার গন্তব্যস্থানে চলিতে থাক, তখন যেরূপ পথিমধ্যস্থিত স্থানসমূহ নিতান্ত অনাসক্তভাবে অতিক্রম কর, সংসারেও তুমি ঠিক সেইরূপ মনোভাব লইয়া, সেইরূপ অনাসক্ত হইয়া তোমার গন্তব্যস্থানে—তোমার স্বস্বরূপে, অনন্ত জ্ঞানের দিকে, অবিচ্ছিন্ন সুখের দিকে অগ্রসর হও। কোনপ্রকার পথশ্রান্তি ঘটিবে না, এবং পরিণামে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে।

কাঙ্গালের হরি।

ওগো আমার উৎপীড়িতের দেবতা
এসো আমার উৎপীড়ণের পরে,
ওগো আমার পরাধীনের দেবতা
এসো আমার ক্ষণিক আসরে।

আমার কাজ ও গণ্ডগোলের বাজারে
হে দেব তুমি এসোনা মোর কভু,
আমার লাজ ও নয়নজলের মাঝারে
এসো না গো এসো না মোর প্রভু।
দীন দুখীদের দেবতা তোমায় জানি গো,
খর্ব্ব যদি করেই কেহ মান,
পারবে না তা সইতে হৃদয়খানি গো,
তুমিই আমার গর্ব্ব অভিমান।
কালের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সাঁঝেতে
খালাস্ হয়ে তোমার হব আমি,
বিশ্বখানা আসবে কুটীর মাঝেতে
নয়নভরে দেখবো তোমায় স্বামী।
বহুরূপীর রঙ মুছে এই ভবনে
প্রাণটী আমার তোমায় যবে পাবে
নূতন জীবন পাব যে সেই গোপনে
মুহূর্ত্তটীই যুগ যে হয়ে যাবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বৈষ্ণব সাধনায় পরকীয়া ভাব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।]

অখিল রসামৃত মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবধূবর্গের যে রাসোৎসব-লীলা বর্ণিত আছে, রসশাস্ত্রের বিচারে উহা পরকীয়া-ভাব-সমন্বিতা। ব্রজরামাগণ পরস্ত্রী সুতরাং পর-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাঁহাদের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবিচল থাকে না; সেই কারণ বর্ত্তমান সময়ে সুরুচিসম্পন্ন ও সুনীতিবাদীগণের মতে এ লীলা অত্যন্ত দূষণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লীলা যাঁহাদের ভজনীয় ও উপসেব্য বলিয়া জগৎসমক্ষে আপনাদিগকে

জানাইয়াছেন, সেই সকল মহানুভব ব্যক্তিগণ সকলেই সাধন-সম্পন্ন বৈরাগ্যবান্ ত্যাগী-পুরুষ।

স্ত্রীপুরুষে ভেদবুদ্ধি বিরহিত নির্ব্বিকার শুকদেবের ন্যায় মুক্তপুরুষ নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিত থাকিলেও, পরীক্ষিৎ সভায় এই লীলা শ্রবণ ও বর্ণনের ফলশ্রুতি-রূপে হৃদয়ে নির্ম্মল প্রেম-সূর্য্যের উদয়ের কথাই বলিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু, সর্ব্বদা অন্তরঙ্গ ভক্তগণ লইয়া "গীতগোবিন্দ" "কর্ণামৃত" প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থের রস আস্বাদন করিতেন, তাহাতে পরকীয়া-ভাবের উৎকর্ষতাই জ্ঞাপিত হয়। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল "শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্ব" বলিয়াই সেই পরমতত্ত্বের শরণ লইয়াছিলেন। রূপগোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি ভজনপরায়ণ সিদ্ধ ভক্তমণ্ডলী, সকলেই সেই যুগল-উজ্জ্বল-রসের সেবাভিলাষের উৎকণ্ঠা এবং আর্ত্তিই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বেশী কথার প্রয়োজন কি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গোস্বামী পাদগণ ও প্রাচীন মহাজনগণের রচিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্যই বলুন আর নাটকই বলুন, সবই ঔপপত্যময়। উপাসনার মধ্যে, মন্ত্রের মধ্যে ঐ এক কথা। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ নাই, কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নাই। এই জন্যই বাংলার মন্দিরে মন্দিরে রাধা কৃষ্ণ, অঙ্গে নামাঙ্কিত রাধাকৃষ্ণ, গাত্রের নামাবলীতে রাধাকৃষ্ণ, ভিক্ষার বোল্ রাধাকৃষ্ণ।

তাই আমাদের স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, কৃষ্ণলীলা বাস্তবিক পক্ষে পরকীয়া-ভাব-সমন্বিতা হইলেও, পবিত্র ও ধ্যানের বস্তু হইতে পারে কিনা? আজকাল 'প্রক্ষিপ্তবাদ' ও "আধ্যাত্মিক বাদ" এই দুইটী মত আসিয়া লীলার অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের মনে একটু সন্দেহ আনয়ন করিয়াছে। বঙ্কিমবাবুকেই বোধ হয় প্রক্ষিপ্তবাদের অগ্রণী বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মনুষ্য; ব্রজলীলা স্বীকারে তাঁহার কৃষ্ণ পারদারিক, পাপাচারী হইয়া পড়েন, তাই তিনি প্রক্ষিপ্ত-বাদের শাণিত ছুরিকায় যাহা তাঁহার বিরোধী, তাহাকেই তিনি ছেদন করিয়াছেন। 'আধ্যাত্মিক বাদের' অস্তিত্ব যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অস্বীকার করেন, এরূপ নয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আধ্যাত্মিকবাদ কেবল ধাতু ও শব্দগত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া, ভক্তের হৃদয়ের অনুভবের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এক নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছে।

একদিকে এই সকল মতবাদ সংশয়াত্মক জড়বাদমূলক প্রবল ঝড়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া হিন্দু চিত্তের বিশিষ্টতাকে বাত্যাবিতাড়িত পত্রের ন্যায় কোথায় উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং তথায় কোথা হইতে ধর্ম্মহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্জ্জনা আনিয়া হৃদয়দেশ পূর্ণ করিতেছে, আর অপরদিকে লীলার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, লীলা রহস্যের অন্তর্নিহিত ভক্তি-লতার আশ্রয়-বস্তুটী যে একমাত্র শ্রীভগবান্, তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া উহাকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাময় কত কত নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নামে বিকাইয়া যাইতেছে।

লীলাবাদ, যাহা মহাপ্রভুর মতে নিত্য, তাহা বুঝিতে হইলে সিদ্ধান্ত অংশটী কঠিন হইলেও জানা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত অংশ না জানিলে, লীলা-বিলাসের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহাতে লাগিবে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥

লীলার দিক দিয়া না বুঝিলেও শ্রীভগবান্ বাস্তবিক যে পরপুরুষ ইহাও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। পুরুষের অতীত যিনি তিনিই পর পুরুষ।

"পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্তনন্যয়া।"

সেই পর পুরুষের প্রতি পুরুষের অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি পরাভক্তি, লীলার দিক দিয়া ইহাই পরকীয়া-ভাব। ভাগবতে স্পষ্টই দেখা যায়—

স বৈ পুংসাম্ পরো ধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

পুরুষের স্বাভাবিক পরপুরুষাভিমুখী চিত্তের গতিকেই পরাভক্তি বলে। যেমন আমরা যাহাই করি না কেন, আমাদের চিত্তবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহতভাবে "আমি" জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় এবং তাহাতেই স্থির হয়। সেইরূপ যখন চিত্তের গতি "আমি" রূপ জীবভাবে সিদ্ধ হইয়া তাহা হইতে "বস্তু" প্রভৃতির অতিগ বুদ্ধিলাভ করিয়া ভগবানেই পরিসমাপ্ত হয়, তখনই এই পরাভক্তির স্রোত বহিতে থাকে। দেবহুতিকে ভগবান কপিলদেব এই তত্ত্বই বলিয়াদিয়াছিলেন,—

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে ॥

যেমন গঙ্গার জল অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্র আমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন মনোগতি হইলে, তাহাকে নির্গুণ ভক্তি বলে। এই ভক্তি ফলানুসন্ধানশূন্য ও ভেদদর্শনরহিত। পরাভক্তির এই চিত্র ব্রজবধুদিগের রাসমণ্ডলে আগমন। তাঁহারা জানিতেন "প্রেষ্ঠো ভবান্ স্তনুভৃতাং কিল বন্ধু রাত্মা" তাই তাঁহারা "সন্তজ্য সর্ব্ববিষয়াং স্তব পাদমূলং ভক্তাঃ"

পরকীয়াভাবের মোটামুটী ইহাই হইল সিদ্ধান্ত। এইবার লীলাবাদের দিক দিয়া পরকীয়া-ভাবটীর তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের আচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী পরকীয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে উজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাধনে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়াভাব যে কত উচ্চ, তাহা আমাদের ন্যায় ভেদভাবাপন্ন জীবের ধারণা করাই একপ্রকার অসম্ভব। সকল প্রকার সাধনেই অধিকার-ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রেও ভক্তের দশাপর্য্যায় তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। ১। প্রবর্ত্তদশা ২। সাধকদশা ৩। সিদ্ধ দশা। প্রথম দশায় ভক্তের হৃদয়াকাশে শ্রীভগবানের জ্যোতির ঈষদ্‌স্ফূর্ত্তি এবং তাহাতে মনোগতির উন্মেষ মাত্র হয়; দ্বিতীয় দশায় ভক্ত ভগবৎ প্রাপ্তির সাধন লাভে ধীরে ধীরে তৎসাধনে প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পান; এই দশাদ্বয়ের পর ভক্ত যে অবস্থায় নীত হন, তাহারই নাম সিদ্ধ দশা, তখন কেবল সেবাভিলাষ। এই তিন দশা বৈষ্ণব আলঙ্কারক-দিগের ভাষায় স্থায়ীভাবান্তর্গত সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থারতি নামে উল্লিখিত আছে। প্রেমের আবার প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব এই কয়েকটী বিভাগ আছে। সাধারণীর সীমা প্রেম পর্য্যন্ত; তাহার দৃষ্টান্ত কুব্জাদি। সমঞ্জসার সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত এবং ইহার দৃষ্টান্ত রুক্মিণী প্রভৃতি। সমর্থারতির সীমা মহাভাব পর্য্যন্ত এবং ইহার দৃষ্টান্ত

ব্রজবাসীগণ এবং তাহার শীর্ষস্থানীয়া শ্রীমতী রাধিকা। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে—

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ
রাধা কৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

এই লীলারস আস্বাদনের জন্য হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীমতী, বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে অভিসারিণী! এই লীলা-রস আস্বাদনের জন্যই শ্রীমতী সাধারণ-ভাবে কুলটা! এই লীলা-রস আস্বাদনের জন্যই শ্রীমতী স্বরূপশক্তি হইয়াও কলঙ্কিনী!!!

পরকীয়ার বিশেষত্ব অনুরাগে আত্মসমর্পণ। স্বকীয়াভাবে বিধি আছে, বন্ধন আছে, গ্রাহের অনুরোধ আছে। সুতরাং সাপেক্ষ সহজ আয়াসশূন্য স্বকীয়াভাব অপেক্ষা, লোকলাজধর্ম্মত্যাগে, অনুরাগের যে প্রাবল্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। এভাবে যে আকর্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা নিরপেক্ষ এবং তীব্র, কিন্তু রসশাস্ত্রের বিচারে এই পরকীয়াভাব ঘৃণিত সত্য এবং হেয়।

সাধনরাজ্যে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার আসঙ্গলিপ্সামূলক ভাবটীমাত্র গৃহীত হইয়াছে—এখানে সে হেয়ত্ব নাই। কারণ,—

"লঘুত্বং ইতি যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বোদার্থমবতারিণি॥" উজ্জ্বলনীলমণি।

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকৃত নায়ক: গোপিকাগণ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। এখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়মত্ব কোথায়? "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" অব্যয় অপ্রমেয় নির্গুণ ও গুণের নিয়ন্তা, মানবের নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেও তিনি অন্যদেহীর তুল্য নহেন। দেহ-ধারণ করিলেও তিনি অনাবৃত ব্রহ্ম হৃষিকেশ। যে, যে ভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবে, সেই ভাবেই তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হইবেন।

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

সুতরাং তাঁহার আবার বন্ধন কোথায়? তিনি নির্গুণ। তিনি গুণের নিয়ন্তা!

"যৎ পাদ-পঙ্কজ-পরাগ-নিষেকতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥"

সুতরাং অপ্রাকৃত এই লীলায় শৃঙ্গার কথা কেবল ছলমাত্র। শ্রীধর স্বামী যথার্থই বলিয়াছেন,—"শৃঙ্গার কথাচ্ছলেন নিবৃত্তি পরা" এই রাস-পঞ্চাধ্যায়। কাজেই পরকীয়া এই লীলা-রস আস্বাদন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়কে এবং বাহিরের বিষয়কে ছাড়াইয়া সেই অতীন্দ্রিয়রাজ্যে যাইতে হয়। কারণ সে লীলা-বিলাসের ক্ষেত্র অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীমদ্ বৃন্দাবন ধাম,—

"ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস"।

কিরূপে "পরকীয়া ভাবে হয় রসের উল্লাস।"

চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর এই কথাটী বুঝিতে হইলে—রস আস্বাদনের কি কি উপকরণ তাহা জানা প্রয়োজন।

ভক্তি-শাস্ত্রমতে রতিসমূহ বিভাবাদির সহযোগে শ্রবণাদি কর্ত্তৃক ভক্ত-জনের হৃদয়ে আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে ভক্তি-রস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ
সাত্মত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

রতি আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। বিভাব সংখ্যায় দুইটী; আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণরতি হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব বলে, এবং যাহা ভাব উদ্দীপনের সহায়তা করে, তাহাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। আলম্বন বিভাবের দুই বিধি;—বিষয় ও আশ্রয়; শ্রীভগবানই বিষয়ালম্বন এবং মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা এবং সমুদয়

ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। কাজেই এ রস আস্বাদনীয় হইতে হইলে, আশ্রয়রূপা জীবশক্তির বিষয়রূপে ভগবান থাকা চাই। কারণ যে বৃত্তির যে বিষয়, তাহাকে ছাড়িয়া, কখন সে বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। ভক্তি-বৃত্তির বিষয়ালম্বন যখন ভগবান, তখন সে রস আস্বাদনের ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহারই সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ॥

বৈষ্ণব মহাজনের প্রতি ছত্রে, প্রতি কবিতায়, প্রতি পদ্যে, এই রসের ইঙ্গিত আছে। সে রস, সে আনন্দ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দের মূলকারণ স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্মানন্দের অতীত লীলারস॥

"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া কৃষ্ণে করে বশ॥" চৈতন্যচরিতামৃত

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজনিত আনন্দানুভব আমাদের নিত্য উপলব্ধি আছে। কিন্তু সে আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, উৎপত্তি-বিলয় আছে, আদি-অন্ত আছে। মুক্ত পুরুষেরা, সিদ্ধভক্তগণ, এ আনন্দে বিগলিত হন না বা এ আনন্দে তাঁহারা মগ্ন হন না। কারণ তাঁহারা জানেন,—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ দুঃখযোনয়ঃ এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

তাঁহাদের আনন্দ সেই সচ্চিদানন্দঘন পরম সৌন্দর্য্যময় চিন্ময় দেহরূপ ভেদরহিত অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের চিন্ময় লীলাসহচর সহচরী পরিবৃত রূপ-সন্দর্শনে, সূর্য্যের সহিত কিরণমালার, চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নারাশির নিত্য অবিনাভাব সম্বন্ধের ন্যায়, "লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং কালিন্দী পুলিনাঙ্গন প্রণয়িনং" "কিশোরাকৃতি" নবনটবরের সহিত—মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যময়ী শ্রীমতির লীলাবিলাসচিন্তনে এবং সেবাভিলাষে।

যাঁহারা দেহসর্ব্বস্ব ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী হইয়া অনাত্মাকেই একেবারে বরণ করিয়াছেন, শ্রীভগবান আছেন বা তাঁহার প্রতি জীবের কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা, এই বোধ যাঁহাদের জাগ্রত হয় নাই, কিম্বা নিরাকার চৈতন্যই একমাত্র সত্য, সেই অনন্তের উপাসনাই যাহাদের মূল মন্ত্র তাহারা কেহই এ রসতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন না।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সাধনা যেরূপভাবে বর্ণিত আছে, তাহাতে নিরাকার

চৈতন্যস্বরূপ অনন্তের সহিত উহা সিদ্ধ হয় না। অনন্তের সহিত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর কোন রসের সম্বন্ধ হইতে পারে না। তবে যে শ্রুতিতে "অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য দেখা যায়, ইহার তাৎপর্য্য কি? তর্ককুশল ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই কোটী ব্রহ্মাণ্ডপতির সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এরূপ অসম্ভবতার কোন কারণ বুঝা যায় না। রূপ গোস্বামী সেইজন্যই বলিয়াছেন,—

"তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং নিষিধ্যেৎ পরমেশতা।
যতশ্চানবগাহত্বেনাস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে॥"

যিনি পরমেশ্বর, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইতে পারিবেন না কেন?

"সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ।" ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৯

তিনি সমস্তই করিতে সমর্থ। একই সময়ে সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ, সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরই তিনি আশ্রয়; ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে,—

"মিথো বিরোধিনোপ্যত্র কেচিন্নিগদিতা গুণাঃ।
হরৌ নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাৎ কোপি ন স্যাদসম্ভবঃ॥"

তাই ভক্তের ভাবনানুসারে তিনি যোগমায়া অবলম্বনে ভক্তের নিকট তাঁহার অপ্রাকৃত-তনু প্রকাশ করেন।

"যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্য
তস্যৈষঃ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥"

গীতাতেও ভগবান তাঁহার প্রকট স্বরূপের পরিচয় প্রদান কালে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ॥" ভক্তপ্রবর শ্রীধর স্বামী প্রতিষ্ঠা অর্থে "প্রতিমা ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশঃ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বৎ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাগবতেও ঐ এক কথা—

"যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগং
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।"

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি শুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।

এই রূপ রতন ভক্তজনের গূঢ়ধন
প্রকট কৈলা নিত্য লীলা হৈতে ॥"

এই মধুর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে কত কত সাধক সেই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত মদনমোহনের দর্শন পাইয়াছেন।

এই লীলা-বিলাসের অনুধ্যান করিতে করিতে ইন্দ্রিয় তাহার স্বাভাবিক সীমা ছাড়াইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে যাইয়া পড়ে। যাহা প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত নহে, রসের অঞ্জন মাখিলে তখন দিব্য চক্ষে সেরূপ দর্শন করিতে পারে, ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার কথা। কবি তাহার সমর্থন করিয়া গাহিলেন,—

"শ্রীপদ কমল সুধা রস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণ গান করি গানে॥
শ্রীমুখ বচন শ্রবণ অনুসঙ্গী।
অনুভাব কত ভেল প্রেমতরঙ্গী॥ (গোবিন্দদাস)

রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া ভাবের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের দিব্যোন্মাদ লীলার ভিতর দিয়া পরকীয়া-ভাবটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শাস্ত্রে এই পরকীয়াভাবে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্তিবাঞ্ছাও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে এরূপ প্রেমভক্তির উল্লেখ থাকিলেও, এই ভক্তির কথা সাধারণে প্রচারিত ছিল না। শ্রীধর স্বামীও (১০।৮৭।২১) শ্লোকের টীকায় "কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকাঃ বিরলাঃ" এই কথাই বলিয়াছেন। আজ আমরা মহাপ্রভুর কৃপাতেই এ ভাবের বিশেষ পরিচয় পাইতেছি। তাই কবি প্রেমানন্দে গাহিয়াছেন,—

"এমন শচীনন্দন বিনে।
প্রেমবলি নাম অতি অদ্ভুত শ্রুত হৈত কার কানে
শ্রীকৃষ্ণ নামের সগুণ মহিমা কেবা জানাইত আর
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা গোচর ছিল বা কার?
ব্রজে যে বিলাস রাস মহাবাস প্রেম পরকীয়তত্ত্ব
গোপীর মহিমা ব্যভিচারী সীমা (কার) অবগতি ছিল এত॥"

সুতরাং এক্ষণে প্রেমাবতার শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের দুই একটী ঘটনার

ভিতর দিয়া পরকীয়াতত্ত্বটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। একদিন মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর মুখে বলিতে লাগিলেন,—

"যঃ কৌমারহর সএব হি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপাঃ।
স্তে চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ॥
সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ।
রেবা রোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

শ্লোকটী কাব্যপ্রকাশ নামক গ্রন্থের প্রাকৃত নায়ক নায়িকা সংক্রান্ত। নায়ক নায়িকা সেই; কিন্তু নায়িকার চিত্ত রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুতলে সুরতলীলার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত। অনেকে এই শ্লোকটী শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহার নিগূঢ় অর্থ স্বরূপদামোদর ও রূপগোস্বামী বুঝিলেন এবং রূপগোস্বামী প্রকৃত গূঢ়ার্থব্যঞ্জক শ্লোক রচনা করিয়া রাখিয়া দিলেন। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে শ্লোকের আর উল্লেখ করিলাম না। তবে সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, মহাপ্রভু তখন রাধাভাবে আবিষ্ট; বহুকাল বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে প্রাণবঁধুকে পাইয়াছিলেন, কিন্তু মন বৃন্দাবনের জন্য ব্যাকুল,—

"অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥ চরিতামৃত

এইরূপে মহাপ্রভু কখনও বেণুরব শুনিয়া সিংহদ্বারে তৈলঙ্গী গাভী মধ্যে কূর্ম্মাকৃতি হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে পতিত, মন কিন্তু মধুরিপুর মধুময় সঙ্গলাভে কখনও প্রেমকলহ করিতেছেন, কখনও রাসেশ্বরীর সহিত রসিকশেখরের নিত্যরাসমণ্ডপে নৃত্য দেখিতে দেখিতে সুষুপ্তির অগাধসাগরে নিমজ্জমান; কখনও বা কৃষ্ণ অদর্শনে সেই মহাভাবের সান্দ্রনীরবতা ও নিস্তব্ধতা কোথায় চলিয়া যায়, তখন সেই ভাবাবেশেই, বাহ্যভাব পূর্ণরূপে আসিতে না আসিতেই সংসারের 'বহু' ভাবের সহিত চিত্তের সম্পূর্ণ যোগ হইতে না হইতেই—ব্যাকুল হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছেন,—

——কৃষ্ণ মুই এখনি পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুন হারাইনু ॥

দিব্যোন্মাদলীলা বা বিরহলীলার ভিতর এই কথাই নানাভাবে বর্ণিত আছে। সেইভাবে, চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন ভ্রম, নীল আকাশে শ্রীকৃষ্ণরূপের স্ফুরণ। এইরূপে জগতের বাহ্যিক রূপের উদ্দীপনায় সেই নিত্য-লীলার স্মরণ ইঙ্গিত করে—

"মুহু র্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতবিবশঃ ॥"

এভাবের পূর্ণ সাধনায় জীব "গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" আশ্রয়ালম্বন আর শ্রীভগবান বিষয়ালম্বন এবং জগৎ বৃন্দাবন, বৃক্ষলতা কল্পদ্রুম নদীমাত্রেই কালিন্দী "কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখা।"

এই ভাবসাধনার আরম্ভও পরকীয়াভাবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ করিয়াই জগতের জিজ্ঞাসু ভক্তমাত্রকেই বলিয়াছিলেন,—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তামেবাস্বদয়ত্যন্ত র্নবসঙ্গ রসায়নং ॥"

বাস্তবিক আমরা সমষ্টিরূপে বিষয়ের সহিত পারিণীত হইয়া পড়িয়াছি; তাই সংসারের ষোল আনা আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে অবিচল। সুতরাং এই "বিষয়বিষামিষগ্রাসনগৃধ্নুচেতসি" যদি পরপুরুষের আভা ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে এই বিষয়ের পরিণীতা, এই জীবের ইহা পরকীয়া নয়ত কি? সুতরাং এ সাধনা বা উপাসনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সমীচীন।

এই ভাবসাধনের দুইটী প্রধান অঙ্গরূপে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে।

সেবা সাধকরূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্র হি।

চরিতামৃতকার বলিলেন—

"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ধারণ।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥"

যাঁহারা জাতরতি, তাঁহাদের এই দেহ স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু যাঁহারা অনুৎপন্নরতি সাধক ভক্ত, তাঁহারা মনে নিজ ভগবানের তৎসেবোপযোগীদেহ বা স্বরূপদেহ ভাবনা করিয়া সেই সিদ্ধ-দেহে লীলা-বিলাস দর্শনাদি করিবেন।

এই সিদ্ধ-দেহের অনস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, আমাদের এই দেহ আকস্মিকভাবে পরিণমিত হয় নাই। ইহার ভিতর একটী কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অপরিহার্য্য নিয়ম বর্ত্তমান আছে। কেবল শুক্রশোণিতের বিকাশেই এমন সুন্দর নরতনুর বিকাশ, ইহার পশ্চাতে কোন চিন্ময়-সত্তার সত্তা নাই, এই বর্ণের সৌন্দর্য্য অঙ্গের স্পর্শশীতলতা, অঙ্গের এই যথোচিত সন্নিবেশ, হৃদ্‌পিণ্ডের জন্মাবধি নিয়মিত ধ্বনি, শ্বাস-প্রশ্বাসের অবিরাম কার্য্য, এই সকলের পশ্চাতে নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ দেহের অস্তিত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রেই প্রায় অবিরোধে স্বীকার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস তাই গাহিয়াছেন,—

"স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়"

এই চিন্ময় সিদ্ধদেহই জীবের স্বরূপদেহ।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥"

এই স্বরূপ-ভাবে যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ে, পরপুরুষের উদ্বোধন হইয়াছে। একবার উদ্বোধন হইলেই, সেই "আড়নয়নের" ইঙ্গিত বুঝিলে, সে কি আর "অহং" ভাবের মহিমায় মহিমান্বিত থাকিতে পারে! সাধারণভাবে আমরাও পারি না। যদি "অহং" জ্ঞানটী সবই হইত, তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমান "অহং" লইয়া তুষ্ট থাকিতাম। "অহং" বিশেষভাবে দেখিবার পিপাসা হইত না; মায়ার জটিল কুটিল ভাবপ্রসূত "অহং" কে দেহাবচ্ছিন্নভাবে দেখিবার শক্তিটী লইয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু এই দেহাত্মবুদ্ধি আমাদের স্বামীর ন্যায় প্রতীত হইলেও "অহং" কে ভোগ করিতে পারে না। সুখবোধের মুহূর্ত্তে, দুঃখের আবর্ত্তের মধ্যে নিদ্রায় মৃত্যুতে দেহাত্মার ছোট "আমি" টী পড়িয়া যায়। তাই হয় ত শুদ্ধা চিন্ময়ী পরাপ্রকৃতি শ্রীমতী রাধা, আয়ান বর্ত্তৃক পরিণীতা হইলেও, আয়ানের ভোগ্যা হয়েন নাই। সেই পরিশুদ্ধ "অহং"রূপী সৌন্দর্য্য, জগতে অতুলনীয়। সমগ্র জগৎ তাহার ক্ষেত্র। কিন্তু তিনিও "আমি"তে স্থির থাকিতে

পারিলেন না; যেন কিসের অভাব, যেন সে আমির পরিপূর্ণতায় একটু অঙ্গহানি হইয়াছে। প্রশান্ত-সমুদ্র-প্রায় সেই "আমি" টী উদ্বেলিত হইয়া তাহার কুল অতিক্রম করিয়া এত সৌন্দর্য্য. এত ভরা যৌবনের লালিত্য, সবটাই সেই "সঃ" রূপ পরম পুরুষের চরণতলে ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

এই "অহং" এর "সঃ" এর প্রতি টান, তাহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরকীয়া। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা বা ভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন না করিলে ত আর তাঁহাকে পাওয়া যায় না, ছিন্ন অহং জ্ঞানে ভগবানের সহিত নিত্যলীলা করিয়াও তৃপ্তি হয় না। তারপর সেই রূপের ভাষা যখন অধিগত হয়, তখন সে দেখিতে পায় যে. সেরূপে আর ছোট "আমি" থাকিতে পারে না ও ছোট "আমি" লইয়া সে "আমি" উপভোগ করিতে গেলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তিনি যে পরপুরুষ, তাঁহাকে ত ভোগ্য বা বিষয়রূপে শেষ করা যায় না। আমাদের "আমিটী" কে বিষয়ক্ষেত্র বা ভোগ্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই পরকীয়া-ভাব। তখনই বুঝা যায় যেন,—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তবু হিয় জুড়ন না গেল॥".

এই উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় ভূমিতে তাঁহারা রস-বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সাধক গোবিন্দদাসের শরণ লইলাম। তাহা হইলেই আর ভাবনা থাকিবে না,—

"রমণ কাহে করসি অনুতাপে।
পহুঁক প্রতাপ মন্ত্র করু যাপে॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি।
পহুঁক চরণ যুগ সারথি করবি॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।

আশা পাশ ডোরি নহ ভঙ্গ ॥
লীলাজলধি তীরে চলু যাই।
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥
রঙ্গতরঙ্গী, সঙ্গী হরিদাসে ॥
রতি মণি দেই পূরব অভিলাসে।
সো শ্যাম লিধি মাঝে মণিগেহ
তঁহি রহি গোরি সুশ্যামা দেহ :
সারথি লেই মিলায়ব তায়
গোবিন্দ দাস গৌর গুণ গায়।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

[শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।]

ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, প্রত্যেক যুগের বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রাচীন গ্রীকদের "হীরোয়িক এজ" বা ক্ষাত্রযুগে কেবল বীরদর্প, ব্যায়াম, অস্ত্র-চালন-পটুতা ও সামরিক উদ্যোগ। পরযুগে কোমল বৃত্তি ও রসের আবির্ভাব, তখন আর যুদ্ধের আয়োজন নাই—ললিত সাহিত্য, স্থপতি, ভাস্কর্য্য ও নাটক অভিনয়। তবে গ্রীক জাতি ধর্ম্মের ধার বড় ধারে না। ইউরোপীয় মধ্যযুগে সন্ন্যাস, সংযম, কারুকার-সংঘ (ক) ও ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ (খ), এই কয়টি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে আমাদের দেশেও আচার ও অভ্যাসের প্রভেদে যুগধর্ম্ম বাহির করিতে পারা যায়। প্রাচীন স্মৃতিকারেরা ঐ জন্য কালধর্ম্ম মানিয়া গিয়াছেন।

(ক) ট্রেড গিল্‌ডস্।
(খ) নাইট এরেন্‌টি।

যাহা হউক, আমাদের বর্ত্তমান যুগেরও একটা লক্ষণ আছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, এখন আমরা কসা-মাজা না করিয়া কিছুই গ্রহণ করিতে পারি না। সকল বিষয়েই পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ চাই, যুক্তি চাই, সঙ্গতি চাই। কপিল বলিয়াছেন বা ক্যাণ্ট বলিয়াছেন বলিয়া উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এ প্রবৃত্তি বর্ত্তমান যুগে নাই। সকল বিষয়েই সমালোচনা ও বিচার—ইহা ছাড়া এক পা চলিবার যো নাই। এ ভাবটা বোধ হয় খ্যাতনামা জার্ম্মন-ভাবুক গেটে ইউরোপে আনিয়াছেন এবং ইউরোপের দেখিয়া আমরা শিখিয়াছি। তাহা ছাড়া আমাদের যুগ বিজ্ঞান-বিস্তারের যুগ। তুমি যত বড়ই বৈজ্ঞানিক হওনা কেন, তোমার কথায় কাজ চলিবে না, তোমার উক্তি অপরে পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া না লইলে ছাড়িবে না।

এ প্রবৃত্তিটা এতই শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে, ইহাকে আর তুলিতে পারা যায় না। ধর্ম্ম, স্মৃতি, নীতি সকল বিষয়েই এই ভাবটা প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপে অর্দ্ধেক শিক্ষিত লোক কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস করেন না ও কেহ কেহ হয়ত বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট উপাদেয় নহে। সম্প্রতি মানব-তত্ত্ব একটি বৃহৎ বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে সকল আদিম মানবজাতি আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে বাস করে, তাহাদের ভাষা. আচার ব্যবহার, মানসিক ভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপার লইয়া অনেক প্রতীচ্য পণ্ডিত আলোচনা করিতেছেন। অনেকে, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় পাদরিগণ তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসন্ধান করিতেছেন। সভ্য জাতির আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও চিন্তাপটুতা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া কিছুই পাওয়া যায় না। হিন্দুরা বলেন যে, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি মানবীয় ব্যাপার-সমূহ অপর জাতি অপেক্ষা ভাল; মুসলমানেরাও ঐ কথাই বলিয়া থাকেন এবং খ্রীষ্টীয়ানেরা বলেন যে, খৃষ্ট ভিন্ন জগতে আর উদ্ধারকর্ত্তা নাই এবং অপর জাতির সামাজিক জীবন বর্ব্বরতা-পূর্ণ।

এইরূপ পরস্পর-বিদ্বেষ-ভাবের এতদিন কোনও মীমাংসা চলিত না

এবং প্রত্যেক জাতিই আপন সমাজকে উন্নত মনে করিতেন। সম্প্রতি এই মানব-তত্ত্ব সাহায্যে আমরা মানুষের মূল প্রকৃতি ও মানব-সমাজের অন্তর্নিহিত ব্যাপার-সমূহ কতক পরিমাণে বুঝিতে পারি। সভ্য মানবের সামাজিক-জীবনে যে সকল ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রূঢ় অবস্থায় বর্ব্বর সমাজে বিরাজ করিতেছে; সভ্য মানবের কারুকার্য্য-পটুতা ও প্রিয়তা উভয়ই আছে, অসভ্য মানবেরও ঐ ভাব যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বেশ ও সজ্জাপ্রিয়তা সভ্য মানবেরও যেমন আছে, অসভ্য মানবেরও সেইরূপ আছে। এমন কি, অসভ্য মানবের সাহিত্য ও ইতিহাসও আছে। তবে এ সকল ব্যাপার বর্ব্বর-সমাজে তাহাদের মতই হইয়া আছে এবং উহা যে সভ্য মানবের সামাজিক ব্যাপারে মূল-ধাতু, তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিত অসভ্য জাতির ধৰ্ম্ম জিনিসটা বুঝিতে পারেন না। কারণ তাহাদের উপাস্য-বস্তু এবং ঐ উপাস্য-বস্তু সম্বন্ধে তাহাদের জাতীয়-সংস্কার এতই রূঢ়, যে সভ্য মানব উহা সহজে বুঝিতে পারে না। গির্জ্জা বা মসজিদ, মন্দিরেরই রূপান্তর অর্থাৎ উহা দেবালয়, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। কিন্তু মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া কেহ উপাস্য-বস্তু রাখিলে উহা যে দেবতার স্থান, ইহা শীঘ্র বুঝিয়া উঠা যায় না।

সম্প্রতি মানব-তত্ত্ববিদেরা অসভ্য জাতির ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন। ইহা হইতে এইটুকু জানা যায় যে, সকল জাতিই একজন লোকাতীত ক্ষমতাশালী কর্ত্তাকে বিশ্বাস করে। কোন কোন জাতি বহু কর্ত্তা বিশ্বাস করে। অসভ্য জাতিরা সেই দেবতা বা দেবতা-সমূহকে উপাসনা, স্তব-স্তুতি ও পূজা করে। তাহাদের পুরোহিত আছে এবং সেই পুরোহিত যাদুকর। সে মন্ত্রদ্বারা অবৃষ্টির সময় বৃষ্টি আনয়নের ব্যবস্থা করে, রোগে প্রক্রিয়া দ্বারা রোগশান্তি করিতে চেষ্টা করে। তাহার উপর অসভ্য জাতির দারুণ বিশ্বাস। পুরোহিত ও জাতীয় অধিপতি, বর্ব্বর জাতির নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। সভ্য মানবেরও এখনও ঐ অবস্থাই আছে, তবে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে; আদিম জাতিরা প্রেত বা জীবাত্মায় বিশ্বাস করে এবং তাহাদের মতে মানব কখনও মরে

না। দেহত্যাগের পরে তাহারা আকাশে বা আবাসে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অসভ্য জাতিদের "টাবু" নামক বিধান আছে। টাবু আমাদের বিধি-নিষেধ-নিয়ম। ইহা করিও এবং ইহা করিতে নাই, করিলে প্রত্যবায় আছে। কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে "শ্বাশুড়ী টাবু" আছে অর্থাৎ শ্বাশুড়ী ও জামাতায় দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা ঐ জাতির মতে বিশেষ দোষাবহ। সকল অসভ্য জাতির মধ্যে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার আছে। বোর্ণিও দেশে "দাযক" জাতীয় যুবকেরা হরিণের মাংস খায় না। "কেন খায় না" জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে, উহা খাইলে হরিণের মত ভীরু হইতে হয়। ইহা ছাড়া কোন বিশেষ রাস্তা দিয়া চলিতে নাই, কোন নদী-বিশেষে স্নান করিতে নাই, কোনও বিশেষ গাছের শিকড় খাইতে নাই, কোনও বিশেষ গাছের ফল খাইতে নাই ইত্যাদি। এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে দোষীকে নানারূপ দৈবনিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। আমাদের দেশে মীমাংসক পণ্ডিতদের বিধি-নিষেধের নানারূপ ব্যবস্থা আছে। অষ্টাদশ সংহিতাতে কত রকমের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের বিধান আছে। মণিপুর প্রদেশে অবিবাহিত বালিকার পক্ষে পুংজন্তু অথবা গর্ভিণী স্ত্রীজন্তু খাওয়া নিষিদ্ধ। মুসলমানদের মধ্যে শম্বুক প্রভৃতি রক্তহীন জীবের মাংস আহার করা দোষাবহ। পারসীকদের মধ্যে অগ্নিতে পাদস্পর্শ মহাপাপ। [illegible]দের মাংস ভক্ষণ করিতে নাই। শিখদের তাম্রকূট-সেবন একেবারে নিষেধ। কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে চুল ও নখ কাটিতে নাই। এই টাবু বা বিধি-নিষেধ-বন্ধন প্রত্যেক মানবসমাজে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহা হইতে আইনের উৎপত্তি এবং ধর্ম্মনীতিসমূহ "টাবু" মূলক বলিতে পারা যায়। "টাবু" এক প্রকার সংযম, যথেচ্ছাচারী মানবের যথেচ্ছাচারে ইহা বাধা। অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, টাবু বা বিধি-বন্ধন হইতে কতকগুলি আচার ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই "টাবুই" মীমাংসক পণ্ডিতদের ইতিকর্ত্তব্যতার মূল। "দিবসে নিদ্রা যাইও না" অথবা "কলঞ্জ ভক্ষণ করিও না" ইহাও "টাবু"। এই "টাবু" ও "ম্যাজিক" বা যাদুবিদ্যা লইয়াই কর্ম্ম ; তাহা পরে দেখান যাইবে।

অতএব ধর্ম্ম বলিলে আমরা সাধারণতঃ এই কয়টি বিষয় বুঝি— আমাদের একজন স্রষ্টা আছেন, মানবের আত্মা আছে, যাহা সহজে হয় না তাহা যাদুবিদ্যা দ্বারা সম্পাদন হয় এবং বিধিনিষেধের সমাধান। এই সকল ব্যাপারের অর্থারোপ লইয়া অনেক গোল আছে। অসভ্য জাতির লোকাতীত শক্তিতে বিশ্বাস কি করিয়া আসিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট ধর্ম্ম অলীক ও কৃত্রিম। অসভ্য মানবেরা আত্ম-রক্ষার্থে উহা অবলম্বন করিয়াছে। অসভ্য জাতিদের মধ্যে চতুর লোকও থাকে, তাহারা নিজের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার জন্য নূতন নূতন বিধি ও নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছে। উহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা "মেডিসন ম্যান্" বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালায় উহার নাম ভিষক্‌-রাজ বলিতে পারা যায়। ভিষক্‌রাজের ক্ষমতার সীমা নাই। সে লোকের ব্যাধি নষ্ট করিবে, ঝড়, বজ্রাঘাত প্রভৃতি উৎপাত হইতে গ্রামের লোককে রক্ষা করিবে ও তুক-তাক করিয়া দৈব-ক্রোধ হইতে গ্রামের লোককে বাঁচাইবে। ইহার হাতে ফাঁপা হাড় থাকে, ও এঁকা বাঁকা কাঠ, অদ্ভুত জীবের চর্ম্ম প্রভৃতি তাহার ব্যবহার্য্য; এই সকল জিনিষের সহায়ে সে দেব-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। ভিষক্‌রাজ সভ্য সমাজে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক পুরোহিত বা ঋত্বিকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের মতে এই যাদু-বিদ্যাই ধর্ম্মের মূল। যখন লোকে দেখিল যে, যাদুবিদ্যায় সব কাজ হয় না, তখন হতাশ হইয়া উপাসনা, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা দেবতার তুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিল। অসভ্য মানুষের উপাস্য জিনিস অনেক আছে। শ্বেত হস্তী ও সর্প প্রভৃতি বিকট দর্শন জীব তাহার উপাসনার বস্তু ও নূতন গোছের গাছকেও সে পূজা করে। সে লোষ্ট্রদেবকে বা "ফেটিস্‌কে" ভজনা করে। কোন স্থানে তাহার মতে ভূত প্রেতের বাসস্থান এবং সেখানে সে সভয়ে দানবের বা "ডিমনের" পূজা করে। ইহাদের পূজা সে কেন করে? "ভয়ে করে" এই উত্তর আমরা পাই। আর ভয়ের সহিত স্তব-স্তুতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে; তাই অসভ্য মানব পশু, উদ্ভিদ ও মানুষ বলি দিয়া ঐ সকল অনৈসর্গিক শক্তিকে তুষ্ট করিয়া তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। না

হয় ইহাই মানিয়া লইলাম। সভ্য মানবের ত ভূত প্রেত দানবের ভয় নাই, তাহারা কেন স্রষ্টার উদ্দেশে পূজা করে। ইহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য লেখকদের নিকট পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি এই দলের বিরুদ্ধে অপর এক সম্প্রদায়ের উত্থান হইতেছে, তাঁহাদের কথা পরে বলিব। পূর্ব্বোক্ত লেখকদের মতে, অসভ্য জাতি যে আত্মায় বিশ্বাস করে তাহার কারণ আর কিছুই নহে কারণ সে মনে করে তাহার মধ্যে দুইটী জীব আছে। স্বপ্নাবস্থায়, নিদ্রার ঘোরে, অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় সে কোনও মৃত আত্মীয় বা অধিপতিকে স্বপ্নে দেখে। সে বাস্তব ও স্বাপ্নিক ব্যাপারে প্রভেদ করিতে পারে না। মৃত ব্যক্তিকে সে কি করিয়া দেখিবে, কাজেই তাহার মধ্যে আর একটা "কেহ" বা "আমি" আছে যে, তাহার দেহ ছাড়িয়া গিয়া সেই মৃত লোকের সহিত ঘুরিতে পারে। আর জলে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা সেই তাহার শরীরমধ্যস্থ অন্য "আমি" এবং ইহা হইতেই আত্মায় বিশ্বাস এবং এই আত্মা হইতে মানুষের অমরত্বে বিশ্বাস এবং তাহা হইতে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস। ইহার উপরে আবার মেজিসন্‌ম্যানের বাতাস দেওয়া আছে—সে ভূত দেখিতে পায়, দেবতাদের সহিত তাহার কথা হয়, আবেশ অবস্থায় সে ভবিষ্যতের ঘটনা সব বলিয়া দেয় এবং এইরূপ নানাপ্রকার বুজরুকি আছে।

কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের বড় নিকট সম্বন্ধ। গীতার মতে কর্ম্ম, ধর্ম্মের অন্যতম সাধন এবং উহা কর্ম্মযোগ। মীমাংসকেরা কর্ম্মকেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ-সাধন বলিয়া থাকেন। সেই কর্ম্ম কি? আমরা জীবিকার্জ্জনের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকি, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকি, সুখ অন্বেষণের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকি। ইহার সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। মীমাংসকেরা যাহাকে, কর্ম্ম বলিয়া থাকেন তাহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাদু-বিদ্যা বা ম্যাজিক বলেন। বৃষ্টি হইতেছেনা, দৈবশক্তিকে বাধ্য করিয়া বৃষ্টি আনিতে হইলে কতকগুলি প্রক্রিয়া করিতে হয় এবং সেই প্রক্রিয়াকে যাগ বলে। বৃষ্টি উৎপাদন করা আবশ্যক হইলে কারীরি যাগ করিতে হয় এবং যে বাধার জন্য বৃষ্টি হইতেছে না, সে বাধা কারীরি যাগ করিলে নষ্ট হয় এবং বাধা নষ্ট হইলে বৃষ্টি আপনা হইতেই হইবে। পুত্র হইতেছেনা,

পুত্র না হইলে পরলোকের ক্রিয়া কে করিবে? পুত্র আবশ্যক এবং যে কারণে পুত্র হইতেছেনা, তাহা নিবারণ করা আবশ্যক এবং উহা কি করিয়া হইতে পারে। উহার জন্য যে যাগ আছে, সেই যাগ অনুষ্ঠান করিলে পুত্র হইবে এবং ঐ যাগকে পুত্রেষ্টি যাগ বলিয়া থাকে। তোমার কোনও ব্যাধি হইয়াছে উহা বিশেষ গ্রহের দৃষ্টিবশতঃ হইয়াছে, সেই গ্রহের প্রীতি-কামনার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিলে বা প্রক্রিয়াবিশেষ করিলে তোমার ব্যাধি উপশম হইবে। পারিবারিক কোনও বিপদ হইলে অপদেবতার প্রভাবে উহা হইয়াছে ধরিতে হইবে এবং সেই অপদেবতাকে সরাইবার জন্য কবচ ধারণ করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। সর্প-দষ্ট ব্যক্তির প্রাণরক্ষার্থে এখনও মন্ত্রাদির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রক্রিয়া প্রাচীন-কালে যথেষ্ট পরিমাণে হইত এবং এখনও অসভ্য মানবের মধ্যে উহা নিবদ্ধ আছে। তবে সভ্যসমাজে উহা কমিয়া আসিতেছে। অথর্ব্ববেদে জ্বর-উপশমের জন্য স্তব-স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। যে কারণেই হউক, যাদুবিদ্যায় মানুষের আর সেরূপ বিশ্বাস নাই। বিজ্ঞান ইহার স্থান ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে।

মীমাংসকদের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও কর্ম্ম। মীমাংসকেরা বলেন, যজ্ঞ সম্পাদনে কর্ম্ম উৎপন্ন হয় এবং ঐ কর্ম্ম অদৃষ্ট আকারে থাকে এবং মৃত্যুর পরে লোকে স্বর্গাদি ভোগ করে। এই জাতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে হিন্দু-সমাজে আর বড় আগ্রহ ও যত্ন দেখা যায় না। যে কারণেই হউক, উহার উপর হিন্দুর আর সে আস্থা নাই। আগে বড় বড় রাজারা স্বর্গ প্রভৃতি কামনার জন্য বড় বড় যাগ যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু এখন সে রাজাও নাই ও সে ঋত্বিক, পুরোহিতও নাই।

বৌদ্ধদের মধ্যে এই কর্ম্মের অর্থ অন্যপ্রকার দাঁড়াইয়াছে এবং উহা "ম্যাজিক" নহে "টাবু"। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম যেমন খৃষ্টদের দশাজ্ঞা বা দশবিধি প্রচার করিয়াছেন, বৌদ্ধদেরও সেইরূপ দশটী প্রধান বিধি আছে এবং তাহা ছাড়া আরও অনেক উপবিধান আছে। এখানে কর্ম্ম এক নূতন অর্থ পাইল। "চুরি করিও না" "ব্যভিচার করিও না" প্রভৃতি নিষেধ আজ্ঞা, আবার "জীবের প্রতি মৈত্রী করিবে" "আতুরের সেবা করিবে"

"অন্নহীনকে অন্ন দান করিবে" ইত্যাদি বিধিও রহিয়াছে। ইহাই বৌদ্ধ নীতি এবং এই নীতিসমূহই অসভ্যজাতির "টাবুর" পরিণত অবস্থা। সভ্যসমাজে এই নীতিবুদ্ধিই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। মনু প্রভৃতি সংহিতা গ্রন্থে আমরা এই সকল নীতির পরিচয় পাই। ব্রহ্মচর্য্যবিধি, শিষ্যের কর্ত্তব্য, অতিথি-সৎকার, গার্হস্থ্য-নিয়ম, যোষিদ্ধর্ম্ম, স্ত্রী-পুরুষের ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শ সমূহ আমরা ঐ সকল গ্রন্থে পাইয়া থাকি।

যাহা হউক, আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে কি আছে? ইহা কি কৃত্রিম, অলীক অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করি। ধর্ম্মের অলীকত্ববাদীদের বিরুদ্ধে এক সম্প্রদায় উঠিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম স্বতোগ্রাহ্য। আমাদের মীমাংসক পণ্ডিতেরাও ঐ কথা বলেন। "চোদনা লক্ষণো অর্থ"কে তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যাহা আপনা হইতে মানুষকে প্রবর্ত্তন করায়, তাহাই ধর্ম্ম। আবার কাহারও মতে ধর্ম্ম রসোমূলক; অর্থাৎ ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক বৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্ম স্বতঃ-বুদ্ধি প্রেরিত বলিলে তাহার ঠিক অর্থ বুঝা যায় না। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বতঃ বুদ্ধি কি এবং মানুষের ভিতর স্বতঃ বুদ্ধি কি আকারে থাকে। এই সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং এই সামান্য প্রবন্ধে উহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে। স্বতঃ বুদ্ধি ইতর জীবে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই, কিন্তু মানুষের মধ্যে উহার চিহ্ন খুব কমই পাওয়া যায়। জীবের বাসা নির্ম্মাণ, শাবক রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপার আমরা স্বতঃ-বুদ্ধি-প্রেরিত বলিয়া থাকি। কিন্তু মানবের ধর্ম্ম কি ঐ জাতীয় ব্যাপার। যাহা হউক, স্বতঃ বুদ্ধি ও রস এই উভয়ই জীবের গভীরতম বৃত্তি। উহার মূলে মানব এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। স্বার্থপর জীব কেন শাবকের জন্য আত্মত্যাগ করে, তাহা এখনও বুঝা যায় না। পণ্ডিত বার্গ-সম্ উহাদিগকে প্রকৃতির খেলা বলিয়াছেন। প্রকৃতি ঐ উপায়ে নিজের কাজ করিয়া লয়। ধর্ম্ম রসোমূলক বলিলে ধর্ম্মের সঙ্গতি রক্ষা হয়। আমাদের দেশের বৈষ্ণবসম্প্রদায় ধর্ম্মকে রসোমূলক

বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণব লেখক শ্রীজীব ও রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ধর্ম্মকে রসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজ কাল সকল জিনিসেরই আমরা প্রয়োজনীয়তা খুঁজিয়া বেড়াই। সুতরাং ধর্ম্মই বা তাহা হইতে বাদ যাইবে কেন। আধুনিক পাশ্চাত্য প্রয়োজন-বাদীরা "প্র্যাগম্যাটিষ্ট" নাম ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা পরকাল মানেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মের সার্থকতা আছে, কিন্তু যাঁহারা পরকাল মানেন না, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মের আবশ্যকতা দেখান কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরোপাসনায় বা ইতিকর্ত্তব্যতা-পালনে আমরা একটা রস পাই সত্য। যদি কেবলমাত্র রসের অনুরোধে ধর্ম্মাচরণ করা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের মূল্য বড়ই কম হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যে আমরা রস পাই, শৃঙ্খলারও সমাবেশে রস অনুভব করি, কাব্যপাঠেও রস আছে এবং সঙ্গীত শ্রবণেও রসাস্বাদ করিয়া থাকি। অতএব ধর্ম্মের সহিত এ সকল রসের একভাব হইয়া পড়ে। দুই একজন জার্ম্মাণ দার্শনিক বলেন, তাহাতে ক্ষতি কি আছে? সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি হইতে আমরা যে তৃপ্তি পাই, তাহা পবিত্র, শুদ্ধ ও স্বর্গীয়। সুন্দর চিত্র বা দৃশ্য দেখিয়া যে রস পাই, তাহা ইতরজীবের সুখ নহে, উহাতে পাশবিক উত্তেজনা নাই, উহা আনন্দ। কথাটা ঠিক। বৈষ্ণবেরা সৌন্দর্য্যকে তিল তিল করিয়া বাছিয়া ঈশ্বরকে মদনমোহন রূপে সাজাইয়াছেন। কামিনীর সৌন্দর্য্যেও আনন্দ পাই যদি তাহাতে ভোগেচ্ছা না থাকে; তাই শাক্তের ঈশ্বরী ষোড়শী। সেইরূপ কাব্যও নৈসর্গিক তাই দেবোপাসনার জন্য সামবেদ এবং দেবতার তৃপ্তির জন্য আমরা সামগান করিয়া থাকি।

মানবসমাজে তত্ত্ব, বিদ্যা ও ধর্ম্ম কেন আসিয়াছে, তাহা আমরা জানি-না। জীবরাজ্যে মানুষের সহিত অপর জীবের এইগুলি লইয়াই প্রভেদ। যিনি জগতের আদি অন্তের সংবাদ জানেন, তিনিই এই রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পারেন। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাই আবশ্যক বলিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া লইব। জ্ঞানরাজ্যে ধর্ম্মের স্থান অতি উচ্চ এবং ইহাতে স্রষ্টা ও সৃষ্টের যে সম্বন্ধ, ইহাই পরম আনন্দ।

ভক্তবাৎসল্যে গোপীনাথ।

১

গোবিন্দ প্রাণের সুতে অকালে হারায়ে হায়,
হেরিলেন অন্ধকার এ বিশাল বসুধায়!
শূন্য ক্ষুদ্র গৃহখানি, শূন্য সারা প্রাণমন,
নীরব শিশুর হাসি রুদ্ধ সুধা-প্রস্রবণ!

২

ইষ্টদেব গোপীনাথ বিরাজিত গৃহে যাঁর,
অদৃষ্টে এমন শোক কেমনে লিখিত তাঁর?
শোকে দুখে অভিমানে গোবিন্দ আপনা-হারা,
ভাবিলেন অনাহারে ত্যজিবেন দেহ-কারা!

৩

গোপীনাথ গৃহদ্বারে রহিলা গোবিন্দ পড়ি'
দীর্ঘ দিবা অবসান অস্তোন্মুখ বিভাবরী!
নাহি সেবা নাহি ভোগ নাহি পূজা অর্ঘ্যদান,
উপবাসী ভক্তসনে উপবাসী ভগবান্!

৪

সহসা শ্রবণে তাঁর পশিল মধুর স্বর
আকুল-আবেগ-ভরা প্রাণ-কাড়া মনোহর!
"গোবিন্দ! বাপ্‌রে মোর! তুই কি নিষ্ঠুর হেন
সারাদিন বারিবিন্দু আমারে দিলিনা কেন?

৫

গোবিন্দ কহিলা রোষে "বটে আমি নিরদয়!
বক্ষ মোর চূর্ণ করি এবে তুমি দয়াময়!
শক্তিহীন দেহ মম, চিত্তে জাগে হাহাকার,
পারিব না সেবা তব করিবারে আমি আর!"

৬

উত্তরিলা গোপীনাথ "আমি বড় ক্ষুধাতুর,
এক পুত্রে হারাইয়ে অপরে কে করে দূর?
এক সুত নাহি বলে অন্য সুতে অনশন
বাপ রে! রেখোনা আর, কর অশ্রু বিমোচন!"

৭

কহিলা গোবিন্দ ক্ষোভে "রাখ তব চতুরালী!
"বাপ্" "বাপ্" ডাকিতেছে চিত্তে মোর চিতা জ্বালি'!
এক মাত্র পুত্রে মোর কেন তুমি হরি' নিলে?
ব্যথা দিয়ে হে নির্দ্দয়! ব্যথা তুমি কিছু পেলে?"

৮

—"গোবিন্দ! গোপনে শুন, কথা এক সুগোপন.
আমি নহি পুত্র তার, যার রহে অন্যজন!
তুমি আমি ছিনু বেশ পিতা-পুত্র দুইজনা,
আবার তেমতি রব, কেন তুমি ক্ষুণ্ণমনাঃ!

৯

"আমি যদি যাইতাম সর্ব্বস্ব যাইত তব,
তাই বাপ সুতে নিনু দিনু দুঃখ অভিনব!
মুছ এবে অশ্রু তব, বড় ক্ষুধা, ভোগ দাও,
বাপ রে! গোবিন্দ মোর! গোপীনাথে ফিরে চাও!"—

১০

পুত্র-শোকাতুর আহা! শুনি এ সান্ত্বনা বাণী,
কহিলা ক্ষণেক চিন্তি, "সত্য আমি, সত্য জানি!
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুত গোপীনাথ তুমি মম,
করিবে কি তবু মোর পিতৃকার্য্য প্রিয়তম!"

১১

গোবিন্দের দুঃখহেতু বুঝি গোপী কৃপাময়
হইলেন প্রতিশ্রুত "জেনো বাপ্ সুনিশ্চয়!

পুত্রের কর্ত্তব্য যাহা শ্রাদ্ধাদি করিব তব,
পূরাতে ভক্তের সাধ নাহি মোর অগৌরব!"

১২

শুনিয়া গোপীর বাণী গোবিন্দ ভুলিলা দুখ,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে অশ্রু, কি অপূর্ব্ব জাগে সুখ!
ক্ষমা মাগি দিলা ভোগ ভক্ত আর ভগবানে,
আরম্ভিলা লীলা পুনঃ যুক্ত হয়ে প্রাণে প্রাণে।

১৩

গোবিন্দ গোবিন্দ-লাভ করিলেন যবে হায়,
বিচ্ছুরিয়া স্নেহ-দ্যুতি স্নেহ-হীন বসুধায়!
কে কাঁদিবে তার তরে, কেহ নাই আপনার,
গোপীনাথ অশ্রু বহে যুগল জাহ্নবী ধার!

১৪

গোবিন্দের শিষ্য এক করে দিলা আয়োজন
পালিতে অশৌচ-ব্রত গোপীনাথ দয়াঘন!
হবিষ্যান্নে ভোগ তাঁর, কণ্ঠে কাছা পরিধান,
শ্রাদ্ধ করি যথারীতি করিলেন পিণ্ডদান!

১৫

চারি শত বর্ষ ধরি' বর্ষে বর্ষে সেই মত
এখনো যে গোপীনাথ পালেন সন্তান-ব্রত!
এখনো যে বর্ষে বর্ষে অগ্রদ্বীপে মহোৎসব
ঘোষিছে দয়ার আর বাৎসল্যের কি গৌরব!

১৬

গোবিন্দ! ভকত-শ্রেষ্ঠ! বন্দি তোমা লক্ষবার,
লভিয়াছ ভগবানে পুত্রস্নেহে আপনার!
ধন্য ধন্য গোপীনাথ! করুণার পারাবার!
যুগে যুগে জন্মে জন্মে লহ পূজা অভাগার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মহাভারতীয় পরম ধর্ম্ম।

[শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম-এ।]

মহাভারতীয় সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা ও বিচার করা অতিশয় দুরূহ ও বহু-সময়সাপেক্ষ। এজন্য প্রথমতঃ এই প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়টীর আলোচনা সংক্ষেপে করা হইবে ও সুযোগ উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ সমস্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, সকল দিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া বক্ষ্যমাণরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সলাভের শাস্ত্রবিহিত সর্ব্বলোকোপকারক হেতুই ধর্ম্ম। (১) ধর্ম্মের অন্যান্য নানাপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্বদ্গণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনটীই উপযুক্ত হয় নাই। এজন্য শাস্ত্রকারগণের বাক্যাদি সম্যক্ বিচার করিয়া

---

(১) যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ। (কণাদ)।

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। (জৈমিনি)।

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥
শ্রুতির্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুরপরে জনাঃ।
ন চ তৎপ্রত্যসূয়ামো ন হি সর্ব্বং বিধীয়তে॥ ইত্যাদি শান্তিপর্ব্ব।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ (ভগবদ্গীতা)

উক্তবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল! সুবিধা হইলে অন্য প্রবন্ধে ঐ সকল মত আলোচনা করিয়া উহার অসম্পূর্ণতা দেখান হইবে। যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মের প্রমাণই শাস্ত্র, অতএব শাস্ত্রের প্রতি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুমাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধাস্থাপন আবশ্যক।

শাস্ত্র ব্যতীত প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অগ্রসর হইবার কোন উপায় নাই, অতএব যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে চাহেন, তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থপাঠে যে বিমল আনন্দ ও প্রচুর শিক্ষালাভ হয়, তাহা তৎপর ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসমূহ এবং সমর্থ হইলে বেদ উপনিষদ্গুলি অধ্যয়ন করা অতি কল্যাণকর। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অত্যন্ত শিথিল, লুপ্তপ্রায়, নাই বলিলেও হয়। আরও শোচনীয় কথা এই, তাঁহারা যে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া পুরাতন শাস্ত্র-সমূহের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা সাধারণতঃ কোনপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানই করেন না। আরও দোষ এই যে, তাঁহারা হুজুগে পড়িলে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম নৈতিক ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন,--- যেন তাঁহাদের নিজের মেরুদণ্ড নাই, হুজুগের স্রোতে যতদূর গড়াইতে পারেন গড়াইলেন ; তাহার পর হুজুগ থামিলে, তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগও থামিয়া গেল। বস্তুতঃ যাহা ভাল বলিয়া ধারণা জন্মে,আজীবন বা আফলোদয় তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। নিজে যাহা ভাল বলিয়া বুঝা যায়, তাহা করিবার জন্য বাহিরের প্রেরণার অপেক্ষা করা স্বাধীন চিত্তের লক্ষণ নহে। অনেকে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, শাস্ত্র নানা কারণে অবিশ্বাস্য ; অতএব তাহার উপরে শ্রদ্ধা হইবে কিরূপে? তাঁহারা বলেন যে, শাস্ত্রসমূহ অসম্ভব ঘটনাপূর্ণ, নীতিবিরুদ্ধ উপাখ্যান-দুষ্ট, অনর্থ-অনুষ্ঠানবিধি-বহুল, প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমাকীর্ণ ইত্যাদি। অতএব তাহার উপর শ্রদ্ধাস্থাপন করা যায় কিরূপে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে বলিয়া আপনাদিগকে যে অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া মানিতে হইবে, অথবা দুর্নীতিকে সন্নীতি বলিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিংবা কেবল ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই থাকিতে হইবে বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক-

সমূহই পাঠ করিতে হইবে, তাহা একেবারেই বলিনা। আপনারা এসমস্তই নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিবেন ও তাহা ত্যাগ করা একান্তই কর্ত্তব্য। এবং আপনারা যদি শাস্ত্র-প্রামাণ্য-স্থাপনকামী মীমাংসকগণের গ্রন্থ পাঠ করেন, তবে দেখিবেন যে তাঁহারাও তণ্ডুলপ্রার্থী ব্যক্তি যেরূপ ধান্যের তুষাংশ নির্ম্মমভাবে ছাঁটিয়া ফেলে, সেইরূপ শাস্ত্রের অসারত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ধান্যের তুষাংশকে তুষভাবে এবং তণ্ডুলাংশকে তণ্ডুলভাবে লইলে যেমন সমস্ত অংশেরই যথাযথ গ্রহণ করা হয়,সেইরূপ তাঁহারাও যথাযথ সম্বন্ধ দেখাইয়া সমগ্র শাস্ত্রেরই প্রামাণ্যস্থাপন করিয়াছেন, কিছুই ত্যাগ করেন নাই। আপনারা সমস্ত গ্রহণ করিতে না পারেন, তুষাংশকে ত্যাগ করিতে যাইয়া যেন তণ্ডুলটী ফেলিয়া না দেন। মণির অনুজ্জ্বল ভাগ দূর করিতে যাইয়া যেন মণিটাই হারাইয়া না বসেন। শাস্ত্রের অসার ভাগ ত্যাগ করিবার আগ্রহে যেন শাস্ত্র ত্যাগ না করেন। দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা পরিস্ফুট করা কর্ত্তব্য।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম ও নৈতিক ধর্ম্ম এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য পরমধর্ম্মলাভ। আত্মজ্ঞানই পরমধর্ম্ম,—"অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্‌।" কিন্তু এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের মূলই শাস্ত্র; এজন্য শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাস্থাপন বিশেষ কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞানও যে শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতিরেকে একান্ত দুর্লভ, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-সূত্র-ভাষ্যকার প্রভৃতির বচনের দ্বারা প্রমাণিত হয়। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া; অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ; শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইত্যাদি।

পরমধর্ম্ম লাভই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য হইলেও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম ও নৈতিক ধর্ম্ম তল্লাভের সোপান; এজন্য উহাদেরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এমন কি অর্থকামেরও প্রয়োজন আছে। এইজন্য কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভই পুরুষার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ষড়্‌জ গীতা নামক মহাভারতের অধ্যায়-বিশেষে, এই চারিটীর কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা দেখা যায়। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, ধর্ম্মের ফল অর্থ-সম্পত্তি-লাভ, অর্থের ফল কামনাপূরণ ও কামের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ হওয়া উচিত নহে। কামের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে, জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যকামনা মাত্র। অর্থের উদ্দেশ্য কামপূরণ নহে, ধর্ম্ম

কার্য্য করা ও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য অর্থলাভ নহে, চিত্তশুদ্ধি, যদ্দ্বারা মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়া যায়।

আত্ম-স্বরূপ চিন্মাত্র উহা দেহ দেহজ বা দেহান্তর্গত কোন পদার্থ নহে। শুদ্ধচৈতন্য ভৌতিক পদার্থ নহে—ইহা অনুভব-গম্য। অতএব শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ আত্মাও পঞ্চভূতময় দেহ বা দেহজ কিছুই হইতে পারে না। এবং এই আত্মা অসঙ্গ, অকর্ত্তা ও অভোক্তা। চিন্মাত্র পদার্থ ভৌতিক পদার্থের সহিত মিশিতে পারে না। অতএব আত্মা অসঙ্গ; এবং অসঙ্গ বলিয়াই অভোক্তা, এবং অভোক্তা—অতএব অকর্ত্তা। আত্মা যাহা তাহাই আছে ও চিরকালই থাকিবে। অতএব আমরা বদ্ধ একথা বাস্তবিক নহে। আমরা চিরমুক্ত, চিরানন্দময়, আত্মারাম। চিরশান্তিময় সর্ব্বজ্ঞতাময় অনন্ত জীবন লাভ হইবে। কোন ভয় নাই, বাধা নাই বিঘ্ন নাই। কেবল যে এই ভ্রান্তি দূর হইলেই চিরশান্তি, সুখ, আনন্দ হইবে তাহা নহে; এই চেষ্টাতেও শান্তি-সুখ-আনন্দ আছে। এই চেষ্টায় কোন বাধা নাই, বিঘ্ন নাই—দেবতারাও বাধা দিতে পারেন না। এই চেষ্টাতে সকলেই সফল-কাম হইবেই হইবে। "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" ইত্যাদি।

আর্য্য হিন্দু সমাজের সূচনা।

[শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।]

মনু।

"যৎ শঞ্চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু।"

ঋগ্বেদ, ১ম, ১১৪ সূ, ২ ঋক্।

সমাজের চারিটী স্তর—ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক স্তরে অনুসন্ধান করিলে যেমন তৎসমুদায়ের উন্মেষ-কালের বৈশেষিক উপাদানগত নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সমূহের পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যেক

স্তরের ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্কলিত হইতে পারে। সমাজের প্রত্যেক স্তরেই এক একটী প্রধান পুরুষের অবদানের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। জল-বায়ু, খাদ্যসামগ্রী, আবাসভূমি ও নিসর্গের সমবেত শক্তি ও প্রভাবের সহিত মানবীয় শক্তির অনুলোম ও বিলোম সম্মিলনে প্রত্যেক সমাজের সংগঠন হইয়া থাকে। বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষা মানবের অন্তঃপ্রকৃতির প্রভাব যে দেশে বলবত্তর, তথায় উভয় শক্তির অনুলোম-মিলন হয়, বলা যাইতে পারে। ইয়ুরোপের দক্ষিণ-দেশ-সমূহে ইহার নিদর্শন বিরল নহে; কিন্তু যেখানে বাহ্যপ্রকৃতির নিকট অন্তঃপ্রকৃতি শক্তিহীনা, অথবা যেখানে অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগতা, কিম্বা অধীনা, সেই খানেই উভয় শক্তি বিলোম-ভাবে মিলিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ইহার প্রধানতম দৃষ্টান্ত। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অংশও ইহার উদাহরণ স্বরূপ প্রকটিত হইতে পারে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও দর্শন-শাস্ত্র-সমূহের আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে আর্য্য-হিন্দু-সভ্যতার সুবর্ণযুগে কপিল ও কণাদ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল তন্ন-তন্নরূপে বিশ্লেষিত করিলেও বাহ্যপ্রকৃতির সেই অবাঙ্‌মনসগোচরা শাশ্বতী শক্তির মহিমা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ও হৃদগত করিতে পারেন নাই।

প্রথম স্তর হিন্দুসমাজের ক্রমিক উন্নতি ও পরিপুষ্টির প্রকৃতি অনুসারে ইহা চারিটী স্তরে বিভক্ত হইতে পারে; যথা ১ম বৈদিক, ২য় দার্শনিক, ৩য় পৌরাণিক, ৪র্থ তৌপাস্তিক। ভগবান্ মনুর সমসাময়িক জলপ্লাবনের পর হইতে প্রথম স্তরের আরম্ভ এবং ভগবান্ পরশুরামের সময় পর্য্যন্ত ইহার শেষ। এই প্রথম স্তরে জলপ্লাবনের পর দুই চারিটী নিরবয়ব সামান্য উপলখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কালে কালে ক্রমে রাশি রাশি সুগঠিত ইষ্টক-প্রস্তরাদি বিবিধ উপকরণ একত্রীকৃত হইয়াছিল; এবং সেই সকল উপকরণের যথাবিধি বিন্যাস দ্বারা হিন্দু-সমাজের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্তরেই চাতুর্ব্বর্ণের উন্মেষ এবং সেই সঙ্গে কৃষি-বাণিজ্যাদি লোকবৃত্তিসমূহের উৎপত্তি ও ক্রমোৎকর্ষ; বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি; বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারের সূচনা; রাজধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের কল্পনা ও ক্রমোন্নতির আরম্ভ। মনু,

পৃথু, সগর, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র,—এই পঞ্চ বীরকে এই স্তরের প্রধান স্থপতি বলা যাইতে যাইতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর—দ্বিতীয় অথবা দার্শনিক স্তর প্রথম স্তরের ক্রমোৎকর্ষ বা পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে ইহাতে অনেকগুলি নূতন উপকরণ উপচিত হইয়াছিল;—তন্মধ্যে উপনিষদ্ ও পরম গুহ্য ব্রহ্ম-রহস্যের উদ্ভব ও আবিষ্কার এবং কপিল ও গৌতমের অতিমানুষ গবেষণা;—এই দুইটীই প্রধান। এই দুইটী প্রধান উপকরণ এবং ইহাদের অনুরূপ অন্যান্য উপকরণের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে যে অভিনব পদার্থ-নিচয় উদ্ভূত হয়, তৎসমুদয়ই হিন্দুর সমাজ-বন্ধনের মূল রজ্জু। এই স্তর জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র ও শ্বেতকেতু, কপিল ও গৌতম, এই ছয়টী মহাবীরের অলৌকিক অবদানে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

তৃতীয় স্তর—দ্বিতীয় স্তর যেমন প্রথম স্তরের পরিণতি, তৃতীয় স্তরও সেইরূপ দ্বিতীয় স্তরের পরিণাম ফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই পরিণামে তাহার চরমোৎকর্ষ অধিক হইয়াছিল। এই স্তরেই শিল্প-বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ, লোকসংখ্যার আত্যন্তিক বিবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে জীবনসংগ্রামের কঠোরতা; উৎকট জীবন-সংগ্রাম জন্য ভীষণ লোকবিপ্লব এবং পরিণামে জাতীয় অধঃপতন;—এই কয়টীই প্রধান ঘটনা। দ্বিতীয় স্তর ও তৃতীয় স্তরের সন্ধিস্থলে শ্রীরাম এবং তৃতীয় স্তরের শেষ যুগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরাশর ও ব্যাস, কণাদ ও জৈমিনি, চরক ও সুশ্রুত, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ,—এই অষ্টজন মহাপুরুষ লইয়াই পৌরাণিক স্তর। ইহাঁরাই কালে কালে পৌরাণিক স্তরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 'নদারুণ লোক-বিপ্লবে হিন্দু-সমাজ ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইলে ইহাঁদের মধ্যে কোন কোন মহাবীর তাহার ধ্বংসাবশেষ লইয়া সমাজের পুনর্গঠনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

চতুর্থ স্তর—ইহার পরই চতুর্থ বা ঔপান্তিক স্তর। এই স্তর প্রাচীন হিন্দু-সমাজের ধ্বংসরাশির উপর বিন্যস্ত। ইহাতে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম—সমস্তই বিপ্লুত; লোকযাত্রার উপায়, সমুদায়ই বিপর্য্যস্ত। আর্য্যের অধঃপতনে অনার্য্যের অভ্যুত্থান; বিভগ্ন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের উপকরণাদি লইয়া শাখাধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম-নিচয়ের সৃষ্টি। এই স্তরে অনেকগুলি বীর

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পাণিনি ও কাত্যায়ন, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত, শাক্যসিংহ ও নাগার্জ্জুন, শঙ্কর ও চৈতন্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চারিটী স্তরে আর্য্য-হিন্দু-সমাজ ক্রমে ক্রমে কিরূপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, যথাক্রমে তাহাই প্রকটিত হইতেছে।

আর্য্য হিন্দুগণের আদি পুরুষ ;

মনু।—মনুকে লইয়াই বিরাট হিন্দু-সমাজের আদি স্তর গঠিত। হিন্দুর সামাজিক জীবনের ইহাই আদি যুগ। **এই স্তরের ক্রমোন্মেষকালেই পরম গুহ্য বেদমন্ত্র সকল ঋষিগণের মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল। মনুর আবির্ভাব হইতেই এই স্তরের সূচনা।** মনুর পূর্ব্বে ভারতে আর্য্য-বসতি ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে নানা মত প্রকটিত আছে। তৎসমুদয় মতের সমন্বয় সাধন করিলে মনুকে ভারতীয় আর্য্যগণের আদি পুরুষ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

আর্য্য-জাতির আদি নিলয়—মনুকে ভারতীয় আর্য্যগণের আদি পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিবার পুর্ব্বে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, ভারতীয় আর্য্য-জাতির আদি বাসস্থান কোথায়? এই বিষয়ে বহুদিন হইতে গভীর আলোচনা চলিতেছে। মোক্ষমূলর-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধানে বিপুল আয়াস স্বীকার ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই মত এই যে, মধ্য-এসিয়ার একটী উচ্চ মালভূমিতে (অনেকে বলেন উত্তরমেরু) শাকসেন, জর্ম্মন, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের আদি-পুরুষগণ ভারতীয় আর্য্য-গণের পিতৃপুরুষদিগের সহিত একত্র একস্থানে বাস করিতেন। সেই প্রদেশ নিতান্ত অল্প-পরিসর ; বহুজাতি বহুকাল একত্র বাস করাতে প্রজা-বৃদ্ধির নিত্য সংক্ষোভে এবং জীবন-সংগ্রামের বিবর্দ্ধমান কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাকসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য-জাতিসমূহের পিতৃপুরুষগণ সেই আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করেন। তদনুসারে ভারতীয় আর্য্য-গণের ও পারসিকদিগের

আদিপুরুষগণও সেই আদিম কেন্দ্রস্থল হইতে বহির্গত হইয়া ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রতিভা-প্রসূত এই প্রবল মত প্রায় সমগ্র সভ্য-জগৎকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। যে কয়েকটী বেদজ্ঞ পণ্ডিত এই মতের মোহিনী-মায়ায় বিমুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গের একমাত্র প্রথিতনামা পণ্ডিত ৺স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যে সকল অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐ বলবৎ মত খণ্ডিত করিয়াছেন, এই অল্প পরিসরের মধ্যে তাহার আলোচনা অসম্ভব; পরন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্যও নহে।

"প্রত্ন-ওক।"—ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহে ভারতীয় আর্য্যগণের একটী "প্রত্ন-ওক" অর্থাৎ পুরাতন বাসস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সেই প্রত্নওক এসিয়া-মণ্ডলের কোন্ নিভৃতস্থানে ছিল, অদ্যাপি তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। সেই দুরূহ মতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কেননা, তদ্দ্বারা সেই প্রাচীনতম আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আর্য্য হিন্দুগণের সামাজিক অবস্থার প্রথম উন্মেষ যে স্থলে আরব্ধ বলিয়া প্রতীতি হইবে, আমরা সেই স্থল হইতেই অগ্রসর হইব। বলা বাহুল্য, মনু হইতেই আর্য্যহিন্দুসমাজের প্রথমোন্মেষ দেখা যায়। মনুই আমাদিগের আদি পুরুষ, অগ্নির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা ও উপাসক এবং প্রথম যজ্ঞকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

জল-প্লাবন—শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, মনুর সময়ে ভীষণ জল-প্লাবন হইয়াছিল; তাহাতে একমাত্র মনু ভিন্ন আর সমস্ত প্রাণীই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বিবরণটীর সার-মর্ম্ম এই স্থানে প্রকটিত হইল। প্রাতঃকালে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত মনুর নিকট জল আনীত হইলে, মনু স্বীয় হস্তস্থিত জলমধ্যে একটী ক্ষুদ্রকায় মৎস্য দেখিতে পাইলেন। মৎস্য তাঁহাকে বলিল, "আপাততঃ আপনি আমাকে রক্ষা করুন; তাহার পর শীঘ্র জল-প্লাবন হইবে, তাহাতে আমি আপনাকে রক্ষা করিব।" মৎস্য মনুকে আরও অনেক কথা বলিল এবং পরিশেষে তাঁহাকে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিল। তাহার কথানুসারে মনু

একখানি নৌকা প্রস্তুত করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট কালে প্লাবনারম্ভ হইলে মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার একটী শৃঙ্গ ছিল। মনু সেই শৃঙ্গে স্বীয় তরণী বন্ধন করিলেন এবং সেই অনন্ত জলরাশির উপর দিয়া উত্তর গিরির (হিমালয়ের) অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

প্লাবনের জলরাশি শুষ্কীভূত হইলে মনু সেই উত্তরস্থ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া প্রজা-উৎপাদনের অভিলাষে অর্চ্চনা, তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে ইড়া নামে তাঁহার এক কন্যা উদ্ভূতা হয়। সেই কন্যার সহিত তপস্যা দ্বারা তিনি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত প্রজা মানব নামে অভিহিত। শতপথ-ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যানের অভ্যন্তরে যে কোন রূপক বা গূঢ় অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন, আমি তাহার আলোচনা করিব না। এক্ষণে এই উপাখ্যানের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক।

১। মনু ভারতেরই কোন স্থানে পূর্ব্বে বাস করিতেন ; কারণ, ভারতবর্ষ তিন দিকে সাগর-দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সেই সাগরেরই জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া ভারতকে গ্রাস করে। মনু তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত নৌকারোহণে উত্তর-গিরি অর্থাৎ হিমালয়ের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

২। মনুর পূর্ব্বে ভারতে লোক ছিল। যাহারা ছিল, একমাত্র মনু ভিন্ন তাহারা সকলেই জল-প্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং প্লাবনের পর মনু একাকীই অবশিষ্ট ছিলেন।

৩। মনুর নৌকা হিমাচলেরই একটী শৃঙ্গে সংলগ্ন হয়। মনু সেই পর্ব্বত-প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্থানেই জল মধ্য হইতে উত্থিতা কন্যা ইলার সহযোগে তপস্যা দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন।

আদি পুরুষ—মনুর সৃষ্ট সেই প্রজাবর্গ যে আর্য্য-হিন্দুগণের আদি পুরুষ, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যানে স্পষ্টরূপে বর্ণিত না থাকিলেও অন্যত্র তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের স্থানে স্থানে মনুর যজ্ঞানুষ্ঠান ও অগ্ন্যাধান প্রভৃতির বহুল উল্লেখ আছে ; তাঁহার যজ্ঞে কিলাত ও অকুলি নামক দুইজন অসুর, যাজকের পাপ-প্রবৃত্তি ও পরাভব এবং তাঁহার নিজের শ্রীবৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত আছে ; কিন্তু তাঁহার পুত্রগণের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণই দেখা যায় না। শতপথ ছাড়িয়া ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয়-সংহিতা

পাঠ করিলে মনুর এবং তাঁহার কোন কোন পুত্রের একটু বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে মনু পুত্রগণের মধ্যে দায়-বিভাগের অল্পবিস্তর বিবরণ আছে। তাহাতে দেখা যায়, মনুর অন্যতম পুত্র নাভানেদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাতে তদীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই নাভানেদিষ্ট মহাভারতের আদিপর্ব্বে নাভাগারিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তথায় লিখিত আছে, মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণের আদি পুরুষ। তাঁহার দশ পুত্র ; বেণ, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, (ইলা (কন্যা)) পৃষধ্র, ও নাভাগারিষ্ট। কথিত আছে, মনুর আরও পঞ্চাশৎ পুত্র ছিল ; কিন্তু আত্ম-কলহে তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিল।

কর্ম্মবশে উন্নতি ও অবনতি।—হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মনুর ঐ সকল পুত্রগণের যে বিশেষ বিবরণ প্রকটিত আছে, তাহা পাঠ করিলে তদনীন্তন আর্য্য-হিন্দু-সমাজের অনেক গূঢ় বৃত্তান্ত জানা যায়। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, মনু-পুত্র পৃষধ্র গুরুর গোবধ জন্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। করুষ হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত ধর্ম্মবৎসল কারুষ নামক ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহারা উত্তরাপথের রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। নেদিষ্ট-পুত্র নাভাগ কর্ম্মবশতঃ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে, নাভাগ বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করাতে বৈশ্য হইয়াছিল। ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টক ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত হয়। ইহাদের সন্তান-সন্ততিগণ কালে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সদস্য, গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন যে, অতঃপর তাঁহারা শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল ও তাহার শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় পত্রাদি ও টাকাকড়ি সমস্তই "প্রধান মন্ত্রী, শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল, ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কেন মন হয়েছ মলিন ?

কেন মন হয়েছ মলিন ?
কোথা সে পবিত্র আশা,
সুপবিত্র ভালবাসা,
দিনেকের পরে কেন গণিতেছ দিন ?
বল, শুদ্ধ বাসনারে
ফেলে দিয়া কোন্ ধারে,
হতাশ অনলে তুমি হইতেছ ক্ষীণ,
কেন মন হয়েছ মলিন ?
ভুলে প্রেম-অবতার,
দাসত্ব করিছ কা'র,
আপনারে ভুলে আজি হইয়াছ দীন ?
বিমল কামনা ফুলে
মালা-গাঁথা প্রাণ খুলে
দেখিনা কেনরে তোমা আর কোন দিন,
কেন মন হয়েছ মলিন ?
কা'র প্রলোভনে আজ,
ভুলেছ আপন কাজ,
সংসারের কাদা মেখে হয়েছ রে হীন ?
আকাশ-কুসুম তুলে,
মায়ার পুতুলে ভুলে,
খেলিতে আসিয়া, হ'লে খেলাতে যে লীন !
তাই বুঝি হয়েছ মলিন ?

শ্রীরাধা।

সাময়িকী।

সরকারী রিলিফ্ ফণ্ড।—ঝড়ে বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য সরকারী "সাইক্লোন সেন্ট্রাল রিলিফ্ ফণ্ডে" এ পর্য্যন্ত মোট চাঁদা উঠিয়াছে ১,২৬ ৫৪৭৸৹ একলক্ষ, ছাব্বিশ-হাজার, পাঁচশত সাতচল্লিশ টাকা বার আনা।

পুরীধামে অন্নকষ্ট।—উড়িষ্যার সর্ব্বাঞ্চলেই এবার অত্যন্ত অন্ন-কষ্ট হইয়াছে। ৺ পুরীধামেও তাহার প্রকোপ নিতান্ত কম নহে। বহু লোকের বিষম কষ্ট হইয়াছে। যাঁহাদের প্রাণ আছে, তাঁহারা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া আতুর অন্নপ্রার্থীদের ক্ষুন্নিবারণের জন্য যত্ন করিতেছেন। আমরা কোন বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট শুনিলাম,—পুরীর পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর সখীচাঁদ এ বিষয়ে একজন প্রধান অগ্রণী। তিনি প্রায় সাতশত মঠ হইতে এক এক হাঁড়ি "ভোগ" সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ প্রায় দুই তিন হাজার লোককে খাওয়াইতেছেন, এবং আরও নানাপ্রকারে বহুলোককে সাহায্য করিতেছেন।

দ্বারকা তীর্থে পথের সুবিধা।—কাঠিয়াবাড়ের সংবাদে প্রকাশ, পোরবন্দর হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত মোটর-সার্ভিস বসিয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর হইতে দুইখানি করিয়া মোটর গাড়ী প্রত্যহ পোরবন্দর হইতে দ্বারকা এবং দ্বারকা হইতে পোরবন্দরে যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিতেছে। ভারতের সর্ব্বাঞ্চল হইতেই এখানে অসংখ্য পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে; তাহাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। জামনগর হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত রেলপথও প্রস্তুত হইবে। জাম সাহেব ইহার জন্য কন্ট্রাক্ট আহ্বান করিয়াছিলেন; একজন আরব-দেশীয় বণিক্ এই রেলের কন্ট্রাক্ট লইয়াছেন। দ্বারকাতীর্থে যাওয়ার বড়ই কষ্ট ছিল। পোরবন্দর পর্য্যন্ত রেলে যাওয়া যাইত, পোরবন্দর হইতে জাহাজে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্র দিয়া দ্বারকা যাওয়া যাইত, অথবা গরুর গাড়ী করিয়া তিন দিনে দ্বারকা যাওয়া যাইত। গরুর গাড়ীর পথে অনেক বিলম্ব হইত, এবং

পথে দস্যু-ভয়ও ছিল. এজন্য অধিকাংশ লোক পোরবন্দর হইতে জাহাজে করিয়াই দ্বারকা যাইতেন। কিন্তু পোরবন্দর ও দ্বারকা, কোথাও জাহাজের জেটী না থাকায়, নৌকা করিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজ হইতে উঠানামা অত্যন্ত বিপদজনক ও কষ্টকর ছিল। এই মোটর গাড়ী প্রচলনে সেই কষ্ট দূর হইল, আর জামনগর হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত রেল হইলে পথের আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

নিয়মাবলী।—শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের "মেমোর্‍্যাণ্ডাম্ অফ্ য়্যাসোসি-য়েসন্ ও নিয়মাবলী" মুদ্রিত হইয়াছে। উহা শীঘ্রই মণ্ডলের সদস্যবর্গের নিকট প্রেরিত হ ইবে।

যজ্ঞ।—শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কাশীধামস্থ যজ্ঞমণ্ডপে আগামী রাস-পূর্ণিমা তিথিতে "শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ"ও ১৪ই ডিসেম্বর কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে "শ্রীশক্তিযজ্ঞ" অনুষ্ঠিত হইবে। দেবতার সম্বর্দ্ধনা, শ্রীভগবানের কৃপাপ্রাপ্তি, সম্রাট, সাম্রাজ্য ও জাতীয় কল্যাণের নিমিত্ত এই যজ্ঞদ্বয়ের অনুষ্ঠান করা হইতেছে।

পরলোকে।—আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গের প্রথিত-যশা, গীতার বাঙ্গালা ভাষ্যকার, অবসর-প্রাপ্ত সব্‌জজ, চিন্তাশীল সুলেখক দেবেন্দ্র-বিজয় বসু, এম এ, বি এল, মহোদয় সম্প্রতি ইহ-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠকবর্গের নিকট তিনি বিশেষ পরিচিত। তাঁহার গভীর তত্ত্ব-পূর্ণ সরল প্রবন্ধাবলী, যাহা ধর্ম্মপ্রচারকে বাহির হইয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। তাঁহার ন্যায় যথার্থ ধার্ম্মিক-পুরুষ আজকাল বাঙ্গালাদেশে দুর্লভ। আমরা আর কি বলিব, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই আজ বাঙ্গালায় প্রকৃত মানুষের এই দুর্ভিক্ষের সময় আমরা এমন একটী মানুষের মত মানুষ হারাইলাম! আমাদের আরও বিশেষ কষ্টের কারণ যে, তাঁহার আরব্ধ গীতার ভাষ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি ঈপ্সিতলোকে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি উহার পাণ্ডুলিপি তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ উহা প্রকাশ করিয়া পিতার আরব্ধ মহান্ কার্য্যের পরিসমাপ্তি করিবেন।

পরশিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কতিপয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক প্রকাশিত হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়ায় অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসের পত্রিকা একসঙ্গে বাহির হইল। আশা করি পত্রিকার সহৃদয় গ্রাহকগণ এই অপরিহার্য্য বিলম্ব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীবিজয়লাল দত্ত,

সম্পাদক, ব-ধ-ম।

জন্মান্তর তত্ত্ব।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

অবতরণিকা।

আমি মরিয়া কোথায় যাইব? এই প্রশ্ন সুখী দুঃখী, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেরই চিত্তে আপনা আপনিই উত্থিত হইয়া থাকে। উদ্দাম ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যিনি বৈষয়িক সুখকেই সার্থক মনে করিয়াছেন, প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিণামজনিত প্রতিক্রিয়ার সময় তিনিও একবার নয়নোন্মীলন করিয়া ভাবিয়া থাকেন "আমার এইরূপেই কি চিরদিন কাটিবে, অথবা আমাকে আমার সমস্ত প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন অদৃশ্য অননুমেয় লোকে গমন করিতে হইবে?" দুঃখীর জীবনের ত প্রত্যেক স্তরেই দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে জন্মান্তর চিন্তা সততই উদিত হইয়া থাকে। কারণ সে যদি বিষয়-সুখ-মুগ্ধ প্রতিবেশীর মধ্যে বাস করিয়া নিজের অনন্যসাধারণ ভীষণ দুঃখের মূলে প্রাক্তন দুষ্কৃতি দেখিতে না পায়, তবে তাহার দুঃখানল দহ্যমান হৃদয়ে শান্তি-সুধাসিঞ্চন কে করিবে? কিরূপেই বা সে সংসারে দুঃখের গুরুভার বহন করিবে? এইরূপ অবিদ্বান মূর্খের মনে যে প্রকার পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্বাভাবিক, সেই প্রকার যিনি জ্ঞানবান, যাঁহার হৃদয়াকাশে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, যিনি আত্মাকে জনন-মরণ-হীন নিত্য বস্তু এবং মৃত্যুকে নিদ্রার রূপান্তরমাত্র বলিয়া বিশ্বাস ও অনুভব করেন, তিনিও জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া জন্মান্তর রহস্যকে একটি অবশ্যমীমাংসিতব্য বিষয়রূপে হৃদয়ে স্থান দেন। অতএব জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই জন্মান্তররহস্য একটি অপূর্ব্ব আলোচ্য বিষয়। এবং এইজন্যই আর্য্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ঔপধর্ম্মিক শাস্ত্রে জন্মান্তরের অনাদিসিদ্ধ শৃঙ্খলা স্বীকৃত হয় নাই সেই সকল শাস্ত্রেও মৃত্যুর পর কোন অদৃশ্যলোকে ভুজ্যমান চিরানন্দময় অথবা চিরদুঃখময় জন্মান্তরীয় দশা স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল যাহার স্থূলপ্রত্যক্ষ

এবং তন্মূলক অনুমান ব্যতীত অন্য প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, যাহারা অবিবেকী, প্রমাদাচ্ছন্ন, ঐন্দ্রিয়িক সুখলালসার তৃপ্তিসাধন ভিন্ন যাহাদের জীবনের আর কোনই উদ্দেশ্য নাই, এইরূপ কতিপয় অতি পাষণ্ড ব্যক্তিই পুনর্জ্জন্ম ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে এই সকল ব্যক্তিকেই 'নাস্তিক' বলা হইয়া থাকে। যথা—"পরলোকোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিকস্তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ"—কৈয়ট।

অন্যান্য উপধর্ম্মের মধ্যে লোকান্তরে তিরস্কার বা পুরস্কারের প্রসঙ্গ বর্ণিত থাকিলেও বৈদিক আর্য্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রের মধ্যেই পূর্ণভাবে জন্মান্তরের বিষয় আলোচিত ও নির্ণীত হয় নাই। প্রাচীন গ্রীক ও ইজিপ্শিয়ানদিগের ধর্ম্ম ও দর্শনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে পুনর্জন্মের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অত্যল্পচিন্তাতেই উপলব্ধি হয়, যে তাহা বেদাদি শাস্ত্র সমূহের পুনর্জন্ম বিষয়ক উপদেশের বিকৃত প্রতিধ্বনিমাত্র এবং তাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশও যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই।* বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট ও পি, জি টেট্ তাঁহাদের প্রণীত "অন্‌সিন্ ইউনিভাস্" নামক গ্রন্থে যদ্যপি মরণের পর কোন না কোনরূপে অস্তিত্ব স্বীকার করাই মানবের নৈসর্গিক সংস্কার এবং সভ্যতার অনুকূল সিদ্ধান্ত এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তথাপি পুনর্জন্মের শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত স্বরূপ ইহাঁদেরও নয়নে এখনও প্রতিভাত হয় নাই।† আর্য্যশাস্ত্র মতে জন্মান্তর রহস্য

* The re-incarnation of souls is not a new idea; it is, on the contrary, an idea as old as humanity itself. It is the metempsychosis, which from the Indians passed to the Egyptians, from the Egyptians to the Greeks and which was afterwards professed by the Druids.—The Day after Death.

† The great majority of mankind have always believed in some fashion in a life after death; many in the essential immortality of the Soul. But it is certain that we find many disbelievers in such doctrines, who yet retain the nobler attributes of humanity. It may, however, be questioned whether it be possible even to imagine the great bulk of our race to have lost their belief in a future state of existence and yet to have retained the virtues of civilized and well-ordered communities.—The unseen Universe.

দুজ্ঞেয় হইলেও অজ্ঞেয় নহে। কারণ লৌকিক স্থূলপ্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা পরলোক ও জন্মান্তর রহস্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা সম্ভব না হইলেও অলৌকিক সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ ও আপ্তোপদেশ দ্বারা উহা জানা যাইতে পারে। কার্য্যের কারণাবধারণ এবং জন্মান্তরের স্বরূপনিরূপণ প্রকৃতপ্রস্তাবে একই কথা। জগতের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে ঈশ্বর, আত্মা, জীব কর্ম্ম, জড়শক্তি, পরমাণু ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্বান্বেষণ করিতেই হয়। প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণ পুরুষবৃন্দ কখনও দার্শনিক পদবাচ্য হইতে পারেন না; কারণ স্থূল ইন্দ্রিয়নিচয় স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ হওয়ায় কেবল লৌকিক স্থূলপ্রত্যক্ষ দ্বারা কোন পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় হওয়া অসম্ভব। এবং অনুমান যখন প্রত্যেক্ষেরই অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তখন অসম্পূর্ণ স্থূলপ্রত্যক্ষমূলক অসম্পূর্ণ অনুমান প্রমাণ দ্বারাও জন্মান্তর রহস্য কখনই পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। অতএব জন্মান্তরতত্ত্ব বিষয়ে অলৌকিক সূক্ষ্মপ্রত্যক্ষ এবং আপ্তোপদেশই যথার্থরূপে প্রমাণ পদবাচ্য হইতে পারে। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, চেতন ও অচেতন পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি, জীবের উৎপত্তি কিরূপে হয়, মরণের পর জীবের অস্তিত্ব থাকে কিনা, সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় কেহ জন্ম হইতেই চিরসুখী, কেহ চিরদুঃখী, কেহ জন্মান্ধ, কেহ কমলনয়ন, কেহ অনেক পরিশ্রম করিয়াও দরিদ্র, কেহ বা সামান্য চেষ্টাতেই ধনকুবের, কেহ চিররোগী ও বিকলাঙ্গ, কেহ সুস্থকায় ও অবিকলাঙ্গ, কেহ পরিশ্রম করিয়াও শিবিকাবহন করিতেছে, কেহ বিনা পরিশ্রমে শিবিকায় আরোহণ করিয়াছে, এরূপ সৃষ্টি বৈষম্যের কারণ কি? নিষ্পক্ষপাত করুণাময় পরমাত্মার রাজ্যে এরূপ পক্ষপাত কেন? কেবল স্থূল প্রত্যক্ষের শরণ গ্রহণ করিলে এ সকল প্রশ্নের কিছুতেই সমাধান হইতে পারে না। ক্রমবিকাশবাদিগণ এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক, সংশয়-বিরহিত উত্তর প্রদান করিতে পারেন না। শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে শান্তি-সুধা সিঞ্চনের শক্তি স্থূল প্রত্যক্ষবাদের নাই। অণুসমূহের পরস্পর সংযোগ হইতে জীবের জন্ম হয়, চতুর্ভূতের সংঘাতই জীবত্বের কারণ, আবার উহাদের বিশ্লেষণই মরণ-বিকার, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই এইরূপ কথা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। প্রবল যুক্তির দ্বারা পরাজয় হইলেও অন্তর্য্যামী ইহা মানিতে প্রস্তুত হন না। একবারে বিবেকের কণ্ঠমর্দ্দন না করিলে কেহই উপর কথিত যুক্তিজালে সন্তোষ ও শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষুদ্রতম জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই যে

নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সদা সচেষ্ট, মরণের পর তাহা আর থাকিবে না। এত চেষ্টা, এত পুরুষার্থ, পুণ্যের জন্য তপঃসাধন, কৃচ্ছ্র ব্রত, ইন্দ্রিয় সংযম, বিদ্যালাভ সকলই মরণান্ত স্থায়ী, পঞ্চভূতের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত শূন্যে চিরবিলীন হইয়া যাইবে, কোন্ ধীরমস্তিষ্ক ব্যক্তি এরূপ দুর্লভ বিশ্বাসকে প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ে স্থান দিতে প্রস্তুত? যাহার প্রতি জীবের এত মমতা, তাহার একেবারে বিনাশ হইবে, এ চিন্তা বোধ হয় জীবমাত্রেরই হৃদয়ের বাধাপ্রদ। মরণের পর কোন না কোনরূপে আমার অস্তিত্ব থাকিবে, অধিকাংশ মনুষ্যের হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাসই স্বভাবতঃ স্থান পায়। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, আত্মার অনশ্বরত্ব বাদের পক্ষপাতী হওয়াই মানবের পক্ষে নৈসর্গিক। এই নিসর্গসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করিয়াই আপ্তপুরুষ যোগী জ্ঞানী অতীন্দ্রিয়দর্শী মহর্ষিগণ জন্মান্তরের রহস্য দর্শনে যোগনেত্র উন্মীলিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভিনিবিষ্ট গবেষণার ফলেই আর্য্যশাস্ত্র জন্মান্তর বাদের অলৌকিক রহস্যে পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে লৌকিক বুদ্ধিবৃত্তির চরম সূক্ষ্মতা সাধিত হইলেও যোগ-লভ্য অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও অলৌকিক ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালব্ধ হয় নাই। এই জন্যই জন্মান্তর ও পরলোক সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির মধ্যে এখনও মানবগণ সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছেন। আর আমাদের অনন্তদাতার মহর্ষি পতঞ্জলি সমস্ত সন্দেহকে নাশ করিয়া সত্যের গম্ভীর নির্ঘোষে যোগদর্শনে বলিতেছেন—

"সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি জ্ঞানম্"—বিভূতিপাদ ১৮ সূঃ

যোগিন্! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন, সংস্কারের উপর সংযম করিতে শিখ। তুমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলে, কোথায় ছিলে সবই অলৌকিক যোগবলে করতলামলকবৎ তোমার নয়নগোচর হইবে। তুমি ইহাও ঐ যোগবলে জানিবে যে—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।" যো. দ. দ্বিতীয় পাদ।

"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ।" যো, দ. দ্বিতীয় পাদ।

জীবের প্রাক্তন কর্ম্মই সকল ক্লেশের মূল। এ জন্মে বা পর জন্মে উহার ভোগ হইয়া থাকে। উহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে জীবের জন্ম হয়, এবং জীবিত কাল ও সুখদুঃখাদি ভোগও প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব জীবের জন্ম জন্মান্তর লাভ নানাবিধ কর্ম্মের দ্বারা হয় কিনা এজন্য বাদবিবাদ বা বিতণ্ডার কোনই প্রয়োজন নাই, কেবল সাধনার দ্বারা

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিলাভ করিতে পারিলেই জন্মান্তর রহস্য স্বয়ংই জ্ঞানীর নেত্রে প্রতিভাত হইয়া থাকে। মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের ১৭ অধ্যায়ে লেখা আছে—

যথান্ধকারে খদ্যোতং লীয়মানং ততস্ততঃ।
চক্ষুষ্মন্তঃ প্রপশ্যন্তি তথা চ জ্ঞানচক্ষুষঃ॥
পশ্যন্ত্যেবংবিধং সিদ্ধা জীবং দিব্যেন চক্ষুষা।
চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ যোনিং চানুপ্রবেশিতম্॥

যেমন নেত্রযুক্ত পুরুষ অন্ধকার রাত্রিতে খদ্যোৎগণকে এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করিতে ও বৃক্ষাদিতে বসিতে দেখেন সেই প্রকার জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাত্মাগণও দিব্যচক্ষুর দ্বারা জীবকে পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিতে এবং অন্য যোনিদ্বারা অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া জন্মান্তর লাভ করিতে দেখেন। শ্রীভগবান্ গীতারও ১৫ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

বিষয়ভোগশীল ত্রিগুণতরঙ্গায়িত জীবাত্মাকে দেহে অবস্থানকালে অথবা এক দেহ হইতে নির্গত হইয়া অন্য দেহে প্রবেশ করিবার সময় অজ্ঞানী পুরুষগণ দেখিতে পায় না, কেবল জ্ঞাননেত্র মহাত্মাগণই দেখিতে পান। অতএব বুঝা গেল যে অলৌকিক যোগদৃষ্টির দ্বারাই জন্মান্তর রহস্য জানা যাইতে পারে। সদ্গুরুর কৃপায় যাঁহার জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে সেই ভাগ্যবান্ সাধকই জীবের জন্ম জন্মান্তরের রহস্যবর্ণন করিতে সমর্থ হন। উহা যেমনই কঠিন, তেমনই পরম কৌতূহলোদ্দীপক। বিশেষতঃ অনন্তবৈচিত্রাময় কলিযুগে জীবের বৈচিত্র্যপূর্ণ গহনগতি দেখিয়া প্রায় সকলের মনেই পরলোকের কথা জানিতে অভূতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এই হেতু সদ্গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত অতি নিগূঢ় জন্মান্তর রহস্য কথা দেশকালপাত্রের অনুকূলতাবোধে বর্ত্তমান গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইবে। ইহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ জিজ্ঞাসুগণের কৌতূহলনিবৃত্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং মনুষ্যজীবনের পন্থা নির্ণীত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সৃষ্টিহেতু।

জন্মান্তরের কথা বলিতে হইলে প্রথমতঃ জন্মের কথা বলিতে হয়। সৃষ্টি হইল কেন? কে এত সৃষ্টি করিল? এরূপ অনন্ত সংগ্রাম, অনন্ত সুখদুঃখ ও অনন্ত বিচিত্রতাময় সংসারের উৎপত্তির কারণই বা কি ছিল? যদি পরমাত্মাই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা হন তবে অনর্থক অনন্ত কোটি জীবকে এইরূপ জন্মমরণ চক্রে অনন্ত সুখদুঃখের সহিত ঘূর্ণিত করিয়া শান্তিময় সত্তাকে অশান্তিময় করিবার তাঁহার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাঁহাকে ত শাস্ত্রে অনন্ত শান্তিময় বলা হয়, তবে কেন তিনি এইরূপ অনন্ত অশান্তিময়, দুঃখময় বিশ্বের উৎপত্তি করিলেন? ইহার দ্বারা তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? এই সকল প্রশ্ন আধ্যাত্মিক পথে সামান্য অধিকার লাভ হইবামাত্র প্রত্যেক সাধকেরই মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রথমতঃ সৃষ্টির হেতুনির্ণয় করা আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টিকে অনাদি অনন্ত বলা হইয়াছে যথা—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি। মহানারায়ণ উপনিষৎ।

এই ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে অনন্ত কোটি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি উহার কেন্দ্রশক্তি জ্যোতির্দাতা সূর্য্যদেব। ঐ সূর্য্যদেবের চারিদিকে অনেক গ্রহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। এবং অনেক উপগ্রহ উক্ত গ্রহ সমূহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে এ পর্য্যন্ত ২৪৮ গ্রহ এবং ২০ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহ এবং উপগ্রহ সূর্য্য হইতেই আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ২৬৮টি গ্রহ, উপগ্রহ এবং কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্যকে লইয়া আমাদের ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড শূন্যমার্গে বিচরণ করিতেছে। দেবীভাগবতে লেখা আছে—

"সংখ্যা চেদ্‌রজসামস্তি বিশ্বেষাং ন কদাচন।"

বরং ধূলিকণারও সংখ্যা হয় কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না। লিঙ্গপুরাণে লেখা আছে—

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।
তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ॥

হ্যসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা হ্যসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
হরয়শ্চ হ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই বিরাটের গর্ভে আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র আছেন। এইরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ব্রহ্মা, অনন্ত বিষ্ণু এবং অনন্ত রুদ্র আছেন। কেবল ঈশ্বরই এক। তিনি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে অদ্বিতীয় চেতনসত্তারূপে ব্যাপ্ত। এই সকল অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীব অবস্থিত। এ সকল ব্রহ্মাণ্ড কেন হইল, এত জীবই বা কি করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মাণ্ডূক্যকারিকায় গৌড়পাদাচার্য্য লিখিয়াছেন—

বিভূতিং প্রসবং ত্বণ্ডে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা॥
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিস্থিতিসৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ॥
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরৈঃ।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা কথা॥

সৃষ্টির হেতু নির্ণয় করিবার জন্য কেহ বলেন যে পরমাত্মা নিজের বিভূতি প্রকট করিবার নিমিত্ত সৃষ্টিরচনা করিয়াছেন। কেহ বলেন যে যেরূপ বিনা বিচারেই অকস্মাৎ স্বপ্ন দেখা যায়, সেই প্রকার জগতও অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ বলেন জগৎ মায়ার বিলাস মাত্র, কেহ পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিকে সৃষ্টির কারণ বলেন, কেহ কালকেই জীবোৎপত্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন, কেহ পরমাত্মার ভোগের জন্য এবং কেহ তাঁহার লীলার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে এই কথা বলেন। কিন্তু এই সমস্ত কল্পনাই মিথ্যা। কারণ আপ্তকাম ভগবানের কোনই ইচ্ছা হইতে পারে না। সৃষ্টি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তির মূলে কোন কারণই নাই। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

যেরূপ উর্ণনাভ (মাকড়সা) প্রয়োজন ব্যতিরেকেই জালের বিস্তার ও সংকোচ করে, যেরূপ পৃথিবীতে ওষধিসকল বিনা কারণেই উৎপন্ন হয়, যেরূপ জীবিত

মনুষ্যের শরীরে কেশ ও লোম আপনাআপনিই নির্গত হয় সেই প্রকার অক্ষর পুরুষ পরমাত্মা হইতে স্বতঃই এই অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডসমন্বিত বিশাল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পরমাত্মার সত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এজন্য তাঁহার শক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। পরমাত্মার চেতনসত্ত্ব নিকটে থাকিলে স্পন্দন-ধর্ম্মিণী মহাপ্রকৃতির মধ্যে ত্রিগুণস্পন্দন আপনাআপনিই উত্থিত হয়। কারণ প্রকৃতির স্বভাবই স্পন্দিত হওয়া। এইরূপে নিত্য বিভু পরমাত্মার চেতনসত্তার প্রভাবে মহাপ্রকৃতির মধ্যে ত্রিগুণের নিত্যই স্পন্দন হইয়া থাকে। এবং এই ত্রিগুণস্পন্দন দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ও অনন্ত কোটি জীবের বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাকে স্বভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? মহাসমুদ্রও আছে, মহাসমুদ্রে নির্ম্মল জলও আছে; জলের ধর্ম্ম তরঙ্গায়িত হওয়া এবং প্রত্যেক তরঙ্গে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা। সূর্য্যরূপী পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিরাজমান। অতএব অনন্ত মহাসমুদ্ররূপিণী অনন্ত মহাপ্রকৃতিতে অনন্ত তরঙ্গরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলসিত হইবে এবং তরঙ্গে তরঙ্গে পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপী জীবাত্মা প্রতিভাসিত হইয়া অনন্ত কোটি জীবের বিকাশ হইবে ইহাতে স্বভাব ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে এবং এইরূপ স্বাভাবিক সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষের হৃদয়ে সন্দেহই বা কি হইতে পারে? এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় "স্বভাবোঽধ্যাত্ম উচ্যতে" এই কথা বলিয়া অনাদি অনন্ত আধ্যাত্মিক সৃষ্টিকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই হইতে পারে যে যদি সৃষ্টি স্বাভাবিকই হইল তবে উহার মধ্যে বা মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি আছে এবং "একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" আমি এক হইতে বহু হই এবং প্রজাসৃষ্টি করি এইরূপ বচনাবলী দ্বারা সৃষ্টির জন্য পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তির কথা কেনই বা বেদে দেখা যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে দেবীভাগবত বলিয়াছেন—

জড়াঽহং তস্য সান্নিধ্যাৎ প্রভবামি সচেতনা।
অয়স্কান্তস্য সান্নিধ্যাদয়সশ্চেতনা যথা॥

প্রকৃতি জড়। জড়বস্তু, স্বয়ং ক্রিয়া করিতে পারে না। এইজন্য যেরূপ লৌহে ক্রিয়োৎপত্তির জন্য চুম্বককে সম্মুখে থাকিতে হয় সেই প্রকার চেতন ঈশ্বর মহাপ্রকৃতির সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে না থাকিলে মহাপ্রকৃতির মধ্যে ত্রিগুণস্পন্দন

উৎপন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টি-বিকাশের মূলে বিভু পরমাত্মার এই নিমিত্ত-কারণতা অবশ্যই আছে। এইজন্যই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূত৷ যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥
নিমিত্তমাত্রমুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষতে।
নীয়তে তপসাং শ্রেষ্ঠ! স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্॥

অনন্ত সৃষ্টির মূলে পরমাত্মা নিমিত্ত কারণ মাত্র। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই বিকাশ-প্রাপ্তির শক্তি নিহিত আছে। জড়ামহাপ্রকৃতি চেতন ঈশ্বরের চেতনসত্তা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ চেতনবতী হন এবং তাহার পর তিনিই প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে নিহিত বস্তুগত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। এ বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কিছুই নাই। তবে যে বেদ সংসারসৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার অর্থ অন্যরূপ। এ ইচ্ছা তাঁহার মনোধর্ম্ম নহে। কারণ তিনি প্রকৃতির বশ নহেন। মহাপ্রলয়ের পরে যখন প্রলয়গর্ভ-বিলীন সমষ্টি জীবের কর্ম্মসমূহ পুনরায় জীব-বিকাশের যোগ্য হয় তখন সেই সমষ্টি-জীবের অনন্ত প্রাক্তন কর্ম্মের প্রেরণানুসারেই ঈশ্বরের মধ্যে জীবসৃষ্টির স্বতঃ প্রেরণা উৎপন্ন হয়। এই স্বতঃ প্রেরণাকেই বেদে এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার অন্তঃকরণ-ধর্ম্মোৎপন্ন প্রাকৃত ইচ্ছা নহে, কিন্তু সমষ্টি জীবের সমষ্টি কর্ম্মানুসারে ইচ্ছানিচ্ছারূপ স্বতঃ ইচ্ছামাত্র। অতএব উপযুক্ত শ্রুতিবচনের দ্বারা সৃষ্টিবিষয়ে পরমাত্মার নির্লিপ্ততা ও নিমিত্ত-কারণতা বাধিত হইতেছে না। অতঃপর বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে সৃষ্টিসঞ্চালন বিষয়ে ঈশ্বরের কিরূপ প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই বিশদভাবে বিবৃত হইবে।

ঈশ্বরের প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুর মধ্যে কার্য্যকারিণী শক্তি থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উত্থিত হইয়া থাকে। জল নিজেই প্রবাহিত হইতে পারে, অগ্নি স্বয়ংই দগ্ধ করিতে পারে, বস্তু স্বয়ংই হিল্লোলিত হইতে পারে, তবে আবার উহাদের মধ্যে পৃথক সঞ্চালক কেন মানি?

অন্তঃকরণকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া একটু অনুধাবন করিলেই হৃদয়ের নিভৃত আকাশে আকাশবাণী রূপে এই গূঢ় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। মানিলাম প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুর মধ্যে কার্য্যকারিণী শক্তি আছে কিন্তু উহা অন্ধশক্তি (blind force) চেতনশক্তি (Inteleijent forcc) নহে। কারণ সমস্ত প্রাকৃতিক-শক্তির জননী মহাপ্রকৃতিই জড়। একথা দেবী ভাগবতের প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্ধশক্তি যদিকোন নিয়ামক চেতন বস্তুর দ্বারা নিয়মিত না হয় তবে উহার আন্ধ্য পরিণাম হইবে, নিয়মিত পরিণাম হইবে না। ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য কথা। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে বাষ্পপূর্ণ ইঞ্জিনের মধ্যে গাড়ী টানিবার বেশ শক্তি আছে। কিন্তু উহা জড়শক্তি বা অন্ধশক্তি হওয়ায় যদি ঐ শক্তিকে নিয়মিত করিয়া ইঞ্জিন চালাইবার জন্য একজন চেতনশক্তিসম্পন্ন বাষ্পীয়-যান-সঞ্চালক না থাকে তবে বাষ্পের ঐ অন্ধশক্তির দ্বারা কিছুতেই নিয়মিত কাজ হইতে পারিবে না। কতটা বাষ্প ইঞ্জিনে থাকিলে তবে গাড়ী চলিবে বেশী বাষ্প উৎপন্ন হইয়া ইঞ্জিন ফাটিয়া যাইবে না অথবা কম বাষ্পে উহার আকর্ষণশক্তি কম হইবে না, কিরূপে কতক্ষণ ষ্টেশনে থাকা উচিত, পুনরায় কখন চলা উচিত, স্থানে স্থানে বেগের কিরূপ তারতম্য হওয়া উচিত ইত্যাদি নিয়মণ কার্য্য জড় অন্ধশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন নিজে করিতে পারে না। নিয়ামক চেতনশক্তিসম্পন্ন বাষ্পীয়যান-চালকই তাহা করিতে পারে। জড় অন্ধশক্তির দ্বারা কেবল এতটাই হইতে পারে যে যদি গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে ত থামিবে না চলিতেই থাকিবে, এবং যদি থামে তাহা হইলে পুনরায় চলিতে পারিবে না, থামিয়াই থাকিবে। নিয়মিত চলা ও থামা এবং আবশ্যকতা অনুসারে বেগের তারতম্য হওয়া নিয়ামক চেতনশক্তি-সাপেক্ষ ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যখন দেখা গেল যে সংসারের সামান্য লৌকিক কার্য্যে ও চেতন-নিয়ামক ভিন্ন জড়শক্তির নিয়মণ হয় না, তখন মহাপ্রকৃতির এই বিশাল জড়রাজ্যের এবং নিয়মিত কার্য্যের মধ্যে কোন বিভু চেতন নিয়ামকশক্তির হাত নাই এরূপ কল্পনা করা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। পৃথিবী আছে তাহার শস্যোৎপাদিকা শক্তিও আছে কিন্তু কোন্ দেশে কোন্ কালে কিরূপ শস্য হওয়া উচিত তাহার নিয়মণ জড় পৃথিবী করিতে পারে না। বসুন্ধরার প্রতি অঙ্কে বিরাজমান চেতনশক্তি ভগবানই তাহা করিতে পারেন। জল বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু কোন্ ঋতুতে কোন্ দেশে কিরূপ ও কত পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া

উচিত তাহার নিয়মণ জলান্তর্গত জড়শক্তির দ্বারা হইতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ামক চেতন ভগবানের দ্বারাই হইতে পারে। বায়ুতে সঞ্চালিত হইবার অন্ধশক্তি নিশ্চয়ই আছে কিন্তু অন্ধশক্তির দ্বারা একদিক্ হইতেই বায়ু বহিতে পারে। বসন্তে দক্ষিণ দিকের সুমধুর মলয় পবন, গ্রীষ্মে পশ্চিমী দিগ্দাহকর প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, বর্ষায় মেঘমালাসঞ্চারী পূর্ব্বপবন, শীতে হিমানীসম্পাতসঙ্কুল উত্তরীয় পবন এইরূপ ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে বায়ুর প্রবাহ বায়ুমধ্যস্থিত চেতন নিয়ামকশক্তির নিয়মণ ভিন্ন কখনই হইতে পারে না। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুই গ্যাসের মধ্যদিয়া বিদ্যুৎশক্তিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জল হয় তাহা ঠিক কিন্তু ঐ বিদ্যুৎশক্তিকে প্রবাহিত করিবে কে? জড় বিদ্যুৎ ত নিজে প্রবাহিত হইতে পারে না? তাহাকে কোনও চেতনের সহায়তায় চালাইতে হয়। এইরূপে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, শীতের পর গ্রীষ্ম, ঋতুগণের নিয়মিত বিকাশ, রবিশশীর নিয়মিত উদয়াস্ত গমন, চন্দ্রকলায় নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি, ভগবান্ ভাস্করের নিয়মিত রাশিচক্র প্রবর্ত্তন,জন্ম. বাল্য, যৌবন ও জরার নিয়মিত সংক্রমণ, যে বিশ্বজগতে জড় প্রকৃতির মধ্যে নিয়মভিন্ন একটী বৃক্ষ-পত্রও সঞ্চালিত হইতে পারে না সেস্থলে এই সকলের মধ্যে চেতন বিভু সকলের নিয়ামক ভগবান্ বিদ্যমান আছেন তাহা আর প্রশ্ন করিয়া তর্ক করিয়া জানিতে হয় না, ভক্তিভরে হৃদয় রত্নাকরের অগাধ জলে অন্বেষণ করিলে অন্তর্য্যামী নিজেই নিজের জাজ্বল্যমান সত্তা সাধকের মানসচক্ষে প্রতিফলিত করিয়া দেন। এই জন্যই মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

পরমাত্মা বাক্য, মেধা বা অনেক শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা প্রাপ্য নহেন। কেবল ভক্ত-হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে জানিতে চাহিলেই তিনি ভক্তের নিকট নিজের অলৌকিক স্বরূপ প্রকট করেন। তাঁহারই নিয়মাধীনে—তাঁহারই প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড; অনন্ত গ্রহোপগ্রহ সূর্য্য এবং নক্ষত্র নিচয়ের সহিত প্রলয়ের নিবিড় অন্ধকারময় মহাগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে, স্থিতির সহস্র সহস্র যুগময় কালের ক্রোড়ে তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহারই অনন্ত সুষমাময়ী মহিমা প্রকট করিতেছে, আবার কালপূর্ণ হইলে পর অনন্ত শূন্যের শান্তিময় অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিতেছে। যদি তিনি নিয়ামকরূপে এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ক্রমবিধান না করিতেন তবে,

প্রলয়ের গর্ত্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বহির্গত হইতেই পারিত না এবং কদাচিৎ বহির্গত হইলেও চিরকালই সৃষ্টি করিত, পুনরায় কদাপি মহাপ্রলয়ের ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতে পারিত না। অতএব সমষ্টি সৃষ্টির শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য বিভু নিয়ামক ঈশ্বরের যে প্রয়োজন আছে এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এত কথা বলিয়াও শাস্ত্র আবার বলেন যে তাঁহার কোনই ইচ্ছা নাই, স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব নাই, কারণ তিনি মায়ায় বশ নন। একথা সত্যই, কারণ তিনি নিজে বদ্ধজীবের মত সৃষ্টি করিবেন কেন? তাঁহার ত নিজের কিছুই কামনা নাই, কর্ত্তব্য নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে সমষ্টি প্রকৃতির স্বাভাবিক স্পন্দনজনিত সৃষ্টি আপনাআপনিই হইয়া থাকে, তবে প্রকৃতি জড় বলিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন স্পন্দিত হইতে পারে না, এইজন্যই চেতন বিভু পরমাত্মার অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং এই নিশ্চয়ই স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—

নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনঃ॥
অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বং চ সংস্থিতম্।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ॥

যেরূপ ইচ্ছারহিত অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) নিকটে থাকিলেই লৌহের মধ্যে চেষ্টা উৎপন্ন হয় সেইপ্রকার পরমাত্মার সান্নিধ্য মাত্রেই প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারিণী ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিচারে পরমাত্মায় কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়েরই আরোপ করা যাইতে পারে কারণ ইচ্ছারহিত হওয়ায় তিনি অকর্ত্তা এবং অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তিনি কর্ত্তা। এইজন্যই সাংখ্যকার কপিলদেব বলিয়াছেন—

"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।"

অয়স্কান্ত মণির মত কাছে থাকিলেই তাঁহার অধিষ্ঠান হয় এবং তদ্দ্বারা প্রকৃতি সৃষ্টিলীলা বিস্তার করিতে পারেন। এইরূপে বেদান্ত দর্শনেও ঈশ্বরকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। যথা—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"
"জগদ্বাচিত্বাৎ"
"তস্মাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্"

জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরের দ্বারাই হইয়া থাকে। তিনিই জগতের কর্ত্তা। আকাশাদি-ভূতোৎপত্তি তাঁহার অধিষ্ঠানরূপ নিমিত্ত-কারণতা দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সমষ্টিসৃষ্টির ন্যায় ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ জীবসৃষ্টি বিষয়েও ঈশ্বরের নিয়ামকত্ব বেদাদি শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। কর্ম্ম স্বভাবতঃ জড় এইজন্য জীব অহঙ্কারবশে যে সকল কর্ম্ম করে তাহার নিজে ফলোৎপাদন করিতে পারে না। কর্ম্মসমূহ চেতন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই যথাযথ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে এবং তাহাতেই পুণ্য পাপময় কর্ম্মানুসারে জীব স্বর্গনরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। ন্যায়দর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে এইজন্যই সূত্র আছে—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ।"

জীব কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে স্বাধীন বটে, কিন্তু কর্ম্মফলভোগ বিষয়ে পরাধীন। কারণ কর্ম্ম জড় হওয়ায় নিজে ফল দিতে পারে না। চেতন ঈশ্বর জড় কর্ম্মকে প্রেরণ করেন। তাহাতেই কর্ম্মানুসার জীবের উচ্চাবচগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্ম্মফলদানবিষয়ে ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণতা সিদ্ধ হইতেছে। এখানে অনেকে এইরূপ সন্দেহ করেন যে এপ্রকার প্রাক্তন কর্ম্ম মানিবার প্রয়োজন কি? কেবল বর্ত্তমান জন্মের কৃতকর্ম্ম মানিলেই ত চলে? এ প্রশ্নের উত্তর 'অবতরণিকায়' ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রাক্তন পুণ্যপাপময় কর্ম্ম স্বীকার ভিন্ন অনন্তবৈচিত্র্য-পূর্ণ সংসারে ভোগবৈচিত্র্যের হৃদয়হারিণী কোন মীমাংসাই করা যাইতে পারে না। কেন লোকে জন্ম হইতে অন্ধ হয়? কেন কেহ জন্ম হইতেই স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে এবং কেহ জন্ম ভিখারী হইয়া মানবদেহ প্রাপ্ত হয়? কেন কেহ জন্ম হইতেই যোগী হয়, কামিনী কাঞ্চনে আদৌ আসক্তি রাখে না এবং অন্য কেহ সহস্র চেষ্টার ফলেও কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে না? কাহারও প্রতিভা ও বল জন্ম হইতেই অসাধারণ কেন দেখিতে পাই এবং কেহ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও, সহস্র চিকিৎসা করিয়াও হীনপ্রতিভ, দুর্ব্বল এবং চিররুগ্ন কেন থাকে? হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্ব কর্ম্ম ভিন্ন এসকল কথার সন্তোষজনক সমাধান আর কিছুতেই হইতে পারে না। এজন্য পূর্ব্ব কর্ম্ম অবশ্যই মানিতে হয় যেরূপ বিজ্ঞান ও অনুভবের সহিত মহর্ষি পতঞ্জলি প্রাক্তন কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়াছেন। কেহ

কেহ এরূপ বলেন যে সংসারের বৈচিত্র্য বিষয়ে ঈশ্বরের লীলা ও বিভূতিবিকাশ মানিলেই ত চলে? ইহার জন্য আবার পূর্ব্ব কর্ম্ম মানিবার কি প্রয়োজন আছে? তিনি নিজের বিচিত্রলীলা দেখাইবার এবং অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ দেখাইবার জন্যই সংসারে কাহাকেও দুঃখী এবং কাহাকেও সুখী করেন, কাহাকেও জন্মান্ধ এবং কাহাকেও কমললোচন করিয়া সৃষ্টি করেন, কাহাকেও হস্তীমূর্খ এবং কাহাকেও অসীম প্রতিভাশালী করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত শুনিতে বিচিত্র ও কৌতুকজনক হইলেও হৃদয়ে শান্তি আনিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বরকে করুণাময়, ইচ্ছারহিত এবং পক্ষপাতশূন্য চিরউদার পুরুষ বলা হয়। তিনি এরূপ পক্ষপাত, বিষণ্ণতাযুক্ত লীলা এবং নিষ্ঠুরতা দেখাইবেন কেন? তিনি কেন কোন জীবকে জন্মান্ধ করিয়া সংসারসুখে বঞ্চিত করিবেন, কাহাকেও ভিখারী করিয়া চিরজীবন কাঁদাইবেন এবং কাহাকেও দুগ্ধফেননিভ শয্যায় চিরআরামে রাখিবেন? তাঁহার এরূপ পাগলের মত অসম্বদ্ধ লীলা করিবার প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই ঈশ্বরকে মায়ার বশ হইতে স্বতন্ত্র, ইচ্ছারহিত, কামনারহিত এবং মায়ার প্রেরকরূপে বর্ণন করিয়াছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লেখা আছে—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" প্রকৃতি মায়া এবং ঈশ্বর মায়ার চালক মায়ী। তিনি মায়ার যদি বশ হইতেন তবে এরূপ অসম্বদ্ধ লীলাদি করিতে পারিতেন, কিন্তু মায়ার বশ নহেন—মায়ার চালক, অতএব তাঁহার দ্বারা এইরূপ অনিয়মিত অন্যায় কার্য্য হইতে পারে না। উদার ঈশ্বরের বিষয়ে এরূপ অনুদার পক্ষপাতযুক্ত হীনচিন্তা করাই মহাপাপ। শ্রীগীতায় ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

> ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
> নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
> অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

৫ম অঃ—১৪-১৫ শ্লোক।

পরমাত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্যের জন্য দায়ী নহেন। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হইলে জীব নিজে নিজেই দুঃখ পাইয়া থাকে। তিনি লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম বা কর্ম্মফলযোগ কিছুই সৃষ্টি করেন না, লোকে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারেই

পাপপুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের সম্বন্ধে ঐরূপ বৃথা অবৈজ্ঞানিকতা-পূর্ণ বিচার করা ঠিক নহে। জীব নিজ নিজ প্রাক্তনানুসারে উচ্চনীচ কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম জড় হওয়ায় তিনি তাহার প্রেরণামাত্র করিয়া থাকেন। এইজন্যই বেদান্তদর্শনে জৈব কর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত সূত্র করা হইয়াছে। যথা—

"ফলমতঃ উপপত্তেঃ।"

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।"

"বৈষম্যনির্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।"

ঈশ্বর কর্ম্মফলের দাতা, কিন্তু কর্ম্মের বৈচিত্র্যানুসারেই জীবগণকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল দান করিয়া থাকেন। এরূপ না হইলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ নিরর্থক হইয়া যাইবে। জীবের কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাহার প্রাক্তনসুকৃতি আছে তিনি তাহাকে সুখী করেন এবং মন্দপ্রারব্ধী জীবকে দুঃখী করেন। অতএব সংসারবৈচিত্র্যে ঈশ্বরের পক্ষপাত বা নৈষ্ঠুর্য্য কল্পনা হইতে পারে না। ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে ঈশ্বরবিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জ্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি ব্রীহিযবাদি-বৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদি-সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি দেব-মনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি। এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনির্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।"

সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে ঈশ্বরকে মেঘসদৃশ মনে করা উচিত। অর্থাৎ যেমন মেঘের জল ব্রীহিযব ধান্য আদির উৎপত্তি বিষয়ে সাধারণ কারণ মাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রীহিযবাদির উৎপত্তি ও পরিণাম যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় তাহার পক্ষে মেঘ কারণ না হইয়া ব্রীহিযবাদির বীজগত অসাধারণ পৃথক পৃথক সামর্থ্যই কারণ হইয়া থাকে, ঠিক সেই প্রকার দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর সাধারণ কারণ। এবং ঐ সমস্ত জীবের সুখদুঃখ ঐশ্বর্য্যাদি যে পৃথক পৃথক দেখা যায় তাহার পক্ষে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ কর্ম্মই কারণ হইয়া থাকে। একই জল নিম্ববৃক্ষে

তিক্তরস উৎপন্ন করে, ইক্ষুবৃক্ষে মিষ্টরস উৎপন্ন করে এবং হরীতকী বৃক্ষে কষায় রস উৎপন্ন করে। জল একই কিন্তু ঐ সকল বৃক্ষের বীজগত পার্থক্যহেতু ঐ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হয়। ঐপ্রকার ঈশ্বরের চেতনসত্তা জড় কর্ম্মকে সাধারণ ভাবেই প্রেরিত করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার ঐ সাধারণ শক্তি বীজগত অসাধারণ কর্ম্মসংস্কারকে আশ্রয় করিয়া অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব সৃষ্টি বৈচিত্র্যে ঈশ্বরের কোনই পক্ষপাত বা সদয়নির্দ্দয়ভাব নাই। তিনি গীতায় আরও বলিয়াছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

তিনি সর্ব্বভূতের পক্ষে সমান, কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাঁহারা ভক্তির সহিত তাঁহার ভজনা করেন তিনি তাঁহাদের ভজনরূপ ক্রিয়ার ফলদান করেন। অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাতে এবং তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে হন। শ্রুতিও বলেন—

পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা জীবের সুখময় পুণ্যলোক প্রাপ্তি এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা দুঃখময় পাপলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আরও ছান্দোগ্যোপনিষদে লেখা আছে—

"তদ্য ইহ রমণীয়াচরণা অভ্যাশো তু যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপন্তেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপন্তেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।"

পুণ্যময় কর্ম্মের ফলে মনুষ্য পুণ্যময় ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি লাভ করে এবং পাপময় কর্ম্মের ফলে পাপযোনি অর্থাৎ কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর জীবকৃত পাপময় বা পুণ্যময় প্রাক্তনানুসারেই জীবগণকে এই সকল যোনি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছাকৃত কোন ব্যাপারই নাই, কারণ তিনি ইচ্ছার অতীত। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে যদি জীবের কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর ফল দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি কোথায় রহিল? তিনি ত কর্ম্মেরই অধীন হইলেন, তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা সিদ্ধ হইল কৈ? এরূপ সংশয় করা অকিঞ্চিৎকর।

[ক্রমশঃ]

আর্য্যজাতি।

অবতরণিকা।

সংসার পরিবর্ত্তনের অধীন। পরিণামিনী প্রকৃতি-মাতার বিলাস ভূমিতে কোন পদার্থই চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। এই অমোঘ নিয়মানুসারে ভারত-জননীর ভাগ্যগগনে বিবিধ ধূমকেতুর উদয় হইয়া ভারতীয় আর্য্যজাতির জীবনেও অনন্ত পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল উন্নত-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্য্যজাতির জীবন-তরঙ্গিনী কল্যাণবাহিনী গঙ্গার মত সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের দিকে নিশিদিন ধাবিত হইত, সে আদর্শ সমূহের গৌরবজ্ঞান অমানিশার নিশাপতির মত ইদানীন্তন আর্য্যজাতির হৃদয়াকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। জীবন-সিন্ধুর পুণ্যময় প্রবাহ কালমরুর কঙ্করাকীর্ণ দগ্ধ-বালুকায় দগ্ধ হইয়া নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কদাচিৎ বালুকাস্তূপের অন্তরালে আর্য্যজীবনের ক্ষীণ-ধারা কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে। এই ক্ষীণধারাকে প্রেম ও করুণারধারায় পরিপুষ্ট করিয়া আবার আর্য্য-জাতির প্রচণ্ড-তেজে দিগন্ত আলোকিত কে করিবে? সাধুগণের পরিত্রাণ ও পাপীর দণ্ডবিধানের জন্য যুগে যুগে যিনি অবতীর্ণ হন, সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানই দীনহীন আর্য্যজাতির এই দীনদশায় একমাত্র সহায়। যাঁহার অপাঙ্গ বিক্ষেপে কোটি কোটি সূর্য্য উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে, তিনিই করুণার অজস্রনীরে আর্য্যহৃদয়ের অনন্ত-কালিমা বিধৌত করুন, আর্য্য-হৃদয়কমলকে করুণারুণের দ্বারা সহস্রদলের মত বিকশিত করিয়া নিজের মুনিজনদুর্লভ চরণকমলের অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করুন। এই বিনীত প্রার্থনা।

কালস্রোতের ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাতে আর্য্যজাতি স্বকীয় জাতীয় জীবনের অতুলনীয় লক্ষ্যকেই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ এবং অভ্যুত্থান কিরূপে হইতে পারে, কোন্ কোন্ শক্তির সম্মিলিত-সহায়তায় জাতীয় জীবন বিনা বিচারে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে শ্রীভগবান মনু নিজ সংহিতায় একস্থানে বলিয়াছেন—

নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং তু সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥

ব্রাহ্মণশক্তির সহায়তা ভিন্ন ক্ষত্রিয়শক্তি পরিপুষ্ট হইতে পারে না এবং ক্ষত্রিয়শক্তির বিনা সাহায্যে ব্রাহ্মণ শক্তিও বৃদ্ধিংগত হয় না। এ কারণ রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণশক্তি উভয়ের মিলনেই ইহকাল ও পরকালে প্রজাগণের অনন্ত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। যেমন রোপিত কোন বৃক্ষের মূলে সলিল সিঞ্চনই তাহার রক্ষার একমাত্র উপায় নহে, অধিকন্তু গো, ছাগ, মহিষাদি জন্তু হইতে উহাকে বাঁচাইবার জন্য কণ্টকাকীর্ণ-বেষ্টনীও উহার রক্ষার অন্যতম উপায়, ঠিক সেইরূপ ব্রাহ্মণশক্তির দ্বারা সত্ত্বগুণমূলক-ধর্ম্মের পোষণ হইয়া থাকে এবং ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা বেষ্টনীর মত অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের রক্ষা হইয়া থাকে। কোন বস্তুর সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনের জন্য আভ্যন্তরীণ পরিপোষণ এবং বহির্বাধার দূরীকরণ উভয়বিধ উপায়েরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই হেতু জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য ভগবান্ মনু রাজসিক ক্ষাত্রশক্তি এবং সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণশক্তির আবশ্যকতার বর্ণন করিয়াছেন। ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও এই তথ্যের সত্যতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। দেখা যায় যখনই আর্য্যজাতির মধ্যে উল্লিখিত দ্বিবিধশক্তির সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে, তখনই ভারতে অধর্ম্মের আসুরী অত্যাচার ও পাপের প্রবল প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং তখনই শ্রীভগবানকে অবতার ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণশক্তি এবং ক্ষাত্রশক্তির পুনর্ব্বার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়াছে। ত্রেতাযুগে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রমুখ ক্ষত্রিয় নরপতিগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া অসুরভাবের আবেশে যখন ব্রাহ্মণশক্তির নাশ করিতে লাগিল এবং ধর্ম্মরক্ষক ব্রাহ্মণশক্তির নাশে, ক্ষাত্রশক্তির অপব্যবহারে, বসুন্ধরা পাপভারাক্রান্তা হইয়া উঠিলেন, তখনই ক্ষাত্রশক্তির উন্মার্গগত প্রভাবকে দমিত করিবার জন্য ভগবান ব্রাহ্মণকুলে পরশুরামাবতার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অলৌকিক ব্রাহ্মণশক্তির বলে ক্ষাত্রশক্তির অপব্যবহারজনিত অত্যাচার নিরস্ত হইয়া উভয় শক্তির সামঞ্জস্য বিধান হইল এবং এইরূপে পরশুরামাবতারে জগতে ধর্ম্মের রক্ষা হইল। পুনরায় রামাবতারের অব্যবহিত পূর্ব্বে উভয় শক্তির সমতা নষ্ট হইয়াছিল। এ সময় ব্রাহ্মণশক্তি নিজের কর্ত্তব্যপথ-চ্যুত হইয়া রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যে ব্রাহ্মণের একমাত্র কর্ত্তব্য জিতেন্দ্রিয়তা,

সংযম-সাধনা ও তপস্যা-পরায়ণতা, যে ব্রাহ্মণ সতীত্ব-রক্ষার ও দৈবজগতের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, সেই ব্রাহ্মণের বংশে রাবণ-প্রমুখ রাক্ষস উৎপন্ন হইয়া অসংযম, পাপাচার এবং দৈবজগতের উপর ঘোর অত্যাচার আদি দুষ্ক্রিয়ার ফলে স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালকে যখন পাপময় করিয়া তুলিল, পতিব্রতা সতীগণের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে গগনমণ্ডল যখন মুখরিত হইয়া উঠিল, তখনই শ্রীভগবানকে অধর্ম্মের নাশ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য অবতার ধারণ করিতে হইল। তিনি রামরূপে ক্ষত্রিয়-বংশে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণশক্তির অত্যাচার বিদূরিত করিলেন এবং এইরূপে উভয় শক্তির সমতাবিধান হওয়ায় জগতে ধর্ম্মের রক্ষা হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রীভগবান মনুর আদেশ মত ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রশক্তির পরস্পর সহযোগিতার দ্বারাই সংসারে ধর্ম্মের রক্ষা এবং নিখিল কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। দ্বাপর যুগের অন্তিমকালে আর্য্যজাতির ভাগ্যদোষে উল্লিখিত উভয় শক্তির মধ্যেই বিশেষ দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। সে সময়ে দ্রোণাচার্য্যের মত ব্রাহ্মণের হৃদয়েও অব্রাহ্মণমূলক জিঘাংসাবৃত্তি এবং কর্ণ, ভীষ্ম আদি দেবাংশোৎপন্ন ক্ষত্রিয়গণের হৃদয়েও পাপমূলক আসুরভাবের অমানিশা জাগরুক হইয়াছিল। তাই এই দুই শক্তিকে অকালনিধন হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান পূর্ণকলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপা হইলেও ভাগ্যচক্রকে কে নিরস্ত করিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপণ চেষ্টাতেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারিত হইতে পারিল না। ভ্রাতৃবিরোধের তীব্র-হুতাশনে ভারতের ক্ষত্রিয়শক্তি চিরদিনের জন্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। কেবল গীতাজ্ঞানামৃতের সিঞ্চনে ব্রাহ্মণশক্তির আংশিক রক্ষা হইল। কিন্তু ক্ষাত্রশক্তির সহায়তা শূন্য হইয়া ব্রাহ্মণশক্তি কতদিন জীবন-সংগ্রামে জীবিত থাকিতে পারে! এজন্য অসহায় ব্রাহ্মণশক্তিও ধীরে ধীরে হীনবল হইয়া পড়িল। আর্য্যজাতির জাতীয় শরীরের মেরুদণ্ড স্বরূপ উভয় শক্তিই এইরূপে নষ্টপ্রায় হওয়াতে আর্য্যজাতি আর দীর্ঘকাল জাতীয়তার উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইল না। এজন্য কালের প্রভাবে প্রথমতঃ নাস্তিকতাজনক বৌদ্ধবিপ্লব এবং তৎপশ্চাৎ বিদেশীয় ম্লেচ্ছরাজশক্তির অধিকার আর্য্যজাতির প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণস্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত করিতে লাগিল এইরূপে ধীরে ধীরে কালের কুটিল চক্রের আঘাতে ও নিষ্পেষণে আমরা এই বর্ত্তমান দীনদশায় উপনীত হইয়াছি।

জাতি কাহাকে বলে, এই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক দেশের মনুষ্যসংঘ এবং উহাদের বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু বিশেষ-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একই দেশে উৎপন্ন এবং লালিত পালিত মনুষ্য-সমূহের বাহ্যপ্রকৃতি একরূপ হওয়াতে, এবং নানা বিষয়ে তাহাদের পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ, আন্তরিক বৃত্তিও ক্রমশঃ একইরূপ হইয়া উঠে। এই একরূপতাই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেমোৎপাদনের গূঢ় কারণ এবং পুরুষ-পরম্পরাক্রমে এই গূঢ় কারণই জাতীয় জীবনে কার্য্যকরী হইয়া প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে মৌলিক জাতীয়ভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই রূপে উৎপন্ন মৌলিক জাতীয় ভাব এক জাতীয় নরনারীর অন্তঃকরণ-নির্ম্মাণ-বিশেষতা এবং বিবিধ বাহ্য সাদৃশ্যের সাহায্যে প্রকটিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আকার ও রূপ-সাদৃশ্য, ভাব ও চিন্তা-সাদৃশ্য, ধর্ম্ম ও আচারসাদৃশ্য, ভাষা ও উচ্চারণসাদৃশ্য এবং রাজ্যশাসন ও সামাজিক রীতিসাদৃশ্য এই গুলিকেই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জাতিগত এই বিশেষতা গুলির রক্ষার সঙ্গে জাতীয়তা রক্ষার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে জাতির জীবনে কোন বিশেষ জাতীয় ভাব নাই, সে জাতির জীবনই বৃথা। ভাবহীন জাতীয়-জীবন ক্ষণপ্রভা সৌদামিনীর মত শীঘ্রই কালমেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে যখন কোন বিদেশীয় জাতি অন্য কোন জাতিকে প্রবল রাজশক্তির বলে নিজের অধীন করে, তখন বিজেতাজাতির হৃদয়ে বিজিত-জাতির ভাব, ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ও সমাজগত বিশেষতা নাশের ইচ্ছা সদাই বলবতী হইয়া থাকে, কারণ জাতিগত-বিশেষতা-সমূহের নাশ না করিতে পারিলে বিজিতজাতিকে সম্পূর্ণরূপে কখনই অধীনস্থ করা যায় না। শিক্ষাই প্রত্যেক জাতির জীবনী-শক্তির প্রচ্ছন্ন বীজকে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিয়া থাকে। এইজন্য বিজেতা-জাতি বিজিত-জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিজায়ত্ত করিবার জন্য প্রথমতঃ শিক্ষাবিভাগকে নিজের হাতে লয় এবং তদনন্তর ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত বিবিধ উপায়ে শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণের কোমলহৃদয়ে বিদেশীয় বীজগুলি এমন ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া দেয় যে কিছুদিন পরে ঐ সকল শিক্ষামন্দিরের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রশংসাপত্র-প্রাপ্ত ধন্যম্মন্য যুবক-যুবতীগণ বিজাতীয় সকল বিষয়ের প্রতিই অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের

হৃদয় হইতে স্বজাতীয় নিখিল ভাবের প্রতি অনুরাগ নষ্ট হইয়া যায়। বিজাতীয় ভাষা বিজাতীয় বেশভূষা, বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় ধর্ম্ম, বিজাতীয় আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, সামাজিক-ব্যবস্থা, সবই তাহারা প্রেমের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং স্বজাতির ভাষা, ভাব, ধর্ম্ম, সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতিকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। স্বজাতির সবই যেন দোষদৃষ্ট, সবই অসম্পূর্ণ সবই উন্নতিমার্গের পরিপন্থী, কুসংস্কারমূলক, বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিশূন্য মিথ্যা, নিঃসার, হেয়, আড়ম্বরমাত্র, এইরূপ বুদ্ধি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়। এই ভাবটি যখন হৃদয়ে বেশ বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন স্বজাতির ইতিহাসের প্রতিও সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্যবীর্য্যাদিমূলক সত্যঘটনাগুলিকে এবং প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাত্মিক তথ্যগুলিকে পৌরাণিক মিথ্যা উপকথা বলিয়া মনে হয়। উহাদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেও যেন সঙ্কোচ-বোধ হয় এবং শিক্ষা ও সভ্যতার বিরুদ্ধবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। উহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাতেই আনন্দ বোধ হয় এবং প্রত্নতত্ত্ববেত্তৃত্বের প্রচণ্ড লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। এই সকল দুর্গুণ শিক্ষার দোষ যখন পরাধীনজাতির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন বিজেতা-জাতির সকলবিধ বিষয়ের অনুকরণ করিবার প্রবল ইচ্ছা বিজিত-জাতির হৃদয়-মন্দিরের উপর অধিকার বিস্তার করে। ইহা হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ যাহার মনে "আমার নিজের কিছুই নাই" বলিয়া দৃঢ়ধারণা হইল, সে চক্ষের সমক্ষে বলবান্ জাতিকে দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিবে না ত আর কি করিবে? কিন্তু পরাধীন জাতির-হৃদয় দুর্ব্বল হওয়ায় সে স্বাধীন জাতির গুণগুলির অনুকরণ করিবার সামর্থ্য রাখে না। এজন্য তাহার পক্ষে বিজেতাজাতির দোষগুলির অনুকরণ করাই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে। এইরূপে বিজাতীয় দোষের প্রতি গুণজ্ঞান, স্বাধীন-সন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্ধের অনুকরণপ্রবৃত্তি, স্বজাতীয় রীতি, নীতি, সামাজিক ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতা ইত্যাদি, ইত্যাদি, জাতীয়তা-ভ্রংশকর ক্ষয়রোগ বিজিত-জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া অবশেষে হৃদ্‌যন্ত্রকে পর্য্যন্ত বিকৃত ও নষ্ট করিয়া দেয়। এবং কিছুদিনের মধ্যে বিজিত-জাতি স্বকীয় জাতিগত সকল বিশেষতাকে হারাইয়া বিজেতা জাতির মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিলীন করিয়া দেয়। কালসমুদ্রে উৎপন্ন বুদ্‌বুদের মত তাহার স্থিতি কালসমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায়।

গ্রহপীড়িত আর্য্যজাতির ভাগ্যে এই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। আমাদের সৌভাগ্যশশী ভয়ঙ্কর বিজাতীয় রাহুদ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে। আমরা নিজের শক্তি, নিজের গৌরব, পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমা সকলই বিস্মৃত এবং সকলের প্রতিই সংশয়াবিষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। সিংহ নিজস্বরূপের অভিমান হারাইয়া হীনশৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য যদি আর্য্যজাতি আবার উন্নত হইয়া পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিতে চায়, তবে তাহাকে নিজস্বরূপের গৌরবজ্ঞান লাভ করিয়া লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। উহা কিরূপে হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য বিষয়। আজকাল জাতীয়তার অভ্যুত্থানকল্পে যত প্রকার আন্দোলন বা সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ঐ সকলগুলির উদ্দেশ্যকেই স্থূলতঃ দ্বিধা বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক জাতীয় চিন্তাশীলগণ ইহাই বলেন যে বর্ত্তমান দেশকাল দেখিবার কোনই প্রয়োজন নাই, আর্য্যজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে যে রীতিনীতির অবলম্বনে চলিয়া আসিয়াছে, ঠিক সেইরূপ করিলেই ইহার পূর্ণোন্নতি সংরক্ষিত হইবে। দ্বিতীয়প্রকার চিন্তাশীল পুরুষগণ বলেন যে প্রাচীন রীতিনীতিগুলি প্রাচীন হওয়ায় বর্ত্তমান দেশকালের প্রতিকূল এবং দোষদুষ্ট। এ সময়ে উহাদের দ্বারা আর্য্যজাতির অবনতি ভিন্ন উন্নতি হইতে পারে না। এজন্য প্রাচীন সমস্ত আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া নবীন পশ্চিমীয় আদর্শে আর্য্যজাতির জীবন গঠিত হইলে পর তবে এই জাতির উন্নতি হইতে পারিবে। এই দুই প্রকার মতবাদ লইয়া নানাপ্রকার আন্দোলন এবং অনেক সময় রাগদ্বেষেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। এজন্য এই উভয়ের কল্যাণকারিতা বিষয়ে প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা বলেন যে পুরাতন প্রথাগুলি ঠিক পুরাতন ভাবেই বর্ত্তমান দেশকালে পরিচালিত হওয়া উচিত, তাঁহারা শ্রীভগবান্ মনু এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বিচার করিলেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। মনু সকল কালে একইরূপ ধর্ম্ম চলিতে পারে একথা বলেন নাই, কারণ মনুষ্যের প্রাক্তনানুসার উৎপন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এজন্য কর্ম্ম ও প্রকৃতি অনুসারে অধিকার বৈচিত্র্যও অবশ্যম্ভাবী। মনু বলিয়াছেন—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

সত্যযুগে তপঃপ্রধান ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ত্রেতাযুগে জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, দ্বাপরে যজ্ঞধর্ম্ম এবং কলিযুগে কেবল দান ধর্ম্মই যুগানুসার সুফল প্রসব করে। এরূপ যুগানুসার ধর্ম্মবিধির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায়। তপস্যা করা অতি কঠিন কার্য্য। শরীর ও মন বিশেষ পবিত্র এবং উন্নত উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত না হইলে তাহার দ্বারা তপস্যা সম্ভবপর হয় না। এজন্যই আর্য্যশাস্ত্রের পুণ্যময় গর্ভাধান সংস্কারের বিধি বর্ণিত হইয়াছে। পিতামাতা যদি দেবভাবে ভাবিত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিতে পারেন তবেই সন্তানের শারীরিক মানসিক উপাদান উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু কালপ্রভাবে গর্ভাধান সংস্কার বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে। প্রায়ই কামভাবে ভাবিত হইয়া নিতান্ত পাশবিক ক্রিয়ার দ্বারা আজকাল সন্তানোৎপাদন করা হয়। এরূপ কামজ সন্তান-সন্ততির শারীরিক ও মানসিক উপাদান নিতান্ত হীন হওয়ায় তাহারা তপস্যার উত্তম অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। কলিযুগ তমঃপ্রধান হওয়ায় এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অতএব কলিযুগে তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠান অতীব দুরূহ। উহা সত্যযুগের পক্ষেই অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। ইহাই 'তপঃ পরং কৃতযুগে' এই শ্লোকাংশের তাৎপর্য্য। সাত্ত্বিক অন্তঃকরণেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। তমঃপ্রধান কলিযুগে এরূপ সত্ত্বভাবাপন্ন অন্তঃকরণ বিরলই দেখা যায়। এজন্য জ্ঞানপ্রধান-ধর্ম্মও এযুগে চলিতে পারে না। আর দ্বাপরযুগের যজ্ঞপ্রধান ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান কলিযুগে হওয়া নিতান্ত কঠিন। কারণ দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি এবং মন্ত্রশুদ্ধি না হইলে যজ্ঞক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ হয় না, প্রত্যুত সময় সময় হানিই হইয়া থাকে। আজকাল শুদ্ধ যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং যাজ্ঞিকদের সংযম, ও শিক্ষাশ্রদ্ধার ন্যূনতাহেতু ক্রিয়াশুদ্ধি এবং মন্ত্রশুদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিয়াছে। দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এরূপ কোন কঠিন বিধির আবশ্যকতাই হয় না। নিজের বস্তুর প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ করিয়া উহা অন্যকে সমর্পণ করিলেই দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বিশেষ মমত্ব পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও রাজসিক দানের ফল লাভ হইতে পারে। অতএব দেখা গেল যে সকল যুগে অথবা সকল কালে একরূপ ধর্ম্মবিধির অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব। দেশ কাল পাত্রানুসারে ধর্ম্মবিধির সামঞ্জস্য না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান কিছুতেই হইতে পারে না। এই হেতু লক্ষ লক্ষ বর্ষপূর্ব্বে আর্য্যজাতির মধ্যে

যে ভাবে ধর্ম্মাচরণ হইত, ঠিক সেইভাবে এখন ধর্ম্মাচরণের আদেশ না দিয়া বর্ত্তমানকালীন জীবের প্রকৃতি অনুসারে বিচার করিয়া ধর্ম্মানুশাসন করাই কল্যাণদায়ক হইবে। কিন্তু ইহাতে যেন এরূপ মনে না করা হয় যে প্রাচীন প্রথা সবই ভুল ও অনুষ্ঠানযোগ্য নহে এবং সেইগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কোন নূতন দেশের নূতন আদর্শে জীবন গঠিত না করিতে পারিলে আর্য্যজাতির উন্নতি হইবে না। এরূপ বিচারের অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে কোন নবীন জাতি যে ভাবে জাতীয় জীবনের উন্নতির বিধান করিতে পারে, প্রাচীন সংস্কারপুষ্ট জাতি সে ভাবে পারে না। সংস্কারশূন্য নবীনজাতি বিজাতীয়-সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া তদনুসারে জাতীয়-জীবন গঠিত করিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন-সংস্কারপুষ্ট-জাতি প্রাচীন-সংস্কারচ্যুত হইলে উন্নতির পরিবর্ত্তে সংস্কার-হীনতা-হেতু কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। কারণ সংস্কারই জাতির জীবন। আর্য্যজাতির মধ্যে যতদিন আর্য্য-সংস্কার আছে ততদিনই আর্য্যজাতি জীবিত থাকিতে পারে। যদি সেই সকল সংস্কারের মধ্যে কোনরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকে তবে সেই ত্রুটিকে বিদূরিত করাই কর্ত্তব্য। অন্যথা আর্য্যসংস্কার-সমূহকে সমূলোন্মূলিত করিয়া বিজাতীয় সংস্কারের বলে আর্য্যজাতিকে উন্নত করিতে গেলে আর্য্যজাতি কালসমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, উন্নত হইবে না। অতএব নবীন মতাবলম্বিগণের যুক্তি দূরদর্শিতাপূর্ণ নহে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিচার্য্য এই যে, যে জাতির অতীত জীবন গৌরবমণ্ডিত ছিল না সে জাতি অন্য কোন গৌরবান্বিত জাতির আদর্শ লইয়া নিজ জাতীয়-জীবনকে উন্নতির সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু যে জাতির ভূতকালীন গৌরব-গাথা সমগ্র জগতে সর্ব্ববাদি সম্মত, কিন্তু কালবশে বিস্মৃতির অমানিশায় আচ্ছন্ন, সে জাতির পক্ষে পূর্ব্বস্মৃতিকে একেবারে মুছিয়া ফেলা অপেক্ষা জাগ্রত করাই স্বাভাবিক, সহজ এবং শুভফলপ্রদ হইবে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ম্যাক্সমুলার কোলব্রুক, সোপেনহর আদি পাশ্চাত্য মনীষিগণ একবাক্যে আর্য্যজাতির পূর্ব্বতন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। উপনিষদের অমূল্য উপদেশ পাঠ করিয়া সোপেনহর স্পষ্ট শব্দে বলিয়াছেন—"It has been the solemn of my life and it will be the solemn of my death. উপনিষদ আমার জীবনে শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াছে এবং মৃত্যুতেও শান্তির সঞ্চার করিবে।" অতএব

আর্য্যজাতির পক্ষে অতীতের গৌরব-কথা হৃদয়পটল হইতে বিলুপ্ত করিয়া বিজাতীয় ভাবে ভাবিত হওয়া অপেক্ষা অতীতের ইতিহাসে জাতীয় জীবনকে উজ্জ্বল করাই সহজ, স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মানুকূল হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা আছে তাহাই থাকে এবং যাহা নাই তাহা আসিতে পারে না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" এ কথা ভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন। বিদেশে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের স্বপ্নও ললনাগণ দেখেন না, কিন্তু ভারতে আজিও পতির চিতায় প্রাণদান বিরল নহে, ইহার কারণ কি? এ দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীললামভূতা সতীগণের গৌরবান্বিত অতীত সংস্কার আছে বলিয়া। বিদেশে ব্রহ্মচর্য্যময়-জীবন স্বপ্নজগতের স্মৃতিমাত্র হইলেও, ভারতমাতার সুপুত্রগণের হৃদয়ে সংযমের সাহসিকতা এখনও উদ্ভাসিত হয় কেন? এ দেশে ভীষ্ম, শুকদেব প্রভৃতি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মহাত্মাগণের গৌরবময় অতীত ইতিহাস বিদ্যমান আছে বলিয়া। যেখানে সীতা ছিলেন, সেখানেই আবার সীতা উৎপন্ন করা সহজ ও স্বভাবিক। যেখানে সীতা ছিলেন না, সেখানে সীতার জীবন উন্মেষিত হওয়া অসম্ভব প্রায়। যেখানে ভীষ্ম ছিলেন না, সেখানে ভীষ্ম হওয়া অতি কঠিন। যেখানে ভীষ্ম ছিলেন, ভীষ্মজীবনের সংস্কার জাজ্জ্বল্যমান, তথায় ভীষ্ম আবার সহজেই আসিতে পারেন। অতএব আর্য্যজাতির পক্ষে আর্য্যজীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও আর্য্যভাবে জীবন গঠিত করা যত সহজ ও স্বাভাবিক হইবে, আর্য্যভাবকে নষ্ট করিয়া অনার্য্যভাবে জীবন গঠিত করা তত সহজ ও স্বাভাবিক হইবে না। প্রত্যুত এরূপ করিতে গেলে জন্মগত, সংস্কারগত, পুরুষপরম্পরাগত প্রকৃতির বিরুদ্ধ হওয়ায় আর্য্যজাতি প্রাণহীন হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আর্য্যজাতিকে আর্য্যজাতির সংস্কার সমূহের অবলম্বনে উন্নত করাই স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মানুকূল। অবশ্যই সেগুলিকে দেশকালের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। নতুবা প্রবাহের বিপরীত গতিতে জীবনসমুদ্রে জাতীয় তরণীকে চালান কঠিন হইবে। কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম্মের ও জাতীয়তার লক্ষ্যকে নষ্ট করা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হইবে না। লক্ষ্যচ্যুত হইয়া কালের প্রবাহে বহিয়া যাওয়া উন্নতির লক্ষণ নহে, কিন্তু লক্ষ্য স্থির রাখিয়া প্রবাহের সহিত সামঞ্জস্য করা উন্নতির লক্ষণ। নবীন নেতাগণ এই মার্ম্মিক তত্ত্বগুলি মনে রাখিলে কদাপি পথভ্রষ্ট হইবেন না। এ সম্বন্ধে

তৃতীয় বিচার্য্য এবং সিদ্ধান্ত নির্ণয় উন্নতির লক্ষণ সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে। সকলেই জানেন যে উন্নতি বীজবৃক্ষ-ন্যায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে! অর্থাৎ যেরূপ বীজের মধ্যে ভাবী বৃক্ষের সমস্ত উপাদান পূর্ব্ব হইতেই থাকে, কেবল রসাদিসংযোগের দ্বারা ঐ উপাদানগুলিকে উদ্বোধিত করিতে হয়, ঠিক সেই প্রকার প্রত্যেক জাতির মধ্যে জাতিগত যে বিশেষ লক্ষণগুলি থাকে, সেইগুলির পরিপুষ্টি এবং পরিবর্দ্ধনের দ্বারা জাতীয় জীবন-কল্পতরু অঙ্কুরিত, পল্লবিত এবং ফলফুলে সুশোভিত হইতে পারে। সেগুলিকে নষ্ট করিলে বা তাহার স্থানে বিজাতীয় উপাদানের দ্বারা জাতীয় কলেবর পুষ্ট করিলে জাতির উন্নতি হয় না। বটবীজের উন্নতি বটবৃক্ষ হইয়াই হইতে পারে, অশ্বথ বা নিম্ববৃক্ষ হইয়া হইতে পারে না। যদি অশ্বথ বা নিম্ববৃক্ষ বট অপেক্ষা বিশালকায়ও হয় তথাপি উহাকে বটের উন্নতি বলা যাইবে না। ঠিক সেইরূপ আর্য্যজাতি যদি নিজের জাতিগত বিশেষতা-গুলিকে হারাইয়া বিজাতীয় বিশেষতাকে গ্রহণ করিয়া অধিক উন্নতও হয় তথাপি উহাকে আর্য্য জাতির উন্নতি বলা যাইতে পারে না। কারণ বিশেষতাই জাতির প্রাণ। তাহা নষ্ট হইলে জাতি মরিয়া যায়, উন্নতিলাভ করে না। মৃতের উন্নতি, উন্নতি পদবাচ্য নহে। জীবিতের উন্নতিই উন্নতি পদবাচ্য। আমি যদি আমিই না রহিলাম তবে আমার উন্নতি কি হইল? এজন্য আর্য্য অনার্য্য হইয়া উন্নতি করিতে পারে না। ভারত ইউরোপ বা আমেরিকা হইয়া উন্নতি করিতে পারে না। তাহাকে উন্নত করিতে হইলে আর্য্যত্ব এবং ভারতত্বের বীজ সমূহকে পরিপুষ্ট করিয়াই উন্নত করিতে হইবে। আমাদের উন্নতি সেক্স্পিয়ার হইয়া হইতে পারে না, কিন্তু বেদব্যাস হইয়াই হইতে পারে; আমাদের উন্নতি মিল্টন শেলি হইয়া হইতে পারে না, কিন্তু কশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য হইয়াই হইতে পারে, আমাদের উন্নতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হইয়া হইতে পারে না, কিন্তু ভীষ্মপিতামহ এবং মহারাণা প্রতাপ হইয়াই হইতে পারে, আমাদের মাতাদের উন্নতি জোসেফাইন হইয়া হইতে পারে না, কিন্তু সীতা সাবিত্রী হইয়াই হইতে পারে। আমরা যাহা লইয়া আমরা—তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি বাঁচিতে পারি, তবেই আমাদের বাঁচা সার্থক, অন্যথা নিজত্বকে কালকূপে বিসর্জ্জিত করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তুচ্ছ জীবনকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। আমরা স্বদেশে বিদেশে যে ভাবে

শিক্ষা পাই না কেন যদি শিক্ষার ফলে আমাদের আর্য্যজাতির ভাব পরিপুষ্ট হয় তবেই আমাদের শিক্ষার মূল্য আছে। অন্যথা শিক্ষিত হইয়া স্বজাতীয় বিশেষতা-বর্জ্জিত হওয়া শিক্ষার বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ বিদ্যা অবিদ্যা মাত্র, এরূপ শিক্ষা কুশিক্ষা মাত্র। ভাগ্যদোষে দীন হীন আর্য্যজাতির জীবনে এরূপ কুশিক্ষারও অধিক অবসর হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই বিষময়-পরিণামে আমরা জাতীয় বিশেষতার গৌরব বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। অতএব আমরা যদি আর্য্যজাতির মহত্ত্বকে পুনরায় উজ্জীবিত করিতে চাই তবে জাতীয় বিশেষতার প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ না হইয়া অনুরক্ত হওয়াই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। আর্য্যজাতির মৌলিক বিশেষতা কি তাহা একটু সমাহিত চিত্তে বিচার করিলেই বেশ বুঝা যায়। আমাদের বিশেষতা সেই গুলি—যাহা অন্য জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না এবং যাহাদের সহিত আমাদের জীবন-মরণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। আর্য্যজাতির আধ্যাত্মিক-জীবন, আর্য্যজাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আর্য্যজাতির পাতিব্রত্যধর্ম্ম এবং আর্য্যজাতির অনন্যসাধারণ সদাচার এইগুলিই আর্য্যজাতির মৌলিক বিশেষত্ব। কারণ এগুলি আর্য্যজাতি ভিন্ন পৃথিবীস্থ আর কোন জাতির মধ্যেই পাওয়া যায় না এবং এইগুলি না থাকিলে আর্য্যজাতি জীবিত থাকিতে পারে না। কালের প্রবল বাত্যায় ভূমণ্ডলস্থিত শত শত জাতি ধূলিকণার ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল, কিন্তু এত বিদেশীয় অত্যাচার, ধর্ম্মবিপ্লব প্রভৃতির প্রচণ্ডাঘাতেও যে আর্য্যজাতি না মরিয়া এখনও জীবিত আছে এবং জাতিগত বীজ রক্ষা করিতেছে, তাহা উল্লিখিত মৌলিক বিশেষতাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা-সমাহিত-দৃষ্টির সুপরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের এই সুদৃষ্টি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে বিচার এবং বিধিনির্দ্দেশ করাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। করুণাময় ভগবান্ আমাদের জাতিগত দিব্যনেত্রকে উন্মীলিত করুন এই প্রার্থনা।

লক্ষণ-নিরূপণ।

স্বরূপজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না ইহা আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। জীব নিজের মধ্যে যে ব্রহ্মসত্তা আছে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াই জীবত্ব হইতে শিবত্ব পদে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে। সেই প্রকার প্রত্যেক জাতিই, সে কে, কোথা হইতে আসিল, তাহার লক্ষণ এবং মৌলিক উপাদান কি, কি, এ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জাতিগত মুক্তিলাভে কদাপি সমর্থ হয় না। এজন্য আর্য্যজাতির বিষয়ে কিছু জানিবার পূর্ব্বে আর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি এবং আর্য্যজাতিরই বা অনন্য-সাধারণ লক্ষণ কি তাহা জানা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আজকাল 'আর্য্য' এই শব্দটিকে আশ্রয় করিয়া দেশে বিদেশে বিবিধ বিবাদের অবতারণা হইয়াছে। কে আর্য্য, কে অনার্য্য ইহার সর্ব্ববাদি-সম্মত নির্ণয়ই হইয়া উঠিতেছে না। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও একমত হইতে পারিতেছেন না। এ কারণ আমাদের প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রেই 'আর্য্য' শব্দ বিষয়ে এবং আর্য্যজাতির লক্ষণ বিষয়ে কিরূপ লেখা আছে তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখা যাউক। আর্য্যশাস্ত্র বলেন যে, যেরূপ এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম শব্দ এবং পাশ্চাত্য রিলিজন শব্দ একার্থবাচক এবং এক ভাবদ্যোতক নহে, সেই প্রকার আর্য্য এবং এরিয়ন শব্দও অন্বর্থবোধক অথবা সমভাব-প্রকাশক হইতে পারে না। কারণ স্থূলদৃষ্টিপরায়ণ পাশ্চাত্য-শাস্ত্রে যেরূপ শারীরিক গঠন-প্রণালীর তারতম্যানুসারে এরিয়ন, মঙ্গোলিয়ন, নিগ্রো প্রভৃতি নামকরণ ও বিভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ কোথাও করা হয় নাই।

আর্য্য-শাস্ত্রে জীবনের অবস্থা ও ভাবানুসারে আর্য্য শব্দের বহুবিধ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে যথা—কর্ম্মমীমাংসা দর্শন :—

"উভয়োপেতার্য্যজাতিঃ।" "তদ্বিপরীতা অনার্য্যাঃ।"

উভয় শব্দের অর্থ এস্থলে বর্ণ ও আশ্রম। চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমযুক্ত যে জাতি তাহাই আর্য্যজাতি নামে অভিহিত। আর্য্যজাতির ইহাই প্রকৃততম লক্ষণ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিহীন জাতিই অনার্য্যজাতি।

ঋ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋ ধাতুর অর্থ গমন অথবা ব্যাপ্তি। বেদের ভাষ্যকার শায়ণাচার্য্য এই অর্থকে অবলম্বন

করিয়া লিখিয়াছেন যে, যে জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে যাইয়া স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা সংস্থাপন করিত তাঁহারাই আর্য্যজাতি। এই বিষয়ে মহাভারতেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা :—

ম্লেচ্ছাশ্চান্যে বহুবিধাঃ পূর্ব্বং যে নিকৃতা রণে।

আর্য্যাশ্চ পৃথিবীপালাঃ।

পূর্ব্বকালে বহুপ্রকার অনার্য্যজাতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া যে জাতি পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিল সেই আর্য্যজাতি।

মহর্ষি মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণ যে যে স্থানে আর্য্য শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সেই স্থলে বর্ণাশ্রম সদাচার-যুক্ত কদাচার-দোষ-রহিত পুরুষার্থশীল মনুষ্য-জাতিই তাহার লক্ষ্যার্থরূপে প্রতীয়মান হয়। যথা—

কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।

তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স তু আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

কর্ত্তব্যপরায়ণ অকর্ত্তব্যবিমুখ আচারবান্ পুরুষই আর্য্য। যাস্কমুনি স্বপ্রণীত নিরুক্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,—

আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ।

ঈশ্বর পুত্রকে আর্য্য বলে। এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা যাস্কমুনি আর্য্য-জাতির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত 'বীরতা' ব্যঞ্জক অর্থের অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক পূর্ণতার প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছেন। কেহ বা 'ঋ' ধাতুর অর্থ এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন,—

অর্ত্তুং সদাচরিতুং যোগ্য ইতি আর্য্যঃ।

এই লক্ষণ অনুসারে ন্যায়পথাবলম্বী, প্রকৃতাচারশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ-জাতিই আর্য্যজাতি এইরূপ সিদ্ধ হয়। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিত আছে,—

যোহমার্য্যেণ পরবান্ ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন ভামিনি।

এই প্রকার বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আর্য্যশব্দের উপযুক্ত লক্ষণেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন,—

আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ।

এই শ্লোকের দ্বারাও পুর্ব্বোক্ত লক্ষণেরই পুষ্টি সাধিত হয়। অতএব আর্য্য শব্দের উপর্য্যুক্ত লক্ষণ-সমূহের তাৎপর্য্য এই হইল যে, যে জাতি বেদবিধান

অনুসারে সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্ববিষয়ে অধ্যাত্ম্য-লক্ষ্যযুক্ত, দোষরহিত এবং চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম-ধর্ম্মযুক্ত সেই আর্য্যজাতি। ভারতবর্ষ এইপ্রকার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আর্য্যজাতিরই রমণীয় প্রাচীন নিবাসভূমি। এই নিমিত্ত ঋগ্বেদের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলে আর্য্য জাতির অপরিসীম গুণগরিমা বর্ণিত আছে। যথা, ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টকের প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"অহং ভূমিমদদামার্য্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্ত্যায়েতি।"

বামদেব ঋষি তপোবলে আপন আত্মার সর্ব্বাত্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি প্রজাপতিরূপ হইয়া আর্য্য অঙ্গিরাকে ভূমিদান করিয়াছি এবং ইন্দ্ররূপ ধরিয়া হবির্দ্দানকারী মনুষ্যগণকে বৃষ্টিদান করিয়াছি' এইপ্রকার ভগবানের নিঃশ্বাসরূপী অনাদি-বেদেও আর্য্যজাতির গৌরব-কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আদিনিবাস নির্ণয়।

আর্য্যজাতির আদিনিবাস স্থান ভারতবর্ষ কি না এ বিষয়ে বহু মতভেদ রহিয়াছে। নিজের দেশে নিজেকে বিদেশী বলা কেবল ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধই নহে অধিকন্তু যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা হইতেও বিরুদ্ধ। এইজন্য এ বিষয়ে বিচার করা যাইতেছে। আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদি জাতি নহে এ বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের যতপ্রকার কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলেন, আর্য্যেরা মধ্য-এশিয়ার কাস্পিয়ন হ্রদের নিকটে কোথাও থাকিতেন, তথা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। এইরূপ কল্পনার পক্ষে তাঁহারা তিনটী যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। যথা :—ঋগ্বেদ সংহিতায় এমন অনেক নদ, নদী ও নগরের নাম পাওয়া যায় যাহাদের তদানীন্তন-স্থিতি মধ্য এশিয়ায় বলা যাইতে পাবে। দ্বিতীয় যুক্তি এই যেঃ—আর্য্যগণ শাস্ত্রে শ্বেতাঙ্গ মনুষ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং মধ্য এশিয়ার লোকেরা শ্বেতবর্ণ। তৃতীয়তঃ—আর্য্যদের উপাস্য অনেক দেবদেবীর

নামের সহিত উক্ত প্রাচীন মহাদেশে অনেক জাতির উপাস্য বহু দেবদেবীর নামের মিল আছে, উহাতে প্রমাণিত হয় যে মধ্য এসিয়ার একই প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আর্য্যেরা যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের দ্বিতীয় কল্পনা এই যে, আর্য্যগণ উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ভারতে আসিয়াছেন। ইহার পক্ষে যুক্তি এই :—বেদে দীর্ঘকালব্যাপী রাত্রি ও দিনের উল্লেখ আছে এবং উত্তর মেরুতে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি থাকে। জেন্দাভেস্তা নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে,—"আর্য্যদের স্বর্গ উত্তর মেরুতে ছিল। সেখানে বৎসরে মাত্র একবার সূর্য্যোদয় হইত। পরে সেখানে বরফ ও শীত অত্যন্ত অধিক হওয়ায় যখন সে স্থান মনুষ্যাবাসের অযোগ্য হইতে লাগিল তখন আর্য্যেরা উহা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ মেরুর দিকে আসিলেন।" ঐতিহাসিকদিগের তৃতীয় কল্পনা এই যে,—জার্ম্মানীর নিকটে কোন স্থানে আর্য্যেরা পূর্ব্বে বাস করিতেন; যেহেতু ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় যে আর্য্যভাষা সংস্কৃতের সহিত জর্ম্মান ভাষার অনেকাংশে ঐক্য রহিয়াছে। ঐতিহাসিকদের এই সকল কল্পনা ব্যতীত আজ কাল আর একটী নবীন কল্পনা দেখা দিয়াছে। এই মতে আর্য্যজাতি তিব্বত হইতে আগত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এখন নিম্নে এই সকল কল্পনার অসত্যতা সম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে।

পরিতাপের বিষয় এই যে আধুনিক ঐতিহাসিক লোকেরা ভারতের প্রকৃতি এবং সৃষ্টির ক্রমবিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে বিচার না করিয়াই স্বীয় স্বীয় কল্পনা প্রকাশিত করিয়াছেন। কোন পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ কারণের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া পরে কার্য্যের তত্ত্ব নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। যেহেতু কার্য্য কারণেরই বিকাশ মাত্র। এইজন্য কারণ সম্বন্ধে পূর্ণ সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইলে তবে কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে। সুতরাং আর্য্যজাতির আদি নিবাস স্থান স্থির করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ভারতের প্রকৃতি, আর্য্যজাতির প্রকৃতি এবং সৃষ্টির ক্রমবিকাশ অনুসারে উভয়-প্রকৃতির কথন ও কিরূপ সম্মিলন হইতে পারে এ সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমষ্টি-সৃষ্টির ধারা উপর হইতে নীচের দিকে আসে। তদনুসারে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পূর্ণ মানব উৎপন্ন হয় এবং সেই

সময়কে সত্যযুগ বলে। ঐ সময় পূর্ণ সত্ত্বগুণের বিকাশ থাকে বলিয়া তখনকার সকল মনুষ্যই পূর্ণ ধার্ম্মিক হইয়া থাকেন। স্মৃতি ও পুরাণে এই প্রকার সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে লিখিত আছে,—

সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥
তান্বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ!
তে নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ॥
অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশপুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির প্রথম অবস্থায় স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিজন পূর্ণসত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, নিষ্ক্রিয় ও ঊর্দ্ধরেতা পুত্র উৎপন্ন হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে সৃষ্টি বিস্তার করিবার ইচ্ছা ছিল না সুতরাং ব্রহ্মা যখন ইঁহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তার করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন তখন ইঁহারা অস্বীকৃত হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তরে কিঞ্চিৎ রজোগুণযুক্ত মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশজন মানসপুত্র উৎপন্ন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত পুত্রচতুষ্টয়ের ন্যায় ইঁহারা পূর্ণ-নিবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন না সুতরাং ইঁহারা সৃষ্টি বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ইঁহাদিগের দ্বারা অনেক জীব উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই কয়েকটী শ্লোকে জীবের প্রকৃতি কি প্রকারে ধীরে ধীরে নীচের দিকে আসে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে সমষ্টি সৃষ্টির ধারা ক্রমশঃ অধোমুখীন হইয়া সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণের দিকে আসে, তদনুসারে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের নাশ ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতি বর্ত্ততে॥
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ॥

(ক্রমশঃ)

নারীধর্ম্ম।

অবতরণিকা।

শ্রীভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

> স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
> স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি॥

স্ত্রীজাতির রক্ষা করিতে পারিলে নিজ সন্তান সন্ততির রক্ষা হয়, চরিত্রের রক্ষা হয় এবং কুল, আত্মা ও স্বধর্ম্মের রক্ষা হইয়া থাকে। আদিপুরুষ মনুর এই বচনানুসারে মহামায়ার অংশস্বরূপিণী নারীজাতির রক্ষার উপরই সামাজিক, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সকল প্রকার উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ইহা সমাজগত জীবনের উন্নতির মানদণ্ড স্বরূপ, লৌকিক জগতে উৎকর্ষ সম্পাদনের অদ্বিতীয় সোপান এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে অমৃতময় করিবার একমাত্র অবলম্বন। মানবজীবনের প্রত্যেক স্তরের সহিত নারীজাতির রক্ষার এইরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে বলিয়াই শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি আর্য্যশাস্ত্রে নারীধর্ম্মের বিষয়ে এত গভীর গবেষণার সহিত তত্ত্বনির্ণয় করা হইয়াছে। সেই সকল তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞানলাভ করিয়া নারীজীবনকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারিলে, গৃহস্থাশ্রমে অমরপুরীর আনন্দধারা প্রবর্ষিত হইবে, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেম ও শান্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে এবং এই মন্দাকিনীর মৃদুমন্দমধুর ধারায় মরালের মত সন্তরণ করিতে করিতে ভাগ্যবান্ দম্পতি নিত্যানন্দময় অপার সচ্চিদানন্দসাগরে গিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কালের কুটিলচক্রে প্রাচীন মহর্ষিগণের তত্ত্বোপদেশ আধুনিক জনসাধারণের হৃদয়কন্দরে স্থানলাভ করিতে পারিতেছে না। আপাতঃ-মধুর বিজাতীয় অনুকরণের প্রবল-বন্যায় ঋষিসুলভ সদ্বৃত্তিগুলি বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মের পরিণাম-সুখদায়িনী মাধুরী বর্ত্তমান জগতের নরনারীর জীবনে কৈ তেমন সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে

না। ক্রমশঃ আর্য্যজীবন অনার্য্য ভাবের নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন হইতেছে। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের আবিষ্কৃত তত্ত্বকথাগুলির মর্ম্মভেদ করা দূরে থাকুক, উহা বর্ত্তমানে আর্য্যজাতির উন্নতিশীল জীবনের সর্ব্বথা পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত এবং উপহসিত হইতেছে। আমরা যেন সেগুলির খণ্ডন করিলেই আনন্দলাভ করি, সেগুলিকে অতি প্রাচীন বোধে বর্ত্তমান দেশ, কাল, পাত্রের বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিলেই বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ উচ্চশিক্ষার চরিতার্থতা অনুভব করি এবং সেগুলির আমূল উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই দেশনেতা হইয়া মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করিলাম বলিয়া মনে করি। এইরূপে বিদেশীয়-বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য অনেকেই ভারতীয় আর্য্যনারীর জীবনকে ইউরোপের আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণের বিস্ময়কর-পরিণামের আক্রমণ হইতে অদৃষ্টচক্র সংরক্ষণ করিতেও সমর্থ হইতেছেন না। ফলে 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া ভীষণ অনুতাপময় ও দুঃখময় গার্হস্থ্য জীবন লাভ করিতেছেন। এই দুস্তর দুঃখপারাবার হইতে আর্য্যজাতির নিস্তার সাধন কে করিবে? কে তাহার হৃদয়কন্দরের অমানিশা বিদূরিত করিয়া জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় পুনরুদ্ভাসিত করিয়া দিবে? কে আবার মহর্ষিগণের জ্ঞানগরিমায় তাহার জীবনকে মহিমাময় ও কৃতকৃতার্থ করিয়া দিবে? করুণাময়ী জগদম্বাই শরণ হউন। তাঁহার অংশরূপিণী নারী-জাতির ধর্ম্মতত্ত্ব নরের হৃদয়ে উদ্‌বোধিত করিয়া প্রাচীন আর্য্যগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন। তাহাহইলেই তাঁহার সপ্তশতী-কথিত "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু" এই দেববাণীর মর্ম্মে মর্ম্মে চরিতার্থতা হইবে।

সাধারণতঃ "রক্ষা" কাহাকে বলে এই বিষয়ে একটু অনুধাবন করিয়া দেখি-লেই, আমরা নারীজাতির রক্ষা বিষয়ে ঋষি-প্রদর্শিত পন্থার উৎকর্ষ অনুভব করিতে পারি। কোন বস্তুর রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার বস্তুত্বের রক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ যে বিশেষ বিশেষ গুণ ও ভাবগুলি লইয়া বস্তুর মৌলি-কতা, সেই বিশেষ বিশেষ গুণ ও ভাবগুলির রক্ষা করিতে হয়। বিশেষতাকে নষ্ট করিলে বস্তুর রক্ষা হয় না, বরঞ্চ নাশই হইয়া থাকে। কারণ বিশেষতাই অনেকের মধ্যে বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্বের রক্ষা করিয়া থাকে, সেইটি নষ্ট হইলে বস্তু অন্য কোন বস্তুর মধ্যে লয় হইয়া যায়, জগতে তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না।

এজন্য বস্তুত্বের রক্ষা এবং উৎকর্ষ সাধনই উন্নতির মূলমন্ত্র। নারীজাতির মৌলিকতা কি? আর্য্যশাস্ত্র পাঠ করিলে এই প্রশ্নের ভূরি ভূরি সমাধান দৃষ্টি-গোচর হয়। দেবী ভাগবতে লেখা আছে "সর্ব্বাঃ প্রকৃতি-সম্ভূতা উত্তমাধম-মধ্যমাঃ।"

উত্তম, মধ্যম, ও অধম সকলপ্রকার স্ত্রীই মহাপ্রকৃতি জগদম্বার অংশ হইতে উৎপন্ন। অতএব প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে মহাপ্রকৃতির সেই অংশটুকু নিহিত রহিয়াছে। মহাপ্রকৃতি জগন্মাতা, তিনি সমস্ত সংসারকে অমৃতময়ী স্তন্য ধারার দ্বারা প্রতিপালিত করেন। তাঁহার স্তন্যধারা সুধাকরের সুধাধারারূপে ক্ষরিত হইয়া ওষধি-সমূহকে পরিপুষ্ট করে এবং জগজ্জীবের বাসনাদীপ্ত মরুপ্রায়-হৃদয়ে শান্তিসুধা সিঞ্চন করে। তাঁহার স্তন্যধারা দিবাকরের প্রচণ্ড রশ্মিমালাকে আশ্রয় করিয়া, জগজ্জনের হৃদয়ে হৃদয়ে নিত্য নূতন প্রাণশক্তি প্রদান করে। তাঁহার স্তন্যধারা গঙ্গাযমুনার পবিত্র-ধারারূপে ভারতমাতার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করে। জগন্মাতার এই প্রাণপোষণময় মাতৃভাব অংশরূপিণী নারীজাতির মধ্যেও অবশ্যই আছে। ইহা নারীজীবনের মৌলিক বস্তু—নারীজাতির জাতীয়-জীবনের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে রক্ষা না করিলে নারীজাতির রক্ষা ও উন্নতি কদাপি হইতে পারে না। তিনি যে জগন্মাতার অংশরূপিণী তাহা তাঁহাকে শিক্ষা, দীক্ষার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে, তাঁহার হৃদয়ে ফল্গুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্ন মাতৃভাবকে ভাগীরথীর প্রবল ধারার ন্যায় পরিস্ফুট করিতে হইবে। তবেই নারীজীবনের একাংশের রক্ষা ও পরিপুষ্টি সাধন হইবে। নারীজীবনের দ্বিতীয় মৌলিকত্ব তাঁহার সতীত্বে। মহাপ্রকৃতি সতীনামে জগতে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি পতিপ্রাণা, মহেশ ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। তাঁহার চিরসহচরী অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে দেখা দেন, পতির নিন্দা তাঁহার বক্ষে শূলের মত বিদ্ধ হয়, এমন কি পিতার মুখেও পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া যোগাগ্নিতে পিতৃদত্ত-শরীরকে দগ্ধ করিয়া নবকলেবর পরিগ্রহ করেন এবং আবার অনেক তীব্র-তপস্যার ফলে পূর্ব্ব জন্মের বৃদ্ধ পতিকে প্রাপ্ত হন। সতীত্বের এই মধুময়, পরম পবিত্র ভাবটি মহাপ্রকৃতির অংশ-রূপিণী প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যেই আছে। এই বিশেষ ভাবটির রক্ষাতেই নারী-জাতিররক্ষা। এইটির নাশেই নারীজাতির নাশ। নারীজাতির শিক্ষা,

নারীজাতির প্রতিপালন, নারীজাতির উন্নতি সকলের মূলেই এই বিশেষ ভাবটি নিহিত থাকা চাই। নতুবা তিনি অন্যভাবে বিদেশীয় আদর্শে যতই শিক্ষিত হউন না কেন, মৌলিক উন্নতি তাঁহার কিছুই হইবে না। মা যেন মা হইয়াই উন্নত হন, মাতৃত্বকে তিলাঞ্জলি দিয়া উন্নত না হন; সতী যেন সতী হইয়াই উন্নত হন, সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া উন্নত না হন। ইহাই নারীজাতির রক্ষা ও উন্নতির একমাত্র মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে জাতির মধ্যে যতই চৈতন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জাতিই কালের সর্ব্বগ্রাসী প্রচণ্ডবেগকে অতিক্রম করিয়া জগতের ইতিহাসে স্বকীয় অমরনাম অঙ্কিত করিতে ততই সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে ধর্ম্মের নানাপ্রকার লক্ষণ বর্ণিত হইলেও, যে শক্তি জীব মাত্রেরই রক্ষা এবং আত্যন্তিক উন্নতি করে তাহাই এইরূপ রক্ষণভাব-মূলক ধর্ম্মের উদার লক্ষণ, আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির ধর্ম্মের মধ্যেই এ পর্য্যন্ত প্রকটিত হয় নাই। এজন্য নারীজাতিকে নিজের উদার স্বরূপ পরিজ্ঞাত করাইয়া তাহার বাল্যজীবনে সেই প্রকার শিক্ষা, তাহার যৌবন জীবনে সেই প্রকার সাধনা এবং তাহার জরাজীর্ণ জীবনে সেই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করাইবার নিমিত্ত আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি পত্রেই স্বর্ণাক্ষরে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মাতাকে জগন্মাতা হইবার শিক্ষা আর্য্যধর্ম্মই দিতে পারে। অন্য দেশে এই গূঢ়তত্ত্ব এখন পর্য্যন্ত স্বপ্নরাজ্যেও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা অন্য শাস্ত্রে স্বপ্নরাজ্যকেও আলোকিত করিতে পারে নাই, তাহা ভারতে আর্য্যজাতির জীবনের জাগ্রদ্দশাকে উদ্‌ভাসিত করিয়াছে। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে দিব্যজ্যোতির্ম্ময় সেই গূঢ়তত্ত্বেরই অবতারণা এবং রহস্যোদ্‌ভেদ করিব। করুণাময় মহর্ষিগণের কৃপাপাত্র মনীষিগণ মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখিলে আর্য্য শাস্ত্রের এই চিরন্তন মহিমার মাধুরীরাশির আস্বাদন লাভ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবেন।

নারীধর্ম্ম বিজ্ঞান।

আর্য্যশাস্ত্রে প্রকৃতিকে পরমাত্মার শক্তিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির মধ্যেই থাকে, উহা হইতে পৃথকভাবে থাকে না, সেই প্রকার পরমাত্মার শক্তিরূপিণী প্রকৃতি পরমাত্মার মধ্যেই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিণীরূপে

থাকেন। মহাপ্রলয়ের সময়ে তিনি পরমাত্মার মধ্যে বিলীন থাকেন এবং সৃষ্টির সময়ে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে প্রকটিত হইয়া তাঁহারই সহযোগে ব্রহ্মাণ্ডে নিখিল সৃষ্টির বিস্তার করেন। যথা মনুসংহিতা—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।

অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

সৃষ্টির সময়ে পরমাত্মা নিজের দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধভাগ পুরুষ এবং অর্দ্ধভাগে নারী হইলেন। এবং সেই নারীর গর্ভেই চেতনার সঞ্চার করিয়া সমস্ত বিশ্বের নির্ম্মাণ করিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও লেখা আছে যথা—সোঽণুবীক্ষ্য নাঽন্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা ঽ পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চা ঽ ভবতাম্। তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদয়মাকাশঃ। স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা একাকীই ছিলেন। এজন্য রমণ হইল না, কারণ একাকী রমণ হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির সহিত রমণ না হইলে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রয়োজন হওয়ায়, পরমাত্মাকে প্রকৃতির জন্য ইচ্ছা করিতে হইল। এরূপ সঙ্কল্পের উদয় হইবামাত্রই তাঁহার শরীর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধাঙ্গে পুরুষ এবং অর্দ্ধাঙ্গে প্রকৃতি হইল। ইহাঁরা পতি পত্নীর মত হইলেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সংসারেও এই রূপেই সৃষ্টি হয়। সমস্ত স্ত্রী প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন এবং সমস্ত পুরুষ পরমাত্মার অংশ হইতে উৎপন্ন। প্রদীপ হইতে প্রদীপজ্বালার মত আদিকারণ প্রকৃতিপুরুষ হইতেই সকল নরনারীর উৎপত্তি হইয়াছে। এজন্য অর্দ্ধচণকের ন্যায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অপূর্ণ। বিবাহের দ্বারা দুই অর্দ্ধেক মিলিত হইয়া যখন এক হয়, তখনই দম্পতি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। সংসারের বিস্তার, সৃষ্টিলীলার বিলাস সেই পূর্ণতার পথেই হইয়া থাকে। সৃষ্টি-লীলা বিস্তার করিতে করিতে যেদিন দুটী আত্মা পরস্পরের পার্থক্য ভুলিয়া একে অন্যের মধ্যে পর হইয়া যায়, সেই দিনই মুক্তি। বিবাহ এই মুক্তির পথপ্রদর্শক বলিয়া আর্য্য শাস্ত্রে পরমপবিত্র-সংস্কার রূপে পরিগণিত

হইয়াছে। লয় কে কার মধ্যে? স্বাভাবিক উত্তর এই যে, যে যাহার মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছে। আমরা শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণে দেখিয়াছি যে প্রকৃতিই পরমাত্মা হইতে নির্গত হন। যতদিন প্রকৃতি পরমাত্মার মধ্যে লীন থাকেন ততদিন পরমাত্মা নিত্য মুক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম। প্রকৃতি প্রকট ও পৃথক হইলেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃতির পতি সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর। আবার প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে লয় হইলেই তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন পুরুষ হইতে নির্গতা প্রকৃতি আবার পুরুষের মধ্যেই লয় হইয়া যাইবেন। বন্ধন দশায় প্রকৃতি পুরুষে লয় হ'ননা। পরন্তু পুরুষকে নিজের বশে আনিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন। এই ভাব নষ্ট হইয়া প্রকৃতির পুরুষে লয় সাধনই মুক্তির একমাত্র সেতু। এই বিজ্ঞানটি জগজ্জীবের জীবনে আরোপিত করিলে সহজেই সিদ্ধ হইবে যে যতদিন পরমাত্মার অংশরূপী নর, প্রকৃতির অংশরূপিনী নারীর বশীভূত থাকিবে ততদিনই তাহার বন্ধন এবং নারী নরের মধ্যে লয় হইলেই উভয়েরই মুক্তি। লয় ক্রিয়া নারীরই নৈসর্গিক কর্ত্তব্য। কারণ প্রকৃতিই পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, পুরুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হ'ন নাই। অতএব প্রকৃতির অংশস্বরূপিনী নারীজাতির ইহাই অনন্যধর্ম্ম ও একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, যাহার দ্বারা তিনি পরমাত্মার অংশস্বরূপ নিজ পতির মধ্যে লয় হইয়া যা'ন। ইহাতে পতির ও মুক্তি এবং তাঁহারও মুক্তি। ইহার বিরোধী কার্য্য তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম, কারণ উহা মুক্তির সাধক না হইয়া বাধক মাত্র হইবে। এই সকল কারণেই মহর্ষিগণ পাতিব্রত্যধর্ম্মের এত গৌরব করিয়াছেন, কারণ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মই শরীর, মন, আত্মার সকলের দ্বারা নারী-জাতিকে পতিদেবতার চরণ-কমলে তন্ময় করাইয়া অন্তে বিলীন করিয়া দেয়। এবং এইরূপেই স্ত্রীজাতি স্ত্রীযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এতদ্ব্যতিরিক্ত স্ত্রীযোনি হইতে মুক্তিলাভের আর কোনই উপায় নাই। এই হেতুই পতিসেবা-ভিন্ন স্ত্রীজাতির পক্ষে আর কোন ধর্ম্মেরই আবশ্যকতা আর্য্য শাস্ত্রে বর্ণিত হয় নাই। মনুসংহিতায় স্পষ্টই লেখা আছে—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

স্ত্রীজাতির পক্ষে অন্য কোনরূপ ব্রত, যজ্ঞ বা উপবাস করার প্রয়োজন নাই,

কেবল পতি-সেবা-রূপ মহাব্রতের দ্বারাই তিনি উন্নত লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মের অন্তিম লক্ষ্য মুক্তি হওয়ায়, আর্য্য-শাস্ত্রে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মুক্তি-সাধন বিষয়ে নানারূপ বিচার করা হইয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে পুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ-প্রধান এবং স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম তপঃ-প্রধান। ইহার কারণ কি তাহা নীচে বর্ণিত হইতেছে। সংসারে দেখা যায় যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাতে যদি স্ত্রীশক্তি প্রধান থাকে তবে কন্যা হয় এবং যদি পুরুষশক্তি প্রধান থাকে তবে পুত্র হয়। শ্রী ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।

অর্থাৎ পুরুষের শুক্র অধিক হইলে পুরুষ এবং স্ত্রীর রজঃ অধিক হইলে স্ত্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিয়মটি কেবল নরনারীর মধ্যেই নহে কিন্তু সৃষ্টির সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ইহার হেতু এই যে পরমাত্মা ও প্রকৃতির সহ-যোগে যখন আদি সৃষ্টির প্রারম্ভ হয় তখনই দুই ভাবে দুইটি সৃষ্টি-ধারা প্রারম্ভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ মনুর প্রমাণানুসারে যখন সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম নিজের দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গে পুরুষ এবং অর্দ্ধাঙ্গে স্ত্রী হন, এবং উভয়ে মিলিত হইয়া সৃষ্টি করেন তখন একটী ধারায় পুরুষ-শক্তির প্রাধান্য-হেতু পুরুষ জীবই উৎপন্ন হইতে থাকে এবং আর একটি ধারায় প্রকৃতি শক্তির প্রাধান্য হেতু স্ত্রী জীবই উৎপন্ন হইতে থাকে। মনুষ্য যোনি প্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রত্যেক জীবকে চুরাশিলক্ষযোনি ভ্রমন করিতে হয়। অর্থাৎ ২০ লক্ষ বার বৃক্ষযোনি ১১ লক্ষ বার স্বেদজ কীটযোনি, ১৯ লক্ষ বার অণ্ডজ-যোনি এবং ৩৪ লক্ষবার জরায়ুজ যোনি অতিক্রম করিবার পর তবে জীব মনুষ্য যোনি লাভ করিতে পারে। মনুষ্যেতর যোনিসমূহে কর্ম্মস্বাতন্ত্র্য না থাকায় প্রকৃতির একই নিয়মে সৃষ্টি কার্য্য চলিয়া থাকে। এজন্য প্রকৃতিপুরুষের উল্লিখিত দুইটি ধারাকে আশ্রয় করিয়া যে সকল জীব মনুষ্যযোনির দিকে অগ্রসর হয়, প্রাকৃতিক নিয়মের অনন্যতা-হেতু তাহারা একইভাবে অগ্রসর হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৃক্ষযোনিতে যে জীব পুরুষ ধারায় পতিত হয় সে ৮৪ লক্ষ-যোনি পুরুষধারাকেই অবলম্বন করিয়া অন্তে মনুষ্যযোনিতে আসিয়াও প্রথমতঃ পুরুষ জীবই হইয়া

থাকে।* এবং বৃক্ষযোনিতেই যে জীব স্ত্রীধারায় পতিত হয় সে ৮৪ লক্ষযোনি স্ত্রীধারাকেই অবলম্বন করিয়া অ:স্ত মনুষ্যযোনিতে আসিয়াও প্রথমতঃ স্ত্রীজীবই হইয়া থাকে। মনুষ্যযোনিতে আসিবার পর জীব -কর্ম্মস্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং সেই সময়েই স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মুক্তির জন্য প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। এই মুক্তি স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে কিভাবে সিদ্ধ হইতে পারে তাহাই বিচার্য্য। শ্রুতি বলিয়াছেন 'ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ।' অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভ হয় না। পরমাত্মা জ্ঞানময়, এজন্য পরমাত্মার অধিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পুরুষধারায় যে জীব অগ্রসর হয় এবং অন্তে পুরুষ যোনি প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যে স্বভাবতঃই জ্ঞান-শক্তির আধিক্য থাকে। কিন্তু প্রকৃতি তমোময়ী, এজন্য প্রকৃতির অধিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীধারায় যে জীব অগ্রসর হয় এবং অন্তে স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় তাহার মধ্যে স্বভাবতঃই জ্ঞানশক্তির ন্যূনতা এবং অজ্ঞান শক্তির আধিক্য থাকে। অতএব সিদ্ধ হইল যে পুরুষ জ্ঞানময় এবং স্ত্রী অজ্ঞানময়ী। পুরুষের মধ্যে নৈস-র্গিকরূপে জ্ঞানের বীজ আছে এবং স্ত্রী জাতির মধ্যে নৈসর্গিক রূপে অজ্ঞানের বীজ আছে। জ্ঞানময় পরমাত্মাকে জ্ঞানের দ্বারাই পাওয়া যায়। এবং তাঁহাকে পাইলেই জীবের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে॥ পুরুষ স্বভাবতঃই জ্ঞানময়, অজ্ঞান-ময়ী প্রকৃতির আবরণে সেই পুরুষ নিজের জ্ঞানময়-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকে। এজন্য পুরুষের মুক্তি তখনই সম্ভব হইবে যখন পুরুষ তাহার জ্ঞানাবরণী অজ্ঞান-ময়ী প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে নিজের জ্ঞানময় চিন্ময় ব্রহ্ম স্বরূপ জানিতে পারিবে। সে যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া যখন দেখিবে যে সে মায়াময় জীব নহে, পরন্তু মায়াতীত চিন্ময় নিত্যানন্দময় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্ম, তখনই অনাদিকালসম্ভূত মায়ার আবরণ অপসারিত হইয়া তাহার মুক্তি পদে প্রতিষ্ঠালাভ হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে পুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ-প্রধান। অর্থাৎ বৈরাগ্যের বলে মায়ার রাজ্যকে ত্যাগ করিয়াই পুরুষ মুক্ত হইতে পারে। এখন স্ত্রীর ধর্ম্ম কি, তাহা দেখা যাউক। মুক্তি জ্ঞানের দ্বারা হয়, একারণ জ্ঞান-প্রধান পুরুষ যেরূপ অজ্ঞানময়ী প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইতে পারে, অজ্ঞান-প্রধান নারীর পক্ষে জ্ঞান-প্রধান পুরুষকে ত্যাগ করিয়া সেরূপ ভাবে মুক্তি হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান অজ্ঞানকে ছাড়িয়া জ্ঞানময় হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানকে ছাড়িলে অজ্ঞানময় ও অপূর্ণই

থাকিবে, পূর্ণ অথবা জ্ঞানময় হইতে পারিবে না। অজ্ঞান, জ্ঞানকে ছাড়িয়া জ্ঞানময় হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে নিজের আত্মাকে বিলীন করিয়া জ্ঞানময় হইতে পারে। অতএব অজ্ঞানময়ী প্রকৃতির পক্ষে জ্ঞানময় পুরুষে বিলীন হওয়াই মুক্তির একমাত্র হেতু হইবে, জ্ঞানময় পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র হওয়া অথবা তাহাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে মুক্তির হেতু হইতে পারিবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে প্রকৃতির অংশরূপিনী স্ত্রীজাতি পতিকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইতে পারে না, পরন্তু পাতিব্রত্যের পূর্ণানুষ্ঠান দ্বারা শরীর, মন, প্রাণ, ও আত্মা সকলই পতিদেবতার মধ্যে বিলীন করিয়া তবে স্ত্রীযোনি হইতে মুক্ত হইতে পারে। এইরূপে শরীর, মন, প্রাণ এবং আত্মাকে সংযত করত, সংসারের অন্য সমস্ত আকর্ষণ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া কেবল পতি-দেবতার চরণ কমলে বিলীন করিয়া দেওয়া পরমতপঃ সাধ্য। এজন্যই নারী-ধর্ম্মকে তপঃ-প্রধান বলা হইয়াছে। তপস্বিনী না হইলে নারী নিজের ধর্ম্মপ্রতি পালন করিতে পারেন না এবং পতিদেবতায় তন্ময়তা দ্বারা স্ত্রীযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিতে ও পারেন না। মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রে এজন্যই পাতিব্রত্য ধর্ম্মবর্ণন প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে—

> বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
> উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
> পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
> পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥
> ভুঙ্‌ক্তে ভূক্তেঽথ যা পত্যৌ দুঃখিতে দুঃখিতা চ যা।
> মুদিতে মুদিতাত্যর্থং প্রোষিতে মলিনাম্বরা॥
> সুপ্তে পত্যৌ চ যা শেতে পূর্ব্বমেব প্রবুধ্যতে।
> নান্যং কাময়তে চিত্তে সা বিজ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

পতি যদি গুণহীন, অসৎ স্বভাব বা দুঃশীল হ'ন, তথাপি সতী স্ত্রীর তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করা উচিত। পতি জীবিত হউন বা মৃত হউন, যে সতী স্ত্রী পতিলোক বাস ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে পতির অপ্রিয় আচরণ কদাপি বিধেয় নহে। যে স্ত্রী পতির ভোজনের পর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করেন, পতির দুঃখে দুঃখিতা এবং আনন্দে আনন্দিতা হন, পতি প্রবাসে গেলে মলিনা-

ম্বয় ধারণ করেন, তাঁহার শয়নের পর শয়ন করেন, গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করেন এবং নিজ পতি ভিন্ন আর কাহারও আকাঙ্খা করেন না, তাঁহাকেই পতিব্রতা বলে। এইভাবে পাতিব্রত্যধর্ম্মের পূর্ণানুষ্ঠান দ্বারা পতি-দেবতায় তন্ময় হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে মরণান্তে সতী স্ত্রীর পতিলোক প্রাপ্তি হয়। পতিলোক উর্দ্ধ পঞ্চমলোক অর্থাৎ জন লোকের অন্তর্গত। এই লোকে তিনি অনেকবর্ষ পর্য্যন্ত নিজ পতির সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন যথা পরাশর সংহিতায়:—

তিস্রঃ কেট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

পতির অনুগামিনী সতী স্ত্রী পতিলোকে মনুষ্য শরীরে যত রোম আছে ততদিন অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি দিন পতির সহিত আনন্দে নিবাস করিয়া থাকেন। যদি তাঁহার পতি নিজ মন্দ প্রাক্তনানুসারে অধোলোকপ্রাপ্ত বা নরকস্থ হ'ন তবে তাঁহার সহিত পতিলোকবাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পরাশর হারীত ও দক্ষ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কৃতঘ্নং বাপিমানবম্।
যমাদায় মৃতা নারী তং ভর্ত্তারং পূনাতি সা॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥

পতি যদি ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী অথবা কৃতঘ্ন হ'ন, তথাপি পতির-অনুগামিনী সতী নিজের তপোবলে পতির উদ্ধার করিতে পারেন। যেরূপ সর্পবশকারি-গণ বিবর হইতে বলপূর্ব্বক সর্পকে আকর্ষণ করিয়া লয়, সেই প্রকার সতী স্ত্রীও নিজতপোবলে পতিত পতির উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত পতিলোকে আনন্দ-লাভ করেন। এই ভাবে বহুবর্ষপর্য্যন্ত সতীলোকে বাস করার পর যখন সুকৃতির ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সেই সতী আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন আর তাঁহাকে স্ত্রীদেহ ধারণ করিয়া সংসারে আসিতে হয় না। কারণ যেরূপ তৈলপায়ী কীট ভ্রমর-কীটের চিন্তা করিতে করিতে উহাতেই তন্ময় হইয়া ভ্রমর কীট হইয়া যায়, সেই প্রকার পতিদেবতার চিন্তা করিতে করিতে পতিদেবতাতেই তন্ময় হইয়া সতী স্ত্রী নিজের স্ত্রীসত্তাবর্জ্জিত

হইয়া যান। তাঁহার স্ত্রীযোনিপ্রাপ্তির কারণ পুরুষেই বিলীন হইয়া যায় এবং তিনি পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আসেন। তাঁহার তীব্র ধারণা শক্তি—যে শক্তির বলে তিনি পতিদেবতায় তন্ময় হইয়া ছিলেন তাঁহাকে উত্তম জ্ঞানির বংশে জন্মদান করিয়া থাকে। এবং এই অত্যুন্নত জ্ঞানাধিকার লাভ করিয়া জ্ঞানপ্রদ পুরুষশরীরে তিনি শীঘ্রই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। এইরূপে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পূর্ণানুষ্ঠান দ্বারা স্ত্রীযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জ্ঞানময় পুরুষ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সতী মুক্তিপদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অতএব দেখা গেল যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনন্য অনুষ্ঠান ব্যতীত নারি জাতির নিঃশ্রেয়স্ লাভের আর কোনই উপায় নাই। এইজন্যই মহর্ষিগণ নারীজাতির পক্ষে পাতিব্রত্যধর্ম্মের একান্ত অনুষ্ঠানের আদেশ করিয়াছেন।

সপ্তসতীর প্রমাণ দিয়া ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সমস্ত স্ত্রী মহাপ্রকৃতির অংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন।

দেবী ভাগবতেও লেখা আছে—

যা যাশ্চ গ্রামদেব্যঃ স্যুস্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
কলাংশাংশসমুদ্ভূতা প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।

গ্রাম্য-দেবীগণ প্রকৃতির কলা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন এবং প্রতিব্রহ্মাণ্ডস্থিতা নারীগণ মহাপ্রকৃতির কলারই অংশাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাবই আছে। যথা দেবীভগবতে—

বিদ্যাহবিদ্যেতি তস্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব!
বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্ব্বধ্যতেহবিদ্যয়া পুনঃ॥

প্রকৃতির বিদ্যা ও আবিদ্যা এই দুই রূপ। বিদ্যার দ্বারা জীবের মুক্তি এবং অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি প্রকৃতির অংশরূপিনী হওয়ায় প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যেই বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ভাবই বিদ্যমান আছে। বিদ্যা সত্ত্বগুণময়ী এবং অবিদ্যা তমোগুণময়ী। বিদ্যাভাবের পুষ্টি হইলে নারী সাক্ষাৎ জগদম্বারূপ হইতে পারেন এবং অবিদ্যাভাবের বৃদ্ধিতে তিনি নরকের কীট হইয়া সমস্ত সংসারকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিতে পারেন। দেবীভাগবতে লেখা আছে—

সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমাঃ জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ।

অধমা স্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ ॥
দুর্ম্মুখাঃ কুলঘ্না ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাং গণাঃ ॥

প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্না বিদ্যাভাবময়ী নারীগণ উত্তমা স্ত্রী হইয়া থাকেন। তাঁহারা সুশীলা এবং পতিব্রতা হ'ন। প্রকৃতির তামসাংশ হইতে উৎপন্না স্ত্রীগণ অধমকোটির অন্তর্গত। তাঁহারা অজ্ঞাতকুলজাতা, দুর্ম্মুখা, কুল-ঘাতিনী, ধূর্ত্তা স্বতন্ত্রা এবং কলহপ্রিয়া হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে বেশ্যা-গণ এবং স্বর্গে অপ্সরাগণ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্তা। অতএব ধর্ম্মের লক্ষ্য ইহাই হওয়া উচিত যাহাতে নারীজাতির মধ্যে বিদ্যাভাবের বিকাশ হইয়া স্ত্রী সাক্ষাৎ জগদম্বা হইতে পারেন এবং তাঁহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবিদ্যাভাবের আদৌ উন্মেষ না হইতে পারে॥ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের পূর্ণ পরিপালনের দ্বারাই নারীজাতি অন্তর্নিহিত অবিদ্যাভাবকে বিদূরিত করিয়া বিদ্যাভাবের পূর্ণোৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন। ইহাতে তিনিও নিজযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিঃশ্রে-য়স পদের অধিকারিনী হইতে পারেন এবং পতি, পুত্র পরিবার সকলেরই মুক্তির পথে সহযোগিনী হইতে পারেন। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ নারী জীবনের প্রতিস্তরের উন্নতি-সাধনার্থ পাতিব্রত্য-মূলক ধর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই নারীধর্ম্মের মহর্ষিপরিদৃষ্ট গম্ভীর সত্য-সুধাময় গূঢ়-বিজ্ঞান। পিতা, মাতা, পতি, সকলেরই এই গূঢ়-বিজ্ঞানের মর্ম্মোপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক নারীর জীবনে সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত যাহাতে এই গূঢ়-বিজ্ঞানই সার্থক্যলাভ করিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত।

নারীজীবন।

কন্যাকাল।

নারীজীবনকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে যথা :— কন্যা, গৃহিণী ও বিধবা। নারীধর্ম্মের বিজ্ঞানানুসারে এই তিন অবস্থাতেই নারী-জীবনকে এরূপভাবে গঠিত করা উচিত, যাহাতে নারী পূর্ণনারী হইয়া অনায়াসে মুক্তি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। পাতিব্রত্যই নারীজীবনকে সার্থক করিবার একমাত্র উপায়ীভূত হওয়ায় কন্যাবস্থায় পাতিব্রত্য-মূলক শিক্ষা গৃহিণী অবস্থায় পাতিব্রত্য ধর্ম্মের চরিতার্থতা এবং অদৃষ্টানুসার-প্রাপ্ত বৈধব্যাবস্থায় পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের চরম পরীক্ষা হইয়া থাকে। নিম্নে ক্রমশঃ এই অবস্থাত্রয়ের বিষয়ে বিচারপূর্ণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমূহ উপস্থাপিত করা হইতেছে।

কন্যাকাল কতদিন এই বিষয়ে আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে

যাবন্ন লজ্জিতাঙ্গানি কন্যা পুরুষসন্নিধৌ।
যোন্যাদীনি নগুহ্যেত তাবদ্ভবতি কণ্যকা॥
যাবচ্চৈলং ন গৃহ্লাতি যাবৎ ক্রীড়তি পাংশুভিঃ।
যাবদ্দোষং ন জানাতি তাবদ্ভবতি কন্যকা॥

যত দিন পর্য্যন্ত পুরুষের সম্মুখে লজ্জিতা হইয়া কন্যা নিজের শরীরের গুপ্তাবয়বগুলি আচ্ছাদিত না করে ততদিন তাহার কন্যাকাল বুঝিতে হইবে। যতদিন সে লজ্জায় বস্ত্র পরিধান না করে, ধুলা-খেলা করিয়া বেড়ায় এবং কোনরূপ দোষও না জানে ততদিন তাহার কন্যাকাল থাকে। এই কন্যাবস্থায় পিতা-মাতার উচিত যে তাঁহারা নিজ দুহিতাকে এরূপভাবে শিক্ষাদান করেন যাহাতে সে ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শসতী, স্নেহময়ী-মাতা এবং সর্ব্ব গুণান্বিতা গৃহিণী হইতে পারে। আর্য্য শাস্ত্রে—

"কন্যাহেপ্যবং পালনীয়া শিক্ষনীয়া হ তি যত্নতঃ

এরূপ আদেশের দ্বারা কন্যাশিক্ষার নিমিত্তই উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। আরও দেখা যায়—

যদি কুলোন্নয়নে সরসং মনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।

যদি নিজত্বমভীপ্সিতমেকদা,
কুরু সুতাং শ্রুতশীলবতীং তদা ॥

যাঁহারা বংশ গৌরব, গার্হস্থ্যসুখ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিলাষ রাখেন, নিজ দুহিতাকে বিদ্যা ও শীলবতী করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শিক্ষা কি প্রণালীতে কিরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া উচিত, তাহা বর্ত্তমান হিন্দুজগতে একটী বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে বিদেশীয় মহিলাজীবনের অনুকরণে জাতীয় স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর বিস্তার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আবার অনেকে আর্য্য মহিলাদের প্রাচীন আদর্শ অনুসারেই শিক্ষা প্রদান করাকে গার্হস্থ্য-শান্তির একমাত্র কারণ মনে করেন। এইরূপ মতদ্বৈধের ফলে দেশে নানারূপ অশান্তির উদয় হইয়াছে। অনেকে বিজাতীয় অনুকরণের কুপরিণাম দেখিয়া কিং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও হইতেছেন। অতএব আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রীজীবনের প্রাথমিক-গঠন সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায় নিম্নে তাহারই সংক্ষেপে বিচার করা হইতেছে।

শিক্ষার আদর্শ।

স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত শিক্ষার লক্ষ্যের উপর একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে মৌলিক সত্তা আছে, সেইটীকে পরিস্ফুট এবং পূর্ণ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। যেমন কোন বীজকে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে, নূতন কিছুই করিতে হয় না, কেবল বীজ-মধ্যগত মৌলিক উপাদান গুলিকে রস, বায়ু ও সৌর কিরণ সঞ্চারের দ্বারা পরিস্ফুট ও পূর্ণ করিতে হয় এবং তাহা হইলে বীজের পরিণামে বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ শিক্ষা কার্য্যে ও যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় সে কে, কিরূপ, তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত বা জাতিগত মৌলিকতা বা বিশেষত্ব কি আছে, এইগুলি ধীরভাবে নির্ণয় করিয়া, পূর্ণ বিকাশ করিতে পারিলেই, শিক্ষাকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কোন বিজাতীয় মৌলিকতার সংযোগে স্বজাতীয়-শিক্ষা সফল হইতে পারে না। অশ্বকে শিক্ষা দিতে হইলে, তাহার শরীরগত অশ্বত্বেরই পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হয়। অশ্বত্বের মধ্যে সিংহত্বের সমাবেশেও অশ্বত্ব পূর্ণ হয় না অথবা গর্দ্দভত্বের

সমাবেশেও অশ্বত্বের নাম সার্থক হয় না। অশ্বজাতির মধ্যে যে মৌলিক উপাদানগুলি আছে সেই গুলিকে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিতে পারিলেই অশ্বকে পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়। বটবীজের উন্নতি বটবৃক্ষ হইয়াই হইতে পারে। আম্রবৃক্ষ বা অশ্বত্থ বৃক্ষ হইয়া হইতে পারে না। যদি কোন কারণে বটের বীজ হইতে অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং তাহা উৎপদ্যমান বটবৃক্ষ হইতে অনেকাংশে বৃহৎ ও উত্তম হয় তথাপি ঐ উন্নতি প্রশংসনীয় বা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কারণ উহার দ্বারা বটবীজের কোনই উন্নতি হইলনা, প্রত্যুত উহার নাশই হইল যদি শিক্ষার লক্ষ্য উন্নতি তবে যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার মধ্যে মৌলিকসত্তা কি আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই বিচার করা উচিত। এইরূপ বিচার করিয়া মৌলিক-সত্তাকে পরিস্ফুট ও পূর্ণ ভাবে বিকশিত করিবার জন্যই শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারণ করা উচিত। সমস্ত সংসার প্রকৃতি-পুরুষাত্মক বলিয়া প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে পুরুষত্বের মৌলিক সত্তা বা উপাদান এবং প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃতির সত্তার উপাদানকে পরিস্ফুট করাই পুরুষ ও নারীজাতির শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। দুইটি উপাদান মৌলিক বিভিন্নতা হেতু একরূপ নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অতএব শিক্ষার আদর্শ এবং শিক্ষাপ্রণালীও স্ত্রীপুরুষের জন্য একরূপ হইতে পারে না। পুরুষকে পূর্ণ পুরুষ করা পুরুষ শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত এবং নারীকে পূর্ণনারী করা স্ত্রী শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্ত্রীকে পুরুষপ্রকৃতি করা অথবা পুরুষকে স্ত্রী প্রকৃতি করা শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। কারণ এরূপ চেষ্টা অপ্রাকৃতিক হওয়ায় অধর্ম্মমূলক এবং অসম্ভব হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রী-শিক্ষার এইরূপই পদ্ধতি হওয়া উচিত যাহাতে স্ত্রীজাতির মধ্যে স্ত্রী-সুলভ যে মনোরম উপাদানগুলি আছে সেইগুলি পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেগুলিকে কুণ্ঠিত করা বিদ্যা নহে—অবিদ্যা মাত্র, শিক্ষা নহে—কুশিক্ষা মাত্র। এরূপ কুশিক্ষার দ্বারা স্ত্রীজাতির কোনই কল্যাণ হয়না, প্রত্যুত তাঁহাদের স্ত্রীজীবনের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। তাঁহার মধ্যে মাতৃত্বের উপাদান আছে এজন্য শিক্ষার ফলে তিনি যেন স্নেহময়ী জননী হইতে পারেন, তাঁহার মধ্যে সতীত্বের উপাদান আছে অতএব শিক্ষার মধুর পরিণামে তিনি যেন পাতিব্রত্যের তেজে দিগন্ত আলোকিত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার

মধ্যে গৃহিণীপনার উপাদান আছে, অতএব তিনি যেন সুশিক্ষার ফলে চতুরা গৃহিণী হইতে শিখেন। এই সকল হইলেই তাঁহার নারীজীবনের মহাব্রতের উদ্‌যোপন হইবে, তাঁহার জন্মধারণ সার্থক হইবে। অন্যথা মাতাকে পিতা করিতে চেষ্টা অথবা স্ত্রীকে পুরুষ করিতে চেষ্টা করিলে এই বিষময় পরিণাম হইবে যে তাঁহার মধ্যে পিতৃত্বের উপাদান না থাকায় তিনি পিতা ত হইতে পারিবেনই না, অধিকন্তু মাতৃত্বের সুকোমল ভাবগুলিও হারাইয়া "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট" হইয়া যাইবেন। তাঁহার হৃদয়ের পূত-সলিলা ভাগীরথী শুষ্ক হইয়া শাহারার মরুভূমির দারুণ দৃশ্য উপস্থিত করিবে। ইহাতে সংসারের সমস্ত শান্তি সমূলে নাশ-প্রাপ্ত হইবে, দাম্পত্য-প্রেমের লহরীলালার একেবারে অবসান হইয়া গার্হস্থ্যজীবনে কঠোরতা, নিঃস্নেহতা, অশান্তি ও অপ্রেমের দগ্ধকঙ্করবাহী দগ্ধ-পবন প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যদি স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন, কিন্তু জননী, গৃহিণী ও সোহাগিনী সতীর পবিত্র ভাবগুলি হইতে বঞ্চিতা হন, তাহা হইলে তাঁহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রকৃত ফল কি হইল? জীবনের কঠোর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া, ব্যবহারিক জগতের সামান্য পরীক্ষার উপাধিলাভ, কেবল উপাধিভিন্ন আর কিছুই নহে। এজন্য শিক্ষাবিভাগের কার্য্যকর্ত্তৃগণের সর্ব্বদা এবিষয়ে সাবধান থাকা উচিত যে কুশিক্ষা প্রদানের ফলে নারীজীবনের মৌলিক বৃত্তিগুলি তাঁহারা যেন নষ্ট না করেন।

নারীজীবনে স্বতন্ত্রতা

শ্রীভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

'অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রো ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বদা অস্বতন্ত্র রাখাই পুরুষের উচিত। উহাদিগকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজের বশে রাখা কর্ত্তব্য। বাল্যজীবনে স্ত্রী পিতার অধীনে থাকিবে, যৌবন সময়ে পতির অধীনে থাকিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকিবে এইরূপে কোন সময়েই স্ত্রীকে স্বতন্ত্রতা দেওয়া উচিত নহে।

জীবে দয়া।

প্রেমে টলমল চরণ যুগল
ভাবের আবেশে বিবশ হ'য়ে।
চলিয়াছে গোরা প্রেমে মাতোয়ারা
প্রেমের পাগল ভকত লয়ে॥
পথে ছিল মাধা কলসীর আধা
ছুড়িল মদের নেশার ঘোরে।
কাটিল কপাল হাসিয়া দয়াল
রকতের ধারা ধরিল করে॥
ভকতের দল রোষে কলকল
করিয়া ছুটিল মারিতে তায়।
নিবারিয়া হরি সবে আঁখি ঠারি
মধুর বচনে ক'ন সবায়॥
অসাধু যেজন হীন আচরণ
তাহারই পক্ষে শোভিত হয়।
তাহা দেখি কেন সাধু মহাজন
নিজ আচরণ ছাড়িয়া রয়॥
পরের অহিত করয়ে সতত
স্বভাবের বশে অসাধুজন।
সাধুজন রীতি জীবে দয়াপ্রীতি
বিলাও ভকতি পরমধন॥
প্রেমে ছলছল নয়ন সজল
কাঁদিলা আবেগে প্রেমিকবর।
হৃদয় উপরে ধরিয়া মাধারে
লুঠিয়া পড়িল ধরণীপর॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী।

শ্রীগুরু-চরণে।

ওই জটাজুটধারি-বিমল-মূরতি হেরি
ভকতিতে পূর্ণ এ হৃদয়,
সমস্ত হৃদয় দিয়া নমি গুরো বার বার
তব পদে দাও গো আশ্রয়।
বিমল জ্ঞানের জ্যোতি প্রশান্ত আননে তব
ভাতিছে নিয়ত পুণ্যবান ?
অভিনব শক্তি কত অন্তরে জাগায়ে তুলি
ফুটাও হৃদয়ে কত ভাব সুমহান।
কি মাধুর্য্যে কি মহত্ত্বে পরিপূর্ণ তুমি যে গো
কি বলিব ওহে যোগিবর ?
প্রকাশিব হেন শক্তি কি আছে আমার দেব ?—
আমি দীন অধম পামর !
কেবল পিপাসা আছে জানিবার বুঝিবার
নরদেহে দেবত্ব তোমার,
মরমে বাসনা জাগে চরণের ধূলি হ'য়ে
ও চরণে থাকি অনিবার।
ধূলার শরীর মোর ধূলায় মিশায়ে রব
ভুলে যাব আমিত্ব আমার,
তুমি অকূলের কূল তোমা বিনা নিরাশ্রয়
এ সংসার অকূল পাথার।
অসহায় বলহীন তাই আমি চেয়ে আছি
ও চরণে আকুল পরাণে,
কৃপা করি শক্তিহীনে দাও গো শকতি দেব
আলো দাও মোহান্ধ নয়নে।

যেমন দুর্গম বনে সহসা প্রবেশ করি
বাহিরিতে পারে না মানব—
যে দিকেতে যায় পথ কণ্টকে আবৃত হেরি
বুদ্ধি তার মানে পরাভব ;
শ্যামল-পল্লবে নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিয়া ঘন
ছেয়ে থাকে কত তরুবর,
বাহু প্রসারিয়া যেন বহে পথ আগুলিয়া
যেন ইচ্ছা গতি রোধিবার,
তেমনি সংসার ঘোর গহন কানন সম
আচ্ছাদিত মায়ার ছায়ায়,
প্রবেশ করিলে সেথা ছিন্ন করি মায়াজাল
মানবের মুক্ত হওয়া দায়।
ঊর্ণনাভ জাল পাতে মরিবার তরে তায়
ডেকে আনে মৃত্যু আপনার,
জানেনা স্বকৃত-জালে আবদ্ধ হইয়া পরে
ঘটাইবে বিনাশ তাহার।
মায়ার শৃঙ্খল মাঝে আবদ্ধ হইয়া সবে
আনি মোরা মোহ অন্ধকার,
পড়ি সে মোহের ঘোরে আত্মহারা হয়ে যাই
ভেসে যাই প্রবাহে তাহার।
স্বশক্তিতে শক্তিমান মানব যে হয় সেই
ছিন্ন করি এ মায়া বন্ধন,
সাধিয়া জীবন-ব্রত চলে যায় লক্ষ্যপথে
শত বাধা করিয়া মোচন।
কিন্তু যে দুর্ব্বল দেব দৈব শক্তি ভিন্ন আর
উঠিবার কি আছে তাহার ?
তোমার করুণা পেয়ে লভে শান্তি চিরতরে
খুলে যায় মর্ম্মের দুয়ার।

নিদ্রিত শকতি যত মহা শক্তিমান তুমি,
জাগরিত, উদ্দীপিত কর মানবের,
জীবনের গতি দেব ফিরাও করুণা করি
পাপী তাপী দীন সন্তানের ।
সুপবিত্র কর তব রাখ দেব শিরোপরি
সন্তানের হরিতে যাতনা,
তাপিতের প্রাণে ঢালো সুশীতল শান্তিবারি
শোকাতুরে দাও গো সান্ত্বনা ।
এসংসার দাব-দগ্ধ মানব ছুটিয়া যায়
লভিবারে শান্তি অনুপম,
প্রমত্ত চিত্তের গতি ফিরায় সে আপনার
দূরে যায় সকল বিভ্রম ।
কি মহা সাধনাবলে দেবত্ব লভিয়া প্রভো
খুলিয়াছ মুক্তির দুয়ার ।
শান্তিহীন মানবেরে ডুবাতে শান্তির নীরে ;
হৃদি তব স্নেহ-পারাবার ।
শান্তির ছায়ায় স্নিগ্ধ পবিত্র আলয় তব
চির শান্তি উথলে তথায়,
নাহি সেথা শোক তাপ নাহি সেথা হৃদিব্যথা
সকলি গো চির শান্তিময় ।
নাহি সেথা হিংসা দ্বেষ, নাহি মান অপমান,
শান্তি সেথা বিরাজে তথায়,
নাহি সেথা পাপচিন্তা নাহি রাগ অভিমান
প্রেমনদী বহিছে তথায় ।
নাহি সেথা ভেদজ্ঞান নাহি উচ্চ নীচ ভাব
দেবভাবে মগ্ন সব প্রাণ,
মনের বিকার যত ঘুচে গো সেথায় গেলে
এমনি সে পুণ্যময় স্থান ।

কি যে শান্তি লভে তথা সবে ফুল্লমনে
দুঃখ জ্বালা না রহে সেথায়,
শান্তিময়ী মূরতিতে প্রকৃতি জননী যেন
নিশিদিন বিরাজে তথায়।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায় সে পবিত্র স্থানে গেলে
এমনি সে শান্তির আলয়,
শুধু শান্তি—শুধু শান্তি—উথলায় প্রাণে সদা
সে পবিত্র পুণ্যের ছায়ায়।
যারা আছে পাপী তাপী এস ছুটে এস সবে
প্রাণারাম শান্তি নিকেতনে,
সেথা গেলে দুঃখতাপ সকলি যাইবে দূরে
পাবে শান্তি জীবনে মরণে।

শ্রীমতী সু——

আর্য্যমহিলা-মহাবিদ্যালয়।

যেদিন আর্য্যজাতির মধ্যে আর্য্যজনোচিত আচারপালন এবং ধর্ম্ম-মর্য্যাদা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান দেশকালানুসারিনী শিক্ষার বহুল প্রচার হইবে সেই দিনই আর্য্যজাতির প্রকৃত উন্নতি, বিশেষত্ব ও মহত্বরক্ষা এবং অপরাপর সর্ব্ববিধ কল্যাণ সম্ভবপর হইবে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতির মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মভাবরহিত শিক্ষার বিস্তার হইতেছে এবং তাহা হইতে হিন্দুজাতির যেরূপ অসম্ভাবিত অকল্যাণ সাধিত হইতেছে—রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেই কিছু না কিছু তাহা অনুভব করিতেছেন। ধর্ম্মহীন-শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা হিন্দুসমাজের তত শীঘ্র অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে না, আর্য্যমহিলাগণের মধ্যে উক্তরূপ শিক্ষার বিষময় ফল যত শীঘ্র সংক্রমিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-প্রাণ আর্য্যজাতির শরীরে আর্য্যমহিলা প্রাণরূপিণী। এইজন্য যদি আর্য্যমহিলাগণ আচার-ভ্রষ্ট ধর্ম্মহীন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের যে সমধিক অমঙ্গল সংসাধিত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। প্রতিকূল পবন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। অতএব এই

ঘোর দুর্দ্দিনে যাহাতে আর্য্যমহিলাগণের মধ্যে ধর্ম্মানুকুল শিক্ষার অত্যধিক প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য।

আজকাল যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কন্যা-পাঠশালা ও বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি নানারূপ শিক্ষালয় স্থাপন করিতেছেন, অথবা স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াসী, তাঁহারা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে সুশিক্ষিতা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী এবং সুযোগ্যা অধ্যাপিকা বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ দুর্ঘট। যদিও আমাদের মাননীয় প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট সুযোগ্যা অধ্যাপিকা প্রস্তুত করিবার জন্য সমধিক চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা হইতে এই অভাবের কিয়দংশ পূর্ণ হওয়াও সম্ভব, তথাপি যতদিন পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মানুকুল ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিতা অধ্যাপিকা প্রস্তুত করা না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির প্রকৃত অভাব দূরীভূত হওয়া কল্পনাতীত।

হিন্দুসমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব যেরূপ প্রবল হইতে প্রবলতর বেগ ধারণ করিতেছে এবং তদনুসারে স্ত্রীস্বাধীনতার বেগ যেরূপ দিন প্রতিদিন বর্দ্ধিষ্ণু হইতে চলিয়াছে তাহাতে একেবারে তাহার গতিরোধ করা মানবীয় ক্ষুদ্রশক্তির পক্ষে অসম্ভব। বরঞ্চ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রথা প্রচলিত আছে, যাহা দ্বারা হিন্দুসমাজে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল সম্ভবপর নহে; সেই সমস্ত প্রথার সহায়তা লইতেও ক্ষতি নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য "স্ত্রী-মিশন" (Mission) এর রীতি অনুসারে যদি ধর্ম্মোপদেশিকাগণকে সুশিক্ষিত করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে বিরুদ্ধধর্ম্মিগণের আক্রমণ হইতে আর্য্যজাতি এবং আর্য্যগণের গৃহ যে কেবল সুরক্ষিত হইবে তাহা নহে তদপেক্ষা নানারূপ সুফলও লাভ হইতে পারে। আর্য্যমহিলা ও আর্য্যবালিকাগণ অন্তঃপুরে থাকিয়াই নিজ নিজ ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণা হইতে পারিবেন। অতএব যেরূপ সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন, তদনুরূপ ধর্ম্মোপদেশিকা প্রস্তুত করিবারও বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয়।

আজকাল এরূপ এক কুপ্রথা চলিতে আরম্ভ হইয়াছে যে বালকবালিকাগণকে রক্ষা করিবার জন্য, লালন পালন করিবার জন্য, প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সর্ব্বত্রই প্রায় বিদেশীয় শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। ইয়ুরোপীয় বিদ্যাশিক্ষিতা

অন্য জাতীয় শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ধনবান এবং রাজা মহারাজাগণের বালকবালিকাগণের পক্ষে শিক্ষা বা অন্যান্য বিষয়ে নানারূপ সুবিধা হয় বটে, কিন্তু যদি বাল্যাবস্থায় হিন্দু বালকবালিকাগণকে সৎশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্র' দ্বারা লালন পালন করান হয়. তাহা হইলে তদপেক্ষা আরও অনেক সুবিধা হওয়া সম্ভব। এইরূপ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী যদি ধর্ম্মশিক্ষা, মাতৃভাষাশিক্ষা, রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষা ও বালকবালিকাগণের লালনপালনোপযোগিনী বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা, সাধারণ টোটকা ঔষধি প্রয়োগ শিক্ষা এবং সঙ্গীতাদি অন্যান্য সাধারণ যোগ্যতা লাভ করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা হিন্দুসমাজের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইবেন। দেখিতে পাওয়া যায় যে ইয়ুরোপীয় সভ্যসমাজে সুদক্ষা শিক্ষয়িত্রীগণ অতি বাল্যাবস্থা হইতেই বালকবালিকাগণকে ঈশ্বরোপাসনা এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম ও আচার অনুসারে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তদনুরূপ বাল্যাবস্থা হইতেই হিন্দু বালকবালিকাগণকে আর্য্যসংস্কার ও আর্য্য ধর্ম্মানুকূল সদাচার ও সৎ পদ্ধতি অনুসারে সুশিক্ষিত করিয়া যদি বিদেশীয় উচ্চশিক্ষা প্রদান করাযায়, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ব্বকথিত এই সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এবং হিন্দুজাতির উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষার অভাব দূরীকরণের জন্য হিন্দুর সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশীধামে "আর্য্যমহিলা মহাবিদ্যালয়" নামক একটী মহিলাগণের উপযুক্ত শিক্ষালয় স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। স্বভাবতঃ কাশীধাম হিন্দুজাতির ধর্ম্ম এবং বিদ্যার কেন্দ্র স্থান। বিশেষতঃ এই কার্য্যোপযোগী সাধন-দ্রব্যসম্ভার এখানে সুলভ ও স্বল্পায়াস-সাধ্য। কিছুদিন হইতে আর্য্যমহিলা-হিতকারিণী মহাপরিষদের সঞ্চালিকাগণের উদ্যোগে "শ্রীঅন্নপূর্ণা স্ত্রীশিক্ষালয়" নামক একটী নাতিবৃহৎ সংস্থা সংস্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ চাঁদা হইতেই তাহার কার্য্যনির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পাঁচ সাতজন বিদ্যার্থিনীকে এই সভা হইতে ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত বিদ্যার্থিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমহামণ্ডলস্থ উপদেশক মহাবিদ্যালয়ে গমন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা, এবং কেহ কেহ বা আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী বিদ্যালয়ে গমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র পরিষৎকে বর্দ্ধিত করিয়া মহাবিদ্যালয়

রূপে পরিণত করিতে বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চলক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন। নিতান্ত কম পক্ষে দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলেই মহাবিদ্যালয়ের সুমহৎ কার্য্য প্রারম্ভ করা যাইতে পারে।

আর্য্যজাতীয় পুরুষগণের মধ্যে যেরূপ সন্ন্যাসিগণের নিবৃত্তিপ্রধান অধিকার, তদ্রূপ আর্য্যমহিলাগণের মধ্যে বিধবাগণ স্বভাবতঃ নিবৃত্তিপরায়ণা ধর্ম্মজীবনরতা এবং পরোপকার-ব্রতধারিণী হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কাশীধাম যেরূপ সন্ন্যাসিগণের প্রধান বাসোপযোগী স্থান বলিয়া কথিত হয়, ধর্ম্মজীবনধারিণী বিধবাগণেরও তদ্রূপ সর্ব্বপ্রধান বাসোপযুক্ত স্থান বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং কাশীধামে সৎকুলোদ্ভবা বিধবা অনায়াসলভ্য হওয়ায় বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিনীগণের অভাব হইবে না।

সংক্ষেপে মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এবং স্থাপনার নানারূপ সুবিধার বিষয় বর্ণন করা হইল। এইরূপ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আর্য্যজাতির যে সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইবে ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুবিধবা এবং অসহায়া রমণীগণের পক্ষে একটী ধর্ম্মানুকুল সুন্দর জীবিকার উপায় কিরূপ হইতে পারে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। বিশেষতঃ উপরোক্ত হিন্দুসমাজের অভাব দূরীভূত হইয়া গেলে যেরূপ অতুলনীয় মঙ্গল সাধিত হইবে আর্য্য নরনারী মাত্রেই তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এইজন্যই আমার সম্পূর্ণবিশ্বাস এই যে এই মহাবিদ্যালয় আরম্ভ করিবার জন্য আমাদের আর্য্য ভ্রাতা ও ভগিনীগণ মুক্তহস্ত হইবেন, এবং আরম্ভ করিতে যে দুইলক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন অল্পায়াসেই তাহা পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই সুপবিত্র মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য খৈরীগড় রাজকোষ হইতে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করিবার সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত রাজা, মহারাজা, রাণী, মহারাণী এবং অন্যান্য ধনবান ভ্রাতা ভগিনীগণ এই ধর্ম্ম-কার্য্যে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক অথবা এই মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনা-পদ্ধতি, পঠন-পাঠনপদ্ধতি বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা (খৈরীগড় রাজভবন রাজধানী, সিঙ্গাহী, জিলা খৈরীগড়, খৈরী লখীমপুর (oudh) এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া বাধিত করিবেন।

(রাণী) সুরথকুমারী দেবী।
(ও, বী, ই,)
তাল্লুকদার খৈরীগড় (oudh).

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহামণ্ডল সংবাদ।—হিন্দুর সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশীধামস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের সুবিশাল যজ্ঞমণ্ডপে এপর্য্যন্ত ৬৩টী যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গত বর্ষেই কেবল ৩৬টী যজ্ঞ হইয়াছে। গতবর্ষে মহারুদ্র যজ্ঞ ১টী, লঘুরুদ্র ১১টী, হরিহর ১টী, বিষ্ণু ৪, গণেশ ৩, সূর্য্য ৪, শিব ৩, দেবী ২, অম্বা ৪, এবং শতচণ্ডী ৩টী হইয়াছে। সর্ব্বসমেত যজ্ঞব্যয় ৬১৪০০০৲ টাকা। তমঃপ্রধান কলিকালে একই স্থানে এত অধিক শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান হওয়া প্রকৃতই বিস্ময়কর ব্যাপার। আশা করা যায় ক্রমাগত এইরূপে দৈবী সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে মহামণ্ডলের কার্য্যালয় একটী পীঠস্থান রূপে পরিণত হইতে পারিবে।

মহিলা মহা বিদ্যালয়। খৈরীগড় রাজ্যেশ্বরী ভারতধর্ম্মলক্ষ্মী মাননীয়া শ্রীমতী সুরথকুমারী দেবী (O. B. E., K. H., Gold Medalist) মহোদয়া ভারতে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে কাশীধামে আর্য্যমহিলা মহাবিদ্যালয় নামক একটী স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিনী সুদক্ষা শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার সুব্যবস্থা করা হইবে। শিক্ষার্থিনীগণকে, ধর্ম্মশিক্ষা, মাতৃভাষা শিক্ষা, রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষায় অতিরিক্ত বালকবালিকাগণের লালনপালনোপযোগিনী বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ, পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা, সাধারণ টোটকা ঔষধি প্রয়োগ শিক্ষা, এবং সঙ্গীতাদি অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। মহারাণী সাহেবা এতদুপলক্ষে খৈরীগড় রাজ্য কোষ হইতে ৫০০০০৲ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এবং তিনি জানাইয়াছেন যে এই সুমহৎ অনুষ্ঠানে পঞ্চলক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন। নিতান্ত কমপক্ষে দুইলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলেই মহা বিদ্যালয়ের সুমহৎ কার্য্য প্রারম্ভ করা যাইতে পারে। ভারতের আদর্শজননী মহারাণী মহোদয়ার অনুমোদিত এই সুমহৎ কার্য্যের দ্বারা প্রকৃতই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে কন্যা-পাঠশালা, স্ত্রীশিক্ষালয় প্রভৃতি যথেষ্ট না থাকিলেও যাহা আছে, প্রকৃত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তাহাদেরই কার্য্য সুসম্পাদিত

হইতেছে না। হিন্দু রমণীগণ আদর্শজননীরূপে সুশিক্ষিতা না হইলেও ভারতের কল্যাণ কামনা করা যাইতে পারে না। অতএব এই সদনুষ্ঠানে স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু-মাত্রেই লাভবান হইতে পারিবেন। আমরা আশা করি মহারাণী সাহেবার এই সদ-ভিপ্রায় পূরণের জন্য যাহার যেরূপ শক্তি তিনি তদনুসারেই কিছু না কিছু সাহায্য করিবেন। যাঁহারা এই মহাবিদ্যালয় সম্বন্ধে কোনও বিষয় জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক খৈরীগড় রাজ্যেশ্বরী শ্রীমতী (রাণী সুরথকুমারী দেবী) খৈরীগড় রাজভবন, রাজধানী সিঙ্গাহী, জিলা খৈরীগড়, খৈরী লখিমপুর এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল গ্রন্থকার ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একটী সুবর্ণ পদক ও দুইটী রৌপ্য পদক পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিবেন। অতএব লেখক মহাশয়গণের সমীপে নিবেদন এই যে তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় উক্ত ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় স্বপ্রণীত পুস্তকসমূহের এক এক খণ্ড সত্বর পাঠাইবেন। যাঁহাদের পুস্তক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাঁহাদিগকে উল্লিখিত সুবর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে এবং মহামণ্ডলের সহিত সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজে ঐ সকল পুস্তক পাঠ্যরূপে গণ্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

সম্পাদক—

স্বামী দয়ানন্দ।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল।

জগৎগঞ্জ, কাশীধাম।

প্রস্তাবনা।

মনুষ্য সমাজে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন বহির্জ্জগতের উন্নতি লক্ষিত হয়, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্যসমাজ যখন যে পরিমাণে শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে, সে মনুষ্যসমাজ তখন সেই পরিমাণে বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজে পদার্থ-বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। পদার্থবিজ্ঞান কখনও সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার না করিলেও তাহার উন্নতির পরিমাণ অনুসারেই মনুষ্যসমাজে বহির্জ্জগতের উন্নতির পরিমাণ অনুমিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অন্তর রাজ্যের জন্য দর্শন শাস্ত্রই একমাত্র অবলম্বন; স্থূলরাজ্যের অতীত, অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ সূক্ষ্মরাজ্যের অনন্ত পারাবারের পক্ষে দর্শন শাস্ত্রই ধ্রুবতারা স্বরূপ। সূক্ষ্মরাজ্যে প্রবেশাভিলাষী সাধক কেবল দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যেই অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যেমন স্থূল নেত্রবিহীন ব্যক্তি স্থূল জগতের কিছুই দেখিতে পান না, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও সূক্ষ্ম জগতের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন না। অতএব ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যে শাস্ত্র সূক্ষ্ম জগতের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে।

পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যখন যে মনুষ্যজাতি আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যসমাজে যে প্রকার দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিরই মধ্যে সেরূপ উন্নতি হয় নাই। সনাতনধর্ম্মাবলম্বী মুনিগণ যোগবলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া, অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। পূজ্যপাদ

মহর্ষিগণ প্রথমে তপ ও যোগের সাহায্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তৎপরে জগতের কল্যাণার্থ সূত্র রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে অন্তর রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পরে জিজ্ঞাসুগণের নিমিত্ত তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার অভিপ্রায়ে বৈদিক দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য শিক্ষিত জাতির মধ্যে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, তাঁহারা দূর হইতে অন্তররাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া তাহার প্রকৃত তথ্য অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিত জাতি বহির্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যেমন সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ তাহা না করিয়া, প্রথমতঃ অন্তর্জগতের বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিয়া সাধারণের কল্যাণার্থ তাহা বহির্জগতে প্রকাশ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। এইজন্যই বৈদিক দর্শনশাস্ত্র সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য শিক্ষিত জাতির দর্শনশাস্ত্র তাহা না হইয়া বৈচিত্র্যময় ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

সৃষ্টি তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্রই তিন তিন ভাগ বিদ্যমান, যথা—বাত, পিত্ত ও কফ রূপী শরীর রক্ষার ত্রিবিধ শক্তি; মনুষ্যের ত্রিবিধ প্রকৃতি, ত্রিবিধ কর্ম্ম ইত্যাদি। এইরূপ সাত প্রকার ভাবের অবলম্বনে সৃষ্টি রাজ্যের সপ্তধাতু, সপ্তবর্ণ, সপ্ত দিবস, সপ্ত উর্দ্ধলোক, সপ্ত অধোলোক, সপ্তরত্ন, সপ্ত অজ্ঞানভূমি, সপ্ত জ্ঞানভূমি ইত্যাদি সপ্তবিধ বিভাগ সকল স্থানেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ সপ্ত জ্ঞানভূমি অতিক্রম করিয়া ক্রমে পরমপদ লাভ করিবার জন্য যে বৈদিক দর্শন বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাও ঐ সপ্ত জ্ঞানভূমি অনুসারেই সপ্ত ভাগে বিভক্ত। এই সপ্ত দর্শনের, দুইটি "পদার্থবাদ" দর্শন, দুইটি "সাংখ্য প্রবচন" দর্শন এবং তিনটি "মীমাংসা" দর্শন। আধুনিক পুস্তকে যে, ষড়্‌দর্শন নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল জৈন ও বৌদ্ধদিগের অনুকরণে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ উহাদের দর্শনশাস্ত্র ষড়দর্শন নামে অভিহিত ছিল বলিয়া নাস্তিক ষড়দর্শনের অনুকরণে বৈদিক ষড়দর্শন নাম প্রচারিত হইয়াছিল। কোন আর্ষ গ্রন্থেই ষড়দর্শন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বহুশতাব্দী হইতে মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায়, মধ্যমীমাংসা দর্শনের একখানিও সিদ্ধান্ত গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। এই সকল কারণেই ক্রমে

অজ্ঞানমূলক ষড়দর্শন শব্দ আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক ন্যায় এবং বৈশেষিক এই দুই পদার্থবাদ দর্শন, যোগ ও সাংখ্য এই দুই সাংখ্য প্রবচন দর্শন এবং বেদোক্ত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই কাণ্ডত্রয় অনুসারে কর্ম্মমীমাংসা, দৈবীমীমাংসা (ভক্তি মীমাংসা) এবং ব্রহ্ম-মীমাংসা এই তিন মীমাংসা-দর্শন; এইরূপে সপ্তদর্শন স্বতঃসিদ্ধ।

দর্শন গ্রন্থের অভাব ও দার্শনিক শিক্ষার লোপ হওয়ায় সনাতন ধর্ম্মের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে। স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস, পরধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছা, সদাচার বর্জ্জন, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের আদেশের উপহাস, বেদ এবং পুরাণে অশ্রদ্ধা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, অলৌকিক অন্তর রাজ্যে অবিশ্বাস, পরলোকে ভয়শূন্যতা, দেবদেবী এবং ঋষি পিত্রাদির অস্তিত্বে সন্দেহ, কর্ম্মকাণ্ডে অনাস্থা, সাধু ব্রাহ্মণে অভক্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে উপেক্ষা, জগৎ পবিত্রকর আর্য্য নারীদিগের ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্তি, জপ ধ্যানাদি সাধনমার্গে অরুচি প্রভৃতি আর্য্যত্ব ভ্রংশকর প্রবল দোষ যে কেবল বৈদিক দর্শন শিক্ষার অভাব হেতুই হইয়াছে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ন্যায়দর্শন শিক্ষা এখন সম্পূর্ণ রূপে হয় না। পূর্ব্বের প্রাচীন ন্যায়ের প্রকৃত শিক্ষা পদ্ধতি এখন আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন প্রাচীন ন্যায়ের পরিবর্ত্তে নব্য ন্যায়েরই অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক দর্শনের উপযোগী আর্ষ ভাষ্যের অভাব হওয়ায় উহার চর্চ্চা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

যোগদর্শন প্রথমতঃ কঠিন শাস্ত্র। উহার সহিত অন্তর্জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, উহার যথার্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কারণ যোগদর্শনের আচার্য্যের প্রকৃত যোগী হওয়া আবশ্যক, কিন্তু একণে সেইরূপ প্রকৃত যোগীর অভাবেই ইহার প্রকৃত শিক্ষার অভাব হইয়া উঠিয়াছে।

সাংখ্য দর্শনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এখন কেহ উহাকে আধুনিক দর্শন বলিতেছেন, কেহ উহাকে প্রক্ষিপ্ত বিষয় পূর্ণ বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন এবং কেহ বা নাস্তিক দর্শন বলিয়া উহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কয়েক সহস্র বৎসর হইতে উহার আর্ষ ভাষ্যের অপ্রাপ্তি এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ভাষ্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্য প্রণীত বলিয়াই এইরূপ

বিশৃঙ্খলতার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু যে জৈনাচার্য্য বা বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি যে ভাবে সাংখ্যদর্শনকে স্বীয় ভাষ্য দ্বারা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। কারণ, তিনি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বৈদিকী হিংসার নিন্দা এবং লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন করত ঈশ্বরের সিদ্ধি সম্বন্ধে অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন, শাস্ত্রোক্ত দেবতাদির খণ্ডন, আদি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে নিরপেক্ষ দার্শনিক ব্যক্তি মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তিনি সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী অন্য কোন সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। এপর্য্যন্ত সাংখ্য দর্শনের উপর যে সকল টীকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের প্রণেতাগণ জৈনাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতানুসরণ করিয়া ঐ সমস্ত প্রণয়ন করিয়াছেন।

দর্শন শাস্ত্রের প্রকৃত প্রচার করিতে হইলে প্রাচীন ন্যায় দর্শনের বহুল প্রচার এবং ঋষিগণের অভিপ্রায়ানুরূপ ভাষ্য সহ বৈশেষিক দর্শনের প্রচার বিশেষ আবশ্যক। ভগবান ব্যাসকৃত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া যোগী মহাপুরুষগণের দ্বারা বিস্তৃত ভাষ্য সহ যোগ দর্শন প্রণীত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্য দর্শনের ভাষ্য সূত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে সম্পূর্ণরূপে নূতন পদ্ধতিক্রমে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সাহায্যে প্রণীত হইয়া প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

তিনটি মীমাংসা দর্শনের মধ্যে ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনী কৃত কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন অতি বৃহৎ হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ ও একদেশী। জৈমিনী দর্শনে কেবল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে কর্ম্ম বিজ্ঞানের সাধারণ রহস্য কিছুই নাই। জৈমিনী দর্শনে যদিও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিজ্ঞান সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রচার প্রায় লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় ঐ দর্শন শাস্ত্রদ্বারা এখন আর আমাদের বিশেষ কোনরূপ উপকার সাধনের সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম কি, সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্মে প্রভেদ কি, বর্ণধর্ম্ম কি, আশ্রমধর্ম্ম কি, পুরুষধর্ম্ম কি, নারীধর্ম্ম কি, জন্মান্তর বাদের বিজ্ঞান কি, পরলোকেগতি কি প্রকারে হইয়া থাকে, সংসারের রহস্য কি, ষোড়শ সংস্কারের বিজ্ঞান কি, সংস্কার শুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া ক্রিয়া শুদ্ধি হয়, উদ্ভিজ্জাদি হইতে মনুষ্য যোনিতে

কি করিয়া জীব ক্রমশঃ প্রবেশ করে, মনুষ্য আবার পুণ্য কর্ম্ম করিয়া কিরূপে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মের ভেদ কত প্রকার, ক্রিয়াশুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য কি প্রকারে মুক্ত হয় ইত্যাদি কর্ম্মমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয়। এরূপ মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বহুকাল হইতে লুপ্ত অবস্থায় ছিল। সংপ্রতি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণের যত্নে একখানি বিস্তৃত সূত্রগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং উহার ভাষ্যও সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত হইতেছে। কর্ম্ম মীমাংসা যদিও লুপ্ত হইয়াছিল, তথাপি উহার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু দৈবীমীমাংসার (অর্থাৎ মধ্যমীমাংসা বা ভক্তিমীমাংসা) কোন গ্রন্থই পাওয়া যাইত না। এক্ষণে উহারও একখানি সিদ্ধান্ত সূত্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং উহার সংস্কৃত ভাষ্য প্রণীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তি কাহাকে বলে, ভক্তিভেদ কয় প্রকার, উপাসনা দ্বারা মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব, ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ কি, ভগবানের ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও বিরাট এই তিন রূপের ভেদ কি, ভক্তির প্রধান প্রধান আচার্য্য ঋষিগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের মত কি, সৃষ্টির বিস্তৃত রহস্য কি, অধ্যাত্ম সৃষ্টি কি, অধিদৈব সৃষ্টি কি, অধিভূত সৃষ্টি কি, ঋষি কাহাকে বলে, দেবদেবী কাহাকে বলে, পিতৃ কাহাকে বলে, উহাদের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি, অবতার কিরূপে হইয়া থাকে, অবতার কয় প্রকার, ভক্তিদ্বারা মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে, চারি প্রকার যোগের লক্ষণ এবং উপাসনার ভেদ কত প্রকার, উপাসনা এবং ভক্তির আশ্রয়ে সাধক কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন, কর্ম্ম মীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি, দৈবীমীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি এবং ব্রহ্মমীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি ইত্যাদি বিষয় এই দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্র লুপ্ত হওয়ায় আর্য্যজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, এবং ইহার অপ্রকাশ হেতুই উপাসক সম্প্রদায়ের এত দুর্গতি ঘটিয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্রের লোপ হওয়ায় যোগ এবং উপাসনা এই উভয়ের একতা সাধন সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞানিগণকেও বিমোহিত হইতে দেখা গিয়াছে। সপ্তম জ্ঞান ভূমির অন্তিম দর্শন ব্রহ্মমীমাংসা, ইহাকেই বেদান্ত বলে। উহার অতি উত্তম ভাষ্য, শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত পাওয়া যায়। কিন্তু এতদিন দৈবীমীমাংসাদর্শন লুপ্ত অবস্থায় থাকায় ও উপাসক সম্প্রদায়েরা অদ্বৈতবাদকে দ্বৈতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করায়, বেদান্ত বিচারের অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে। এই মধ্যমীমাংসা মধ্যযুগে বিলুপ্ত

না হইলে দ্বৈত এবং অদ্বৈত বাদের বিরোধ কদাপি সংঘটিত হইত না। ন্যায়-দর্শনের যে আর্ষ ভাষ্য পাওয়া যায়, উহা অতীব বিস্তৃত। বৈশেষিক দর্শনের বিস্তৃত ভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত হইতেছে। যোগদর্শনের বিস্তৃত ভাষ্য পূর্ব্বোল্লিখিত মতে প্রণীত হইয়াছে এবং উহার কিয়দংশ "বিদ্যারত্নাকর" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের সংস্কৃত ভাষ্য পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের মতানুযায়ী প্রণীত হইয়াছে এবং উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ভাষ্য পাঠ করিয়া এখনকার শিক্ষিত মণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছেন, এবং সাংখ্য দর্শন যে, আস্তিক দর্শন তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন সভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। দৈবীমীমাংসা দর্শন অর্থাৎ মধ্যমীমাংসা দর্শন সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং উহার তিনপাদ সংস্কৃত ভাষায় উক্ত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় ভাষ্যও প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন আর্য্যগণের মত যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া এবং অন্যান্য নিম্ন জ্ঞান ভূমির অধিকার সকল ঐ সমস্ত দর্শনোক্ত জ্ঞান ভূমির যথাযথ বিজ্ঞানানুসারে প্রতিপাদিত করিয়া এই বেদান্ত ভাষ্যকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে চেষ্টা করা হইবে। এই সপ্তবিধ দর্শন শাস্ত্রের যথাযথ প্রচার ও যথাবিধি শিক্ষা দিবার জন্য এই সাতখানি দর্শনের সংস্কৃত ভাষ্য প্রণয়নের কার্য্য বহুল পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার পাঠকদিগের জন্য ঐ সকল দর্শন গ্রন্থ সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তৃত ভাষ্যের সহিত ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।

আমাদের সুহৃদ্‌গণের মধ্যে অনেকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, জ্ঞান ভূমির ক্রম অনুসারে ন্যায় ও বৈশেষিকাদি দর্শন প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম, যখন ইতিপূর্ব্বেই ঐ দর্শনগুলি কতক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে, তখন ঐ গুলির বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রচার আবশ্যক হইলেও প্রথমেই ঐ গুলি প্রকাশ করিলে পাঠকগণের তাদৃশ চিত্তবিনোদন হইবে না এবং দ্বিতীয়তঃ দৈবীমীমাংসাদি দর্শন গ্রন্থের প্রচার যখন একেবারেই ছিল না, তখন ঐ গুলি প্রথমে প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় পাঠকদিগের আনন্দ, উৎসাহ এবং অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ বৈদিক দর্শনশাস্ত্র প্রচারের কার্য্যে আমরা যখন প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন প্রথমেই

ভগবদ্ভক্তি প্রকাশক দৈবীমীমাংসা-দর্শনের প্রকাশ যে অতীব কল্যাণকর তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপরি উক্ত সাতখানি বৈদিক দর্শন গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যোগের ক্রিয়া সিদ্ধাংশ (Practical) সম্বন্ধীয় পাঁচখানি গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। উপাসনার মূল ভিত্তিরূপী যোগের ক্রিয়া সিদ্ধাংশ চারিভাগে বিভক্ত; যথা মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। এই চারি প্রণালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অঙ্গ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধ্যান, এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকার নির্ণীত আছে। নাম এবং রূপের অবলম্বনে যে সাধন প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে, তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্রযোগ ষোল অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানকে স্থূল ধ্যান বলে।

স্থূল শরীরের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যে প্রণালী, তাহাকে হঠযোগ বলে। হঠযোগ সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত এবং হঠযোগের ধ্যান জ্যোতির্ধ্যান নামে অভিহিত।

লয়যোগ আরও অধিক উন্নত অবস্থার সাধন। জগৎ-প্রসূতিকুল-কুণ্ডলিনী শক্তি, যিনি সকল শরীরেই বিদ্যমান আছেন, সেই শক্তিকে গুরু উপদেশানুসারে জাগ্রত করিয়া সহস্রারে লয় করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যে প্রণালী তাহাকে লয়যোগ বলে। লয়যোগ নয় অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানের নাম বিন্দুধ্যান।

যোগ প্রণালী সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগপ্রণালীর নাম রাজযোগ। উল্লিখিত ত্রিবিধ সাধককে উন্নত অবস্থায় রাজযোগের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। কেবল বিচার শক্তিদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যে প্রণালী, তাহাকে রাজযোগ বলে। রাজযোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যান ব্রহ্মধ্যান নামে অভিহিত। উপরি উক্ত তিনটি যোগ প্রণালীর সমাধিকে সবিকল্প বলে, কিন্তু রাজযোগের সমাধিই নির্ব্বিকল্প সমাধি।

উপরি উক্ত চারি প্রকার যোগ প্রণালীর অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহ, বেদ, আর্ষ সংহিতা, পুরাণ ও তন্ত্রাদির অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকারানুসারে ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়াগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে যথাক্রমে কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে গুরু এবং শিষ্য সম্প্রদায়ের অধিকার উন্নত ছিল বলিয়া ঐরূপ সাধন বিভাগের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু

বর্ত্তমান সময়ে ঐ চারিটি সাধন প্রণালীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রন্থ না পাওয়ায় যোগী এবং উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা মন্ত্রযোগ সংহিতা, হঠযোগ সংহিতা, লয়যোগ সংহিতা ও রাজ-যোগ সংহিতা এই চারিখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ পাইয়াছি। উহাতে প্রত্যেক সাধন প্রণালী বিস্তৃত ও সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। এই চারিখানি গ্রন্থ ব্যতীত, গুরুগণ ইহাদের অবলম্বনে শিষ্যগণকে কিরূপে শিক্ষা দিবেন, তদ্বিষয়ে "যোগ-প্রবেশিকা" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই পাঁচ খানি গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিব। উপরি উক্ত সাতখানি দর্শন গ্রন্থ ও এই পাঁচখানি যোগগ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় দার্শনিক জগতের উন্নতি বিষয়ে যে এক অভিনব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।

দৈবীমীমাংসাদর্শন।

ভূমিকা।

যিনি নিত্য, নির্ব্বিকার, একও বিভু; যিনি চেতন ও জড়; পুরুষ ও শক্তি; যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ; যিনি এক হইয়াও কারণ হইতে কার্য্যব্রহ্ম পর্য্যন্ত বহুভাবে প্রতীয়মান, যিনি জগতের কল্যাণকামনায় আদ্য, অদ্বিতীয়রূপ পরিত্যাগ করিয়া নানা শরীরে, রূপে বিবর্ত্তিত, সেই রসের সাগর, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ভক্তিভরে বারংবার প্রণাম করিতেছি। যিনি রসরূপ হইয়া রসভাবপরিপ্লুত ও ভক্তিযুক্ত মুমুক্ষুগণকে নিরন্তর পরমানন্দ সাগরে উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত করিতে করিতে পরিশেষে স্ব-স্বরূপ করিয়া দেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিতেছি। ত্রিকালদর্শী, পরম-করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ ও মানবের আদিগুরু মহর্ষি অঙ্গিরা,—যাঁহার করুণা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র প্রাপ্ত হইয়াও জীবগণ দেবদুর্ল্লভ নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহারই শ্রীপদারবিন্দ ধ্যান করত তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক যথা-শক্তি এই ভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতেছি*।

---

*"যো নিত্যো নির্ব্বিকারঃ প্রকৃতিরপি পুমান্ নির্গুণঃ সদ্গুণশ্চ
ভাত্যেকোঽনেকরূপো বিবিধতনুতয়া কারণাৎ কার্য্যতশ্চ।
আনন্দাব্ধৌ রসাত্মা নিরবধি রসিকান্ ভক্তিযুক্তান্ মুমুক্ষূন্
মজ্জীকুর্ব্বাত্মনীশঃ স দ ইহ পরমং ভক্তিভাবৈকগম্যম্ ॥

"আত্মেত্যেবোপাসীত," "তদাত্মানমেবাবেৎ" "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ আত্মারই উপাসনা করা উচিত, আত্মাকেই জ্ঞাত হওয়া উচিত,কেননা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায়, এই সকল শ্রুতিবচনসমূহের চরিতার্থতা-সম্পাদনার্থ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত বৈদিক সপ্তদর্শনবিজ্ঞান অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশকারী মুমুক্ষুগণের দিব্য নেত্র স্বরূপ।

এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশাল সংসারে প্রথমতঃ জীব উচ্চ নিম্ন অগণিত উদ্ভিজ্জপিণ্ডে প্রবেশ করিয়া পরে স্বেদজের অগণিত পিণ্ডে ভ্রমণ করে। তদনন্তর প্রকৃতি মাতার অপার অনুগ্রহে ক্রমোন্নতি লাভ করত অণ্ডজের অনন্ত যোনি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীব ক্রমশঃ জরায়ুজ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য শরীর লাভ করিয়াও জীব জন্মমরণরূপী কঠোর দুঃখের হস্ত অতিক্রম করিতে পারেনা। অধিকন্তু বাসনাজালে বিজড়িত হইয়া জন্মমরণরূপ সংসার-প্রবাহে স্থায়ীরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। কেবল উপাসনাদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেই জীব পরমানন্দরূপ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই উল্লিখিত শ্রুতিসমূহের চরিতার্থতা। ভগবৎ-সান্নিধ্যপ্রাপ্তির উপায় বিশেষের নামই উপাসনা। ভক্তিবিজ্ঞান অনুসারে সাধন, ধারণা এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা ক্রমশঃ পরমাত্মার সান্নিধ্য-

"সন্তন্ত্রিকালজ্ঞগুরোঃ কৃপাকণং
তন্বা অবাপ্যাজিরসঃ কৃতার্থতাম্।
তেষূর্ণ হৃবৎপদপঙ্কজং স্মরন্
বিধাস্যতে ভাষ্যমিদং যথামতি॥

লাভ হয় এবং চরমে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। শ্রীগীতোপনিষদে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! হে অর্জ্জুন! সুকৃতী ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন। তবে সুকৃতের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা চতুর্ব্বিধ, যথা—আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাদিজনিত দুঃখে পীড়িত, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে ভোগসাধনভূত অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছুক এবং জ্ঞানী অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানবান্। এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। উক্ত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতেই ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ; কেননা আমি জ্ঞানী ভক্তের অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়। (জ্ঞানীদিগের দেহাদিতে অহংবুদ্ধির অভাব বশতঃ তাঁহাদের চিত্তবিক্ষেপ হয়না; এজন্য তাঁহারাই নিত্যযুক্ত এবং অনন্যভক্তি হইতে পারেন। অন্যে পারেনা) এই চারি প্রকার ভক্তই মহান্, কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ; যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি-স্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। ভক্তগণ বহুজন্মের পরে জ্ঞানবান্ হইয়া "বাসুদেবই এই জগৎ" সর্ব্বত্র এইরূপ আত্মদৃষ্টি দ্বারা আমাকে পরিজ্ঞাত হন, তাদৃশ মহাত্মা দুর্ল্লভ"*। কর্ম্মকাণ্ডের সহায়তায় আধি-ভৌতিক শুদ্ধিলাভ করিয়া উপাসনা কাণ্ড দ্বারা আধিদৈবিক

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন!
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

শুদ্ধিলাভানন্তর জ্ঞানী ভক্ত পরমাত্মাকে "ব্রহ্মই জগৎ" এই ভাবে দর্শন করিয়া উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপৌরুষেয় বেদের উপাসনা কাণ্ডের পুষ্টির জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি অঙ্গিরা দ্বারা এই দর্শন বিজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল। তৎপরে মহর্ষি শাণ্ডিল্য এবং ভগবান শেষ আদি দ্বারাও এই দর্শনবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

উন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য যখন অন্তররাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন দার্শনিক নেত্রের সহায়তা ব্যতীত কদাপি তিনি গম্য-স্থানে যাইতে সমর্থ হন না। বেদ অভ্রান্ত; এইজন্য বৈদিক বিজ্ঞানও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও সুন্দর এবং নির্দ্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত। সপ্তজ্ঞানভূমি অনুসারে বৈদিক দর্শনও সাতটী। এই সাতটী জ্ঞানভূমির নাম ও লক্ষণ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়াছে যে, প্রথম জ্ঞানভূমির নাম জ্ঞানদা, দ্বিতীয় জ্ঞানভূমির নাম সন্ন্যাসদা, তৃতীয় যোগদা, চতুর্থ লীলোন্মুক্তি, পঞ্চম সত্যদা, ষষ্ঠ আনন্দপদা ও সপ্তম পরাৎপরা। আমি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা প্রথম ভূমির অনুভব; পরিত্যজ্য পদার্থ সমূহকে ত্যাগ করিয়াছি, ইহা দ্বিতীয় ভূমির অনুভব; প্রাপ্য-শক্তি-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা তৃতীয় ভূমির অনুভব; এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ মায়ারই লীলা-বিলাস মাত্র, ইহাতে আমার

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

কোনই অভিলাষ নাই, ইহা চতুর্থ ভূমির অনুভব, এই জগতই ব্রহ্ম, ইহা পঞ্চম ভূমির অনুভব; ব্রহ্মই জগৎ ইহা ষষ্ঠ ভূমির অনুভব এবং আমি অদ্বিতীয় নিরাকার নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, ইহা সপ্তম জ্ঞান ভূমির অনুভব। এই সপ্তম জ্ঞান ভূমি প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মস্বরূপ অধিগত হয় *

নিখিল শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান প্রধান সকল শাস্ত্রই চতুর্ব্যূহ-দ্বারা সুরক্ষিত; উপাসনা কাণ্ডের মীমাংসারূপী এই দৈবী-মীমাংসা দর্শনও উল্লিখিত নিয়মানুসারে চতুর্ব্যূহদ্বারা সুরক্ষিত; যথা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্বরূপ, এই তিনের হেতু, মুক্তি এবং মুক্তির উপায়। দৈবীমীমাংসাদর্শন অনুসারে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্যূহের আশ্রয় দ্বারাই মুমুক্ষুগণ ভব-

* জ্ঞানদা জ্ঞানভূমের্হি প্রথমা ভূমিকা মতা।
সন্ন্যাসদা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া যোগদা ভবেৎ॥
লীলোন্মুক্তিশ্চতুর্থী বৈ পঞ্চমী সত্যদা স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যানন্দপদা জ্ঞেয়া সপ্তমী চ পরাৎপরা॥
যৎ কিঞ্চিদাসীজ্ জ্ঞাতব্যং জ্ঞাতং সর্ব্বং ময়েতি ধীঃ।
প্রথমো ভূমিকায়াশ্চানুভবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
ত্যাজ্যং ত্যক্তং ময়েত্যেবং দ্বিতীয়োঽনুভবো মতঃ।
প্রাপ্যা শক্তির্ময়া লব্ধাঽনুভবো হি তৃতীয়কঃ॥
মায়াবিলসিতং চৈতদ্দৃশ্যতে সর্ব্বমেব হি।
ন তত্র মেঽভিলাষোঽস্তি চতুর্থোঽনুভবো মতঃ॥
জগদ্ ব্রহ্মেত্যনুভবঃ পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ব্রহ্ম এব জগৎ ষষ্ঠোঽনুভবঃ কিল কথ্যতে॥
অদ্বিতীয়ং নির্ব্বিকারং সচ্চিদানন্দরূপকম্।
ব্রহ্মাহমস্মীতি মতিঃ সপ্তমোঽনুভবো মতঃ।
ইমাং ভূমিং প্রপদ্যৈব ব্রহ্মসারূপ্যমাপ্যতে॥

পারাবার-পারংগত হইতে পারেন। পদার্থবাদী ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যেমন পদার্থ জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিপূর্ব্বক মুক্তিপথ প্রদর্শন করেন, যোগদর্শনও যেমন একতত্ত্ব-প্রাপ্তি-পুরঃসর ক্রমশঃ সমাধিদ্বারা নির্ব্বাণ পথ প্রদর্শন করেন, সাংখ্য-দর্শন যে প্রকার ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া মুক্তির জন্য সাংখ্য বিজ্ঞানের বিধান করিয়া থাকেন ও কর্ম্মমীমাংসাদর্শন যেমন সংস্কারশুদ্ধি ও ক্রিয়াশুদ্ধি দ্বারা মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে উপদেশ প্রদান করেন, সেইরূপ ভক্তিশাস্ত্র দৈবীমীমাংসাদর্শনও ভগবদ্ ভক্তির সহায়তায় ত্রিবিধ শুদ্ধি সম্পাদন করত মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন।

অন্তর্‌রাজ্যের ও বহির্‌রাজ্যের মধ্যভাগে অবস্থিত বলিয়া যোগদর্শন যেমন নির্ব্বিরোধী ও সর্ব্বহিতকর সেইরূপ দৈবী-মীমাংসাও কর্ম্মকাণ্ডের এবং জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় অবিরুদ্ধ ও সর্ব্বহিতকর। কোন দর্শন স্বীয় জ্ঞান ভূমির অনুরোধে অন্য দর্শনমতের খণ্ডন করিলেও যদিচ তাহা বিশেষ হানিজনক নহে, তথাপি দৈবীমীমাংসাদর্শনের সর্ব্বা-বিরোধিতারূপ বিশেষত্ব ও মহত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। সমতল ভূমিতে পর্য্যটনশীল পথিক যদি সহচারীর পার্ব্বত্য-পথ-ভ্রমণের ক্রিয়া-কুশলতার নিন্দা করিয়া সমতল ভূমির ভ্রমণকৌশলের প্রশংসা করেন এবং এইরূপে পার্ব্বত্য-মার্গ-বিচরণশীল পথিক যদি স্বীয় ভ্রমণ-কুশলতার প্রশংসা করত সমতল ভূমিতে ভ্রমণশীল ব্যক্তির ভ্রমণ-কৌশলের নিন্দা করে, সেইস্থলে কাহারও কোন হানি হইতে পারেনা। অধিকন্তু উহা দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে উপকারকই হইয়া থাকে। সেইরূপ

যদি এক দর্শন-বিজ্ঞান দর্শনান্তর-বিজ্ঞানের কোন অংশ-বিশেষের উপর দোষারোপ করে, এমন কি বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত খণ্ডিত করে, তথাপি তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারেনা। পক্ষান্তরে যে জ্ঞান-ভূমি-প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞান বলা হইতেছে, ঐ বিজ্ঞানেরই দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি এ দর্শনে ঐরূপ কোন খণ্ডন-মণ্ডন প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং এই দর্শন শাস্ত্রের সার্ব্বভৌম দৃষ্টি অবশ্যই সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

সকল শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মা আদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি, মহর্ষি পর্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্র-সমূহের স্মারক মাত্র, উহাদের প্রণেতা নহেন।* পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ নিত্যস্থিত-জ্ঞান-রাজ্য হইতে অভ্রান্ত বৈদিক শাস্ত্র সমূহের আবিষ্কার করিয়া থাকেন মাত্র। চক্রায়মাণ কালের তীব্র নিষ্পেষণে কোন কোন শাস্ত্রের আবির্ভাব ও কোন কোন শাস্ত্রের তিরোভাব হইয়া থাকে। আবার কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ কয়েকজন ঋষিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃতও হয়।

মহর্ষি জৈমিনি, মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রভৃতি দ্বারা আবিষ্কৃত কর্ম্মমীমাংসাদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যেমন বিচিত্র, বিশাল অথচ দুরূহ কর্ম্মরহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, সেইরূপ ভক্তি-শাস্ত্র দৈবীমীমাংসাদর্শনের বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, যে কোন সম্প্রদায়ের উপাসক হউন না কেন, তিনি স্বীয় অধিকার অনুসারে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হন না। অধিকন্তু স্বাধিকার প্রাপ্তি পক্ষে ভগ্নমনোরথ হইয়া বিষাদগ্রস্ত

* "ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ"।

হইয়া পড়েন। দৈবীমীমাংসাদর্শনের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া সাম্প্রদায়িক উপাসকগণ পথভ্রষ্ট হওয়ায় কখনও কর্ম্মমার্গে যাইয়া অধিকারবিরুদ্ধ আচরণ করেন, আবার কখনও জ্ঞানমার্গে গমনপূর্ব্বক অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। পক্ষান্তরে স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে স্বহস্তেই কণ্টক রোপণ করেন। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তখন তাঁহারা "ইতো ভ্রষ্টাস্ততো নষ্টাঃ" হন। অতএব কর্ম্মমীমাংসা যেমন সকল শাখা এবং সম্প্রদায়েরই কল্পসূত্র ও স্মার্ত্তানুশাসনের পরম সহায়ভূত, সেইরূপ দৈবীমীমাংসাদর্শনও সকল প্রকার উপাসকেরই পরম আশ্রয়স্বরূপ, ইহা নিঃসন্দেহ।

বেদের কাণ্ডত্রয়ানুসারে মীমাংসাত্রয়ও পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং মীমাংসাত্রয়ের জ্ঞানভূমিও পরস্পর নৈকট্য-ভাবে সম্বদ্ধ। কিন্তু এই তিনের পুরুষার্থের মধ্যে যথেষ্ট ভেদ-ভাব আছে। কর্ম্মমীমাংসাদর্শন কর্ম্মকেই মুক্তির সাধন বলিয়া থাকে। দৈবীমীমাংসাদর্শন ভক্তিকেই মুক্তির উপায় বলিয়া বর্ণন করে এবং ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। ঈদৃশ নানা জ্ঞানভূমির বিজ্ঞান অনুসারে পুরুষার্থের ভিন্নতা দেখিয়া মুমুক্ষুগণের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা অন্নময় শরীরের পোষণ সম্বন্ধে যদি কেহ বলে যে, শারীরিক যন্ত্রের মধ্যে শরীরের পোষণ জন্য মুখই প্রধান, আর কেহ যদি বলে পাকস্থলীই প্রধান আবার যদি তৃতীয় ব্যক্তি বলে যে, হৃদয় যন্ত্রই প্রধান, এইরূপ স্থলে

তিন জনের কথাই সত্য হইবে; যেহেতু অন্ন প্রথমতঃ মুখ দ্বারা পাকস্থলীতে যায়, পরে রসরূপ হইয়া হৃদয়-যন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া রক্তরূপে শরীরের রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এক যন্ত্রে অন্ন প্রবেশ করিলে পর আপনাআপনিই অন্যান্য যন্ত্রে গমন করিয়া যথাযথ কার্য্য সম্পাদন করে। সেইরূপ কর্ম্ম-যোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ এই যোগত্রয় পরস্পর অন্যোন্যাশ্রয়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ মতভেদে লক্ষ্যহানির সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানী ভক্ত অবশ্যই কর্ম্মযোগী এবং তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন। সেইরূপ কর্ম্ম-যোগীও স্বতঃই অন্যান্য অধিকারদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এইরূপ মতভেদ দেখিয়া মুমুক্ষুদিগের ক্ষোভ প্রকা-শের ও চঞ্চলতার কোন কারণ নাই।

এই দর্শন শাস্ত্রে পরমাত্মাকে আনন্দস্বরূপ সিদ্ধান্ত করায় সদ্ভাবে ও চিদ্ভাবে আনন্দের ব্যাপকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপে মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সেই নির্ব্বাণ, পরমানন্দ পদপ্রাপ্তির জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি এই ভক্তিশাস্ত্র, "দৈব-মীমাংসা" দর্শনের বর্ণন করিয়াছেন। ইতি।

রসপাদ।

সকল শাস্ত্রের মূলভূত বেদ তিন কাণ্ডে বিভক্ত। যথা কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। এই কাণ্ডত্রয়ানুসারে মীমাংসাদর্শনের মধ্যেও তিন ভেদ দৃষ্ট হয়। যথা কর্ম্মমীমাংসাদর্শন, উপাসনামীমাংসাদর্শন ও জ্ঞানমীমাংসা-দর্শন। ইহাদের মধ্যে "কর্ম্মমীমাংসাদর্শনে" কর্ম্মকাণ্ডীয়-বিজ্ঞানের মীমাংসা করা হইয়াছে; ইহাকে পূর্ব্বমীমাংসাও বলা হয়। "উপাসনামীমাংসাদর্শনে" উপাসনাকাণ্ডের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে; ইহাকেই "মধ্যমীমাংসা" বা "দৈবীমীমাংসাদর্শন" বলা হয়। এবং "জ্ঞানমীমাংসাদর্শনে" জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ব-নির্ণয় করা হইয়াছে; ইহাকে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসাও বলা হইয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডের যেমন ধর্ম্ম-বিজ্ঞানই মূল, সেইরূপ উপাসনাকাণ্ডেরও দৈবী-মীমাংসা-প্রতিপাদিত ভক্তিই একমাত্র মূল। এইজন্য দৈবীমীমাংসাদর্শন প্রারম্ভ করা হইতেছে, যাহার ইহাই প্রথম সূত্র—

(অথ)

এখন ভক্তি বিষয়ক জিজ্ঞাসা হইতেছে।১।

[illegible] শুদ্ধি আদি

ন[illegible]ক জিজ্ঞাসাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

(১) অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা ।১।

'অথ' শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই মঙ্গল হইয়া থাকে। কেননা স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, "ওঁকার এবং অথ এই দুই শব্দই ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছে। সুতরাং ওঁকার ও অথ এই শব্দদ্বয় মাঙ্গলিক"*। পাপসমূহের বিনাশ, প্রারব্ধকার্য্যের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি ও শিষ্টাচারসেবিত শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহের আজ্ঞাপালনজন্যই যে কোন কার্য্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা হইয়া থাকে। কেননা শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "কার্য্যের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি-প্রয়াসী অবশ্যই মঙ্গলাচরণ করিবে"†। 'অথ' শব্দ অনেকার্থবাচক হইলেও এইস্থলে 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ভক্তিবিষয়ক জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হইয়া থাকে। "অতঃ" এই পদে হেত্বর্থক পঞ্চমী। কেননা ভক্তিই উপাসনার একমাত্র মূল। এই হেতু ভক্তিবিষয়ক জিজ্ঞাসাই অবশ্য কর্ত্তব্য ॥১॥

ভক্তি-জিজ্ঞাসা-বিষয়ে প্রথম জ্ঞাতব্য পদার্থের নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—

পরমাত্মা রসরূপ ও মায়া জড়রূপা ।২।

পরমাত্মা রসস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দরূপ। শ্রুতিতেও বারংবার কথিত হইয়াছে যে, "পরমাত্মা রসস্বরূপ" "ব্রহ্ম

---

* "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥"

† "সমাপ্তিকামো মঙ্গলমাচরেৎ"।

(২) "রসরূপঃ পরমাত্মা জড়রূপা মায়া" ।২।

আনন্দরূপ,” “ব্রহ্মের আনন্দরূপ জ্ঞাত হইলে সকল প্রকার ভয় দূর হইয়া যায়,” “আনন্দ হইতেই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি; আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয় প্রাপ্তি হয়”*। রস এবং আনন্দ এই দুই শব্দই একার্থবাচক। পরমাত্মা অবাঙ্মনসোগোচর অর্থাৎ বাক্য এবং মনের অতীত হইলেও জিজ্ঞাসুদিগের বোধের নিমিত্ত সদ্ভাব, চিদ্ভাব ও আনন্দভাবদ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই ভাবত্রয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইলেও “কর্ম্মমীমাংসাদর্শন” দ্বারা প্রধানতঃ সদ্ভাব, “ব্রহ্মমীমাংসাদর্শন” দ্বারা চিদ্ভাব ও “দৈবীমীমাংসাদর্শন” দ্বারা আনন্দভাবেরই প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে। জগদ্ধাত্রী মহামায়া জড়রূপা। সুতরাং পরমাত্মার চেতনশক্তি ব্যতীত জড়াত্মিকা প্রকৃতিদ্বারা কোনরূপ কার্য্যই হইতে পারেনা। প্রকৃতিমাতা সর্ব্বব্যাপক চেতনসত্তার প্রভাবে পরিণামিনী হইয়া অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টিলীলা বিস্তার করেন। এই বিজ্ঞান স্পস্ট করিবার জন্যই শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, “তাঁহারই জ্যোতিতে সমস্ত পদার্থ জ্যোতির্ম্ময়; সমস্ত চেতন সত্তাই তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন”; “প্রকৃতি মায়া এবং ব্রহ্ম মায়ার প্রেরক মায়ী”†। এইরূপে স্মৃতিতেও

---

* “রসো বৈ সঃ,” আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ;”
“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,”
“আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।”

† “তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।”
“মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।”

কথিত হইয়াছে যে, "পরমাত্মা প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ; প্রকৃতি তাঁহার শক্তি, এবং তাঁহারই সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সচেতনতা। চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃই যেমন লৌহের কার্য্যকারিণী শক্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের সান্নিধ্যদ্বারাই প্রকৃতি চেতনযুক্তা হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে"*। "ব্রহ্মই গুণময়ী মায়াতে সমাবিষ্ট হইয়া জগতের সর্গ, স্থিতি ও প্রলয় করেন"। "জন্মরহিত পরমাত্মা স্বকীয় শক্তিরূপ অজা প্রকৃতিতে চেতনসত্তার সন্নিবেশ করেন"†। প্রাক্তন-সংস্কার অনুসারে স্পন্দনধর্ম্মিণী প্রকৃতিতে যখন সৃষ্টির সূচনা হয় তখন পরমাত্মা প্রকৃতিতে আপন চেতনসত্তা প্রদান করিয়া থাকেন; তাহাতেই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে"‡। এইরূপে মায়া জড়া হইলেও সৃষ্টিবৈভব বিস্তার করিয়া থাকেন ॥২॥

---

* "স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা।
তৎসান্নিধ্যবশাদেব চৈতন্যং ময়ি শাশ্বতম্ ॥
জড়াহং তস্য সংযোগাৎ প্রভবামি সচেতনা।
অয়স্কান্তস্য সান্নিধ্যাদয়সশ্চেতনা যথা ॥"

† "আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ !
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥"
"ত্বং দেবশক্ত্যা গুণকর্ম্মযোনৌ।
রেতস্ত্বজায়াং কবিরাদধেঽজঃ ॥"

‡ দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥"

রস এবং জড় এই উভয়ের স্পষ্টীকরণমানসে লক্ষণ করা হইতেছে—

রস জ্ঞানময় এবং জড় অজ্ঞানময়।৩।

রস জ্ঞানাত্মক এবং জড় অজ্ঞানাত্মক। আনন্দরূপ পরমাত্মার আনন্দসত্তা জগতের সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও, জীব দুইপ্রকারে সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত আনন্দ এবং অপর সাক্ষাৎ চিদানন্দ। প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত যে আনন্দ, উহা প্রকৃত ব্রহ্মানন্দের ছায়ামাত্র। প্রকৃতির অতীত শুদ্ধ নিত্য ভূমানন্দই বাস্তবিক আনন্দ বলিয়া কথিত। এইজন্য শ্রুতি ও স্মৃতি আদিতেও বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় যে, "ব্রহ্মেই পরমানন্দের অবস্থিতি; অন্যান্য প্রাকৃতিক জীবগণ উক্ত ব্রহ্মস্থিত পরমানন্দের ছায়া মাত্র উপভোগ করিয়া থাকে*। ঐ ছায়া আবার মায়াদ্বারা আনীত হয়। পক্ষান্তরে মায়া ভ্রমকারিণী হওয়ায় মায়াবদ্ধ অজ্ঞানী জীব বৈষয়িক সুখকেই যথার্থ ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া উহাতেই লিপ্ত হয়। কস্তুরী-মৃগ যেমন নিজ নাভিদেশস্থিত

(৩) রসো জ্ঞানময়ো জড়শ্চাজ্ঞানময়ঃ।৩।

* "এষোঽস্য পরমানন্দ, এতস্যৈবানন্দস্যা-
ন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"
"অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্।
নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ॥
এষোঽস্য পরমানন্দো যোঽখণ্ডৈক রসাত্মকঃ।
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে॥"

কস্তুরী-গন্ধে উন্মত্ত হইয়া উহার অন্বেষণে ইতঃস্তত ধাবিত হয়, (কেননা মৃগ জানেনা যে, তাহার নাভিদেশেই কস্তুরী আছে) সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক, পরমানন্দরূপ ভগবানের আনন্দসত্তা নিখিল জীবের অন্তর্নিহিত থাকায় জীবের সমস্ত প্রবৃত্তি স্বতঃই সেই আনন্দ লাভের জন্যই হইয়া থাকে*। পরন্তু অবিদ্যা-গ্রস্ত,—সংসার-মায়ামুগ্ধ-জীব স্পর্শমণি-ভ্রমে প্রস্তর গ্রহণের ন্যায়, নাশবান পরিণাম-দুঃখ-প্রদ, আপাতমধুর বিষয়-সুখকেই বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। এইজন্য জিজ্ঞাসুগণের সন্দেহ দূরীকরণার্থ এবং লক্ষ্যস্থিরীকরণমানসে কথিত হইতেছে যে, স্বরূপে জ্ঞানের নিত্য-বিদ্যমানতা হওয়ায় "রস জ্ঞানময়"। জ্ঞানের পূর্ণতাদ্বারাই আনন্দের পূর্ণতা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "নির্ব্বিকল্প-সমাধি-পদস্থিত, পূর্ণ জ্ঞানী যোগী, যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কেবল জ্ঞানরাজ্যে অনুভবদ্বারাই উহার বোধ হইয়া থাকে"†। এইরূপে শ্রীভগবান্ গীতোপনিষদেও বলিয়াছেন যে, "চিত্তবৃত্তির নিরোধ করত জ্ঞানযোগী যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়ের এবং প্রকৃতিরাজ্যের অতীত নিত্যানন্দ প্রাপ্ত

* "যদা বৈ করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি, নাসুখং লব্ধ্বা করোতি, সুখমেব লব্ধ্বা করোতি, সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য, নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব তৎসুখ-মিতি শ্রুতিঃ।"

† "সমাধি-নির্ধূত-মলস্য চেতসো, নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখংভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা, তদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"

হইয়া থাকেন; যে আনন্দ প্রাপ্ত হইলে আর অপর কোন আনন্দই তাঁহার নিকট প্রকৃত আনন্দ বলিয়া বোধ হয়না এবং যে আনন্দে অবস্থিত হওয়ার পর প্রারব্ধজনিত কোন প্রবল দুঃখ সমুপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে অভিভূত হয়েন না”*। এতদ্ব্যতীত স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে, “শব্দ এবং মায়ার অতীত যে ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ পরমপদ বিদ্যমান আছে, উহাই শোকরহিত নিত্য পূর্ণানন্দময়”†। সৃষ্টি অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এইজন্য তৎকারণীভূত জড় ও অজ্ঞানময়। কেননা কার্য্য ও কারণ অভিন্ন ধর্ম্মাত্মক,—এক। নাম ও রূপাতীত অদ্বিতীয় কারণ ব্রহ্মে যে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ নাম-রূপাত্মক কার্য্যব্রহ্মের প্রতীতি হয়, উহা কেবল অঘটন ঘটনা পটীয়সী মহামায়ার লীলা-বিলাস মাত্র। কার্য্যদ্বারাই কারণের অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যজাত নিখিল জগৎ অজ্ঞানময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বলিয়া, ইহার কারণরূপ জড় ও অজ্ঞানময় অর্থাৎ জগৎকারণ মায়া ও অজ্ঞানরূপিণী ॥৩॥

---

* “যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ-সেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥”

† শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

আত্মা এবং মায়া পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় উভয়েরই সংখ্যা-বিষয়ক সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলিতেছেন—

জ্ঞানরূপ হওয়ায় তিনি (রস) একই এবং অজ্ঞানরূপ হওয়ায় তিনি (মায়া) অনন্ত।৪।

রসস্বরূপ পরমাত্মা জ্ঞানরূপ হওয়ায় এক—অদ্বিতীয় এবং জড়রূপা মায়া অজ্ঞানস্বরূপিণী হওয়ায় অনন্ত অর্থাৎ বহু। সর্ব্বব্যাপক, পূর্ণ, বিকাররহিত সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মা এক—অদ্বিতীয়। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, "পরমাত্মা এক ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপক এবং প্রাণি-সমূহের অন্তরাত্মা"*। সাধক যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিভূমিতে সম্যক্‌রূপে আরূঢ় হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন, তখনই আত্মার এই অদ্বিতীয় রূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেননা একমাত্র জ্ঞানই পরমাত্মার স্বরূপোপলব্ধির কারণ। এই বিষয়ে শ্রুতিও বলিতেছেন যে, "যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জ্ঞান দ্বারাই পরিজ্ঞাত হইয়া সাধক সমস্ত পাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন"†। এইরূপে স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে, "এক,—

(৪) জ্ঞানরূপত্বাৎ স এক এব, অজ্ঞানরূপত্বাচ্চ সাঽনন্তা।৪।

* একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

† নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিখিল জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম ; এইজন্য জ্ঞানদ্বারা সাধক আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া অদ্বিতীয় চিদানন্দে নিমগ্ন হইয়া যান”*। প্রকৃতির বৈভবরূপ সৃষ্টি অজ্ঞানেরই লীলা-বিলাস মাত্র। সুতরাং সৃষ্টিজাত নিখিলপদার্থের অনন্ত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হওয়া বিজ্ঞান-সিদ্ধ। এই বৈচিত্র্য-প্রতীতির কারণ অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানই মায়ার স্বরূপ। এইজন্যই জড়রূপা মায়া অনন্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৪॥

পরমাত্মা জ্ঞানরূপ হইলেও অপ্রাপ্য নহেন, এই বলিয়া আশ্বাসিত করিতেছেন—

সৃষ্টির অতীত এবং বুদ্ধির পর হইলেও পরমাত্মা ভক্তি-লভ্য ।৫।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণাম-জাত বলিয়া নিখিল সৃষ্টিও ত্রিগুণময়। পরন্তু পরমাত্মা নির্গুণ। সুতরাং রসরূপ পরমাত্মা ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টির অতীত। কিন্তু বুদ্ধি আদি প্রাকৃতিক পদার্থের অতীত হইলেও পরমাত্মাকে ভক্তি-মানগণ ভক্তিদ্বারাই লাভ করিতে পারেন। মহত্তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় বুদ্ধিও প্রকৃতিরই অন্তর্গত। সুতরাং

---

* বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং
ব্রহ্মৈতজ্জগদাপরাণু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়-শ্রুতেঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সংত্যক্ত-বাহ্যাঃ স্ফুটং
ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈব ধ্রুবম্॥

(৫) সৃষ্টেরতীতো বুদ্ধেশ্চ পরঃ স ভক্তিলভ্যঃ।৫।

পরমাত্মাকে বুদ্ধিদ্বারাও লাভ করা যাইতে পারে না। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "ইন্দ্রিয়ের পরে ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন বিষয়ের পরে, মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতেও পরে মহত্তত্ত্ব, আবার মহত্তত্ত্ব হইতেও অব্যক্ত পরে এবং আত্মা এই অব্যক্তেরও পরে অর্থাৎ অতীত; পরমাত্মার পরে আর কিছুই নাই; তিনিই অন্তিম গতি"*। এইরূপে আরও কথিত হইয়াছে যে, "আত্মা শব্দস্পর্শরহিত, অনাদি, অনন্ত এবং মহত্তত্ত্বেরও অতীত, এই পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইলে জন্ম-মৃত্যুর ভয় থাকেনা"†। আবার স্মৃতিতেও এই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, "আনন্দরূপ পরমাত্মা শব্দরাজ্যের অতীত, মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারেনা, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য ও পূর্ণানন্দস্বরূপ"‡। এইরূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্বন্ধের অতীত হইলেও

---

* ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

† অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

‡ শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

কেবল ভক্তিদ্বারাই লভ্য। এই কথার সমর্থন করিয়া শ্রুতিও বলিতেছেন যে, "ভক্তিদ্বারাই পরমাত্মা প্রাপ্য, ভক্তির সহায়তায় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হন, এইজন্য ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-সমূহের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপায়। উপনিষদ্‌রূপ ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনারূপ তীক্ষ্ণ শর যোজনা করত ভক্তিযুক্ত চিত্তে যখন প্রয়োগ করা হয়, তখনই পরমাত্মারূপ লক্ষ্য ভেদ হইয়া থাকে"*। আবার স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে, "শ্রুতিলভ্য পরমাত্মা সাধকের ভক্তিযুক্ত হৃৎ-কমলরূপ আসনে সমাসীন হয়েন। সাধক প্রাকৃতিক গুণের অধীন না হইয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হৃদয়ে ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারেন"†। এইরূপে শ্রীগীতোপনিষদে ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, "হে অর্জ্জুন! বেদাধ্যয়ন তপ দান যজ্ঞাদি কোন অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাকে

---

* "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী"।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধিয়ীত।
আযম্য তদ্ভাগবতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥

† "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতীক্ষিত-পথো নন্থ নাথ! পুংসাম"
অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগুর্ণানাং,
জ্ঞানেন বৈরাগ্য-বিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুদ্ধম্॥

প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল অনন্য-ভক্তিদ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়”* । ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দ্বারা যে মুক্তিলাভ হয়, তাহাও ভাগ্যবান সাধক ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সুতরাং ভক্তিই মুক্তির কারণ । এইজন্য স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, “ভগবানের প্রতি ভক্তি-যুক্ত হইয়া আনন্দ-ভাবোন্মত্ত সাধক উক্ত ধ্যেয় বস্তুতে স্বীয় চিত্ত সংলগ্ন করিয়া অবশেষে গুণাতীত আত্মসাক্ষাৎকাররূপ নিঃশ্রেয়সপদ লাভ করিয়া থাকেন”† । অতএব ভক্তিই জীবের ভব-ভয় দূর করিয়া পরমানন্দময় নির্ব্বাণপদে লইয়া যাইতে সমর্থ ॥৫॥

---

* নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন !
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

† এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধ-ভাবো
ভক্ত্যা দ্রবৎ-হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।
ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্প-কলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্ত-বড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥
মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্ত-গুণ-প্রবাহঃ ॥
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখ-দুঃখ-বাহ্যে ।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ,
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধ পরাত্মকাষ্ঠঃ ॥

এই ভক্তির লক্ষণ কি, এই প্রশ্নে বলিতেছেন—

উহা অনুরাগরূপ ।৬।

পূর্ব্বোক্ত ভক্তি অনুরাগাত্মিকা। চিত্তের যতগুলি বৃত্তি আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ কারণরূপ বৃত্তি দুইটী, যথা রাগ ও দ্বেষ; এই উভয়ের মধ্যে দ্বেষবৃত্তি তমঃ-প্রধান হওয়ায় দুঃখদায়িকা এবং রাগবৃত্তি সত্ত্বপ্রধান হওয়ায় সুখদায়িকা হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনেও লিখিত আছে যে, "সুখানুশয়ী রাগঃ" "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ," অর্থাৎ রাগ সুখকারক এবং দ্বেষ দুঃখকারক। তন্মধ্যে অধোগতিপ্রাপক দ্বেষবৃত্তির প্রতিকূল, উন্নতির নিদানভূত ও অনুরাগবৃত্তির সমভূমিস্থিত অনুরাগের নামই ভক্তি। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভাগীরথীর অবিরল জলধারার ন্যায় সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি যে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ, তাহাই 'ভক্তি' নামে কথিত"*। সুতরাং সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাকেই ভক্তি বলে। অতএব ভক্তি অনুরাগরূপা ॥৬॥

(*) সানুরাগরূপা ।৬।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

সেই অনুরাগ কিরূপ ?

স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধাতিরিক্ত অলৌকিক ঈশ্বরানুরাগরূপ ।৭।

পরমাত্মার প্রতি পরম অনুরাগরূপিণী ভক্তি লৌকিক স্নেহ, প্রেম এবং শ্রদ্ধা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। লৌকিক প্রীতি বা অনুরাগ সাধারণতঃ তিন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধা। পুত্র কন্যাদির প্রতি নিম্ন-প্রবহণশীল যে অনুরাগ-প্রবাহ, তাহাকে স্নেহ বলে ; মিত্র-কলত্রাদি সমসমে যে অনুরাগ হয়, তাহাকে প্রেম এবং পিতা মাতা আদি গুরুজনের প্রতি যে উর্দ্ধগামী অনুরাগ হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলা হইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ লৌকিক অনুরাগ প্রবাহই নাশশীল বিষয়াবলম্বী হওয়ায় নশ্বর,—অচিরস্থায়ী। কেননা উহার আশ্রয়ভূত জগৎ নশ্বর হওয়ায় তাহা অবশ্যই নশ্বর হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু ভক্তি অবিনশ্বর পরমাত্মার প্রতিই অলৌকিক অনুরাগস্বরূপ হওয়ায় এতৎসমুদয় হইতে অতিরিক্ত ॥৭॥

ঈশ্বরানুরাগরূপ ভক্তি কতিবিধ ?—

ভক্তি দ্বিবিধ, গৌণী ও পরা ।৮।

ভক্তি সাধারণতঃ গৌণী ও পরা ভেদে দুই প্রকার। সাধন দশাগতভক্তি 'গৌণী' এবং সিদ্ধ দশাগতভক্তি 'পরা' নামে

(৭) স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধাতিরেকাদলৌকিকেশ্বরানুরাগরূপা ।৭।

(৮) সা দ্বিধা, গৌণী পরা চ ।৮।

আখ্যায়িত। আনন্দময় ভগবানের যে আনন্দসত্তা তাহা জীব দুই প্রকারে অনুভব করিতে পারে। যতদিন বিষয়সংযুক্ত হইয়া জীব অজ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করে, ততদিন সে প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত বিষয়ানন্দই অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এবং মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিলে স্বরূপানন্দ অনুভবে সমর্থ হয়। এই দুই স্বতন্ত্র অধিকার বশতঃই ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ এই স্বভাবসিদ্ধ দুই অধিকারীর জন্য ভক্তিমার্গকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এই বিজ্ঞানই এরূপ বিভাগদ্বয়ের কারণ ॥৮॥

ক্রমশঃ ভেদ বিবরণ বর্ণিত হইতেছে—

স্বরূপ-প্রকাশক হওয়ায় পূর্ণ আনন্দপ্রদ-ভক্তিই 'পরা ভক্তি' ।৯।

ভক্তগণ পরাভক্তিদশায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ। অতএব পরাভক্তি দশাতে ভক্ত যখন সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণস্বরূপ, পরমানন্দময় পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন, তখন পূর্ণজ্ঞানী ভক্ত পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। শ্রুতিতেও লিখিত হইয়াছে যে, "আনন্দরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভক্ত আনন্দরূপই হইয়া থাকেন"*। জীব পরমাত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হেতু প্রকৃতিগত ইচ্ছা,

---

(৯) স্বরূপ-দ্যোতকত্বাৎ পূর্ণানন্দদা পরা ।৯।

রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি।

(ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে সভা রেজেষ্টারী করণোদ্দেশ্যে)

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের

মেমোর‍্যাণ্ডাম্ অব্ য়্যাসোসিয়েসন্।

১। এই সভার নাম "শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল" হইবে।

২। সভার কার্য্যক্ষেত্র—সমগ্র বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় বিস্তৃত হইবে।

৩। সভার প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু আবশ্যক হইলে বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সদস্যগণের এবং বঙ্গদেশের শাখা সভাসমূহের মতানুসারে "শ্রীভারতধর্ম্মমণ্ডলের" অনুমোদনানুযায়ী অপর কোন উপযুক্ত স্থানে উহা স্থানান্তরিত হইতে পারিবে।

৪। সভার উদ্দেশ্য ঃ—

(ক) শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা ও উপদেশানুসারে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি সাধন।

(খ) সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিস্তারের জন্য বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসভা সংস্থাপন এবং তজ্জন্য উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষক ও প্রচারক প্রস্তুতের ব্যবস্থা।

(গ) সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থাদি উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হইয়া, যাহাতে বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বন্দোবস্ত, ঐ সকল গ্রন্থের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ও প্রচার করা এবং ঐ বিষয়ে স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট প্রাচীন ও নূতন গ্রন্থাদি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।

(ঘ) হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন।

(ঙ) সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং সাধারণতঃ হিন্দু-সমাজের একতা ও সামঞ্জস্য বর্দ্ধন।

(চ) হিন্দুর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরক্ষণ ও দৃঢ়ীকরণ।

(ছ) হিন্দুসমাজের পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা এবং নিরাশ্রয়া সধবা ও অসহায়া বিধবাগণের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত উপায়-বিধান এবং সমাজহিতকর ও দাতব্য কার্য্য-সংসাধনোদ্দেশে "সেবা-সমিতি" আদি সংস্থাপন।

(জ) হিন্দু নরনারীর বিদ্যাশিক্ষার বিশেষতঃ ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা।

(ঝ) বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলন ও প্রচার-প্রভাবে সমগ্র ভারতে হিন্দুভাবের আদান প্রদান।

(ঞ) হিন্দুর যে সকল পবিত্র তীর্থস্থানে অনাচারাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিরাকরণ জন্য প্রকৃত উপায় অবলম্বন এবং বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ঐ সকল স্থানের পবিত্রতা এবং গৌরব বর্দ্ধনের ব্যবস্থা।

(ট) হিন্দু দেবালয়, মঠ, ধর্ম্মশালা এবং অন্যান্য দাতব্য সভাসমিতির সম্পত্তি ও ধনভাণ্ডার যাহাতে সুরক্ষিত ও সুপরিচালিত এবং লুপ্ত তীর্থাদির উদ্ধারসাধন হয়, তদ্বিষয়ক সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(ঠ) হিন্দুর ধর্ম্মোৎসবের আবশ্যকতা ও উৎপত্তির মূল জনসাধারণের নিকট প্রচার এবং হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রকৃত তিথি নির্ণয় এবং যথারীতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

(ড) গো-রক্ষার জন্য আইনসঙ্গত উপায় বিধান।

(ঢ) সমগ্র ভারতের স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুজাতির প্রতিনিধি "শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল" নামক বিরাট সভার স্থানীয় প্রতিনিধি স্বরূপে শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের যাবতীয় উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্লাদি যাহাতে যথাসম্ভব বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(ণ) সভার উল্লিখিত সমস্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য উপযুক্ত ও আইনসঙ্গত উপায় গ্রহণ।

৫। সভার বর্ত্তমান কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বা governing bodyর নাম ধাম ও পেসা নিম্নে লিখিত হইল।

৬। সভার আয় এবং সম্পত্তি যে স্থান হইতে অর্জ্জিত হউক না কেন,

উহা সভার নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধন জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হইবে ; সভা-সংক্রান্ত কোন প্রকার আয় হইতে ডিভিডেণ্ট বা বোনাস ভাবে অথবা অন্য কোন প্রকারে কোন সভ্য কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং উক্ত প্রকার আয় হইতে সদস্যগণ পরস্পরের মধ্যে উক্ত আয়ের লভ্য অংশ-রূপে বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন না।

৭। সভার হস্তে গচ্ছিত ধন ও সম্পত্তির পরিচালন-সম্বন্ধে কোন ক্ষতি বা সম্পত্তির হানিজনক কার্য্য বা অপচয় ইচ্ছাপূর্ব্বক সঙ্ঘটিত হওয়ার প্রমাণ ভিন্ন কোন সভ্য বা কর্ম্মচারী তজ্জন্য দায়ী হইবেন না।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের

নিয়মাবলী।

১। শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য পরবর্ত্তী নিয়মানুসারে একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি (Executive council) গঠিত হইবে।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সাধারণ সভা গঠিত হইবে :—

৩। সংরক্ষক (Patron) :—সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত অন্যূন ¾ (তিন চতুর্থাংশ) ভাগ সভ্য কর্ত্তৃক সভার সংরক্ষক রূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এইরূপে নির্ব্বাচিত সংরক্ষকগণ সাধারণসভা ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে মণ্ডলের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদান এবং উহার ক্যর্য্যক্ষেত্রের প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য সাধারণভাবে পরিদর্শন করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন সাধারণ সভায় বা কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতিতে তাঁহারা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা যে কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিবেন।

৪। সহায়ক সভ্য (Sahayak member) :—সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী বার্ষিক অন্যূন ১২৲ বার টাকা চাঁদা প্রদান করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচনে "সহায়ক" সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। সভায় উপস্থিত না হইয়াও, তাঁহারা উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা সভার প্রস্তাবিত বিষয়ে, অভিমত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৫। (ক) সাধারণ সভ্য (Ordinary member) :—
সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কোন পুরুষ বা স্ত্রী বার্ষিক অন্যূন ৩৲ তিন টাকা চাঁদা প্রদান করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচনে সাধারণ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীলোক, তাঁহারা উপযুক্তরূপে প্রতিনিধি (proxy) নির্ব্বাচন করিয়া সভার সকল কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন।

(খ) সাধারণ সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা সভাকে এককালীন ১০০৲ এক শত টাকা দান করিবেন, তাঁহারা "আজীবন"-সভ্যরূপে (Life member) পরিগণিত হইতে পারিবেন। তাঁহাকে আর কখনও চাঁদা দিতে হইবে না।

৬। বিশেষ সভ্য (Honorary member) ঃ- শ্রীবঙ্গ-ধর্ম্মমণ্ডলের সহিত সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শাখা-সভা কর্ত্তৃক মণ্ডলের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে যাঁহারা ঐ সকল শাখা সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যাঁহাকে অবৈতনিক ভাবে কার্য্যকারক-রূপে মনোনীত করিবেন, তাঁহারা "বিশেষ সভ্য" বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

৭। "সংরক্ষক সভ্য" "সহায়ক সভ্য" "সাধারণ সভ্য", "আজীবন সভ্য" ও "বিশেষ সভ্যগণ", সভা হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন এবং সাধারণ সভ্যগণ "ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের" সমাজ-হিতকরী-কোষ" হইতে নিয়মানুযায়ী আর্থিক সাহায্য লাভে সক্ষম হইবেন।

৮। প্রকাশ থাকে যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কোন সভ্য বিনা-উপযুক্ত কারণে যদি ক্রমান্বয়ে উক্ত সমিতির পর পর তিনটী অধিবেশনে উপস্থিত না হয়েন, তাহা হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার নাম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যতালিকা হইতে উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

৯। সাধারণ সভার অধিবেশন ঃ—

(ক) প্রতিবর্ষে অন্ততঃ একবার অধিবেশন হইবে। সেই অধিবেশনে মণ্ডলের বার্ষিক উৎসব, আগামী বর্ষের বজেট, বিগত বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন ও কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনানুসারে অন্য সময়ে এবং সদস্যগণের মধ্যে অন্ততঃ ২০ বিশ জন সভ্য হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক পত্র লিখিলে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দিনে সভার সাধারণ অধিবেশন হইতে পারিবে।

(খ) এই সকল অধিবেশনের স্থান, সময় এবং আলোচ্য বিষয়গুলি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

(গ) ঐ সকল অধিবেশনে অধিক সংখ্যক সভ্যের অভিমত (ভোট) অনুসারে সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। যে সকল সভ্য আলোচ্য বর্ষের চাঁদা দেন নাই অথবা সভ্যের তালিকা হইতে যাঁহাদের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারা সভার অধিবেশনে অভিমত (ভোট) দিবার অধিকার পাইবেন না।

(ঘ) উক্ত অধিবেশনে প্রয়োজন-মত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে. নিয়মাবলী সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় প্রস্তাব লিখিতভাবে হওয়া আবশ্যক হইবে এবং ঐ লিখিত প্রস্তাবের অনুলিপি প্রত্যেক সভ্যের নিকট সভার কার্য্য-স্থচীসহ প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঃ—

(ক) সভার বার্ষিক অধিবেশনে আগামী বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। কর্ম্মচারী ব্যতীত এই সমিতির সভ্য সংখ্যা ২৫ জনের অধিক ও ১৫ জনের কম হইবে না। সভার সভ্য ভিন্ন অপরে এ সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন না।

(খ) সভাপতি, সহকারী সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিগণ ও কোষাধ্যক্ষ পদানুরোধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইবেন।

১১। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা ঃ—

(ক) সভার কার্য্য-পরিচালন জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন এবং তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

(খ) মণ্ডলের সম্পত্তি ও তহবিলের উপর কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন এবং তাহার রক্ষণ ও পরিচালনের ব্যবস্থা।

(গ) মণ্ডলের পরিচারক ও কার্য্যকারকদিগের পরিচালন জন্য উপবিধি (bye-laws) প্রণয়ন এবং তাঁহাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি, অবকাশ-দান ও অস্থায়ীভাবে কার্য্য হইতে অপসারণ।

(ঘ) মণ্ডলের নিয়ম এবং উদ্দেশ্যানুরূপ প্রয়োজন অনুসারে উপবিধি (bye-laws) প্রণয়ন।

(ঙ) অবস্থানুসারে মণ্ডলের অবলম্বিত অনুষ্ঠানের অনুকূল অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ।

১২। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সভ্য সংখ্যা ঃ—সাধারণ সভার ন্যায় অধিকসংখ্যক সভ্যের মতানুসারে এই সমিতির সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে ; কিন্তু সভার কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যূন চারিজন সভ্য উপস্থিত না হইলে সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবে না। তন্ন্যূনে সমিতির অধিবেশন স্থগিত রহিবে। ঐরূপ স্থগিত অধিবেশনের পরে উহার পুনর্বিজ্ঞাপিত অধিবেশনে চারিজনের পরিবর্ত্তে তিনজন মাত্র সভ্য উপস্থিত হইলেই সমিতির কার্য্য চলিবে।

১৩। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন ঃ—বৎসরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ছয়টী অধিবেশন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রয়োজন হইলে, উহার অপেক্ষা অধিক অধিবেশনও হইতে পারিবে। ঐ সকল অধিবেশনে কার্য্য-সূচীর নির্দ্দিষ্ট বিষয়, বিগত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এবং মণ্ডলের আয়-ব্যয়ের হিসাব আদি আলোচিত হইবে।

১৪। সাধারণ সভা ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের বিজ্ঞাপন ঃ—মন্ত্রী কিংবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত অপর কোন কর্ম্মচারী, মণ্ডলের সভা-সম্পর্কীয় সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারিবেন। সাধারণ সভার জন্য উহার অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট দিনের ১৫ দিন পূর্ব্বে এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের অন্যূন পাঁচদিন পূর্ব্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এই নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

১৫। সভার কর্ম্মচারী ঃ—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী নামে অভিহিত হইবেন ঃ—

(ক) একজন সভাপতি, (খ) দুইজন সহকারী সভাপতি, (গ) একজন প্রধান মন্ত্রী (Chief Secretary), (ঘ) এক বা ততোধিক মন্ত্রী (Secretary) (ঙ) একজন ধনাধ্যক্ষ (Treasurer)।

১৬। যদি বৎসরের মধ্যে কোন কর্ম্মচারীর পদ কোন কারণে শূন্য

হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরের অবশিষ্ট কালের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঐ পদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা :—

১৭। **সভাপতি** :—মণ্ডলের সমস্ত কার্য্যের উপর সভাপতির সাধারণ ভাবে কর্তৃত্ব থাকিবে।

(ক) তিনি সভার কর্ম্মচারিগণের কার্য্যসম্পাদনে সহায়তা প্রদান এবং কার্য্য-পরিচালনের সুব্যবস্থা করিবেন।

(খ) উপস্থিত থাকিলে তিনিই সর্ব্বপ্রকার অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবেন।

১৮। **সহকারী সভাপতি** :—সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী-সভাপতি সভার অধিবেশন-সংক্রান্ত সভাপতির যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

১৯। **প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য** :—(ক) বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কার্য্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে সম্পন্ন করা এবং সমিতি কর্তৃক পরিগৃহীত সঙ্কল্পাদির যাহাতে সমাধান হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(খ) বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের প্রতিনিধি স্বরূপ আদালত বা রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া মণ্ডল-সম্পর্কীয় আইন-ঘটিত কার্য্যাদির ব্যবস্থা করা।

(গ) বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়, মণ্ডল-সংশ্লিষ্ট শাখাসমিতিগুলি এবং প্রচার-সমিতির কার্য্যাবলী তত্ত্বাবধান করা ও পরিদর্শন করা।

(ঘ) মণ্ডলের মুখপত্র ও তাহাতে প্রকাশ্য প্রবন্ধাদি ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থা করা।

(ঙ) মণ্ডলের সমস্ত প্রাপ্য টাকাকড়ি আদায় করিয়া কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করা। প্রকাশ থাকে যে, মণ্ডলের নিয়মিত অত্যাবশ্যক খরচের জন্য নিজের নিকট ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রী রাখিতে পারিবেন। বাকী সমস্ত টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকট থাকিবে।

আরও প্রকাশ থাকে যে, বিশেষ প্রয়োজন স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমতি লইবার পূর্ব্বে ১০৲ (দশ) টাকা পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রী ব্যয় করিতে

পারিবেন; কিন্তু ঠিক পরবর্ত্তী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উক্ত টাকা ব্যয়ের বিবরণ জানাইয়া উহা অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন।

(চ) মণ্ডল-সংক্রান্ত সমস্ত পত্র ব্যবহার করা এবং মণ্ডলের সাধারণ, বিশেষ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপস্থাপ্য কার্য্যতালিকা প্রণয়ন এবং উক্ত সমস্ত সভার অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী প্রস্তুত করা।

(ছ) মণ্ডলের অধিবেশন-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার আহ্বান-পত্র স্বাক্ষর করিয়া তাহা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রেরণ করা।

(জ) মণ্ডলের আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা।

(ঝ) কার্য্যালয়ের এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজপত্র ও পুস্তকাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সমস্ত বেতনভোগী ও অবৈতনিক কার্য্যকারকগণ তাঁহার আয়ত্তাধীন থাকিবেন।

(ঞ) আয়-ব্যয়ের হিসাব Budget অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রধান মন্ত্রী প্রয়োজন মত তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার মন্ত্রিগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ প্রকারে যদি সাধারণ ভাবে কোন মন্ত্রীর প্রতি কোন বিষয়ের ক্ষমতা বা অধিকার অর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহা অনুমোদনার্থ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গোচরে আনিতে হইবে।

২০। মন্ত্রী ঃ—প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশানুসারে সভার নিয়মানুযায়ী মণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন এবং বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। কোষাধ্যক্ষ ঃ—মন্ত্রী কোষাধ্যক্ষের হস্তে যে টাকা জমা দিবেন, কোষাধ্যক্ষ তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর কিম্বা তৎকর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত পত্র ভিন্ন কাহাকেও কোন টাকা দিবেন না।

২২। পদচ্যুতি ঃ—কোন কারণবশতঃ কোন সভ্যকে মণ্ডলের সংস্রব হইতে অপসারিত করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার অনুরোধক্রমে সভার সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত

সভ্যের অন্যূন ¾ (তিন-চতুর্থাংশ) সংখ্যক সভ্যের মতানুসারে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে।

২৩। মণ্ডলের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ১০৲ দশ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্ম্মচারীদিগকে গুরুতর কারণবশতঃ অপসারিত করিবার আবশ্যক হইলে, প্রধান মন্ত্রী তাহা করিতে পারিবেন। কিন্তু ১০৲ দশ টাকার ঊর্দ্ধ বেতনের কোন কর্ম্মচারী সম্বন্ধে ঐ প্রকার কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে প্রধান মন্ত্রী তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মতে কার্য্য করিবেন।

২৪। **বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রচারক** ঃ—শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে নিযুক্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রচারক, যিনি বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবেন, তাঁহার নিয়োগ বা পদচ্যুতির আদেশ শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের হস্তে থাকিবে। কিন্তু যত দিন তিনি বা তাঁহারা বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অধীনে কার্য্য করিবেন, ততদিন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশানুসারে চলিতে হইবে। তাঁহাদের কার্য্য-শৈথিল্য, কার্য্যে অমনোযোগিতা, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম, স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য দোষ লক্ষিত হইলে, প্রধান মন্ত্রী সে বিষয় শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলে বিজ্ঞাপিত করিয়া সেখানকার অভিমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

২৫। **মণ্ডলের সহিত সংশ্লিষ্ট শাখাসভা সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম** ঃ—(ক) মণ্ডলের কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে উহার উদ্দেশ্যানুরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তার কল্পে প্রতিষ্ঠিত যে কোন ধর্ম্মসভা বৎসরে ১২৲ টাকা, ২৫৲ টাকা বা ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সভাকে প্রদান করিলে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেন। ঐরূপে সংশ্লিষ্ট সভা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবেন।

(খ) ঐরূপে সংশ্লিষ্ট সভা বৎসরে ১২৲ টাকা দান করিলে একজন, ২৫৲ টাকা দান করিলে দুইজন, এবং ৫০৲ টাকা দান করিলে চারিজন প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার পাইবেন।

(গ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আর্থিক অবস্থা বা তদ্রূপ কোন বিশেষ কারণ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐরূপ সভাকে উক্ত সংশ্লেষ-ঘটিত অর্থদান হইতে

মুক্তি দিতে পারিবেন। ঐরূপে দায়মুক্ত সভা সাধারণ সভায় একজন মাত্র প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবেন।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট শাখাসভাসমূহ স্থানীয় অবস্থানুসারে কার্য্য পরিচালন জন্য স্ব স্ব নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া উহা বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের অনুমোদনার্থ পাঠাইবেন। উক্ত নিয়মাবলী বঙ্গধর্ম্মমঙ্গল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে শাখাসভা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু ঐ সকল সভার সুপরিচালন উদ্দেশ্যে বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল কর্ত্তৃক যে সকল অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধি অবধারিত হইবে, সংশ্লিষ্ট সভাকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর কাল নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান না করিলে, এবং বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ করিলে সংশ্লিষ্ট সভার নাম, মণ্ডলের রেজিষ্টার হইতে পরিত্যক্ত করিবার অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

২৬। প্রচার-কার্য্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সভার অধিকার ঃ— সংশ্লিষ্ট সভা "শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের" সপ্ত প্রধান বিভাগের সমস্ত অধিকার পাইবেন। বেতনভোগী উপদেশক ও প্রচারক এবং অবৈতনিক প্রচারকগণ শাখা-সভার বার্ষিক অধিবেশন অথবা কোন বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট সভাকে পাথেয় ভিন্ন অন্য কোন খরচ দিতে হইবে না। তাঁহারা অন্যান্য সময়ে সভার স্থানীয় কার্য্য-ক্ষেত্র-মধ্যে প্রচার-কার্য্য পরিচালন করিবেন।

২৭। বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের সহিত অসংশ্লিষ্ট সভার সম্বন্ধ ঃ— যে সকল ধর্ম্মসভার উদ্দেশ্য মণ্ডলের অনুরূপ, সেই সকল সভা মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত না হইলেও প্রচার-কার্য্য উপলক্ষে উহা হইতে যথাসম্ভব সাহায্য পাইতে পারিবেন। ঐরূপ অসংশ্লিষ্ট সভা মণ্ডলের "সহায়ক সভা" নামে অভিহিত হইবেন।

২৮। ধর্ম্মপ্রচারক ও উপদেশক ঃ—(ক) যে কোন সুশিক্ষিত ও সুচরিত্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি, মণ্ডলের উদ্দেশ্যানুরূপ ধর্ম্মপ্রচার ও অন্যান্য কল্যাণকর কার্য্যের সম্পাদন জন্য ধর্ম্মপ্রচারক পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(খ) যে কোন সাধু অথবা শাস্ত্রবিশারদ, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, মণ্ডলের অনুরোধক্রমে "শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল" হইতে উপদেশক ও মহোপদেশক বলিয়া পরিচয় ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন, তিনি ধর্ম্মোপদেশকরূপে কার্য্য করিবার বিশেষ অধিকার পাইবেন।

২৯। ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক-মণ্ডলী ঃ—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সনাতন-হিন্দুশাস্ত্র-বিশারদ, নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া ব্যবস্থাপক মণ্ডলী সংগঠন করিবেন। কোন অত্যাবশ্যক ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থাবিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জিজ্ঞাসিত হইলে, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবেন। ধর্ম্মোপদেশকগণ এই ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক সভা এবং প্রচার-সমিতি, মণ্ডলের নিয়মানুসারে উক্ত মণ্ডলীর জন্য, স্থানীয় উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত পণ্ডিত মনোনীত করিবার অধিকার পাইবেন।

২৮। মণ্ডলের মুখপত্র ঃ—মণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে সভার আর্থিক অবস্থানুযায়ী মাসিক, ত্রৈমাসিক, দ্বৈমাসিক, পাক্ষিক, অথবা সাপ্তাহিক একখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইবে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় ব্যতীত উক্ত পত্রিকায় মণ্ডলের উদ্দেশ্যানুযায়ী সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইবে। উক্ত পত্রিকা মণ্ডলের মুখপত্ররূপে গণ্য হইবে এবং উহা মণ্ডলের সমস্ত সভ্যগণকে এবং সংশ্লিষ্ট সভাকে বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

২৯। বিবিধ ঃ—কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের নির্দ্দিষ্টকাল গত হইলে, নূতন কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা পদস্থ থাকিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য পরিচালন করিবেন।

সমাজ-হিতকরী-কোষ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

(১) সাধারণ মেম্বরগণ ও তাঁহাদের নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারিগণের (Nominees) উপকারের জন্য সমাজ-হিতকরী-কোষ (Mahamandal Benevolent Fund) নামক একটী ফণ্ড খোলা হইয়াছে। তিন বৎসরকাল ক্রমান্বয়ে নিয়মিতরূপে বাৎসরিক চাঁদা দিবার পরে কোন মেম্বরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী (Nominee) এই সমাজ-হিতকরী-কোষ (Mahamandal Benevolent Fund) হইতে অর্থ-সাহায্য পাইবেন।

(২) তিন বৎসরের মধ্যে কোন মেম্বরের মৃত্যু হইলে তাঁহার নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী (Nominee) সমাজ-হিতকরী-কোষ হইতে কোন সাহায্য পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) ইচ্ছা করিলে কোন মেম্বর একবার বিনা-ব্যয়ে স্বীয় নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারীর (Nominee) নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। তৎপরে উত্তরাধিকারীর (Nominee) নাম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, সেই মেম্বরকে ।০ চারি আনা হিসাবে ফি দিতে হইবে।

(৪) সাধারণ মেম্বরগণ এবং অন্য অন্য মেম্বরগণের নিকট হইতে চাঁদা-স্বরূপ যত টাকা আদায় হইবে, উহার ⅓ এক-তৃতীয়াংশ শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়ে সমাজ-হিতকরী-কোষে রাখা হইবে, এবং বাকী শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের গ্রন্থমালা প্রকাশ আদি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

(৫) সমাজ-হিতকরী-কোষে যত টাকা জমা হইবে, সেই সমস্ত টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইবে।

(৬) সমাজ-হিতকরী-কোষের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটী বিশেষ কমিটী থাকিবে।

(৭) এক বৎসরের মধ্যে যতগুলি মেম্বরের মৃত্যু হইবে, সেই সকল মেম্বরের নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে ঐ বৎসরের সমাজহিতকরী-কোষে যত টাকা জমা হইবে,তাহার অর্দ্ধাংশ সমানভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে; আর অপরার্দ্ধ যাহা উক্ত কোষে জমা থাকিবে, তাহা হইতে যে সুদ

পাওয়া যাইবে, সেই সুদ হইতে কমিটি বিশেষ বিবেচনা সহকারে মহামণ্ডলের যে কোন কর্ম্মচারীর পরিবারবর্গকে তাহাদের দুরবস্থার সময়ে অর্থ সাহায্য করিবেন।

(৮) কোন মেম্বরের মৃত্যু হইলে, মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষের তদ্বিষয়ের বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য যদি সেই মেম্বর মহামণ্ডলের শাখাসভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন, অথবা কোন শাখাসভার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সেই শাখা সভা হইতে মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ একখানি পত্র দাখিল করিতে হইবে। এইরূপে মেম্বরের মৃত্যুর প্রমাণ পাইলে, তবে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৯) যে স্থানে মহামণ্ডলের শাখা সভা নাই, তথায় মহামণ্ডলের কোন প্রতিনিধির নিকট হইতে, অথবা Native State হইলে তথাকার দরবারের উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে, অথবা নিকটবর্ত্তী কোন দরবারের উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কোন মেম্বরের মৃত্যুজনিত পত্রাদি যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) কোন মেম্বরের মৃত্যু হইলে, মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় স্বীয় বিবেচনা-মত স্থানীয় রাজকীয় কর্ম্মচারীর দ্বারাও উক্ত মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

(১১) সমাজ-হিতকরী-কোষে প্রতি বৎসর ৩৲ তিন টাকা চাঁদা প্রদান করা সত্ত্বেও যে সকল সদাশয় মেম্বর হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধনের এবং দরিদ্র-দিগকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-হিতকরী-কোষের আর্থিক সাহায্য নিজে গ্রহণ না করিবেন, তাঁহাদের নাম সহায়ক মেম্বরশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

(১২) শ্রীমহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় হইতে প্রত্যেক সাধারণ মেম্বর, মেম্বর-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রমাণস্বরূপ মহামণ্ডল-কার্য্যালয়ের মোহর-চিহ্নিত এবং পঞ্চ-দেবতার সুন্দর চিত্রসহ এক একখানি সার্টিফিকেট পাইবেন।

---

* এই সুদের টাকা হইতে প্রান্তীয় মণ্ডলের কর্ম্মচারীদেরও সহায়তা করা হইতে পারিবে এবং কমিটী উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এই সুদের টাকা হইতে কোন মেম্বরকেও সাহায্য করিতে পারিবেন।

(১৩) মেম্বরগণ বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিলে, রেজিষ্টার নম্বর সমেত তাঁহাদের নাম চাঁদা-প্রাপ্তিস্বীকার-স্বরূপে যিনি যে কার্য্যালয়ের পত্রিকা পাইয়া থাকেন, সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(১৪) প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে সেই বৎসরের ৩৲ তিন টাকা চাঁদা অগ্রিম দেয়। এই টাকা প্রদানের আরও একমাস সময় থাকিবে। যদি উক্ত অধিক সময়ের মধ্যে এই টাকা কোন মেম্বর না দেন, তাহা হইলে সেই মেম্বরের নাম রেজিষ্টার হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং তিনি সমাজ-হিতকরী-কোষ হইতে কোন সাহায্যলাভ করিবার যোগ্য থাকিবেন না।

(১৫) উপরোক্ত একমাস অধিককাল অতীত হইবার পরে ও তিনমাস অতীত হইবার পূর্ব্বে (অর্থাৎ মে মাস পর্য্যন্ত) কোন অসমর্থ (defaulting) মেম্বর চাঁদা সম্বন্ধে বিলম্বের বিশেষ কোন কারণ প্রদর্শন করিলে কমিটির সভ্য-গণের তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার অধিকার থাকিবে। এরূপ অসমর্থ মেম্বরকে ।০ চারি আনা ফি দিয়া কমিটির আজ্ঞানুসারে পুনরায় নাম লিখাইতে হইবে।

(১৬) বৎসরের মধ্যে যে কোন মাসে মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হইলেও তাঁহাকে সেই বৎসরের পূর্ণ বাৎসরিক চাঁদা দিতে হইবে। বর্ষারম্ভ জানুয়ারী মাস হইতে ধরা হইবে।

(১৭) যে ব্যক্তি মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি মহামণ্ডল আফিসে বা প্রান্তীয়মণ্ডল আফিসে প্রদত্ত আবেদন-পত্রে স্বাক্ষরাদি করিয়া কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন এবং তৎসঙ্গে ৩৲ তিনটাকা বার্ষিক চাঁদাও পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক বৎসরে সমাজ-হিতকরী-কোষের সাহায্যের দাবী তৎপরবর্ত্তী বৎসরের মার্চ্চমাসে স্থিরীকৃত হইবে। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা ৮ম সংখ্যক নিয়মানুসারে বৎসরের মধ্যেও কোন দাবী দাওয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(১৮) এককালীন ১০০৲ এক শত টাকা দিলে হিন্দুনরনারীমাত্রেই সমাজ-হিতকরী-কোষের আজীবন (life-member) মেম্বর এবং শ্রীমহামণ্ডল ও বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের মেম্বর হইতে পারিবেন। তাঁহাদের আর বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে না।

(১৯) উপর্য্যুক্ত নিয়মগুলিতে কোন নূতন নিয়ম যোগ করিতে, কোন নিয়মের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে, অথবা সমস্ত নিয়ম বা উহার যে কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে শ্রীমহামণ্ডলের ক্ষমতা থাকিবে।

(২০) সমাজ-হিতকরী-কোষের যাবতীয় সাহায্য শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে দেওয়া হইবে।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

১ম ভাগ {মাঘ, সন ১৩২৬। ইং জানুয়ারা ১৯১৯} ১০ম সংখ্যা।

নারীজীবন।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

কন্যাকাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এরূপ আপাতঃ প্রতীয়মান কঠোর আজ্ঞা স্ত্রীজাতির প্রতি কেন যে প্রয়োগ করা হইল, অব্যশিক্ষিত সুসভ্যম্মন্য অনেকেই ইহার মর্ম্মভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া মহর্ষিগণের প্রতি তীব্র কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়াছেন। অতএব এরূপ সংশয়প্রদ বিষয়ের সর্ব্বথা সমাধান হওয়া উচিত। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে কিরূপ দূরদর্শিতার সহিত পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্ত অস্বতন্ত্রতার আজ্ঞা দিয়াছেন। স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই জীবনের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই জীবনের অন্তিম লক্ষ্যের প্রতি অনুধাবন পূর্ব্বক স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কোন কার্য্য আপাততঃ সুখকর ও উল্লাসপ্রদ প্রতীত হইলেও যদি তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে লক্ষ্যসিদ্ধির বিষয়ে ব্যাঘাত হয়, তবে দূরদর্শী ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য যে প্রথম হইতেই সেরূপ কার্য্যে মনোনিবেশ না করেন। যখন একমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই স্ত্রীজাতি নিজযোনি হইতে মুক্তিলাভ

করিতে পারে এবং শরীর, মন, প্রাণ ও আত্মা সকলের দ্বারা পতিদেবতার সেবা ও পূজা করাকেই পাতিব্রত্য বলে, তখন পতি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার অধীন না হইলে, স্ত্রীজাতি কদাপি নিজধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে না। যে যাহার পূজা উপাসনা করিয়া তন্ময় হইবে, সে যদি উপাস্যের অধীন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী না হয়, তবে উপাসনাই হইতে পারে না। উপাস্য-উপাসকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের ভাব কদাপি আসিতে পারে না। কারণ শরীর মন প্রাণ আত্মার দ্বারা নিজেকে উপাস্যের মধ্যে বিক্রীত করিতে না পারিলে উপাসনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। ব্রজগোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এইভাবে বিক্রীতা হইয়াই তাঁহাতে তন্ময়তালাভ এবং তাঁহার অলৌকিক প্রেমলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য পুরুষের পক্ষে এরূপ ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়সপ্রদ হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে লয় হইয়া মুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়াই মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে যাহা হইতে পৃথক না হইলে মুক্ত হইতে পারে না, সে যদি তাহার অধীন হয়, তবে তাহার মুক্তি না হইয়া, বন্ধনই হইবে। এজন্য পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর বশীভূত হওয়া বন্ধনের কারণ। স্ত্রৈণ পুরুষ কদাপি নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে না। পুরুষের পক্ষে মায়াজাল হইতে স্বতন্ত্র এবং পৃথক থাকাই একমাত্র মুক্তির সেতু। অন্যপক্ষে স্ত্রী যদি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র হয় এবং মনে প্রাণে উপাস্য উপাসকভাবে পতিদেবতার পূজা ও অনুগমন না করে তবে তাহারও পতিপদে তন্ময়তা না হওয়ায় স্ত্রী যোনি হইতে নিস্তার লাভ হইতে পারিবে না। এসকল বিচার করিয়াই দূরদর্শী মহর্ষিগণ নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্ত কন্যা, গৃহিণী, বৃদ্ধা সকল অবস্থাতেই নারীজাতিকে পুরুষের অধীন থাকিতে বলিয়াছেন। কন্যাবস্থায় পিতার অধীন থাকিয়া এই প্রকার শীলতা ও নম্রতার শিক্ষালাভ করিতে হয়। তাহা হইলেই যুবাবস্থায় পতির অধীন থাকা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও পুত্রের বশে থাকা গ্লানিজনক বা সঙ্কোচপ্রদ হয় না। শ্রীভগবান্ মনুর উপর-কথিত আজ্ঞার ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য। সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে যতদিন পুরুষ প্রকৃতির অধীন থাকে ততদিন পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই বদ্ধ থাকে, কাহারও মুক্তি হইতে পারে না। পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া স্বস্বরূপে স্থিত হইলে তবে পুরুষের মুক্তি হয় এরূপ অবস্থায় প্রকৃতিরও

লয় হইয়া থাকে। বদ্ধপুরুষের প্রকৃতি লয় হইতে পারে না, পরন্তু নিজবিলাস-কলা দ্বারা পুরুষকে বন্ধনই করিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তানুসারে যদি স্ত্রী পুরুষের অধীন না হইয়া স্বাতন্ত্র্য-ভাবাপন্ন হয়, তবে সে পুরুষের মুক্তির পথে সহায়ক না হইয়া পুরুষকে নিজের অধীন করিয়া ফেলিবে। ফলে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও মুক্তি হইতে পারিবে না। উভয়েই সংসারবন্ধনে বদ্ধ থাকিবে। যদি স্ত্রী পুরুষের অধীন থাকে, তবেই পুরুষের পক্ষে স্বরূপলাভের সুবিধা এবং স্ত্রীর পক্ষেও তন্ময়তার পরিণামে লয় হইবার সুবিধা হইবে। অতএব নারীজীবনের স্বতন্ত্রতা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পক্ষে বিশেষ হানিকর ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রমাণ দিয়া ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার ইচ্ছা হইতেই প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। নিজের ইচ্ছা যদি নিজের বশে না থাকে, তবে নিজেরও হানি এবং ইচ্ছারও দুর্দ্দশা নিশ্চিত। অতএব ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতির পক্ষে ইচ্ছাময় পরমাত্মার অধীন থাকাই শ্রেয়স্কর এবং স্বাভাবিক। এই সিদ্ধান্তমতেও ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন স্ত্রীজাতির পক্ষে পতিদেবতার অধীন হওয়াই তাহার ও পতির পক্ষে মঙ্গলজনক। অন্যথা পুরুষ স্ত্রীর অধীন এবং স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যভাবাপন্ন হইলে উভয়েরই হানি। আধ্যাত্মিক অবনতি এবং গৃহস্থাশ্রমে মহান্ অনর্থ অবশ্যম্ভাবী হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই সকল কারণেই আর্য্যশাস্ত্রে নারীজাতির কল্যাণের জন্য তাহাকে পরতন্ত্র হইতে বলা হইয়াছে। ইহা নিষ্ঠুরতা বা কঠোরতা নহে, পরন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে পরম কল্যাণজনক দূরদর্শিতাপূর্ণ আর্ষ আজ্ঞা মাত্র। বৃদ্ধ মহর্ষিগণের করুণাপূর্ণ উপদেশ গুলিকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ও পরিপালন করিলে কেহই অকল্যাণভাজন হইবে না, প্রত্যুত অবলীলাক্রমে নিঃশ্রেয়সের রাজমার্গে অগ্রসর হইবে, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করা উচিত নহে। স্ত্রীকে পুরুষের মত শিক্ষা দিলে উহার হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভ্রমণ, স্বতন্ত্র প্রেম, স্বেচ্ছাচার আদি স্বতন্ত্রতা-ব্যঞ্জক ভাব সমূহ অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হইবে। কারণ পুরুষের জন্য বিহিত শিক্ষার মধ্যে এ সকল ভাব স্বতঃ পূর্ণ আছে। ইহাতে পুরুষের অনেক বিষয়ে লাভ থাকিলেও স্ত্রীজাতির বিশেষ হানি অবশ্যম্ভাবী অতএব স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত এবং স্ত্রীকে কদাপি পুরুষের মত শিক্ষা দেওয়া উচিত

নহে। ইহার দ্বারা আরও একটি গুরুতর অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই কিছু অভিমানিনী হইয়া থাকে। তাহার এই অভিমান যদি পাতিব্রত্যমূলক হয় তবে স্ত্রীজাতির পক্ষে উহা বড়ই কল্যাণ-দায়ক হইয়া থাকে। "আমার মনপ্রাণ পতিদেবতার চরণকমলে মধুকরের মত এতই নিমগ্ন যে, অন্য কোন পুরুষের চিন্তা আমি স্বপ্নেও করি না, আমার নেত্রে আমার পতি ছাড়া আর কেহ পুরুষ বলিয়াই বোধ হয় না, আমি এজন্যই বাঁচিয়া আছি যে আমি থাকিলে উনি সুখী হন, আমি মরিলে যদি উঁহার সুখ হয় তবে এখনই আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।" এইপ্রকার সৌভাগ্যগর্ব্ব সোহাগিণী সতীর মধুর জীবনকে আরও মধুময় করিয়া তুলে। যদি অভিমান হয়, তবে এইরূপ সাত্ত্বিক মর্ম্মস্পর্শী অভিমানই স্ত্রীলোকের হওয়া উচিত। যদি স্ত্রীকে পুরুষের মত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার উপর্য্যুক্ত অভিমান বিদূরিত হইয়া পুরুষের সহিত সমকক্ষতাজনক দূষিত অভিমান উৎপন্ন হইবে। "আমি উঁহার অপেক্ষা কম কিসে? কেন আমি ছোট হইয়া উঁহার সেবা ও খোসামোদ করিব? আমিও এতগুলি পরীক্ষায় পাস করিয়াছি এবং উঁহার মত সব কার্য্য করিতে পারি। আমাকে গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া আমার স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিবার এবং দাসীর মত গৃহকার্য্য করাইবার উঁহার কি অধিকার আছে?" ইত্যাদি ইত্যাদি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাতকারী অভিমান শিক্ষার দোষেই স্ত্রীজাতির হৃদয়ে রূঢ়মূল হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব স্ত্রীজাতিকে পুরুষের মত শিক্ষা দেওয়া কদাপি উচিত নহে। যে সকল অধুনাতন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য আদর্শে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের পক্ষপাত করেন, একটু সমাহিত চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলেই উল্লিখিত কারণে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিনীগণকে পুরুষের মত ব্যায়াম আদি করাইবার দিকেও যে অনেকের আসক্তি দেখা যাইতেছে, তাহাও স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই। সুশ্রুত আদি চিকিৎসাশাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত যে রজঃপ্রধান কোমল শরীর স্ত্রীদিগের পক্ষে বীর্য্যপ্রধান কঠিন শরীর পুরুষের উপযোগী ব্যায়াম বিহিত করিলে উহাদের শরীর-যন্ত্রের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহার ফলে অনেক সময় গর্ভাশয়ের দোষ হইয়া সন্তানোৎপাদনেরও বাধা হয়। এজন্য

অন্যভাবে ব্যায়াম না শিখাইয়া গৃহকার্য্যের দ্বারাই উহাদের যাহাতে প্রচুর ব্যায়াম হয়, তাহাই করা উচিত। আজকাল এরূপ কুশিক্ষার ফলে স্ত্রীগণকে প্রায়ই গৃহকার্য্যে উদাসীন, মাতৃভাব শূন্য এবং বিলাসপ্রিয় দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে এরূপ কুঅভ্যাস সমূহ যাহাতে হইতে না পারে এজন্য কন্যাকাল হইতেই বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহা হইলেই নারী জাতি সুশিক্ষা লাভ করিয়া নারীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠায় পদার্পণ পূর্ব্বক নিজেও ধন্য হইবেন এবং পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়কেই ধন্য করিবেন।

শিক্ষণীয় বিষয় নির্দ্ধারণ।

স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া কন্যাবস্থায় স্ত্রীদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহারই বর্ণন করা হইতেছে। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কন্যাকে এরূপ ভাবে শিক্ষিতা করা উচিত যাহাতে সে গৃহিণী অবস্থায় উত্তমা মাতা এবং পতিব্রতা সতী হইতে পারে, কারণ নিজ জীবনের লক্ষ্যসিদ্ধি ব্যতীত সন্তানসন্ততিরও বাল্যজীবনের শিক্ষা, পিতা অপেক্ষা মাতার উপরই অধিক নির্ভর করিয়া থাকে। বীর মাতার বীর সন্তান এবং ধার্ম্মিক মাতার ধর্ম্মশীল সন্তান হওয়া জগতে দুর্লভ নহে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অভিমন্যু, মহারাণা প্রতাপ, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জোসেফ মেজিনি, জর্জ্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনকাহিনীর অন্বেষণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে উঁহাদের অসাধারণ চরিত্রবীজ বাল্যজীবনে মাতার দ্বারাই উঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অতএক কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দান করা উচিত যাহাতে তিনি মাতা হইয়া আদর্শ সন্তান প্রসব করিতে সমর্থ হন। আর্য্যধর্ম্মের সার তত্ত্বগুলি সরল ভাষায় মৌখিক উপদেশ অথবা পুস্তকাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে শিখান উচিত। রামায়ণ, মহাভারত আদি হইতে সারগর্ভ বিষয়, মন্বাদি স্মৃতি, ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণ সমূহ হইতে সদাচার, আশ্রম ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, জীবনের রহস্য, ভগবদ্‌ভক্তি, সাধনার তত্ত্ব আদি উপযোগী বিষয় সমূহের শিক্ষা দেওয়া উচিত। সাধারণ ভাবে সংস্কৃত ভাষা পড়ানও উচিত। এবং যদি কাহারও মধ্যে বিশেষ প্রাক্তন সংস্কার দেখা যায় তবে বিশেষভাবে সংস্কৃত বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, উপনিষৎ আদিরও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীনকালে মৈত্রেয়ী,

গার্গী, মদালসা আদি এইরূপ অসাধারণ বিদুষী স্ত্রী হইয়াছিলেন। তবে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ইহা অসাধারণ অধিকার, এজন্য সাধারণ ভাবে সকল প্রকার স্ত্রীর জন্য বিধান করিবার বিধি নহে। গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত স্ত্রী সংসারে দুটি একটিই হইয়া থাকেন। ইহা তীব্র প্রাক্তন বলে হইয়া থাকে। সাধারণ প্রারব্ধ বশে হয় না। এজন্য সকলকে গার্গী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা বৃথা চেষ্টা মাত্র হইবে এবং সংস্কার-বিরুদ্ধ হওয়ায় অনেক স্থলে উহার বিপরীত ফল হইবে। স্ত্রীজাতির আদর্শ গার্গী নহেন, পরন্তু সীতা, সাবিত্রী। একারণ সীতা সাবিত্রীর আদর্শে স্ত্রীজীবন গঠন করিবার নিমিত্ত শিক্ষা দেওয়াই উচিত। শোভা প্রকৃতি রাজ্যের বস্তু এবং জ্ঞান পুরুষ রাজ্যের বস্তু। শোভার সহিত স্ত্রীর এবং জ্ঞানের সহিত পুরুষের নৈসর্গিক সম্বন্ধ আছে। এজন্য জ্ঞানের পূর্ণতায় পুরুষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির পূর্ণতা জ্ঞানের পূর্ণতায় হয় না। প্রকৃতির পূর্ণতা মাতৃভাবের পূর্ণতার দ্বারা হইয়া থাকে। পূর্ণ প্রকৃতি জগদম্বা। প্রকৃতি জগন্মাতা হইয়াই পূর্ণ শোভা প্রাপ্ত হইতে পারেন, জ্ঞানী হইয়া পূর্ণ শোভা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। উঁহার যাহা কিছু জ্ঞান, সকলই মাতৃভাবমূলক, মাতৃভাবের নাশক নহে। কারণ এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক, অতএব শোভার বিঘাতক বই পোষক নহে। এজন্য সীতা সাবিত্রীই নারীজাতির আদর্শ, গার্গী মৈত্রেয়ী নহেন। এইরূপ বিচার সমূহকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াই কন্যাদিগের শিক্ষার বিধান করা উচিত। তাহা হইলেই শুভ ফল ফলিবে। স্ত্রীজাতির চিত্তে যে স্বাভাবিকী ভক্তি আছে উহাকে শিক্ষার দোষে নষ্ট করা উচিত নহে, কিন্তু বিবিধ ব্রত, পূজা, উপাসনা আদির দ্বারা পুষ্ট করা উচিত। শিবপূজা, দেবীপূজা আদি পূজা এবং স্তোত্রাদি উহাদিগকে শিখান উচিত। সীতা, সাবিত্রী, রাজস্থানের পদ্মিনী, মদালসা আদি রমণীললামভূতা সতীগণের পবিত্র চরিত্র পুস্তকাকারে প্রণয়ন করিয়া উহাদিগকে পড়ান উচিত, যাহাতে উহাদের বালহৃদয়ে সতীধর্ম্মের পুণ্যময় মধুর চিত্র খচিত হইয়া যায়। ধর্ম্মসাধন বিষয়ে কন্যাবস্থায় এই বিষয়গুলির শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।

কন্যাদিগকে কিছু কিছু সাহিত্যের শিক্ষাও দেওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্য অথবা দেশীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য গৃহীত হইতে পারে। ইহার দ্বারা চিন্তাশক্তির স্ফুরণ এবং বিস্তার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্ত ইতিহাস ও

ভূগোলের শিক্ষাও সাধারণ ভাবে দেওয়া উচিত। গৃহিণীধর্ম্মের সুবিধার নিমিত্ত আবশ্যকমত পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় কিছু শিক্ষাও দেওয়া চাই। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল আচার ও রীতিনীতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই সব গুলিরই মধ্যে কিছু না কিছু রহস্য আছে। সেগুলির দ্বারা কিরূপে শরীর রক্ষা, শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং নানাপ্রকার রোগ নাশ হইতে পারে তাহা গৃহিণীর জানা আবশ্যক। কন্যাবস্থায় এই সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই গৃহিণী-জীবনে তিনি এ সকল জানিতে পারিবেন। কোন্ মুখে কিরূপ ভাবে গৃহনির্ম্মাণ করা উচিত, গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চারের নিমিত্ত কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, গৃহের বহির্দ্দেশ ও প্রাঙ্গণাদি কতদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, কূপ, সরোবর আদি গৃহ হইতে কতদূরে থাকা উচিত, ভোজনাদির ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বালক বালিকাগণের কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত, ঋতুভেদে খাদ্য দ্রব্যের কি কি প্রকার ভেদ হওয়া উচিত, দেশে মহামারীর প্রকোপ হইলে কি কি রূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এবং সে সময়ে আহার্য্য বস্তুর বিষয়ে কিরূপ সাবধান হওয়া উচিত, রোগীর সেবা কিভাবে করা উচিত, এই সকল বিষয়ের শিক্ষা কন্যাজীবনে অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা গৃহিণী জীবনে তিনি চতুরা, কার্য্যকুশলা গৃহিণী হইতে পারিবেন না। সাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্র এবং কাষ্ঠাদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের জ্ঞানও তাঁহার হওয়া উচিত, কারণ গৃহস্থাশ্রমে সন্তান সন্ততির সামান্য রোগেই যদি ডাক্তার ডাকিতে হয়, তবে খরচেও কুলায় না এবং সুবিধাও হইয়া উঠে না। প্রাচীন বৃদ্ধারা এখনও এমন 'টোট্‌কা' ঔষধের পরিচয় জানেন, যাহাতে চিকিৎসকের সহায়তা বিনাই অনেক সময় কঠিন কঠিন ব্যাধি নষ্ট হইয়া থাকে। গণিত শাস্ত্রেরও সাধারণ শিক্ষা কন্যাকে দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে গৃহিণী হইয়া দৈনিক সংসার খরচের হিসাব রাখিতে তিনি সমর্থ হন। সাধারণ শিল্পকলার শিক্ষাও তাঁহার পাওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে গৃহকার্য্য হইতে অবকাশের সময় টুকু বৃথা না কাটাইয়া তিনি সন্তান সন্ততির জন্য সে সময়ে কন্থা, মোজা, টুপি আদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এবং আবশ্যক মত কিছু কিছু চিত্র আদিও অঙ্কিত করিতে পারিবেন। মাতৃত্বের প্রধান অঙ্গ, সন্তান প্রতিপালন। তাহার সহিত ভোজনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ ভোজন ভিন্ন প্রতিপালন হয় না।

এই হেতু রন্ধন ক্রিয়ার সহিত মাতৃত্বের পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। ভাল মাকে ভাল পাচিকা হইতে হয়। অন্নপাক বিষয়ে তাঁহার অভিমান ও গৌরব-জ্ঞান থাকা চাই। তিনি যেন উহাকে গৌণ কার্য্য মনে করিয়া উপেক্ষা না করেন। গৃহাস্থাশ্রমে ভোজন একটি নিত্য যজ্ঞ। গৃহিণী অন্নপূর্ণার মত ঐ নিত্য যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ভোজনকারিগণ যজ্ঞভাগ গ্রহীতা বেবতা। সাধারণ যজ্ঞে দেবতাগণ পরোক্ষে থাকেন বলিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু ভোজনরূপী নিত্য যজ্ঞের দেবতাগণ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের মতামত তখনই প্রকট করিয়া থাকেন। এজন্য নিত্য যজ্ঞের যোগ্য অধিষ্ঠাত্রী হইবার মত শিক্ষা কন্যাকাল হইতেই প্রদান করা উচিত। যজ্ঞের সামগ্রী কিরূপ উত্তম হইলে তবে যজ্ঞক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ হয়, কিরূপ শুচিতার সহিত যজ্ঞীয় কার্য্য সমূহের সম্পাদন করাউচিত, কিপ্রকার প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞীয় প্রত্যক্ষ দেবতাগণকে পরিবেশন করা উচিত, ইত্যাদি সকল বিষয়েই শিক্ষা প্রথম হইতে দিলে পর তবে গৃহিণী অবস্থায় জগন্মাতা অন্নপূর্ণার স্নেহময় ভাবগুলির বিকাশ হইয়া থাকে। যে গৃহে এরূপ মাতা নিবাস করেন তথায় লক্ষ্মী ও শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া চির বিরাজমান হন ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। উপর কথিত বিষয় সমূহের শিক্ষাদানের ভার যদি স্বয়ং পিতামাতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়, নতুবা কোন বিশ্বস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাকে পাঠাইয়া এই সকল শিক্ষা দেওয়া উচিত। অধুনাতন কন্যা পাঠশালা বা বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথা প্রাচীন নহে, অতি নবীন। উহার মধ্যে অনেকপ্রকার দোষের সম্ভাবনা থাকায় উহা শিক্ষার আদর্শ স্থান হইতে পারে না। তথাপি যেখানে বাটীতেই শিক্ষাদানের সন্তোষজনক ব্যবস্থা অসম্ভব, তথায় আপদ্ধর্ম্মরূপে উক্ত প্রথা গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু গৃহীত হইলেও পিতামাতা বা অভ্যক্ষের ইহা বিশেষভাবে দেখিয়া লওয়া উচিত যে ঐ সকল বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শানুসারে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে কি না। কারণ অহিন্দু আদর্শযুক্ত বিদ্যালয়ে কন্যাকে লেখা পড়া শিখান অপেক্ষা মূর্খ রাখা খুব ভাল। উহাতে শিক্ষার লক্ষ্যই পণ্ড হইয়া যায়। এই ভাবে বিশেষ সাবধানতা ও দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করিলে তবে সুফল ফলিবে। অন্যথা হিতে বিপরীত হইবার খুবই সম্ভাবনা

আছে। কন্যার বিবাহের পর অথবা ঋতুমতী হইবার পর তাহাকে কদাপি শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে পাঠান উচিত নহে। এ অবস্থায় পতির উপর তাহার ধর্ম্মশিক্ষার ভার এবং শ্বশ্রুমাতার উপর সাংসারিক শিক্ষার ভার অর্পিত হওয়া উচিত। এইরূপে কন্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইলে পর তবেই কন্যা গৃহিণীজীবনে আদর্শ সতী এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না মাতা হইতে পারিবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

নারীজীবনে সংস্কার নির্ণয়।

আর্য্যশাস্ত্রে গর্ভাধান, উপনয়ন, বিবাহ আদি ষোড়শ প্রকার সংস্কারের বর্ণন আছে। যেমন সুধাকর ষোড়শ কলার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণ ও অমৃতময় হন, সেইরূপ ষোড়শ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত মানব-শরীর পূর্ণতাযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। এইহেতু স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সংস্কারে অধিকার আছে। তবে পুরুষ-প্রকৃতির সহিত স্ত্রী-প্রকৃতির কিছু পার্থক্য থাকায়, ষোড়শ সংস্কারের বিধি এবং অনুষ্ঠানের মধ্যেও মহর্ষিগণ ঐরূপ পার্থক্যের নর্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা কিরূপ সে বিষয়ে নীচে ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। স্ত্রীজাতির সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

শারীরিক পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার যথাকাল ও যথাক্রম স্ত্রীদিগেরও করান উচিত, কিন্তু উহাদের সংস্কার বৈদিক মন্ত্ররহিত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত সংস্কার বলাতে যদি উপনয়ন সংস্কারও মনে করা হয় এজন্য দ্বিতীয় শ্লোকে মনু বলিতেছেন যে স্ত্রীজাতির পুরুষের মত উপনয়ন হওয়া উচিত নহে। উহাদের পক্ষে বিবাহই উপনয়ন সংস্কার, পতিসেবাই উপনয়নানন্তর আচার্য্যকুলবাস এবং গৃহকার্য্যই উপনীত ব্রহ্মচারীর হবনের মত অগ্নি-পরিচর্য্যা। এরূপ কেন বলা হইল তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে উপনীত ব্রহ্মচারীকে আচার্য্যকুলে গিয়া যে সকল

প্রাত্যহিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা বিবিধ শারীরিক কারণে স্ত্রীজাতির দ্বারা হইতে পারে না এবং হওয়ার আবশ্যকতাও নাই। ব্রহ্মচারী বালককে প্রত্যহ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করত অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ হইতে না হইতেই মাসে মাসে রজোধর্ম্ম প্রাপ্ত হন এবং সে সময় তিন বা ততোধিক দিন শারীরিক অপবিত্রতা হেতু তিনি বৈদিক কর্ম্ম করিবার যোগ্য থাকেন না। অনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সুফল না হইয়া, কুফলই হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রীজাতির পক্ষে বৈদিক উপনয়নের আজ্ঞা কিরূপে হইতে পারে? কারণ উল্লিখিত শারীরিক অপবিত্রতা ও অসম্পূর্ণতা হেতু স্ত্রীজাতির দ্বারা নিয়মিত বৈদিক কার্য্য কদাপি হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উপনীত ব্রহ্মচারীর পক্ষে আচার্য্যকে আত্মসমর্পণ করত তাঁহারই আজ্ঞানুগমন করাকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কদাপি এরূপ করিতে পারেন না। কারণ তাঁহার পক্ষে পতিদেবতার চরণকমলে আত্মসমর্পণ করাই নিজযোনি হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র সেতু। তাঁহার পতি ভিন্ন আর কাহাকেও আত্মসমর্পণ করা উচিত নহে। এজন্য বিবাহই তাঁহার উপনয়ন হইতে পারে, পৃথক আর কোন উপনয়ন হইতে পারে না। পতিই তাঁহার পরম গুরু এবং একমাত্র গুরু, তাঁহারই সেবা স্ত্রীজাতীর গুরুকুলবাস, ইহাতেই তাঁহার মুক্তি। অতএব উপনয়নের দ্বারা গুরুকুলবাসের প্রয়োজন কি আছে? এই সব কারণেই ভগবদ্দৃষ্টি-সম্পন্ন মহর্ষিগণ স্ত্রীজাতির জন্য উপনয়নের বিশেষতার বর্ণন করিয়াছেন স্ত্রীজাতির পুরুষের মত উপনয়ন ও বেদপাঠ নিষেধের পক্ষে মহাভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রদত্ত প্রমাণকেও তৃতীয় কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

যদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় উদাত্ত, অনুদাত্ত আদি উচ্চারণ বিধি অনুসারে লাঘব গৌরব বিচার পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ না করা হয় অথবা উচ্চারণ কালে বর্ণাশুদ্ধি হইয়া পড়ে তবে বেদমন্ত্রের দ্বারা কদাপি সুফল প্রাপ্তি হয় না। প্রত্যুত যেমন স্বরের দোষে, স্বীয় শত্রু ইন্দ্রকে নিধন করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা সত্ত্বেও 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে 'ইন্দ্ররূপ শত্রু' এইরূপ অর্থ প্রকাশিত না

হইয়া 'ইন্দ্রের শত্রু' এইরূপ অর্থ হওয়ায় বৃত্রাসুর নিজের মন্ত্রের দ্বারা স্বয়ংই আহুতি প্রদত্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল সেই প্রকার প্রকৃত স্বরহীন বেদমন্ত্র বজ্রের ন্যায় যজমানের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতির শরীর রজঃপ্রধান হওয়ায় উঁহাদের কণ্ঠ স্বভাবতই অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এরূপ কণ্ঠের দ্বারা বেদে যেমন উদাত্তাদি ভেদে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে, তদনুসারে স্ত্রীজাতি কখনই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হন না। উঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত স্বরে বৈদিক লাঘব গৌরবের সমাবেশ হয় না, প্রায় একই প্রকার স্বর নির্গম হইয়া থাকে। অতএব স্বরহীন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে উঁহাদের হানির সমূহ সম্ভাবনা দেখিয়াই মহর্ষিগণ মন্ত্রহীন সংস্কারের আজ্ঞা দিয়াছেন। এইজন্যই ভগবান্ মনু পুনরপি নিজ সংহিতার নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।"

স্ত্রীজাতির বৈদিক মন্ত্রাবলম্বনে সংস্কার কার্য্য পরিপালিত হওয়া উচিত নহে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। এবং এজন্যই বোধ হয় শ্রীভগবান্ গীতায় স্ত্রীজাতিকে হীনযোনি বলিয়া তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়াছেন. যথা :—

মাংহি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

শ্রীভগবানের চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করিয়া পাপযোনি স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ পর্য্যন্ত পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই নারীজাতির জন্য মন্ত্রহীন ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত উপদেশাবলীর তাৎপর্য্য। এক্ষণে এই সামান্য বিধির উল্লঙ্ঘন কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থায় করা যাইতে পারে তাহাই নীচে ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

দুইটি বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীজাতি বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে পারেন। এক বিবাহ এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মবাদিনী অবস্থা। জাতকর্ম্মাদি সংস্কার মন্ত্রহীন হওয়া. সত্ত্বেও, বিবাহ সংস্কার কেন সমন্ত্রক করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল তাহা মন্ত্রমহিমার উপর বিচার করিলেই বেশ বুঝা যায়। বৈদিক মন্ত্রসমূহ দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা—শক্তিপ্রধান মন্ত্র এবং ভাবপ্রধান মন্ত্র। নিরুক্তশাস্ত্রে বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়—

"অথাঽপি কস্যচিদ্ ভাবস্যাচিখ্যাসা।"

শক্তি-প্রধান মন্ত্র ব্যতিরিক্ত অনেকগুলি মন্ত্র ভা প্রধানও হইয়া থাকে। জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সমূহে শক্তি-প্রধান মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কারণ স্থূল শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন শক্তি-প্রধান মন্ত্র ভিন্ন হইতে পারে না। শক্তি-প্রধান মন্ত্রের উচ্চারণে উদাত্তানুদত্তাদি স্বরভেদের প্রয়োজন হয়; কারণ শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বর-শক্তির লাঘব গৌরব অবশ্যই হইয়া থাকে। এইহেতু অপূর্ণ শরীর, অপূর্ণ কণ্ঠ স্ত্রীজাতির পক্ষে শক্তি-প্রধান মন্ত্র সমূহের উচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। উহা উন্নত শরীর দ্বিজগণের জন্যই বিহিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে ভাব-প্রধান মন্ত্রসমূহের উচ্চারণে ওরূপ বিধিনিষেধের প্রয়োজন হয় না এবং উহাতে ওরূপ স্বরের লাঘব গৌরবেরও বিচার করা হয় না। কারণ ভাব-রাজ্যে ভাবেরই প্রাধান্য থাকে, শক্তির প্রাধান্য থাকে না। বিবাহের সময়ে দম্পতিকে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় উহা ভাব-প্রধান মন্ত্র, শক্তি-প্রধান নহে। এজন্য বিবাহকালে উচ্চারণ তারতম্যের আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন হয় না। আর্য্যজাতির বিবাহ সংস্কার অন্যান্য জাতির মত কেবল স্থূল ব্যাপার নহে। ইহা একটি বিশেষ ধর্ম্মসংস্কার। সপ্তপদী গমনের সময়ে যে মন্ত্রগুলি ধারাবাহিক ভাবে পতি ও পত্নীকে পাঠ করিতে হয় সেগুলির উপর প্রণিধান করিয়া দেখিলেই এই তথ্যের সম্পূর্ণ মর্ম্ম-জ্ঞান হইয়া থাকে। আর্য্যজাতির বিবাহ পূর্ব্বলিখিত বৃহদারণ্যকের উপদেশানুসারে এইজন্য হইয়া থাকে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুতা প্রকৃতি আবার গিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বিলীন হউন। স্থূল জগতে ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ পুরুষ এবং প্রকৃতির অংশরূপিণী স্ত্রী এই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের পূর্ত্তির জন্যই বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব এরূপ শুভভাব সম্পাদনকালীন সমস্ত মন্ত্র অবশ্যই ভাব-প্রধান হওয়া উচিত এবং ভাব-প্রধান বলিয়াই দম্পতি উহা নিঃসঙ্কোচে পাঠ ও হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরমকল্যাণের অধিকারী হইতে পারেন। যজুর্ব্বেদে পাণিগ্রহণকালিক এইরূপই অনেকগুলি মন্ত্র পাওয়া যায় যাহাদের অর্থ এই—"আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী; তোমা বিনা আমি শূন্য, তুমিই আমার লক্ষ্মীরূপিণী; আমি সামবেদ এবং তুমি ঋগ্বেদ, আমি আকাশ এবং তুমি পৃথিবী; তুমি ও আমি উভয়ে মিলিয়াই পূর্ণ। তোমার হৃদয় আমার হইয়া যাউক এবং আমার হৃদয় তোমার হউক। অন্নরূপী পাশ, মণিতুল্য প্রাণসূত্র এবং সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা আমি তোমার মন

ও হৃদয়কে বাঁধিলাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্রের দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিবাহকাল দম্পতির পক্ষে পরম ভাব-শুদ্ধি এবং তন্ময়তা শিক্ষার মধুর মহেন্দ্রযোগ। এই হেতুই মহর্ষিগণ বিবাহের মন্ত্রগুলিকে ভাবের উচ্ছ্বাসময় করিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে মন্ত্রোচ্চারণ নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও বিবাহের মাহেন্দ্রযোগে ভাব-প্রধান বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের আদেশদান করিয়াছেন।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের অন্যতম অধিকার ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীদিগের হইয়া থাকে। কেবল অধিকার নহে আর্য্যশাস্ত্রে দেখা যায় যে অনেক ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী বৈদিক-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি পর্য্যন্ত হইয়াছেন। এরূপ কেন হয় এবং ব্রহ্মবাদিনীগণের বেদে অধিকার কেন প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বিচার্য্য। স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞানময় পুরুষসত্তার বিকাশ কম এবং তমোময়ী প্রকৃতির সত্তার বিকাশ অধিক থাকায় জ্ঞান-শক্তির প্রাদুর্ভাব স্ত্রীজাতির ভিতরে কমই দেখা গিয়া থাকে। ইহাদের হৃদয়ে উপাস্যদেবতা পতির চরণে তন্ময়তামূলক ভক্তির ভাবই অধিক দেখা যায়। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণের প্রকৃতি কিছু অসাধারণ শ্রেণীর হওয়ায় অসাধারণ জ্ঞান-শক্তির বিকাশও ব্রহ্মবাদিনীদিগের মধ্যে হইয়া থাকে। উহা কিরূপে হয় তাহা ক্রমশঃ বর্ণন করা যাইতেছে। সৃষ্টির ভিতরে দেখা যায় যে সাধারণ মনুষ্য অথবা পশ্বাদির অপেক্ষা আরূঢ়-পতিত মনুষ্য অথবা পশ্বাদির মধ্যে বিশেষ যোগ্যতা প্রকটিত হইয়া থাকে। উচ্চাবস্থা হইতে পতিত এবং অন্যযোনি প্রাপ্ত জীবকেই আরূঢ়-পতিত জীব বলা যায়। এরূপ জীবের প্রবল সংস্কার বশে পতন হইলেও প্রাক্তন উচ্চাবস্থার অন্য অনেক উচ্চশ্রেণীর সংস্কার তাহার মধ্যে থাকে। এরূপ সংস্কারবশেই সে তত্তদ্‌যোনিগত সাধারণ জীব অপেক্ষা বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারে। সাধারণ মৃগ অপেক্ষা মৃগযোনি প্রাপ্ত ভরতঋষি অপূর্ব্বই ছিলেন। তিনি ঋষির আশ্রমে থাকিয়া প্রসাদভোজন করিতেন; মৃগীর সহিত সম্বন্ধ করিতেন না এবং মৃগ-শরীর ত্যাগকালে জাহ্নবীর জলে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সকল অপূর্ব্বতা প্রাক্তন সৎসংস্কারের ফলেই তাঁহার মধ্যে প্রকটিত হইয়াছিল। সেইরূপ সাধারণ শূদ্র বা বৈশ্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়যোনি হইতে পতিত শূদ্র বা বৈশ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ দক্ষতাযুক্ত হইবে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবাদিনী নারীগণও আরূঢ়-পতিত শ্রেণীর স্ত্রী, সাধারণ স্ত্রী নহেন, এরূপ বুঝা উচিত; কারণ সাধারণ স্ত্রীদিগের মধ্যে এরূপ অসাধারণ জ্ঞান শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। ইঁহারা পূর্ব্বজন্মে কোন উচ্চঅঙ্গের জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন কিন্তু ভরতঋষির ন্যায় কোন স্ত্রীজন্মপ্রদ প্রবলকর্ম্মের ফলে স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্ত্রীযোনিতে আসিয়া প্রাক্তন স্ত্রী-সুলভ সংস্কার ক্ষয়িত হইয়াছে। এবং জ্ঞান-প্রধান প্রাক্তন পুরুষযোনির সংস্কার উদিত হইয়াছে। এই হেতু স্ত্রী হইয়াও অপূর্ব্ব জ্ঞানের বিকাশ, বেদমন্ত্রদর্শনের শক্তি তাঁহার ভিতরে প্রকাশিত হইয়াছে; ত্রিগুণ তরঙ্গময়ী, মোহময়ী দুরত্যয়া মায়ার রাজ্যে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। যখন বিশ্বামিত্র, ভরত আদি ঋষির জীবনেও পতন সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে তখন অন্যের কথা আর কি বলা যায়? এই ভাবে স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইয়াই পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান-পথবর্ত্তী পুরুষ ব্রহ্মবাদিনী নারী হইয়া থাকেন। মৈত্রেয়ী, গার্গি আদি এইরূপই ব্রহ্মবাদিনী নারী ছিলেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ জ্ঞান-শক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। রাজর্ষি জনকের সভায় যে জ্ঞান-দর্পে ব্রহ্মবাদিনী গার্গি আধ্যাত্মিক প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা কে বিস্মৃত হইবে? সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণের সময় যখন স্থূলসম্পত্তি গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন তখন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী যে ভাবে উত্তর দিয়া নিজের অলৌকিক ভাষা ও বৈরাগ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন উপনিষদ সেইগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া জগতে নারীজাতির মহিমা ঘোষিত করিয়াছে। স্থূলসম্পত্তির লোভ দেখাইলে পর মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্' যখন ধনসম্পত্তির দ্বারা অমৃতত্বলাভ হইতে পারে না, তখন আমি উহা লইয়া কি করিব? আমার সম্পত্তি গ্রহণের প্রয়োজন নাই; আমি আনন্দনিলয় ব্রহ্মকেই পাইতে চাই। এইরূপে ব্রহ্মবাদিনী নারীগণের লোকোত্তর-চমৎকার জীবন-কাহিনী আর্য্যশাস্ত্রে ভূরিশঃ বর্ণিত হইয়াছে। এবং জ্ঞান-প্রধান পুরুষযোনি হইতে কুকর্ম্ম-বিপাকবশে স্ত্রীযোনি লাভের কথাও শাস্ত্রে অনেকস্থলে বর্ণিত হইয়াছে, যথা কাত্যায়ন সংহিতায়—

মাণ্ডা চেম্মিয়তে পূর্ব্বং ভার্য্যাপতিবিমানিতা।
ত্রীণি জন্মানি সা পুংস্ত্বং পুরুষঃ স্ত্রীত্বমর্হতি ॥

যো দহেদগ্নিহোত্রেণ স্বেন ভার্য্যাং কথঞ্চন।
সা স্ত্রী সম্পদ্যতে তেন ভার্য্যা বাঽস্য পুমান্ ভবেৎ॥

যদি নির্দ্দোষী মাননীয়া স্ত্রী পতিকর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে এই পাপের ফলে তাঁহার পতি তিন জন্ম স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্ত্রী তিন জন্ম পুরুষযোনি লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে যদি কোন পুরুষ নিজপত্নীকে দগ্ধ করে তবে সে স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রী পুরুষযোনি লাভ করিয়া থাকে। দক্ষসংহিতায় লেখা আছে—

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
স জীবনান্তে স্ত্রীত্বঞ্চ বন্ধ্যাত্বঞ্চ সমাপ্নুয়াৎ॥

নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ স্ত্রীকে যে গৃহস্থ পুরুষ যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, তাহাকে পরজন্মে বন্ধ্যা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

মৃত্যুকালে যে বিষয়ের চিন্তায় অন্তঃকরণ ভাবিত হয়, তদনুসারেই জীবের আগামী জন্মলাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জনাখ্যানে এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

শাশ্বতীরনুভূয়ার্ত্তিং প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ।
তমেব মনসা গৃহ্নন্ বভূব প্রমদোত্তমা॥

রাজা পুরঞ্জন প্রমদাসঙ্গ দোষে অনেক দিন দুঃখ পাইবার পর মৃত্যুসময়ে নিজের পতিব্রতা স্ত্রীকে স্মরণ করিতে করিতে মরিল এবং এতাদৃশ মৃত্যুকালীন চিন্তা হেতুই মরণের পর তাহার সতীস্ত্রীযোনি প্রাপ্তি হইল। অতএব এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হইতেছে যে কর্ম্ম-বিপাকবশে পুরুষের স্ত্রীযোনি প্রাপ্তি অসম্ভব নহে এবং যদি কোন জ্ঞান-প্রধান সংস্কারযুক্ত পুরুষ স্ত্রীযোনি সুলভ প্রবল প্রাক্তনবশে পতিত হয় তবে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীযোনিলাভ তাহার অবশ্যই হইতে পারে। এইরূপ ব্রহ্মবাদিনী নারীগণের সংস্কার সাধারণ নারী অপেক্ষা ভিন্নপ্রকার হওয়াতেই আর্য্যশাস্ত্রে বিশেষ ধর্ম্ম-বিধি অনুসারে উঁহাদের জন্য উপনয়ন সংস্কার এবং বেদ-পাঠের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন—

দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়ন মগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা চ ॥

স্ত্রীজাতি দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে যথা ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীদিগের জন্য উপনয়ন, অগ্নীন্ধন, বেদাধ্যয়ন এবং নিজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যার বিধান করা হইয়াছে। সদ্যোবধূ নারীগণের জন্য এরূপ বিধান করা হয় নাই। উহাদের পক্ষে বিবাহই উপনয়ন সংস্কার এবং পতি-সেবা গুরুকুল বাস। যেরূপ মনু আজ্ঞা করিয়াছেন। সত্য ত্রেতাদি জ্ঞান-প্রধান পুণ্যময় যুগে জ্ঞানীপুরুষ অনেক ছিলেন এজন্য আরূঢ় পতিত ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীও পাওয়া যাইত। এই হেতু ঐ সকল যুগে ব্রহ্মবাদিনী নারীর একটি বিভাগ হিন্দুসমাজের মধ্যে ছিল। ঐ সকল নারীর উপবীতধারণ, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞসাধন আদি ব্যবস্থাও প্রাচীনকালে ছিল। কিন্তু তমঃপ্রধান পাপময় কলিযুগে পুরুষের মধ্যেই কদাচিৎ যথার্থ জ্ঞানের বিকাশ দেখা যায়। এ কারণ এ যুগে স্ত্রীজাতির মধ্যেও অসাধারণ জ্ঞান-সংস্কার দেখা যায় না। কর্ম্মবশে পুরুষের স্ত্রীযোনি প্রাপ্তি হইলেও ব্রহ্মবাদিনী কোটির স্ত্রী হওয়া দুর্লভ হইয়া উঠে। কারণ পুরুষের মধ্যেই যখন জ্ঞান নাই, তখন আরূঢ় পতিত স্ত্রীযোনির মধ্যে উহার সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? এজন্য কালধর্ম্মানুসারে অধুনাতন নারীদিগের জন্য মহর্ষি মনুকথিত সংস্কার বিধিই আজ্ঞপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি যম বলিয়াছেন—

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিধীয়তে ॥
বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ ॥

পূর্ব্ব কল্পে কুমারীগণের নিমিত্ত মৌঞ্জীবন্ধন, বেদাধ্যয়ন এবং গায়ত্রীমন্ত্রের বিধান ছিল। পিতা, পিতৃব্য অথবা ভ্রাতা উহাদিগকে বেদ পড়াইতেন। অন্য কাহারও বেদাধ্যায়নের অধিকার ছিল না; নিজ গৃহেই উহাদের ভিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইত। অজিন, কৌপিন এবং জটাধারণের আজ্ঞা দেওয়া হইত না।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

[ঈশ্বরের প্রয়োজন।]

কারণ দাহ্যবস্তু না থাকিলে অগ্নি দহনক্রিয়া করিতে পারে না, এজন্য অগ্নিতে দাহিকাশক্তি নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা মিথ্যা নহে কি? দাহিকাশক্তি আছে বলিয়াই অগ্নি দাহ্যবস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে। জলের মধ্যে দাহিকাশক্তি নাই এজন্য দাহ্য বস্তু থাকিলেও জল দহনকার্য্য করিতে পারে না। এইরূপে জড় কর্ম্মের নিয়ামক, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে বলিয়াই ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মানুসারে ফল দিতে পারেন। যদি তাঁহার মধ্যে শক্তি না থাকিত, তবে জীব কর্ম্ম করিলেও তিনি ফল দিতে পারিতেন না। অতএব জীবকৃত প্রাক্তনের অপেক্ষা থাকিলেও ঈশ্বরে সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্বতন্ত্রতার কথা। তাহার উত্তর এই যে প্রজাগণের কর্ম্মানুসারেই রাজা দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু উহাতে রাজার স্বতন্ত্রতা বা শক্তির অভাব কল্পনা হইতে পারে না। অতএব বিচার ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে ইচ্ছার অতীত এবং মায়ার বশ না হইলেও ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড উভয়বিধ সৃষ্টির স্থলেই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাঁহারই অলৌকিক চেতন প্রেরণায় সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা সতত নয়নাভিরাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারই অতিমানুষ নিয়ামিকা শক্তির বলে অনন্তকোটি গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডকটাহ অনন্ত শূন্যে বিঘূর্ণিত হইতেছে এবং ঋষি, দেব, পিতৃ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সমস্ত প্রাণী যন্ত্রারূঢ়ের মত তাঁহারই অমোঘ প্রেরণার বলে নিয়ত নিয়তিচক্রে অনাদিকাল হইতে আবর্ত্তিত হইতেছে। অতঃপর জীবোৎপত্তি বিজ্ঞান আলোচিত হইবে।

জীবের জন্ম।

পরমাত্মা ও প্রকৃতির অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী সত্তার মধ্যে দেশকাল পরিচ্ছিন্ন জীব-সত্তার আবির্ভাব কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নের উত্তর এতই কঠিন যে অনেক শাস্ত্রেই ইহার মীমাংসা করা হয় নাই। অনেক দর্শনে জীবকে প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া ঐখানেই বিষয়ের পর্য্যবসান করা হইয়াছে। পৃথক্‌ভাবে জীবোৎপত্তি

বিজ্ঞান আলোচিত হয় নাই। অথচ আমরা আর্য্যশাস্ত্রে এই বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই যে জীব জন্মগ্রহণের পর মনুষ্যেতর যোনি সমূহে চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন উদ্ভিজ্জ হইতে প্রারম্ভ করিয়া যোনি সমূহের সংখ্যানির্ণয় করা হইয়াছে তখন জীব কোন না কোন সময়ে এই বিরাটের গর্ভ হইতে ব্যষ্টিরূপে অবশ্যই নিঃসৃত হইয়া তবে এই চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াছিল ইহা প্রত্যেক বিচারবান ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। অতএব জীবভাব বিকাশের একটি সময় ও অবস্থা আছে ইহা প্রমাণিত হইল। সে অবস্থাটি কি এবং কখন হয় তাহাই এই অধ্যায়ের বিবেচ্য বিষয়। মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়ের পরে যে জীবসৃষ্টি হয় উহা নূতন জীবসৃষ্টি নহে। উহাতে মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়ের পূর্ব্বে যে সকল জীব বিশ্বের মধ্যে নিবাস করিত এবং যাহারা মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয়ের কবলে কবলিত হইয়াছিল, তাহারাই ক্রমশঃ দেশকাল-যুগানুসারে আবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল প্রলয়ান্তে প্রকাশমান জীবসঙ্ঘের উৎপত্তি, নিদান কোথায়, উহাদের মধ্যে জীবভাবের প্রথম বিকাশ কখন হওয়ার পর তবে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজাদি ক্রমে নানা যোনিতে ঐ সকল জীব পরিভ্রমণ করিয়াছিল, এই বিষয়টিই এখন বিচার্য্য। শাস্ত্রে চিৎ এবং জড়ের গ্রন্থিকে জীব বলা হইয়াছে। এবং এই চিজ্জড়গ্রন্থির ভেদনকে মুক্তি বলা হইয়াছে। চিৎ এবং জড়ের এই গ্রন্থি হইয়া ব্যাপক প্রকৃতি পুরুষ সত্তার মধ্যে অব্যাপক দেশকাল পরিচ্ছিন্ন জীবভাবের বিকাশ নিম্নলিখিত ভাবে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিভু চেতন পরমাত্মার চেতনসত্তা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তবিস্তারময়ী মহাপ্রকৃতি অনন্ত স্পন্দনের দ্বারা অনন্ত সৃষ্টিবিস্তার করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টিবিস্তার লীলার মধ্যে জড় ও চেতনে দুই প্রকার গতি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। এক জড় হইতে চেতনের দিকে এবং দ্বিতীয় চেতন হইতে জড়ের দিকে। একটি সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি বুঝান যাইতেছে। একটি বৃক্ষ, যাহা জড় ও চেতনের সমষ্টি, উহা যদি মারা যায় তবে উহার উপাদানভূত জড় ও চেতনের গতি কি প্রকার হইবে? উহার অন্তর্গত চেতনসত্তা প্রকৃতির স্বাভাবিক বেগে ক্রমশঃ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজের সকল যোনি ভেদ করিয়া মনুষ্য যোনিতে পৌঁছিবে এবং মনুষ্য যোনিতে উন্নত কর্ম্মানুসারে উন্নত যোনি প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের পূর্ণ পরিণামে ঐ ক্ষুদ্র চেতন

প্রকৃতি-রাজ্য অতিক্রম করিয়া মায়ারহিত নির্গুণ অসীম চেতনে লয় হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। এইরূপে প্রকৃতির মধ্যে জড় হইতে চেতনের দিকে একটি ধারা আছে যাহা স্বাভাবিকরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষের মধ্যে যে জড়াংশ আছে তাহার গতি কোন্ দিকে হইবে? বিচার করিলে পর দেখা যাইবে যে জড়ের গতি নীচের দিকে হইবে। যথা বৃক্ষের মধ্য হইতে চেতনসত্তা নির্গত হইবা মাত্র প্রাকৃতিক বিশ্লেষণবিধি অনুসারে উক্ত বৃক্ষের উপাদানভূত জড় শরীর ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া তমোগুণের দিকে অগ্রসর হইবে এবং অন্তে বৃক্ষের পত্র, কাষ্ঠ প্রভৃতি সকলই মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি জড়পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। এইরূপে জড়চেতনাত্মক জগতে স্বভাবতঃই চেতনধারাটি ব্রহ্মের দিকে বা সত্ত্বগুণের দিকে এবং জড়ধারাটি তমোগুণের দিকে যাইয়া থাকে। প্রকৃতির উপরদিকের শেষ সীমা সত্ত্বগুণ এবং তাহার পর গুণাতীত ব্রহ্ম। এজন্য চেতনধারা ক্রমোন্নত হইয়া সত্ত্বগুণের শেষ সীমায় আসিয়া ব্রহ্মে লয় হইতে পারে। কিন্তু জড়ধারা কোথায় লয় হইবে? কারণ চেতনের মত জড়ের দিকে ত কোনরূপ সীমা নাই? এজন্য নিয়ত পরিণামিনী ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির অধঃপরিণামকে আশ্রয় করিয়া জড়ধারা তমোরাজ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিবে কিন্তু তথায় লয় হইবার কিছু না পাইয়া যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ বেলাভূমিতে আঘাত করিয়া আবার সমুদ্রেরই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ঠিক সেই প্রকার জড়ধারা তমোগুণের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া প্রকৃতির উন্নতিশীল প্রবাহকে আশ্রয় করিয়া আবার বিপরীত ভাবে রজোগুণের দিকেই স্বভাবতঃ অগ্রসর হইবে। পরমাত্মার সত্তা সর্ব্বব্যাপী, এইজন্য তমোগুণ হইতে রজোগুণের দিকে অগ্রসর হইবার সময়েই আত্মসত্তা উক্ত জড় প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইবে। যেপ্রকার সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র থাকিলেও মলিনদর্পণে উহার প্রতিবিম্বপাত হয় না, কিন্তু মলিনতা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবিম্বের উদয় হইয়া থাকে ঠিক সেই প্রকার পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও পূর্ণ জড়প্রকৃতিতে উহার প্রতিবিম্ব হয় না কিন্তু পূর্ণ তমোগুণ হইতে কিঞ্চিৎ রজোগুণের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জড় প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপক পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বা অংশ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই যে প্রতিবিম্বের দ্বারা জড় ও চেতনের মধ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অনুসারে গ্রন্থি, ইহা হইতেই প্রথম জীবভাবের উদয় হইয়া থাকে। এইজন্য জড়ধারায় প্রতিফলিত উক্ত প্রতিবিম্বকে জীবাত্মা বলা হয় এবং জড়ধারার যে অংশে

প্রতিবিম্ব পড়ে উহাকে কারণ শরীর বলা হয়। এইরূপে ব্যাপক প্রকৃতি-পুরুষ সত্তার মধ্যে সঙ্কীর্ণ এবং দেশকালপরিচ্ছিন্ন জীবসত্তার বিকাশ হইয়া থাকে। এই জীবসত্তাই সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূলশরীরের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ নানা যোনির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। আত্মা চেতনস্বরূপ। এইজন্য জড়ধারা-প্রতিফলিত উক্ত প্রতিবিম্বিত আত্মাও চেতনস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপ অগ্নির মধ্যে পূর্ণ দাহিকাশক্তি থাকিলেও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি দাহনকার্য্য করিতে পারে না, সেইপ্রকার আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময়, চেতনাময় ও সদামুক্ত হইলেও প্রাকৃতিক তমোগুণময় জড়তাচ্ছন্ন আত্মার মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। এই জন্যই জড়তাময় অবিদ্যাগ্রস্ত উক্ত আত্মাকে বদ্ধ বলা হয়। এই বন্ধন বাস্তবিক নহে, ঔপচারিক মাত্র। অর্থাৎ যেরূপ স্বচ্ছ স্ফটিকের সম্মুখে রক্ত জবাপুষ্প রাখিলে স্ফটিকও রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে, সেইরূপ জড়প্রকৃতির সম্পর্কে আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া মনে হয় মাত্র; বাস্তবিক নিত্য মুক্ত আত্মার বন্ধন নাই। এই বন্ধনকল্পনা অন্তঃকরণের দিক হইতেই হইয়া থাকে, আত্মার দিক হইতে হয় না। অর্থাৎ অন্তঃকরণই আত্মাকে ভ্রান্তিবশে বদ্ধ মনে করিয়া থাকে। আত্মা বাস্তবিক বদ্ধ হন না। এইজন্য চিত্তবৃত্তিনিরোধ-রূপ যোগসাধনা দ্বারা যখন অন্তঃকরণকে লয় করিয়া দেওয়া হয় তখন আত্মার উপর ঐরূপ ভ্রান্তির আরোপ করিবার কিছুই থাকে না। এজন্য তখন আত্মা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম বলিয়া নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এইরূপে অন্তঃকরণের ভ্রান্তিবশে নিত্যমুক্ত আত্মার প্রতি বন্ধনের আরোপ করা হইয়া থাকে। অতএব আত্মার বন্ধন তাত্ত্বিক নহে, ঔপচারিক মাত্র, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

জড়ের সহিত চেতনের এইপ্রকার স্বাভাবিক সম্বন্ধ অবস্থাভেদানুসারে আর্য্য শাস্ত্রে দুইপ্রকার মতবাদে পরিণত হইয়াছে। একটির নাম অবচ্ছিন্নবাদ এবং দ্বিতীয়টির নাম প্রতিবিম্ববাদ। অবচ্ছিন্নবাদিরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া থাকেন। প্রতিবিম্ববাদিগণ অংশ না বলিয়া প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকেন। যথা বেদান্তদর্শনে—"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ।" "আভাস এব চ।" বাস্তবিক এই দুই মতবাদের মূলে কোনপ্রকার প্রভেদ নাই। প্রভেদ কেবল অবস্থা ভেদানুসারেই হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত তমোগুণময় জড় প্রকৃতিতে আত্মা গাঢ়

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এরূপ প্রচ্ছন্ন থাকেন যে ক্ষীণ প্রতিবিম্ব জ্যোতিঃ ভিন্ন আত্মার আর পূর্ণশক্তিসম্পন্ন কোনরূপ স্বরূপই প্রকটিত হয় না। সে সময় পূর্ণপুরুষের জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় অংশত্বের কোনপ্রকার চিহ্নই পরিদৃষ্ট না হওয়ায় প্রতিবিম্ববাদিগণ উক্ত অবস্থাকে প্রতিবিম্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবচ্ছিন্ন-বাদ উহার উপরের অবস্থার বিষয়। অর্থাৎ জড়প্রকৃতি তমোগুণ হইতে ক্রমশঃ সত্বগুণের দিকে যতই অগ্রসর হন ততই আত্মার নিজস্বরূপ আপনা আপনিই ভস্মমুক্ত অগ্নির ন্যায় প্রকটিত হইতে থাকে। সে সময় জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপমহিমা স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এজন্য অবচ্ছিন্নবাদিগণ ঐ উন্নত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়াছেন। আবার এই অংশই ভ্রান্তিদায়িনী সুখদুঃখমোহময়ী প্রকৃতির সম্পর্ক হইতে পূর্ণমুক্ত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত যখন একতাপ্রাপ্ত হন তখন ইনিই নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়াই মানিতে পারেন। এইরূপে অবস্থাভেদানুসারে অবচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার মধ্যে কোন বাস্তবিক ভিন্নতা বা মতবাদ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির যে অতি সূক্ষ্ম জড়াংশের উপর জীবাত্মা প্রতিবিম্বিত হন সেই জড়ভাবকে কারণশরীর বলে। উহাকে বেদান্তশাস্ত্রে অবিদ্যা বলা হইয়াছে। ইহা জীবভাবের প্রথম কারণ এবং স্থূলসূক্ষ্ম-শরীরদ্বয় প্রাপ্তিরও কারণীভূত হওয়ায় ইহার কারণশরীর সংজ্ঞা হইয়াছে যথা বেদান্ত শাস্ত্রে—

অনির্ব্বাচ্যাঽনাদ্যবিদ্যারূপা স্থূলসূক্ষ্মশরীরকারণমাত্রং স্বস্বরূপাজ্ঞানং যদস্তি তৎ কারণশরীরম্।

অনির্ব্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যাস্বরূপ, স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের কারণ মাত্র নিজস্বরূপের বিষয়ে অজ্ঞানময় যে সত্তা তাহাকে কারণশরীর বলে। কারণশরীর উৎপন্ন হইবামাত্র জীবের মধ্যে অহম্ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা ভোগাদির নিমিত্ত জীবের ভিতর স্বভাবতঃই প্রেরণা উৎপন্ন হয়। এই প্রেরণাই কারণশরীরের উপর সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

অন্তঃশরীর-আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ মনো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানণুঃ॥

প্রাণেনাক্ষিপতা ক্ষুত্তৃষ্ণা জায়তে বিভোঃ।
পিপাসতো জক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত॥
মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোহধিগম্যতে॥
বিবক্ষোর্মুখতো ভূম্নো বহ্নির্বাগ্‌ব্যাহৃতং তয়োঃ।
জলে চৈতস্য রুচিরং নিবোধঃ সমজায়ত॥
নাসিকে নির্ভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ॥ ইত্যাদি।

আত্মার প্রেরণায় অনন্তাকাশে ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন, বল ও সূক্ষ্মপ্রাণের বিকাশ হয়। প্রাণের স্পন্দনে ক্ষুধাতৃষ্ণার বিকাশ হইলেই তন্নিবারণার্থ মুখের উৎপত্তি হয় এবং মুখমধ্যে তালু ও রসগ্রাহী রসনেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। তদনন্তর কথা কহিবার ইচ্ছা হইলেই বাগিন্দ্রিয় এবং বহ্নি দেবতার বিকাশ হয়। প্রাণবায়ুর অত্যন্ত সঞ্চার এবং গন্ধ গ্রহণের ইচ্ছা হওয়া মাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। এই প্রকারের অবিদ্যোপহিত চৈতন্যে অহম্ভাবের সূচনা হইয়াই তৎপ্রেরণায় কারণশরীরের দ্বারা সূক্ষ্মশরীর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর সপ্তদশ সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। যথা পঞ্চদশীতে—

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন এবং বুদ্ধি (যাহার মধ্যে চিত্ত ও অহঙ্কার অন্তর্ভুক্ত) এই সপ্তদশ উপাদানে সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি প্রাণ ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম বস্তু, স্থূল কেহই নহে। চক্ষু বলিতে স্থূল চক্ষু গোলক নহে, যে সূক্ষ্মশক্তির দ্বারা স্থূল-চক্ষু গোলক দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। পঞ্চ প্রাণও সূক্ষ্ম শক্তি যাহার দ্বারা পঞ্চ স্থূলবায়ু কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্য উহাও সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত। মনের স্বভাব

সঙ্কল্প বিকল্প করা এবং বুদ্ধির স্বভাব নিশ্চয় করিয়া দেওয়া। চিত্ত, মন ও বুদ্ধির দ্বারা অর্জ্জিত সমস্ত সংস্কারের আশ্রয় স্থান এবং অহঙ্কার বুদ্ধির মূলে থাকিয়া জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বভ্রম উৎপন্ন করে। এইরূপে সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইবার পর তাহার বেগে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ভোগের যন্ত্রস্বরূপ স্থূল ইন্দ্রিয় সমূহ ভিন্ন ভোগ-সম্পাদন করিতে পারেনা। এইজন্য সূক্ষ্ম মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ভোগের নিমিত্ত প্রেরণা উৎপন্ন হইলেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়া সূক্ষ্মশরীরের উপর অবস্থিত হয়। এইরূপে ব্যাপক প্রকৃতি-প্রকৃতরাজ্যে স্বাভাবিক প্রকৃতি স্পন্দন দ্বারা জীবভাবের উৎপত্তি এবং জীবাত্মার সহিত স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরের সম্পর্ক হইয়া থাকে। উল্লিখিত শরীরত্রয়কে বেদান্তশাস্ত্রে পঞ্চকোষও বলা হইয়া থাকে। যথা—পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর অন্নময় কোষ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তিগুলি মিলিয়া প্রাণময় কোষ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন মিলিয়া মনোময় কোষ। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি মিলিয়া বিজ্ঞানময় কোষ। অবিদ্যামূলক কারণশরীর আনন্দ-ময় কোষ। এইরূপে তিন শরীর বা পঞ্চকোষযুক্ত জীবাত্মাকেই জীব বলা হইয়া থাকে এবং এই জীবই অনাদি মায়ার চক্রে লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য-যোনির মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের দ্বারা কখন স্বর্গে, কখন নরকে, কখন দেব-যোনিতে, কখন মনুষ্য পশ্বাদি যোনিতে যন্ত্রারূঢ়ের মত বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। উহা কেন এবং কি প্রকারে হয়, তাহাই অতঃপর আলোচিত হইবে।

জীবের গতি।

অনাদ্যনন্তা প্রকৃতিমাতার অসীম অঙ্কে চিজ্জড়গ্রন্থি-যোগে কতই জীব অনবরত উৎপন্ন হইতেছে এবং দুর্লভ নিঃশ্রেয়সপদ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটিযন্ত্রের মত জননমরণ-চক্রে কতই ঘূর্ণিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

এবং জীবাশ্রিতা ভাবা ভবভাবনমোহিতাঃ।
ব্রহ্মণঃ কল্পিতাকায়াল্লক্ষশোঽথ কোটিশঃ॥
অসংখ্যাতাঃ পুরা জাতা জায়ন্তে চাপি সম্প্রতঃ।
উৎপতিষ্যন্তি চৈবাম্বুকণৌঘা ইব নির্ঝরাৎ॥

স্ববাসনাদশাবেশাদাশাবিবশতাং গতাঃ।
দশাস্বতিবিচিত্রাসু স্বয়ং নিগড়িতাশয়াঃ ॥
অনারতং প্রতিদিশং দেশে দেশে জলে স্থলে।
জায়ন্তে বা ম্রিয়ন্তে বা বুদ্‌বুদা ইব বারিণি ॥
কেচিৎ প্রথম জন্মানঃ কেচিজ্জন্মশতাধিকাঃ।
কেচিদ্বা জন্মসংখ্যাকাঃ কেচিদ্‌দ্বিত্রিভবান্তরাঃ ॥
ভবিষ্যজ্জাতয়ঃ কেচিৎ কেচিদ্‌ ভূতভবোদ্ভবাঃ।
বর্ত্তমানভবাঃ কেচিৎ কেচিন্নভবতাং গতাঃ ॥
কেচিৎ কল্পসহস্রাণি জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ।
একামেবাস্থিতা যোনিং কেচিদ্‌ যোন্যন্তরং শ্রিতাঃ ॥
কেচিন্মহাদুঃখসহাঃ কেচিদল্পোদয়াঃ স্থিতাঃ।
কেচিদত্যন্তমুদিতাঃ কেচিদর্কাদিবোদিতাঃ ॥
কেচিৎ কিন্নরগন্ধর্ববিদ্যাধ[illegible] ।
কেচিদর্কেন্দ্রবরুণা[illegible]পদ্মজাঃ ॥
কেচিৎ কুষ্মাণ্ডবেতালযক্ষরক্ষঃপিশাচকাঃ।
কেচিদ্‌ ব্রাহ্মণভূপালা বৈশ্যশূদ্রগণাঃ স্থিতাঃ ॥
কেচিচ্ছ্বপচচাণ্ডালকিরাতাবেশপুক্কসাঃ।
কেচিত্তৃণৌষধীঃ কেচিৎ ফলমূলপতঙ্গকাঃ ॥
কেচিদ্‌ ভুজঙ্গগোনাসকৃমিকীটপিপীলিকাঃ।
কেচিন্মৃগেন্দ্রমহিষ মৃগাজচমরৈণকাঃ ॥
আশাপাশ-শতৈর্বদ্ধা বাসনাভাবধারিণঃ।
কায়াৎ কায়মুপাজন্তি বৃক্ষাৎ বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ ॥
তাবদ্‌ ভ্রমন্তি সংসারে বারিণ্যাবর্ত্তরাশয়ঃ।
যাবন্মূঢ়া ন পশ্যন্তি স্বমাত্মানমনিন্দিতম্‌ ॥
দৃষ্ট্বাত্মানমসৎ ত্যক্ত্বা সত্যামাসাদ্য সংবিদম্‌।
কালেন পদমাগত্য জায়ন্তে নেহ তে পুনঃ ॥

এইরূপে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চিদংশ জীব সংসার ভাবনায় ভাবিত চিত্ত হইয়া নিয়ত নিয়তিচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অসংখ্য পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে,

অসংখ্য এখনও উৎপন্ন হইতেছে এবং নির্ঝরিণী-নিঃসৃত জল-কণার মত অসংখ্য ভবিষ্যতেও উৎপন্ন হইবে। জীব স্ববাসনার আশা-বিবশ হইয়া অতি বিচিত্রভাবে বন্ধনপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সমুদ্রে জলবুদ্‌বুদের মত জলে স্থলে অনুক্ষণ কালের কবলে কবলিত হইতেছে। কাহারও একই জন্ম হইয়াছে, কাহারও শতাধিক জন্ম হইয়া গিয়াছে, কেহ বা কল্পে কল্পে জন্মধারণ করিয়াছে, কেহ এখনই জন্ম লইবে এবং কেহ লইতেছে। কাহারও মহান্ দুঃখ হইতেছে, কেহ সামান্য দুঃখী এবং কেহ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাহারও কিন্নর-গন্ধর্ব্বাদি যোনি প্রাপ্তি হইতেছে, কেহ কর্ম্মফলে সূর্য্য-চন্দ্র-বরুণ বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হইতেছেন, কেহ বেতাল যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদি যোনিলাভ করিতেছে এবং কাহারও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি মানব জন্মলাভ হইতেছে। কেহ শ্বপচ চণ্ডালাদি নীচযোনি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং কেহ তৃণৌষধি ইত্যাদি উদ্ভিদ্‌যোনি, কৃমি-কীটাদি স্বেদজযোনি, মৃগেন্দ্র-মহিষাদি পশু-যোনি ও সারসহংসাদি অণ্ডজ-যোনি সমূহে জন্মলাভ করিতেছে। অবিদ্যায় বিবিধভাবে মুগ্ধ হইয়া এইরূপে সমস্ত জীব বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরগত পক্ষীর মত শরীর হইতে শরীরান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। এবং আনন্দময় পরমাত্মার দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্ত জলাবর্ত্তের মত সংসার-চক্রে আবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিবার পর কদাচিৎ কালপ্রাপ্ত হইলে পর তবে জীব মায়াজাল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং তখনই জীব নিজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জনন-মরণ-চক্র হইতে চিরকালের জন্য নিস্তার লাভ করিয়া থাকে। ইহাই মহর্ষি বশিষ্ঠ বর্ণিত অনন্তবিলাসময়ী জীবসৃষ্টির অনন্ত ধারা। এখন এই জীবধারার প্রথমযোনি হইতে শেষযোনি পর্য্যন্ত জীব কিপ্রকারে অগ্রসর হয় ক্রমশঃ তাহাই বর্ণিত হইবে।

মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের চতুর্থ গতি।

সংস্কার বিনা ক্রিয়া হইতে পারে না এবং ক্রিয়া বিনা জীব প্রকৃতির উন্নতিশীল প্রবাহে অগ্রসর হইতেও পারে না, এজন্য চিজ্জড়-গ্রন্থিদ্বারা জীবভাবের বিকাশের পর তিনশরীরবিশিষ্ট জীবের প্রকৃতি-প্রবাহে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত ক্রিয়ার প্রয়োজন। সে ক্রিয়ার সংস্কার কোথা হইতে আসিবে? শাস্ত্র বলেন—প্রাকৃতিক স্পন্দনই ক্রিয়া অর্থাৎ জীবভাব উৎপন্ন করিবার জন্য তমোগুণ হইতে রজোগুণের দিকে প্রকৃতির যে গতি, সেই গতিনিবন্ধন স্পন্দন হইতেই প্রাকৃতিক ক্রিয়া

উৎপন্ন হয় এবং এই ক্রিয়ার সংস্কারকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভিদ্-যোনি হইতে মনুষ্য-যোনির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীব অগ্রসর হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে জীবভাবের বিকাশের প্রথম যোনিকে উদ্ভিজ্জ বলা হইয়াছে এবং ঐ যোনি হইতে মনুষ্য-যোনির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চতুরশীতি লক্ষযোনি প্রত্যেক জীবকে ভ্রমণ করিতে হয় এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে। যথা বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে—

স্থাবরে লক্ষবিংশত্যো জলজং নবলক্ষকম্।
কৃমিজং রুদ্রলক্ষঞ্চ পক্ষিজং দশলক্ষকম্॥
পশ্বাদীনাং লক্ষত্রিংশচ্চতুর্লক্ষঞ্চ বানরে।
ততোহি মানুষা জাতাঃ কুৎসিতাদেব্বিলক্ষকম্॥

মনুষ্য-যোনি লাভের পূর্ব্বে প্রথমতঃ জীবের বিশ লক্ষবার উদ্ভিদ্-যোনি লাভ হয়, তাহার পর একাদশ লক্ষবার স্বেদজ-যোনি লাভ হয়, তাহার পর উনবিংশতি লক্ষ-বার অণ্ডজ-যোনি লাভ হয় এবং তাহার পর চতুস্ত্রিংশৎ লক্ষবার পশু-যোনি লাভ হয়। এইরূপে চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভোগ হইবার পর তবে জীব মনুষ্য-যোনি লাভ করিতে পারে। মনুষ্য-যোনি লাভের পূর্ব্বে জীবের অন্তিমজন্ম কোন যোনিতে হইয়া থাকে এবিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ত্রিগুণানুসারে জীবের মনুষ্যের প্রবাহে অন্তিমজন্মও তিন প্রকারের হইয়া থাকে। যথা, তমোগুণানুসারে অন্তিমজন্ম বানরের হয়, তাহার প্রমাণ উপরেই দেওয়া হইয়াছে। সত্ত্বগুণানুসারে অন্তিমজন্ম গোজাতিতে হয়। যথা পদ্মপুরাণে—

চতুরশীতিলক্ষান্তে গোজন্মা তৎপরং নরঃ।

চুরাশিলক্ষ যোনির অন্তে গোজন্ম হইয়া তৎপরে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। রজোগুণানু-সারে অন্তিমজন্ম সিংহের হয়, এই বিষয়েও শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল যোনি প্রাপ্তির বিষয়ে বেদেও বর্ণন আছে। যথা, ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদে—

"এষ চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জরায়ুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ।"

মনুষ্যেতর যোনিতে জীব উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ এই চার যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের এইরূপ যোনিলাভ কেবল স্থূলশরীরের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের পরিবর্ত্তন বা নাশ হয় না। যথা ছান্দোগ্যোপনিষদে—

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।

সূক্ষ্ম ও কারণশরীরযুক্ত জীবাত্মাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে স্থূল শরীরেরই মৃত্যু হইয়া থাকে; জীবাত্মার মৃত্যু হয় না। এইরূপ গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন যথা:—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যেপ্রকার জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে সেইরূপ জীবাত্মা জীর্ণশরীর ত্যাগপূর্ব্বক অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবাত্মার স্থূলশরীর পরিত্যাগকেই মৃত্যু বলা হয়। প্রথম উদ্ভিদ্-যোনি হইতে শেষ উদ্ভিদ্-যোনি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও কারণশরীরসংযুক্ত জীবাত্মা বিশ লক্ষবার এইপ্রকারে একের পর দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের পর তৃতীয় ক্রমানুসারে ক্রমোন্নত উদ্ভিদ-যোনি গ্রহণ করিয়া উক্ত যোনিকে সমাপ্ত করেন। তদনন্তর জীবাত্মা ১১ লক্ষবার ক্রমোন্নত স্বেদজ কীটাদির যোনিসমূহ প্রাপ্ত হন। স্বেদজ-যোনির পর ১৯ লক্ষবার জীবের ক্রমোন্নত অণ্ডজ-যোনি প্রাপ্তি হয়। উহার মধ্যে জলোৎপন্ন মৎস্য মকরাদি ক্রমোন্নত অণ্ডজ-যোনি ৯ লক্ষবার এবং স্থলোৎপন্ন বিহঙ্গ পতঙ্গাদি ক্রমোন্নত অণ্ডজ-যোনি ১০ লক্ষবার প্রাপ্তি হয়। অণ্ডজ-যোনি সমাপ্ত করিয়া জীব জরায়ুজ পশু-যোনির মধ্যে প্রবেশ করে এবং ৩৪ লক্ষবার ক্রমোন্নত পশু-যোনি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া তবে জরায়ুজ পশু-যোনি সমাপ্ত করিতে পারে। এইরূপে ৮৪ লক্ষবার মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জন্ম হইবার পর তবে জীবের মনুষ্য-যোনি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যেতর যোনিসমূহে যেরূপ জন্মগ্রহণের সংখ্যা শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে মনুষ্য-যোনিতে সেইরূপ সংখ্যানির্দ্ধারণ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের বুদ্ধি-বিকাশ ও অহঙ্কার বিকাশ না হওয়ায় জীব ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য কোন কর্ম্মই নিজে করিতে পারে না। প্রবাহিনী-পতিত কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় তমোগুণ হইতে ক্রমোর্দ্ধগামিনী ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির প্রবাহে জীবকে প্রবাহিত হইতে হয়। অতএব যখন ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠেন এবং জীব সেই প্রবাহে পড়িয়া থাকে, তখন মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের কখনই পতন হইতে পারে না। প্রথম উদ্ভিদ হইতে শেষ পশু পর্য্যন্ত তাহার অবাধ ক্রমোন্নতিই হইয়া থাকে। এইরূপে বাধাহীন ক্রমোন্নতি

হওয়ার জন্যই মহর্ষিগণ জীব-গতির উপর সংযম করিয়া ৮৪ লক্ষ যোনির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য-যোনিতে আসিলেই জীবের বুদ্ধি বাড়িয়া যায়, অহঙ্কার বাড়িয়া যায়, জীব নিজের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিয়া ভালমন্দ কত কর্ম্মই করে এবং সেই সকল স্বতন্ত্র কর্ম্মের দ্বারা কখন স্বর্গে, কখন নরকে ইত্যাদি কত যে সুদশা দুর্দ্দশাই লাভ করে, তাহার ইয়ত্তা হইতে পারেনা। কারণ সে যখন স্বতন্ত্র, তখন তাহার কর্ম্ম-সংস্কার স্বতন্ত্র এবং কর্ম্মের বশে উচ্চাবচ বিবিধ যোনিপ্রাপ্তিও নিশ্চিত। অতএব মনুষ্য-যোনিতে কতবার জন্মগ্রহণ করিয়া তবে মনুষ্য পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা সকল মনুষ্যের পক্ষে একরূপও হইতে পারে না এবং ইহার সংখ্যা নির্ণয়ও হইতে পাবে না।

মনুষ্য ও তদিতর যোনি সমূহে কর্ম্মের তারতম্য।

মনুষ্যেতর সমস্ত যোনিতে জীব ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির স্পন্দন জনিত প্রাকৃতিক সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহপতিত রূপে অগ্রসর হইয়া থাকে। এজন্য ঐ সকল যোনিতে জীব সমূহের ঐরূপই চেষ্টা হইবে যেরূপ ক্রমোন্নতিশীল প্রবাহে জীব অগ্রসর হইতেছে। উহা ক্রমোন্নতি অনুসারে পৃথক পৃথক হইলেও এক প্রবাহে একইরূপ হইবে। এই জন্যই মনুষ্যেতর যোনি সমূহে সমশ্রেণীর জীবের মধ্যে সমানরূপ চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন সিংহ বা ব্যাঘ্রকে কেহ কখনও ঘাস খাইতে দেখিবেন না। ইহারা নিজের প্রকৃতি অনুসারে মাংসই খাইবে। আবার গরু কদাপি মাংস না খাইয়া ঘাসই খাইবে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দনজনিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নানা যোনির মধ্য দিয়া জীব ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। কিন্তু ঐ সকল সংস্কার ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি দ্বারা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাদের সহিত জীবের স্বামিত্ব-সম্বন্ধ থাকে না এবং এই জন্যই মনুষ্যেতর জীবসমূহের মধ্যে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার পরজন্মের কারণরূপ হয় না। পূর্ব্বজন্মের সমাপ্তির সময় পূর্ব্বজন্ম-প্রদ প্রাকৃতিক সংস্কার ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির মধ্যেই থাকিয়া যায় এবং জীব প্রকৃতি-চালিত হইয়া আগামী জন্মের নূতন সংস্কার নূতন প্রাকৃতিক স্পন্দনের ফলরূপে নূতন ভাবেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার নূতন জন্মের চেষ্টাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি কোন জীবের প্রাকৃতিক সংস্কারানুসারে শ্বান-যোনি প্রাপ্তি হয়, তবে সে শ্বান-যোনি-সুলভ মাংস ভক্ষনই করিবে এবং নিদ্রা-ভয়-মৈথুনও শ্বান প্রকৃতির সংস্কারানুসারে করিবে।

কিন্তু যদি শ্বান-যোনি শেষ হইবার পর তাহার অশ্ব-যোনিলাভ হয় তবে আর শ্বান-যোনির সংস্কার তাহাকে আদৌ আশ্রয় করিবে না, সে নবীন অশ্ব-যোনির সংস্কারবশে মাংস খাওয়া ভুলিয়া গিয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিবে। অর্থাৎ সে শ্বান-যোনিতে মাংস খাইত, সুতরাং সেই সংস্কারবশে পরের যোনিতেও খাওয়া উচিত এরূপ হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে মনুষ্যেতর যোনিসমূহে জীবের গতি একমাত্র প্রাকৃতিক সংস্কারের বলেই হইয়া থাকে, উহাতে পূর্ব্বকর্ম্মের সহিত পরবর্ত্তী কর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ থাকে না এবং প্রারব্ধ-সঞ্চিত আদি কোনপ্রকার সংস্কার বৈচিত্র্যও উহার মধ্যে নাই। পরন্তু মনুষ্য-যোনিতে পদার্পণ করিয়া জীবের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ সময় বুদ্ধি-বিকাশ এবং নিজশরীর ও ইন্দ্রিয়গণের উপর মমত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে মনুষ্য ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির সংস্কার-ধারাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র কর্ম্ম প্রভাবে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সংস্কার উৎপন্ন করিতে থাকে। তদনুসারে মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের আগামী জন্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং উন্নত বা অবনত নিজকৃত প্রারব্ধানুসারে উন্নত বা অবনত জন্মলাভ হইয়া থাকে। এই কারণ বশতই মনুষ্যেতর যোনি সমূহে কেবল মাত্র প্রাকৃতিক সংস্কার (Instinct) থাকিলেও মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীব প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ এই তিনপ্রকার স্বোপার্জ্জিত সংস্কারবশে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করিয়া থাকে। পশ্বাদি যোনিসমূহে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির অধীনতা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহের উপর স্বামিত্বের অভাব থাকার জন্য পশু প্রভৃতির মধ্যে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি সকল ক্রিয়াই নিয়মিত হইয়া থাকে। উহাতে প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধতা অথবা অপ্রাকৃতিক বলাৎকারের সহিত কোন কার্য্যই হয় না। এই জন্যই পশুপক্ষী আদির মধ্যে অনিয়মিত মৈথুনাদি কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি-কার্য্যের জন্য ঋতুকাল উপস্থিত হইলে উহাদের মধ্যে স্বয়ংই মৈথুনেচ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পরেই ঐ ইচ্ছা একেবারে বিলুপ্ত হয়। সে সময় স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে থাকিলেও কাম-প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মনুষ্যযোনিতে আসিলেই উদ্দাম ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বশে জীব ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতির এই মধুর নিয়মকে অতিক্রম করে এবং অনিয়মিত ভাবে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়-সেবা-পরায়ণ হইয়া প্রকৃতির ক্রমোন্নতিশীল প্রবাহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই কারণেই পশ্বাদি জীবের মধ্যে আহার,

নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি নিয়মিতভাবে হইলেও মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীবের ঐ সকল ক্রিয়া অনিয়মিত হইয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ধারা তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণের দিকে ক্রমোন্নত হয় বলিয়া মনুষ্যেতর জীবসমূহ এই ধারার অবলম্বনে যতই ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, ততই উহাদের মধ্যে পঞ্চকোষের ক্রমবিকাশ এবং তন্নিবন্ধন শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিসম্বন্ধীয় বিবিধ বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেক জীব-শরীরের উপাদানের মধ্যে তিন শরীর অথবা পঞ্চকোষের সম্বন্ধ থাকে বলিয়া জীবমাত্রের মধ্যেই পঞ্চকোষ বিদ্যমান থাকে। কেবল প্রভেদ এই যে নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে সকল কোষের বিকাশ হয় না। জীবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোষ সমূহেরও ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। তদনুসারে উদ্ভিজ্জ যোনিতে অন্নময় কোষের বিকাশ, স্বেদজে অন্নময়, প্রাণময় উভয়েরই বিকাশ, অণ্ডজে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় তিন কোষেরই বিকাশ, এবং জরায়ুজ পশু-যোনিতে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় চার কোষেরই বিকাশ হইয়া থাকে। উদ্ভিদে কেবল অন্নময় কোষের বিকাশ হয় বলিয়া এই যোনিতে জীব প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না; কিন্তু স্বেদজে প্রাণময় কোষেরও বিকাশ হওয়ায় স্বেদজ কীটাদি ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারে এবং নিজের প্রাণ-শক্তির দ্বারা মহামারী আদি উৎপন্ন করিয়া পরের প্রাণকে বিপদ্‌গ্রস্তও করিতে পারে। অণ্ডজে মনোময় কোষের বিকাশের জন্যই অণ্ডজ কপোত, চক্রবাক আদি পক্ষীর মধ্যে অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ ও দাম্পত্যপ্রেম দেখা গিয়া থাকে। জরায়ুজ পশুগণের মধ্যে অন্নময়াদি কোষত্রয়ের অতিরিক্ত বিজ্ঞানময় কোষেরও স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া পশুগণ নানাবিধ মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিরও পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। গোমাতা নিজের সন্তানকে বুভুক্ষু রাখিয়াও জগজ্জনের পরিপালনের জন্য অমৃতধারা বর্ষণ করেন। অন্ন-কণা-তৃপ্ত শ্বান কৃতজ্ঞতার সহিত বিনিদ্র-রজনীতে নিজ স্বামীর সম্পত্তিরক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রভুর বিপদে অবলীলাক্রমে আত্মবলিদান করিয়া ধন্য হয়। পশুরাজ সিংহ দুর্ব্বল পশুর উপর কদাপি আক্রমণ করে না এবং যৌবনাবস্থায় পিতামাতার দ্বারা সংগৃহীত মৃগ-মাংসও ভক্ষণ না করিয়া নিজের বীরত্বে সংগৃহীত মাংসভোজন করিয়া থাকে। এইরূপে চারি কোষের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবসমূহে ক্রমোন্নত বৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি এই সকল যোনিতে আনন্দময় কোষের বিকাশ হয় না। এবং ইহাদের

মধ্যে বিকশিত বুদ্ধি-বৃত্তিও স্বশরীরের উপর অভিমান আনয়ন করিবার যোগ্য হয় না। আনন্দময় কোষের বিকাশ না হওয়ার জন্যই মনুষ্যেতর জীবেরা হাসিতে পারে না। হৃদয়ানন্দ-বিকাশসূচক স্পষ্ট হাসি মনুষ্যই হাসিয়া থাকে। কারণ আনন্দময় কোষের বিকাশ মনুষ্যের মধ্যেই হইয়া থাকে। এই আনন্দময় কোষের বিকাশের জন্যই "আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়, আমি ইহাদের দ্বারা যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারি" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি ও বাসনা উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের মধ্যে ইন্দ্রিয় লালসাকে বলবতী করিয়া দেয়। কারণ যাহার মধ্যে যে শক্তি আছে সে যদি জানে যে আমার এই শক্তি এবং ইহার দ্বারা এই সুখসাধন করিতে পারি, তবে স্বভাবতঃই তাহার ইচ্ছা শক্তিচালনা ও সুখভোগের দিকে বাড়িয়া উঠিবে। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ-শক্তি থাকিলেও উহার জ্ঞান থাকে না এজন্য প্রকৃতি ঐ ইন্দ্রিয় লালসাকে নিয়মিত করিতে পারে। মনুষ্যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও জ্ঞান, শরীরের উপর অহঙ্কার সবই পরিস্ফুট হয়। এবং এই জন্যই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা দ্বারা মনুষ্য প্রকৃতির ক্রমোন্নতিশীল প্রবাহ হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে এবং ইহাতে তাহার আবার অধোগতির আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। যে শক্তি মনুষ্যের এই অধোগমনের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া মনুষ্যকে ক্রমোন্নতির অবসর প্রদান পূর্ব্বক পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর করে, সেই শক্তির নামই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বিধিই মানবীয় প্রকৃতি-প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যানুসারে বেদাদি শাস্ত্রসমূহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মনুষ্যেতর যোনিসমূহে বুদ্ধি-বিকাশের অভাব ও অল্পতাহেতু শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মবিধির আশ্রয়ে ঐ সকল জীবের উন্নত হইবার শক্তি নাই। প্রকৃতি-মাতাই অসহায় শিশুর মত নিজের অঙ্কে ধারণ করিয়া ঐ সকল জীবকে উন্নত করিতে করিতে মনুষ্য-যোনি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। উহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের ভার প্রকৃতিমাতার উপরই থাকে। এজন্য মনুষ্যেতর যোনিসমূহে পাপ-পুণ্য কিছুই আশ্রয় করে না। ব্যাঘ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়াও পাপী হয় না এবং গোমাতা দুগ্ধ দান করিয়াও পুণ্যবতী হন না। কারণ উহাদের অন্তঃকরণে ঐ সকল ক্রিয়ার কোনরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। পরন্তু মনুষ্যযোনিতে স্বকীয় কর্ম্মের অভিমান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; মনুষ্য বুঝিতে শিখে যে "আমি এই কার্য্য করিয়াছি" ; তাহার আত্মার সহিত সুকৃত দুষ্কৃতের অভিমান ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এই জন্যই মনুষ্য-যোনিতে পাপ-পুণ্যের

দায়িত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাপপুণ্যের দায়িত্ব লইয়া মানুষ যদি শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে ধর্ম্মকার্য্যে রত হয় তবেই অধোগতির সম্ভাবনা হইতে রক্ষা পায় এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়া নিঃশ্রেয়স পদ লাভ করে। নতুবা উদ্দাম ইন্দ্রিয় বৃত্তির বশে আবার মনুষ্যেতর যোনিতে পতিত হইয়া থাকে। অতএব সিদ্ধান্ত এই নিশ্চয় হইল যে মনুষ্যেতর যোনিসমূহে কর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য না থাকায় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতির আশ্রয়ে জীব ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য-যোনি লাভ করে, কিন্তু বুদ্ধি-বিকাশের নিমিত্ত মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীব স্বাভিমানের সহিত ব্যাপক প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া নিজের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি-প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। এবং ঐ ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে দ্বিবিধ বিশেষত্ব উৎপন্ন হয়। এক বিশেষতা শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে উদ্দাম প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া নিঃশ্রেয়সের দিকে অগ্রসর হইবার শক্তিলাভ এবং দ্বিতীয় বিশেষতা ইন্দ্রিয় লালসায় অভিভূত হইয়া আবার নিম্নগতি প্রাপ্ত হইবার শক্তি লাভ। অতঃপর উল্লিখিত দ্বিবিধ শক্তির তারতম্যানুসারে মনুষ্য-যোনিতে জীবের কত প্রকার গতি ও জন্মজন্মান্তর হইয়া থাকে তাহাই আলোচিত হইবে।

কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের সহজ গতি।

পশু-যোনি হইতে মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া জীব প্রথমতঃ পশুবৎই আচরণ করিয়া থাকে ; কারণ, প্রথম মানব যোনি হওয়ায় উহা পাশবিক প্রকৃতির প্রায়ই সমতুল্য হয়। পৃথিবীর অনেক অরণ্যদেশে এখনও ঐরূপ পশুপ্রায় 'জঙ্গলী' মনুষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাপক-প্রকৃতি পশুদের জন্য যেমন নিজের স্পন্দনজনিত কর্ম্ম-সংস্কার উৎপন্ন করেন, সেইরূপ প্রাথমিক মনুষ্যের জন্যও করিয়া থাকেন। তবে বুদ্ধি-বিকাশের বৃত্তি-স্ফুরণোন্মুখ হওয়ায় মনুষ্য ব্যাপকপ্রকৃতির ঐ কর্ম্ম-প্রেরণাকে নিজের আত্মার সহিত অভিমানযুক্ত করিয়া লয় এবং তদনুসারে উহা তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্মের কারণ হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তিগত কর্ম্ম-সংস্কার মনুষ্য-যোনিতে তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যথা সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ। অনেক জন্ম ধরিয়া মনুষ্য যে রাশি রাশি কর্ম্ম করিতেছে, অথচ সব কর্ম্মের ভোগ না হইয়া কেবল প্রবল কর্ম্মগুলিরই ভোগ হইতেছে, ঐ সকল অভুক্ত রাশীকৃত কর্ম্ম-সংস্কারকে সঞ্চিত বলে। সঞ্চিত কর্ম্মসকল চিত্তের গভীরদেশ যাহাকে চিদাকাশ বলে তথায় সঞ্চিত থাকে এবং ধীরে ধীরে জন্মজন্মান্তরে ফলদান করে। নবীন বাসনার বশে প্রতিজন্মে মনুষ্য যে সকল নবীন নবীন কর্ম্ম করে তাহার সংস্কারকে ক্রিয়মাণ সংস্কার বলে।

[ক্রমশঃ]

সর্ব্বধর্ম্ম-সদন।

ইতিপূর্ব্বে কাশী—শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক জনৈক উদারচেতা সন্ন্যাসীপ্রবরের প্রস্তাবানুসারে দ্বারবঙ্গ-নরেশ সর্ব্বধর্ম্মসদনের বিষয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আর্য্যমহিলা নামক হিন্দী পত্রিকায় মহামণ্ডলের অন্যতম সন্ন্যাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামী তাহার উদ্দেশ্য ও সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যথা:—

(১) এই তীর্থভূমির একদিকে সনাতন ধর্ম্মের সকল প্রকার উপাসনা-মন্দির থাকিবে। সনাতন ধর্ম্মানুসারে উপাসনা পাঁচ প্রকার (ক) ব্রহ্মোপাসনা (খ) সগুণোপাসনা—অর্থাৎ শিব, শক্তি, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং গণপতির উপাসনা। (গ) লীলাবিগ্রহোপাসনা—অর্থাৎ অবতারোপাসনা। (ঘ) ঋষি, দেবতা, এবং পিতৃগণের উপাসনা। (ঙ) আসুরী অর্থাৎ ভূত প্রেতাদির উপাসনা। এই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার স্থান ভক্তের হৃদয়মন্দির সুতরাং তাহার পৃথক স্থানের প্রয়োজন নাই। এবং আসুরী উপাসনা সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষনীয়। এই কারণ ও এই তীর্থভূমির একদিকে পঞ্চোপাসনার পঞ্চমন্দির অবতারোপাসনার এক মন্দির, এবং ঋষি, দেবতা, পিতৃগণের এক মন্দির এইরূপে সাতটী মন্দির স্থাপিত হওয়া উচিত। এবং তাহাদের যথারীতি সেবা ও পূজাদির বন্দোবস্ত করা উচিত।

(২) এই তীর্থভূমির অপরদিকে পৃথিবীস্থ বিভিন্ন প্রধান প্রধান সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মন্দির নির্ম্মিত হউক। যথা—জৈন-মন্দির, বৌদ্ধমন্দির, মুসলমান ধর্ম্মের উপাসনা মন্দির, খৃষ্ট-ধর্ম্মের উপাসনা মন্দির, পারসিক ধর্ম্মের উপাসনা মন্দির ইত্যাদি। এই সমস্ত ধর্ম্ম স্থানে নিজ নিজ ধর্ম্মমার্গ এবং সিদ্ধান্তানুসারে উপাসনার ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের এক একজন মর্ম্মজ্ঞ বিদ্বান আপন আপন ধর্ম্মালয়ে অবস্থান করিবেন।

৩। সর্ব্বধর্ম্মের দার্শনিক ও ধার্ম্মিক পুস্তকের একটা পুস্তকাগার নির্ম্মিত হউক, এবং তৎসঙ্গে একটা বক্তৃতালয় নির্ম্মিত হউক যাহাতে সকল ধর্ম্মের

আচার্য্যগণ ধর্ম্মব্যাখ্যা, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিয়মিত কার্য্য করিতে পারেন।

(৪) আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী পৃথিবীর যে কোনও জাতীয় চরিত্রবান বিদ্বান ব্যক্তি এই তীর্থভূমিতে আগমন করিয়া যদি দার্শনিক শিক্ষা লাভ করিতে চান তবে তাহাদের থাকিবার ও ভোজনাদির সুপ্রবন্ধ করা হউক।

(৫) এই ভূমির একদিকে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক মহা-বিদ্যালয়ের স্থান এবং ছাত্র ও বিদ্বান্‌গণের থাকিবার উপযুক্ত স্থান নির্ম্মিত হউক।

স্বামীজী মহারাজের এই সাধু প্রস্তাব আমরা সহর্ষ অনুমোদন করি। ইহা বর্ত্তমান দেশ কালের উপযোগী এবং সর্ব্বজন হিতকর, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সত্য, শুদ্ধ, সরল, ও সাহজিক দিব্য ভাবের অভাবেই আজ ভারতবর্ষে এই ঘোর দুরপনেয় দুরবস্থা। যুগান্তর পূর্ব্বে আদর্শ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নির্ম্মল অন্তঃকরণেও এই সমন্বয়ের সমুজ্জ্বল সংস্কার জাগরূক হইয়াছিল। আপাততঃ বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান্ অনন্তধর্ম্ম ও ধর্ম্মমার্গের মধ্যে ও সর্ব্বজ্ঞ ঋষি নির্ব্বাধকতা ও সমপ্রাণতার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি জ্বলন্ত অক্ষরে নিজ সংহিতায় বর্ণন করিয়াছেন—

> ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন সধর্ম্মঃ, কুধর্ম্মতৎ
> অবিরোধীতু যো ধর্ম্মঃ সধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব।

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে বাধা প্রদান করে তাহা ধর্ম্ম নহে অধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম অবিরোধী অর্থাৎ কোনও ধর্ম্মকে আক্রমণ করে না তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। অতএব যে ধর্ম্মে অন্য ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ, হিংসা, দ্বেষ, কুটীলতা প্রভৃতি আছে তাহা ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। এক আনন্দ হইতেই জীবের উৎপত্তি, আনন্দ রাজ্যেই স্থিতি আবার আনন্দেই পর্য্যবসান সুতরাং জীব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে পারিলে আর কিছুই চায় না। যত কিছু সাধনা, ভজনা, সব ইহারই জন্য সুতরাং নিখিল জীবেরই লভ্য বা অন্বেষ্টব্য বস্তু এক। তরঙ্গিনীনিচয় তরঙ্গভঙ্গে অনন্তভাবে অনন্তদিকে প্রবাহিত হইলেও তাহাদের অন্তিম গন্তব্যস্থল যেমন একমাত্র সমুদ্র, তদ্রূপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র-নিবন্ধন জীবের প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ধর্ম্মমার্গ অনন্ত হইতে পারে, আচার, বিচার, ব্যবহার পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারে,

অধিকারের বৈষম্যে ভাবের বৈষম্যে সাধনার বৈষম্য অনন্ত হইতে পারে কিন্তু লক্ষ্যস্থল কাহারও বিভিন্ন হইতে পারে না; সকলেরই লক্ষ্য সকলেরই উদ্দেশ্য সকলেরই সাধনার একমাত্র প্রার্থিত আকাঙ্খিত বিষয়—আনন্দকন্দ সচ্চিদানন্দ সমুদ্র।

দুর্দ্দমনীয় কালের অচিন্ত্যনীয় প্রভাবে জ্ঞানের বিকাশ এবং সুশিক্ষার অভাবে ঋষিহৃদয়ের অনুভূত সর্ব্বজীব হিতকর এই পরম পবিত্র-ভাব সমাজের অন্তঃস্থল হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে—অজ্ঞানান্ধকারের কুজ্ঝটীকায় প্রত্যেক মানবের হৃদয়পটল কালিমাময় ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে সত্যানুসন্ধিৎসা জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার পরিবর্ত্তে কেবল আড়ম্বরপূর্ণ ভীতিজনক কোলাহল। ভগবৎ প্রেম সহচরী, স্নেহ, দয়া, মায়া মমতা, প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি গুলি বিদ্বেষাগ্নির প্রচণ্ড শিখায় দগ্ধীভূত শুষ্কপ্রায় হইয়া সর্ব্বরসপূর্ণ মানবজীবনকে সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে—শবময় মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে। চিন্তাশীল প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী বিদ্বৎসমাজ কালের প্রভাব বর্ণন করিয়া নিজ নিজ দায়িত্বভার অপসারণ করিবার জন্য সচেষ্ট। এরূপ সময়ে লুপ্তপ্রায় ঋষিযুগের ক্ষীণ-স্মৃতি ঋষিকল্প কোন মহাত্মার চিত্তাকাশে প্রতিভাত হইয়া যে জগতে কল্যাণ সাধন করিবে ইহা স্বপ্নরাজ্যের ও অগোচর ছিল। কারণ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যে চিন্তাকে কেবলমাত্র শ্লোকাকারে পরিণত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন জগতের সমক্ষে তাহার প্রচার করিয়া কার্য্যে পরিণত করা যে মানবের ক্ষুদ্রশক্তির পক্ষে কিরূপ সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে একটা কথা এই যে প্রয়োজন ভিন্ন কোনও বস্তুর প্রচার হয় না। ঋষির সময়ে ইহার প্রচারের প্রয়োজন ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজন হইয়াছে এবং সুসময় হইয়াছে, সুতরাং প্রচার হওয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। সাধু হৃদয়ের সদ্ভাব-মূলক সদিচ্ছার সহিত ধর্ম্মপ্রাণ রাজর্ষির অনুমোদন মণিকাঞ্চনের যোগের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাব নির্ম্মল সাত্বিক ব্রাহ্মণ-শক্তি রজোগুণময়ী ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব জ্ঞানজ্যোতির চাকচিক্যময় প্রভাবে অজ্ঞানজলদাবৃত ভারতের ঘোর অন্ধকার বিদূরিত করিবার আশারেখা প্রত্যেকের চিত্তফলকে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। বড়ই আনন্দের কথা এই যে কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বীজরোপনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরোদ্গম দেখা দিয়াছে। খৈরী-

গড়রাজ্যেশ্বরী পরম ধার্ম্মিকা ভারতধর্ম্মলক্ষ্মী মহারাণী শ্রীমতী স্থরথকুমারী দেবী এই শুভকার্য্যের স্থত্রপাতের জন্য ৪।৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

শান্তি উৎসবের দিবস (১৪ই ডিসেম্বর) শ্রীমহামায়াট্রষ্ট নামে একটী ট্রষ্ট স্থাপিত করিয়া তিনি তাহাতে ৩১৫০০০ তিন লক্ষ পনর হাজার টাকা জমা করিয়া দিয়াছেন। এই ট্রষ্টের দ্বারা তীর্থভূমির জমি খরিদ এবং ট্রষ্টী-গণের নিকট সনাতন ধর্ম্মের সাতটী মন্দির ও তাহার সেবা পূজাদির ব্যবস্থা করা হইবে। পুণ্যবতী শ্রীমতী মহারাণীর এইরূপ অলৌকিক ধর্ম্মবুদ্ধি, উদারতা, আত্মোৎসর্গ ও সহৃদয়তা ভারতের আদর্শ আর্য্যমহিলারই উপযুক্ত; যদিও অনেক প্রাচীন ভারতজননীগণের ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল কীর্ত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে তথাপি মহারাণী মহোদয়ার এই অদ্ভুত ত্যাগময়ী কীর্ত্তিপতাকা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের দ্বারা ভারতের কল্যাণ বিধান করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বধর্ম্ম সদনের উচ্চশীর্ষে উড্ডীয়মান থাকিবে। ভগবৎ সমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি এই পবিত্র দানযজ্ঞের দ্বারা ইহপারলৌকিক উন্নতিলাভ করিয়া খৈরীগড়-রাজ্যেশ্বরী জগদীশ্বরের কৃপাপাত্রী হউন। এবং তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য মহিলাগণ ও ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণ তাঁহারই অনুকরণ করিয়া নিজ নিজ জীবন পুণ্যময় করুন। যিনি যে কোনও সম্প্রদায়েরই, হউন না কেন নিজ নিজ ধর্ম্মকীর্ত্তি স্থাপন করিতে সচেষ্ট হউন। তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই আমরা এই সর্ব্বধর্ম্মসদনকে সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ দেখিতে পাইব। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না হইয়া এক মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিব। পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া, ঋদ্ধি সিদ্ধির অদ্বিতীয় সোপান একতার পাশে আবদ্ধ হইয়া সংসার আনন্দমহীরূহের একত্বরস—রসস্বরূপ পরম পুরুষে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া পরম—অসীম আনন্দের অবিরল ধারায় অবগাহন করিতে পারিব। পরস্পর পৃথক থাকিয়াও—নিজ নিজ জাতীয় ভাবের সীমাবিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও—অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতের অনন্ত পার্থক্যের মধ্যেও মণিমালার স্থতার মত স্থত্রাত্মা পরমপুরুষকে অবগত হইতে পারিয়া আনন্দে বিভোর আত্মহারা হইয়া যাইব। তখন বেদমন্ত্রের ধ্বনির সহিত নিজ ধ্বনি মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বলিব—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংনো মনাংসি জানতাং
সমানী নঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি নঃ
সমানমস্তু নো মনো যথা নঃ সুসহাসতি॥

এস, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা মিলিত হই,—একমন হইয়া সম্মিলিত বাক্য প্রয়োগ করি—একই বিষয় নির্দ্ধারণ জন্য সকলে তৎপর হই। শারীরিক চেষ্টার জন্য আমাদের সংকল্প সমান হউক, কায়িক উদ্যমের মূল হৃদয় সকলেরই একরূপ হউক—এস সকলে সর্ব্বদা শুভ কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একচিত্ত হই।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী।
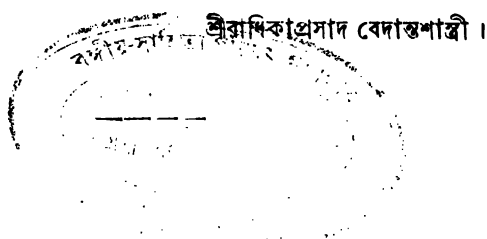
অসীমে সসীম।

তুমি একমাত্র অনাদি অব্যয়,
　　তোমাছাড়া আর দ্বিতীয় নাই
তুমিই আবার অনেক হ'য়েছ—
　　প্রত্যেক জীবেতে তোমারে পাই।

অসীম তুমিগো নাহি তব সীমা,
　　সীমাবদ্ধ তুমি কাহারও নও ;—
তুমিই আবার বিবিধ রূপেতে
　　ভকতের হৃদে উদিত হও।

যে ডাকে যে ভাবে, ওহে দয়াময়!
　　পূর্ণরূপে তাহে তব বিকাশ ;
অসীম তাহ'লে কে বলে তোমায়,
　　সসীমেও যবে হও প্রকাশ?

স্পর্শাতীত তুমি, কে ধরে তোমায় ?
সাধনার ধন জীবনাধার !
যোগীজন তোমা' সদা হৃদিমাঝে
ধরিয়া আনন্দে করে বিহার ?

তুমি ত অশব্দ ওহে শিবময় !
এ বিশ্ব মাঝারে নীরবে রয়েছ,
কিন্তু ধ্বনিময় সাধকের কাছে—
অনাহত শব্দে সদাই বাজিছ !

পতঙ্গ যেমন আলোক দর্শনে
ধায় নিজ প্রাণ সঁপিতে তায়,
জ্যোতির্ম্ময় তুমি, তব আকর্ষণে
ভকতের প্রাণ ছুটিয়া যায় ;

পতঙ্গের নাশ আলোক-শিখায়,
পঞ্চভূতে দেহ পায় বিলয়
তোমার আলোক ধরিতে পারিলে
মরি' নর-নারী অমর হয়।

যে তোমার জ্যোতি লভে হৃদিমাঝে
সে কভু কি মজে অনিত্য সংসারে ?
ভব পারাবারে আর পুন তার
আসিতে হয় না বারবার ফিরে।

যে পেয়েছে তব অমিয় সন্ধান
অমৃতের খনি, করুণা নির্ঝর !
কি আনন্দে মত্ত হইয়া সে সজন
ডুবে থাকে রূপ-সাগরে তোমার।

শ্রীমতী সু—

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল সংবাদ।—১৪।১৫।১৬ ডিসেম্বর তারিখে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বিশাল ভবনে মহামণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশন সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীভগবনের কৃপাপ্রাপ্তি, সম্রাট্, সাম্রাজ্য এবং জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে দুই দিন ধরিয়া কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা শক্তিযাগ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাতৃগণের ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিদিন অনেকানেক শিক্ষিত ভদ্র লোকের সমাগম হইত। স্থানীয় কমিশনার, কালেক্টর ও জজ সাহেব প্রভৃতি রাজপুরুষগণ, এবং প্রতিষ্ঠিত মুসলমানগণ, হিন্দু জমিদারগণ ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্বান পণ্ডিতগণ এই শুভ উৎসবে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতের যে সমস্ত স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে, মানপত্র উপাধি, পদক প্রভৃতি দান করা হইল তাহাদের নামাবলী পাঠ করা হইয়াছিল। মানপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২০০ দুই শত ছিল। এইরূপে গুণীর পূজা, দেশের কল্যাণ, ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা দিবসত্রয় পরম পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। অধিবেশনের কার্য্য পূর্ণ উৎসাহ, আনন্দ এবং সন্তোষের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আনন্দের কথা। শ্রেয়াংশে বহুবিঘ্নানি। শুভ কার্য্যে বিঘ্ন বাহুল্য হওয়া স্বাভাবিক।

গো-হত্যা নিবারণ।—অখিল ভারতীয় মুসলমানগণের বিরাট সভা "মোস্‌লেমলিগে" এই প্রস্তাব পাস হইয়া গিয়াছে যে "বকরীদ্ উপলক্ষে ভারতের কোনও স্থলে কোনও মুসলমান "গো-হত্যা" করিতে পারিবে না।" ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এই মহৎ কার্য্যের দ্বারা মুসলমানগণ হিন্দুজাতির উপর যথেষ্ট ভ্রাতৃপ্রেম এবং গোজাতির উপর সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাবক মহোদয়গণ কেবল হিন্দু নরনারীগণের নয়, সমগ্র ভারতবাসিরই ধন্যবাদার্হ।

শঙ্কর মঠে বেদ বিদ্যালয়।—১২ই মাঘ সোমবার বীণাপাণি সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা দিবসে হাওড়া রামরাজাতলা শঙ্কর মঠে শঙ্করমঠের প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী পরমানন্দ পুরী মহোদয়ের আন্তরিক, উৎসাহ ও উদ্যমে মীমাংসা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তলাল্ শাস্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ, বঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের প্রধানমন্ত্রী রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য পণ্ডিতগণের সমাবেশ হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গদেশে বেদবিদ্যা প্রচার, এবং তাহার উপায়ীভূত উপযুক্ত আদর্শ ব্রহ্মচারী প্রস্তুত। সভাস্থলে অনেক বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের বেদের উপকারিতা সম্বন্ধে সুললিত ও সারগর্ভিত বক্তৃতা হয়। ফলে উদ্দেশ্যটী যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী অতীব মহৎ এবং সর্ব্বজন হিতকর। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অল্লাধিক পরিমাণে বেদশাস্ত্রের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমাদের, এমনি আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি যে বহুকাল হইতেই আমরা বেদ শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। অথচ বিবাহাদিতে "সামবেদীয়কুথুমীশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ" মন্ত্র পাঠ করিতে একটুও সঙ্কুচিত হই না। বেদের অনভ্যাসই যে আমাদের পতনের মূল কারণ তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ভগবান্ মনু "অনভ্যাসেন বেদানাং......নরঃ পতন মৃচ্ছতি" বলিয়া এই বিষয়টী নিজ সংহিতায় বিশেষ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ সুমহৎ কার্য্যে প্রত্যেক হিন্দুর সহানুভূতি, ঐকান্তিক প্রযত্ন এবং আর্থিক অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের উৎসাহে এই কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছে —তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং তাঁহারা এই কার্য্যে সফলকাম হইলে প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শ্রদ্ধাভাজন হইবেন। ভগবান তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা প্রদান করুন।

দ্বেষ, সুখ, দুঃখ আদি ধর্ম্ম আপনাতে আরোপিত করিয়া থাকে। এইজন্যই জীবকে ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় জন্ম-মরণ-চক্রে নিরন্তর ভ্রমণ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার দুঃখই ভোগ করিতে হয়। কেননা: আত্মা যখন অভিমানবশতঃ আপনাকে প্রকৃতির ন্যায় মনে করিয়াছে, তখন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ-শরীরের সহিত আত্মার অবশ্যই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সুখ-দুঃখসমূহও তাহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যখন করুণাময় ভগবানের কৃপায় সাধক পরাভক্তি লাভ করিবেন এবং তাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইবে যে, আমি স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীরদ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং তত্তৎসম্বন্ধযুক্ত জীব নহি, শরীরগত সুখ-দুঃখের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তখনই সেই জ্ঞানী ভক্ত স্বরূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং তিনি প্রকৃতি-পারাবার-পারস্থিত সচ্চিদা-নন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবেন। শ্রুতি স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, "জ্ঞানী ভক্ত আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আনন্দরূপ, সর্ব্বাধার, পরমাত্মার প্রতি পরাভক্তিপরায়ণ হইতে পারিলে সেই সাধকের আর অন্য কিছু লাভের অবশেষ থাকে না। নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রাপ্ত জ্ঞানী ভক্ত যেইরূপ অপার আনন্দ লাভ করেন, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণন করা যায় না। এইরূপে সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলে ভক্তের সমস্ত সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; পঞ্চকোষের

সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় যে জীবভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই জীবভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। পরাভক্তি-প্রাপ্ত যোগী—জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের আনন্দ-সত্তা প্রাপ্ত হইয়া সংসারচক্রের জন্ম-মরণ-ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন"* ॥৯॥

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব!
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্ব-যজ্ঞ-পতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥

সমাধি-নির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥
তদা পুমান্মুক্ত-সমস্ত-বন্ধন-
স্তদ্ভাব-ভাবানু-কৃতাশয়া-কৃতিঃ।
নির্দগ্ধ-বীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তি-প্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্॥
অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতি-চক্র-শাতনম্।
তদ্ব্রহ্ম-নির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ
ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥
বিনির্ধূতাশেষ-মনোমলঃ পুমান্
অসঙ্গ-বিজ্ঞান-বিশেষ-বীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রি-মূলে কৃত-কেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে॥

এইরূপে—

বৈধী ও রাগাত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ সাধন-লভ্য ভক্তিই গৌণী।১০।

সাধনদ্বারাই গৌণীভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈধী ও রাগাত্মিকাভেদে গৌণীভক্তি দুই প্রকার। সাধনের আতিশয্যদ্বারাই গৌণীভক্তির পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। যখন সাধক শাস্ত্রসম্মত বিধি-নিষেধের অধীন থাকিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, জপ, ধ্যান, বহির্যাগ ও অন্তর্যাগ আদি ভগবানের প্রতি ভক্তি-ভাবের উৎপাদক সাধনসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভক্তিভূমিতে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন তাদৃশ ভক্তিকেই বৈধী-ভক্তি বলা হইয়া থাকে। ভক্তির এতাদৃশ অবস্থাতে কর্ত্তব্যা-

---

যদা রতির্ব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমান্
আচার্য্যবান্ জ্ঞান-বিরাগ-রংহসা।
দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোষং
পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ॥
দগ্ধাশয়ো মুক্ত-সমস্ততদ্গুণো
নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে।
পরাত্মনো যদ্ব্যবধানং পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে॥
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত-
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥

(১০) বৈধী-রাগাত্মিকা-নাম-ভিন্না সাধন-লভ্যা গৌণী।১০।

কর্ত্তব্যের নিয়ম বিদ্যমান থাকে বলিয়াই ইহাকে বৈধী-ভক্তি বলা হয়। পরন্তু এইরূপে বৈধী-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি এক অলৌকিক রাগযুক্ত হয়, যাহাতে সেই ভক্ত নিশিদিন ভক্তি-ভাবে মগ্ন থাকিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, তখনই সাধকের চিত্তে আনন্দরূপ অমৃত-সিঞ্চনকারী, তৈল-ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন যে এক পরম অনুরাগমূলক অপূর্ব্ব ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাহাকেই রাগাত্মিকা-ভক্তি বলা হইয়া থাকে ॥১০॥

দ্বিবিধ গৌণীভক্তির মধ্যে প্রথমে বৈধীভক্তিরই স্বরূপ বর্ণন করা হইতেছে—

বিধি-অনুসারে সাধ্যমান ভক্তির নাম বৈধী, উহা সোপানরূপা ।১১।

বিধি অনুসারে সাধন করা হয় বলিয়া প্রথম দশার ভক্তিকে বৈধী বলা হইয়া থাকে। ভক্তির উন্নত দশাপ্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে বৈধী-ভক্তিই অবলম্বনীয়, সুতরাং ইহা সোপান-স্বরূপ। প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেমন মনুষ্যকে পরম্পরাস্থিত সোপান (সিঁড়ি) অবলম্বন করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই মনুষ্য প্রাসাদের উপরে (ছাদে) উঠিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ গুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী থাকিয়া বৈধীভক্তির নয় প্রকার অঙ্গের সাধন করিতে করিতে

(১১) বিধিসাধ্যমানা বৈধী সোপান-রূপা ।১১।

সাধক ক্রমশঃ যোগসম্বন্ধীয় 'প্রত্যাহার' ভূমি অতিক্রম করিয়া ভক্তির অন্তর্‌রাজ্যে প্রবেশ করিতে পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়া থাকেন। বৈধী-ভক্তির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন এই নয় প্রকার অঙ্গ কথিত হইয়াছে*। এইসকল অঙ্গ অনুসারে সাধক আপন আপন জীবনচর্য্যা যখন ভগবানের সেবা আদি রূপেই পরিণত করিয়া দেন, তখন তাঁহার চিত্ত সর্ব্বপ্রকার পাপ-শূন্য হইয়া শ্রীভগবানেরই কৃপাবলে সেই হৃদয়-মন্দির-বিহারী শ্রীহরির অপূর্ব্ব আসনরূপ হইয়া যায়। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, "প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণসমূহকে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভগবদ্‌-বিষয়ক ভক্তিও সাধকের চিত্তস্থিত পাপরাশিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ভগবানের প্রেমময় মধুর নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্রই হৃদয়ের সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়"†। শ্রীভগবান্‌ নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, "আমি বৈকুণ্ঠে থাকিনা, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করিনা, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করিয়া থাকেন, সেই স্থানেই আমার চির-নিবাস"†। এইরূপে গীতো-

---

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্‌॥

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা তদ্বিষয়া ভক্তি করোত্যেনাংসি কৃৎস্নশঃ।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেন স্বানাং ভাব-সরোরুহং।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ॥

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!॥

পনিষদেও তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করে, তাহার পক্ষে আমি (ভগবান) অত্যন্ত সুলভ"*। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যে পবিত্র চরণ হইতে নিঃসৃতা হইয়া সমস্ত সংসারকে পবিত্র করিতেছেন, সেই চরণপঙ্কজের সেবনদ্বারা যে চিত্তের জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত মলিনতা সত্বরই নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? এইরূপে বৈধী-ভক্তির সাধক শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসমূহের বিধিবৎ সাধন করিতে করিতে পবিত্রচিত্ত হইয়া দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন নামক বৈধীভক্তির চরম তিন অঙ্গের অভ্যাস করিতে থাকেন। রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাইয়াই এই তিন অঙ্গের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। পরন্তু অভ্যাসের তীব্রতা অনুসারে ভক্তির বৈধী দশাতেও এই পূর্ব্বোক্ত তিন অঙ্গের সাধন হইয়া থাকে। ভগবানকে প্রভু মনে করিয়া দাসভাবে তাঁহার সেবাতেই চিত্তকে একাগ্র করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অভ্যাসই দাস্যরূপ অঙ্গের লক্ষণ; আর ভগবানকে প্রিয়তম মিত্ররূপে মনে করিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের নিমিত্ত প্রযত্ন করাই সখ্যভাবরূপ অঙ্গের লক্ষণ এবং এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার যখন

* অনন্য-চেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

† যৎপাদ-সেবাভি-রুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সরিৎ॥

ভগবানেরই নানাবিধ সেবাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন বৈধী-ভক্তির অন্তিম সাধনরূপ আত্ম-নিবেদন ভাবের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "এইরূপ অবস্থাগত সাধকের মন ভগবানের চরণ-কমলে লীন, বচন তাঁহারই গুণগানে, হস্ত তাঁহারই মন্দির-মার্জ্জনে, কর্ণ তাঁহারই সৎকথা শ্রবণে, নেত্র তাঁহারই মূর্ত্তি দর্শনে, অঙ্গ তাঁহারই ভক্তের গাত্র-সংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহার চরণ-সরোজের সুগন্ধ আঘ্রাণে, জিহ্বা তাঁহাতে সমর্পিত তুলসীদলের রসাস্বাদনে, চরণ তাঁহার অধিষ্ঠানদ্বারা পবিত্রীকৃত তীর্থসমূহের পর্য্যটনে, মস্তক তাঁহারই চরণে প্রণাম করিতে এবং সকল প্রকার কামনা তাঁহারই (ভগবানের) দাসত্বে সমর্পিত, হইয়া থাকে*"। এইরূপে যখন ভক্ত বৈধী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, তখনই শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব কৃপায় উক্ত সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি এক অনুপম-প্রীতি-প্রবাহ

---

* স বৈ মনস্তস্য পদারবিন্দয়োঃ
বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং কুরুষাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ-লিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভক্ত-গাত্র-স্পর্শেহঙ্গ-সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানু-সর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম-কাম্যয়া
যথোত্তম-শ্লোক-জনাশ্রয়ারতিঃ॥

উৎপন্ন হয়, যাহাতে ভক্তের হৃদয়ে নিশিদিন অবিরলধারে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভগবানের মধুর গুণ-কথা-শ্রবণ এবং ভগবৎ-স্বরূপের ধ্যান করিতে করিতে যখন ভক্তের চিত্ত সম্পূর্ণ একাগ্র হইয়া যায়, তখন সেই ভক্ত সাধকের ভগবানে শুদ্ধা-রতি এবং ভাগীরথীর পবিত্র ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন মনোগতির প্রাপ্তি হইয়া থাকে"*। এতাদৃশ ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। পরসূত্রে ইহার বিবরণ বর্ণিত হইবে ॥১১॥

দ্বিতীয় রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—

রসানুভাবিকা এবং আনন্দ ও শান্তিদায়িনী ভক্তিই রাগাত্মিকা ।১২।

---

* ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরোষ্ঠ—
ভাসারুণায়িত-তনুদ্বিজকুন্দ-পংক্তি।
ধ্যায়েৎ স্বদেহকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণোঃ
ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্দিদৃক্ষেৎ॥

সতাং প্রসঙ্গান্মম-বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ, ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না, যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য, নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্য-ব্যবহিতা, যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

(১২) রসানুভাবিকা-নন্দ-শান্তিদা রাগাত্মিকা ।১২।

গৌণী ভক্তির অন্তর্গত রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হইলে সাধক ভগবানের প্রতি প্রীতিজনিত অলৌকিক রসের অনুভব করিতে সমর্থ হন। ধারণাভূমি সুদৃঢ় হওয়ায় সাধকের চিত্ত যখন নিশিদিন ভগবানেরই শ্রীপাদপদ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তখন সেই ভগবৎ-প্রাণ ভক্ত এক অপূর্ব্ব প্রীতি-রস অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভক্তাগ্রগণ্য সাধক ভক্তিরসে আর্দ্রীভূত ও সেই রস-পানেই উন্মত্ত হইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপন চিত্তকে ভগবানের চরণ-কমল-চিন্তন হইতে বিশ্রাম করিতে দেন না"*। ভক্তের চিত্ত যখন এইরূপে ভগবানে নিবিষ্ট,--একাগ্র

---

* বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ—
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
ত্রিভুবনবিভব-হেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতি-রজিতাত্ম-
সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি
যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥
এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধ-ভাবো
ভক্ত্যা দ্রবৎ-হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্প-কলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান—
স্তচ্চাপি চিত্ত-বড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাং।
যেনাঞ্জসোল্বণ-মুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ-কথামৃত-পান-মত্তঃ॥

হইয়া যায়, তখন ভগবদ্-রসাস্বাদনের দ্বারা ভক্তের হৃদয়ে পরমানন্দ-জ্যোতিঃ ও শান্তির উদয় হইয়া থাকে ; ইহাই রাগাত্মিকা-ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন দশাগত সাধকের চিত্তের অপূর্ব্ব ভাব। এইরূপে স্মৃতিতে আরও লিখিত হইয়াছে যে, "ভগবানের প্রতি এতাদৃশ রাগাত্মিকা-ভক্তির উদয় হইলে সাধকের চিত্ত পুলকিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যায় ও তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে এবং সকল সাধনের ফলভূত পবিত্র শান্তি সেই ভক্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে"*। ইহাই রাগাত্মিকা-ভক্তির চরম লক্ষণ ॥১২॥

এইরূপ ভাবের উদয় হইলে সেই ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয় ?—

যাহার জ্ঞান হইলে মত্ততা, স্তব্ধতা ও আত্মারামতা হইয়া যায়।১৩।

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্র—
মানন্দ-বাষ্প-কলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানঃ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো
নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্ত-লিঙ্গঃ ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ-প্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥

(১৩) যজ্জ্ঞানান্মত্তস্তব্ধাত্মারামত্বম্।১৩।

রাগাত্মিকা ভক্তিতে নিমগ্ন সাধক কখনও মত্ত, কখনও বা স্তব্ধ আবার কখনও বা আত্মারাম হইয়া থাকেন। যোগ-সম্বন্ধীয় ধারণা-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ভক্ত যখন রস-সমুদ্রের বিভিন্ন ভাবে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তিলাভ করেন, তাদৃশ অবস্থায় তাঁহার চিত্তে বিষয়-বাসনার লেশমাত্রও থাকেনা এবং ঐ সময় আনন্দ-সাগরে উন্মজ্জন ও নিমজ্জনশীল ভক্তের রস-বোধের তারতম্য অনুসারে তাঁহার বহির্লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। রাগাত্মিকা ভক্তিতে নিমগ্ন সাধক কখনও রাগামৃতপানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন, কখনও বা অনুরাগরাশিদ্বারা আপন অন্তঃকরণ পূর্ণ করিয়া পূর্ণকুম্ভের ন্যায় স্তব্ধ, নীরব ভাবে অবস্থান করেন, আবার কখনও হৃদয়পদ্মে বিরাজমান আত্মাতে অপূর্ব্ব রতিযুক্ত হইয়া আনন্দের পবিত্র-ধারায় অবগাহন করত আত্মারাম ভাবে অবস্থিত হইয়া থাকেন। ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তির চরম ফল। এই বিষয়ে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভগবানের প্রতি রাগাত্মিকা-ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিলে ভক্তের কোটী কোটী জন্ম-সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাঁহার অন্তঃকরণের বিষয় বাসনা অনুরাগের পবিত্র বহ্নিতে শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। তখন তাঁহার লোকলজ্জা, লোকভয় আদি কিছুই থাকেনা। তিনি হয়ত কখনও উচ্চহাস্যে নভোমণ্ডল কম্পিত করেন, কখনও বা আনন্দভাবে বিগলিত ও উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন, আবার কখনও ভগবানের মধুর গুণগাথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে নির্ল্লজ্জভাবে সর্ব্বত্র ভ্রমণ

করেন"*। এইরূপভাবে আরও বর্ণিত আছে যে, মধুপান-লোলুপ ভ্রমর যেমন ফুলের মধু প্রাপ্ত হইলেই নিস্তব্ধভাবে উহা পান করিতে থাকে, সেইরূপ রাগাত্মিকা-ভক্তিপ্রাপ্ত সাধক,-ভক্ত কখনও কখনও আনন্দময় ভগবানের আনন্দামৃত পান করিতে করিতে নিস্তব্ধভাবে থাকেন, কখনওবা ভগবৎ-বিষয়ের বর্ণন করিতে করিতে আনন্দাশ্রুধারায় নিজবক্ষঃ প্লাবিত করেন, আবার কখনও হয়ত পরমাত্মাতেই একান্ত

কথং বিনা রোমহর্ষং, দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনা-নন্দাশ্রু-কলয়া শুদ্ধোদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥
যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি,
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥
বাগ্গদ্গদা দ্রবতো যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি॥
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত-চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
ক্বচিৎ রুদন্ত্যচ্যুত-চিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥
ক্বচিৎরুদন্তি বৈকুণ্ঠ,—চিন্তা-শবল-চেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তা,-হ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥

রতিযুক্ত হইয়া বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইয়া যান। ইহাই রাগাত্মিকা-ভক্তির চরম লক্ষণ, অপূর্ব্ব রাগ-মহিমা ॥১৩॥

রাগাত্মিকা-ভক্তিযুক্ত ভক্তের ভাব বর্ণনান্তর ভাবের সহিত ঈশ্বর এবং কার্য্যব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে—

ঈশ্বর ভাবগম্য এবং ভাব শব্দদ্বারা প্রকাশ্য সুতরাং কার্য্যব্রহ্ম নাম ও রূপাত্মক।১৪।

ভাবের সহায়তাতেই ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায় এবং ভাব শব্দদ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ নিখিল দৃশ্যমান্ জগৎ নাম ও রূপাত্মক। ভগবান অবাঙ্মনসোগোচর অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও বাক্যের অতীত হইলেও

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শ-নির্বৃতঃ।
অস্পন্দ-প্রণয়ানন্দ-সলিলা-মীলিতেক্ষণঃ ॥
নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্য্যাণি লীলা-তনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎ-পুলকাশ্রু-গদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস—
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥

(১৪) ভাবগম্য ঈশ্বরঃ শব্দ-দ্যোত্যশ্চ ভাবস্তস্মা-ন্নাম-রূপাত্মকং কার্য্যব্রহ্ম।১৪।

ভাবুক সাধক কেবল ভাবের দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এইজন্য শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "ভাবের দ্বারাই যাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় এমন যে ভাব এবং অভাব এতদ্বয়ের কর্ত্তা এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর শিবরূপ ভগবান, তাঁহাকে যে ভক্ত জানিতে পারেন, তিনি বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন"*। এতদ্ব্যতীত তটস্থ জ্ঞান হইতে স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার সময় অর্থাৎ স্বরূপ দশায় যাইতে হইলে একমাত্র ভাবই প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। যে দশায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটী বিদ্যমান থাকিতে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাকে তটস্থজ্ঞানের দশা বলে এবং যে অবস্থায় ত্রিপুটীর লয় হইয়া অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহার নাম স্বরূপজ্ঞানদশা। এই জ্ঞান-ভূমিদ্বয়ের সন্ধিস্থলে ভাবেরই বিশেষ আবশ্যকতা হইয়া থাকে কেননা তটস্থ জ্ঞানভূমি হইতে স্বরূপ জ্ঞান-ভূমিতে গমন করিবার সময় কোনপ্রকার স্থূল অবলম্বন না থাকায় সাধককে ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই অবস্থায় সাধক 'আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম' এই প্রকার উচ্চভাবসমূহের অবলম্বন করিয়াই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করত কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। এইজন্যই স্মৃতিতে ভাবের ঈদৃশ অপূর্ব্ব মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"ভাবের দ্বারা সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভাবের বলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আবার

---

* ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাব-করং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥

ভাব বলেই পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক সাধকেরই ভাবের অবলম্বন করা উচিত। ভাবের অবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধিলাভের পক্ষে অন্য কোন সুগম উপায় নাই। এইরূপে ভাবের সহায়তাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়; ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ভগবানের কৃপা লাভ হইয়া থাকে, যাহাতে জীব পরম আনন্দ লাভ করিতে পারে। দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ভাবের অধীন; অতএব ভাবের সহায়তা ব্যতীত সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব; সুতরাং সর্ব্বথা ভাবের অবলম্বন করিবে"*। আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেষ্টাও সহায়ক হইয়া থাকে বটে তথাপি শব্দই এবিষয়ের প্রধান সহায়ক। অধিকন্তু বহির্জগতে শব্দদ্বারাই আন্তরিক ভাবসমূহের স্থিতি হইয়া থাকে। ক্ষণপ্রভা যেমন প্রভাদান করিয়া ক্ষণকালের জন্য জগৎকে আলোকিত করে পরন্তু পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যেই মেঘগর্ভে বিলীন হইয়া জগৎকে দ্বিগুণ অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ শব্দ-

---

* ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেব-দর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনম্॥
ভাবাৎ পরতরং নাস্তি ত্রৈলোক্যে সিদ্ধিমিচ্ছতাম্।
ভাবো হি পরমং জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানমনুত্তমম্॥
ভাবাৎ পরতরং নাস্তি যেনানুগ্রহ-ভাগ্‌ভবেৎ।
ভাবাদনুগ্রহ-প্রাপ্তিরনুগ্রহান্মহাসুখী॥
ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবাধীনমিদং জগৎ।
ভাবং বিনা মহাকাল! ন সিদ্ধির্জায়তে কচিৎ॥
ভাবাৎ পরতরং নাস্তি ভাবাধীনমিদং জগৎ।
ভাবেন লভ্যতে যোগস্তস্মাদ্ভাবং সমাশ্রয়েৎ॥

দ্বারা অন্তর্জগতের ভাব বহির্জগতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভাবের অপ্রকাশ হেতু বহির্জগৎ ভাবশূন্যতারূপ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কারণব্রহ্মের সহিত ভাবের পূর্ণ সম্বন্ধ বিদ্যমান; ভাব জগতে রূপ এবং শব্দদ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম নাম ও রূপাত্মক। কেননা কারণের গুণই কার্য্যরূপে পরিণত হয় এবং ঐ কারণের সহিত যখন ভাবের অটুট সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং কার্য্য যখন ঐ কারণেরই বিবর্ত্ত মাত্র, ও উক্ত কারণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাব নাম ও রূপ দ্বারা কার্য্যেতে প্রকাশিত হয়, তখন কার্য্যব্রহ্ম যে নাম ও রূপাত্মক হইবে ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ সন্দেহ নাই। এইজন্যই শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "কারণব্রহ্ম যে মায়ার আশ্রয় দ্বারা বহুরূপ হইয়া কার্য্যব্রহ্মরূপে বিবর্ত্তিত হন, তাহাও নাম এবং রূপেরই অবলম্বন দ্বারা হইয়া থাকে"*। সুতরাং ঈশ্বর ভাবগম্য এবং ভাব শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ নাম ও রূপাত্মক ইহা বিজ্ঞান সম্মত ॥১৪॥

ভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে জ্ঞান ভূমি ও অজ্ঞান ভূমির নির্দ্দেশ করা হইতেছে—

---

* "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তো হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥"
"নামরূপে ব্যাকরবাণি।"
"সর্ব্বানি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরা, নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে"
"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা।"

ধর্ম্ম বৃক্ষ ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মপ্রচারকের প্রথম বর্ষ শেষ হইতে চলিল। গ্রাহক ও সদস্যগণের নিকট নিবেদন এই যে যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের চাঁদা ২৲ অথবা সদস্য পক্ষে ৩৲ চৈত্র মাসের মধ্যে আমাদের নিকট মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিবেন তাঁহাদের আর ডাক মাসুল বাবদ ১০ বা ৵০ অতিরিক্ত দিতে হইবে না। চৈত্র মাসের মধ্যে যাহাদের টাকা আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া না পঁহুছিবে তাহাদিগের নিকট বৈশাখের ধর্ম্মপ্রচারক ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। আশাকরি সহৃদয় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভিঃ পিঃ প্রেরিত পত্রিকা গ্রহণে আমাদিগকে বাধিত করিবেন। বলা বাহুল্য যে ভিঃ পিঃ ফেরত পাঠাইলে সাধারণ ধর্ম্মসভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

বিনীত—
শ্রীবিজয়লাল দত্ত,
সম্পাদক, ব-ধ-ম।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥

১ম ভাগ { ফাল্গুন, ১৩২৬। ইং ফেব্রুয়ারী ১৯২০ } ১১শ সংখ্যা।

নারীজীবন।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

কন্যাকাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপে মহর্ষি যম পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মবাদিনী নারীগণের নিমিত্ত অসাধারণ ধর্ম্মের ব্যবস্থা বলিয়াছেন। ভগবান্ মনু দেশকাল পাত্র বিচার করিয়া সাধারণ ধর্ম্মের বিচারে উহার নিষেধই করিয়াছেন। এবং মহর্ষি হারীত দুই শ্রেণীর স্ত্রীর বিভাগ বর্ণন করিয়া ব্রহ্মবাদিনীগণের জন্য অসাধারণ বিধি এবং সদ্যোবধূগণের জন্য সাধারণ বিধির বিধান করিয়াছেন। কলিযুগে অসাধারণ বিধির অধিকারিণী নারী নিতান্ত বিরল বলিয়া সাধারণ সদ্যোবধূ-বিধিই প্রচলিত হওয়া উচিত, ইহা বিচারবান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

পতিতে তন্ময়তা ভিন্ন স্ত্রীজাতি নিকৃষ্টযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, এজন্য ব্রহ্মবাদিনী নারীগণ পরমপতি পরমাত্মাতেই তন্ময় হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্ত্রীযোনি-সুলভ অধিকারের অলৌকিকত্ব হেতু মুক্তির অধিকারও এইরূপ অসাধারণ ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বিবাহকাল।

পূর্ব্ব-কথিত বিধি অনুসারে কন্যাকে শিক্ষাদান করিবার পর উপযুক্ত পাত্রে তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত। পাত্রের যোগ্যতা বিষয়ে পিতামাতার এইরূপ বিচার করা উচিত যে পাত্র যেন রূপ, গুণ, কুল, শীল প্রভৃতিতে নিজের কন্যা অপেক্ষা কোন অংশে কম না হয়। যদি পুত্রের মত না হয় তবে অন্ততঃ কোন আত্মীয়ের মত যেন অবশ্যই হয়। নিজ কুলমর্য্যাদার সহিত পাত্রের তুলনা হওয়া উচিত, কারণ সমান ঘরে কন্যাদানই পারিবারিক শান্তি-জনক। অন্যথা আত্মীয়-বিরোধ, কুটুম্ব-কলহ, দাম্পত্যপ্রেমহীনতা এবং গৃহ-বিচ্ছেদ প্রায়ই হইয়া থাকে। বর ও কন্যার বিবাহকালীন বয়ঃক্রমের বিষয়ে আর্য্যশাস্ত্রে নানাবিধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মত-মতান্তর লইয়া আধুনিক সামাজিক জগতে বিবিধ বিবাদ-বিসম্বাদেরও সৃষ্টি হইতেছে। অতএব এই অত্যাবশ্যক বিষয়টি সম্বন্ধে বিচার করিয়া কর্ত্তব্যবিধান করা উচিত। নিম্নে ক্রমশঃ উদ্বাহলক্ষ্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বরকন্যার মহর্ষিমতানুমোদিত বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত হইতেছে।

বিবাহের লক্ষ্য কি? বিবাহের উদ্দেশ্য বর্ণন করিতে যাইয়া ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

সন্তানোৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্য, সেবা, ধর্ম্মানুকূল রতি এবং নিজের ও পিতৃগণের স্বর্গলাভ—গৃহস্থাশ্রমে এই সব গুলিই স্ত্রীর অধীন। অতএব বিবাহ এরূপ ঘরে, এরূপ পাত্রে এবং এরূপ বয়সে হওয়া উচিত যাহাতে বিবাহের উল্লিখিত উদ্দেশ্য গুলি চরিতার্থ হয়। অন্যথা বিবাহের লক্ষ্যই পণ্ড হইবে এবং গৃহস্থাশ্রম শান্তি-নিকেতন না হইয়া নিদারুণ দুঃখেরই আগার হইয়া উঠিবে। অন্য জাতির সহিত আর্য্যজাতীর বিচারের পার্থক্য এই যে কেবল স্থূলদেহের আরাম ও উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া আর্য্যজাতি বিচার করে না। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ এবং আত্মা তিনকেই লক্ষ্য করিয়া আর্য্য জাতির বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব বিবাহের বয়োনির্দ্ধারণ বিষয়েও যদি কেবল এরূপ বিচার করা যায় যে, যে বয়সে

বিবাহ দিলে দম্পতির স্থূল স্বাস্থ্যরক্ষার কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে এবং সন্তানসন্ততিও দৃঢ়কায় ও বলবান হইতে পারে সেই বয়সেই স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত, তাহা হইলে আর্য্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মতে অসম্পূর্ণ বিচার করা হইবে। আর্য্য শাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ বিচার তখনই হইতে পারিবে, যখন বিবাহের এরূপ লক্ষ্য মনে করিয়া বয়োনির্দ্ধারণ করা হইবে যে, তাহার দ্বারা সন্তান-সন্ততি কেবল সুস্থকায় না হইয়া ধর্ম্মপ্রাণও হয়, দাম্পত্য প্রেম পাশবিক ব্যবহারে পরিণত না হইয়া পবিত্র ভগবৎ প্রেমের উন্মেষক হয় এবং ধর্ম্মমূলক শুভপরিণয়ের ফলে সংসারাশ্রমে অনন্ত শান্তির অমিয়ধারা প্রবাহিত হয়। করুণাময় দূরদর্শী মহর্ষিগণ এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নিম্নলিখিত ভাবে বরকন্যার বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিবাহকাল বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

বিবাহকাল বিষয়ে ঋষিগণের মত নির্ণয়।

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

ত্রিশবর্ষ বয়স্ক পুরুষের নিজহৃদয়ের অনুকূলা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত বিবাহ করা উচিত। অথবা চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবক অষ্টবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা থাকিলে ইহা অপেক্ষা আরও শীঘ্র বিবাহ হইতে পারে। মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধং দশাব্দাদ্ যা কন্যা প্রাগ্‌রজোদর্শনাত্তু সা।
গান্ধারী স্যাৎ সমুদ্বাহ্যা চিরং জীবিতুমিচ্ছতা।

দশ বৎসর বয়সের পর রজোদর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যাকে গান্ধারী বলা হয়। দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থী যুবকের এই গান্ধারী কন্যার পাণিগ্রহণ করা উচিত।

সংবর্ত্তসংহিতায় লেখা আছে—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে॥

অষ্টবর্ষীয়া অবিবাহিতা স্ত্রীকে গৌরী বলে, নববর্ষীয়াকে রোহিণী বলে এবং দশবর্ষীয়াকে কন্যা বলা হয়। ইহার পরে কন্যার রজস্বলা সংজ্ঞা হয়। এরূপ রজস্বলা কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নরকবাস হইয়া থাকে। এজন্য রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। অষ্টম বর্ষে কন্যার বিবাহই প্রশস্ত বিবাহ। যমসংহিতায় লেখা আছে—

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥

দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেলেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ না দেন তবে তাঁহার প্রাতিমাসিক রজোজনিত শোণিত পানের পাপ হইয়া থাকে। পরাশর সংহিতায় লেখা আছে—

পিতুঃ প্রদানাত্তু যদা হি পূর্ব্বং
কন্যাবয়ো যঃ সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমপীক্ষমাণা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব॥
যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি,
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাম্।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥

সুপাত্রে সমর্পণের পূর্ব্বেই যদি কন্যা রজোমতী হওয়ায় কন্যাকাল অতীত হইয়া যায় তবে কালাতিরিক্ত গুরু দক্ষিণার ন্যায় দৃষ্টিমাত্রেই এতাদৃশ কন্যা দানকর্ত্তা পিতাকে পাপগ্রস্ত করিয়া থাকেন। কন্যার পরিণয় স্পৃহা আছে এবং সৎপাত্রও পাওয়া যাইতেছে এরূপ অবস্থাতেও যদি পিতামাতা ঋতুকালের পূর্ব্বে কন্যাদান না করেন, তবে সেই কন্যা যতবার ঋতুমতী হন, ততবার পিতামাতাকে ভ্রূণহত্যার পাপ স্পর্শ করে। রজস্বলা হইবার ভয়ে তৎপূর্ব্বেই যোগ্যপাত্রে কন্যাকে সমর্পণ করা উচিত। কারণ অবিবাহিত অবস্থায় কন্যা ঋতুমতী হইলে

পিতাকে দোষ স্পর্শ করে। এই সকল মত ব্যতীত গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণেরও এ বিষয়ে অনেক মত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

প্রদানং প্রাগৃতোরপ্রযচ্ছন্ দোষী (গৌতমঃ)

অদৃষ্টরজসে দদ্যাৎ কন্যায়ৈ রত্নভূষণম্ (আশ্বলায়নঃ)

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

এই সকল বচনের দ্বারাই মহর্ষিগণ ঋতুকালের পূর্ব্বে কন্যাদানের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের মত সমূহের সামঞ্জস্য করিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ আট বৎসর হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের মধ্যেই মহর্ষিগণ বিবাহকালের বিধান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অষ্টম বর্ষে বিবাহদানের ভূয়সী প্রশংসা, কেহ বা দশম বর্ষীয় পরিণয় ক্রিয়ার প্রশংসা এবং কেহ কেহ দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ দিবার প্রশস্ত কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তবে ঋতুকালের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত এ বিষয়ে কোন মহর্ষিরই মতভেদ নাই। এরূপ মতভেদের অভাবের কারণ কি এবং বিবাহকাল নির্ণয় বিষয়ে মহর্ষিদের মধ্যে এত মতভেদ কেন হইল, তাহা নিম্নে ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। গ্রন্থারম্ভেই ভগবান্ মনুর আজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে যথা—

আর্ষ মতাবলীর সামঞ্জস্য বিধান।

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি ॥

স্ত্রীজাতির রক্ষায় নিজ সন্তানসন্ততি, চরিত্র, বংশমর্য্যাদা, আত্মা এবং ধর্ম্ম সকলেরই রক্ষা হইয়া থাকে। এজন্য স্ত্রীজাতির রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এই রক্ষা কিরূপে হইতে পারে এখন তাহাই বিচার্য্য। বিবাহের উদ্দেশ্য বিষয়ে বিচার করিলে বুঝা যায় যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে নৈসর্গিক ভোগ্য-ভোক্তৃভাব আছে তাহাকে অনর্গল ও উচ্ছৃঙ্খল হইতে না দিয়া নিয়মিত করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। প্রকৃতি পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিস্বরূপিণী বলিয়া প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন স্ত্রী এবং পরমাত্মার অংশ হইতে উৎপন্ন পুরুষ—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্মিলনের তীব্র ইচ্ছা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে। যাহাতে এই স্বাভাবিক ইচ্ছা সমস্ত সংসারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিস্তৃত হইয়া অতি হীন পাশবিক ভাবে পরিণত না হয় প্রত্যুত এক স্ত্রীর এক পতির প্রতি এবং এক পতির এক স্ত্রীর প্রতি অবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে পশুভাবের নাশ এবং দেবভাবের অভ্যুদয়

বিধান করে সেইজন্যই বিবাহ সংস্কারের দ্বারা দম্পতিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান হইয়া থাকে। এইরূপে ভাবশুদ্ধির দ্বারা একই পতিতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করত স্ত্রী ধর্ম্মানুকূল প্রবৃত্তির আশ্রয়ে নিবৃত্তি পথের পথিক হইতে পারেন এবং পুরুষও পরস্ত্রী হইতে হৃদয় আকর্ষণ করিয়া প্রবৃত্তিভাব দমন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়তা ও সংযমের সহায়তায় নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইতে পারেন। বিবাহের দ্বারা এই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়াই বিবাহ পুণ্যময় সংস্কার। অতএব স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সেই সময়েই হওয়া উচিত যে সময়ে উহাদের মধ্যে পারস্পরিক ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উন্মেষ হইতে থাকে; অর্থাৎ স্ত্রী নিজকে পুরুষের ভোগ্যা এবং পুরুষ নিজকে স্ত্রীর ভোক্তা মনে করিতে আরম্ভ করে। কারণ যদি এই সময়ে এক পুরুষের দ্বারা স্ত্রীর চিত্তকে কেন্দ্রবদ্ধ এবং এক স্ত্রীর দ্বারা পুরুষের চিত্তকে কেন্দ্রবদ্ধ না করিয়া দেওয়া হয় তবে কেন্দ্রহীন চিত্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে রমমাণ হইয়া অতিশয় চাঞ্চল্য ও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহকাল নির্ণয় সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম। এক্ষণে এই সাধারণ নিয়মের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিভেদানু-সারে বিশেষ বিধি কি হওয়া উচিত নিম্নে তদ্বিষয়েই বিচার করা হইতেছে।

বিবাহের বয়োনির্ণয় বিষয়ে বিশেষ বিধি।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্॥
এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি॥

মদ্যাদি পান, দুর্জ্জন-সংসর্গ, পতিকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকা, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অতি নিদ্রা এবং পরগৃহবাস এই ছয়টি স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দোষ। স্বাভাবিক দোষ বলিয়াই সতত সাবধানচিত্তে স্ত্রীজাতির রক্ষা করা পুরুষের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক স্ত্রী প্রকৃতির অংশরূপিণী বলিয়া উহার মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় ভাবই বিদ্যমান। উপর কথিত ছয়টি দোষ অবিদ্যাভাবের বিষময় পরিণামে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাভাবের মধুর বিকাশে তাহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব ধৈর্য্য, পাতিব্রত্য, তপস্যা, তন্ময়তা প্রভৃতি দিব্যগুণাবলীরও উদয় হইয়া থাকে। অতএব ইহা সহজেই সিদ্ধান্ত করা

যায় যে, যে বয়সে বিবাহ দিলে স্ত্রীজাতির মধ্যে অবিদ্যাভাবের উন্মেষ না হইয়া বিদ্যাভাবেরই প্রকাশ হইতে পারে সেই বয়সই উহাদের বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত কাল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের সম্মুখে লজ্জিত হইয়া বস্ত্রের দ্বারা নিজের শরীর আবৃত করিতে না শিখে এবং যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীসুলভ কোনরূপ চাঞ্চল্য তাহার মধ্যে না দেখা যায়, ততদিনই তাহার কন্যাকাল। অতএব কন্যার বিবাহ সেই সময়েই হওয়া উচিত যখন তাহার মধ্যে স্ত্রীসুলভ চাঞ্চল্য এবং স্ত্রীভাবের কথঞ্চিৎ বিকাশের সূচনা হয় এবং পুরুষের সহিত সে নিজের পার্থক্য ও ভোগ্যভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ বুঝিতে আরম্ভ করে। কারণ এইরূপ হইলেই স্ত্রীভাবের নৈসর্গিক বিকাশ এবং মনোবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় পতিভাবে একটি পুরুষের সহিত কেন্দ্রবদ্ধ হইবে এবং অনেক পুরুষে বিকীর্ণ হইবার অবসর পাইবে না। অন্যথা বিকাশের মুখে মনোবৃত্তি যদি অবলম্বন না পায় তবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া স্ত্রীজাতির মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায় সতীধর্ম্মের মূলোচ্ছেদের সম্ভাবনা জন্মাইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণেই পিতামাতার পক্ষে বিশেষ সাবধানতার সহিত কন্যার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিবাহকাল নির্ণয় করা উচিত। এই কাল নির্ণয় সকল কন্যার পক্ষে একরূপ হইতে পারে না। কারণ প্রকৃতির পার্থক্য বশতঃ স্ত্রীভাবসমূহের বিকাশ সকলের মধ্যে একই কালে হইতে পারে না। তবে সাধারণতঃ আট বৎসর হইতে বার বৎসরের মধ্যে উল্লিখিত স্ত্রীভাব সমূহের বিকাশ দেখা গিয়া থাকে। এজন্য মন্বাদি মহর্ষিগণ এইরূপই আজ্ঞা দিয়াছেন। তবে তাঁহাদের আজ্ঞাসমূহের মধ্যে মতভেদ হইবার কারণ এই যে সকল স্মৃতি একই কালকে লক্ষ্য করিয়া বিরচিত হয় নাই। এই হেতু যে কালকে লক্ষ্য করিয়া যে স্মৃতি বিরচিত হইয়াছে, সেই কালে কন্যাগণের অবস্থার বিচার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ আজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে। পাপময় কলিযুগে যে বয়সে স্ত্রীভাব ও স্ত্রীসুলভ চাঞ্চল্যের বিকাশ হওয়া সম্ভব, পুণ্যময় সত্যাদি যুগে তদপেক্ষা অধিক বয়সে ঐ সকলের বিকাশ নিশ্চয়ই হইবে। কারণ সত্ত্বগুণ-প্রধান দেশকালের প্রভাবে নরনারীর মধ্যে কামাদি বৈষয়িক বৃত্তির বিকাশ অবশ্যই কিছু ন্যূন হইবে। স্মৃতিকারগণ যুগধর্ম্মানুসারেই অনুশাসন সমূহের বিধান করিয়া থাকেন। এবং এই জন্যই নানাস্মৃতিতে স্ত্রীপুরুষের বিবাহের

বয়ঃক্রম বিষয়ে নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল শরীরের সহিত স্ত্রীভাব বিকাশের সম্বন্ধ থাকায় সাত্ত্বিক স্থূল শরীরে স্ত্রীভাব সমূহের বিকাশ কিছু বিলম্বে হইয়া থাকে। কিন্তু তামসিক স্থূল শরীরে একরূপ হইতে পারে না। যেরূপ কামজ পুরুষ-শরীরে ব্রহ্মচর্য্যধারণের শক্তি কম হয় এবং যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের বিকাশও শীঘ্রই হইয়া পড়ে, সেই প্রকার কামজ নারীদেহেও নারী-ভাবের বিকাশ অল্প বয়সেই হইয়া থাকে এবং মানসিক চপলতাও শীঘ্র প্রকাশ পায়। অন্য যুগে গর্ভাধানাদি ষোড়শ সংস্কার যথাশাস্ত্র হইত বলিয়া বালক-বালিকাগণের শরীরও সত্ত্বপ্রধান হইত। এজন্য ঐরূপ শরীরে নারীভাবের বিকাশও শীঘ্র হইতে পারিত না। কিন্তু দুরন্ত কলিযুগে গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহ বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। ধর্ম্মভাবমূলক সন্তান উৎপাদনের সংস্কার কলিকল্মষ-দূষিত নরনারীগণের হৃদয়াকাশ হইতে একবারেই অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। আজকাল পাশবিক ভাবের উন্মাদেই সন্তানোৎপাদন করা হইয়া থাকে। গীতোক্ত 'ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামে'র পুণ্যময় লক্ষণ আর দেখা যায় না। এই হেতুই আজকাল বালক বালিকাগণকে অল্প বয়সেই বিষয়-ভাব-প্রবণ এবং তদনুকূল লক্ষণযুক্ত দেখা যায়। স্মৃতিকার মহর্ষিগণ এই সকল যুগধর্ম্মের তারতম্য দেখিয়া ধর্ম্মবিধির বিধান করিয়াছেন বলিয়াই, সকল স্মৃতির মত একরূপ দেখা যায় না। কিন্তু বিবাহের বয়ঃক্রম বিষয়ে মহর্ষিগণের মত পার্থক্য থাকিলেও, রজোধর্ম্মের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে কোন ঋষিরই মতদ্বৈধ দেখা যায় না। প্রত্যুত সকল মহর্ষিই একবাক্যে একথা স্বীকার করিয়াছেন। ঋগ্বেদে একটি মন্ত্র আছে যথা—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়োঽগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার উপর প্রথমতঃ চন্দ্রদেবের অধিকার হয়, তাহার পর গন্ধর্ব্বদেব কন্যাকে গ্রহণ করেন, তাহার পর অগ্নিদেব এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যপতির কন্যার উপর অধিকার জন্মে। এই তিন দেবতার অধিকার কন্যার উপর কোন্ কোন্ সময়ে হইয়া থাকে এ বিষয়ে গোভিল গৃহ্যসূত্রে লেখা আছে যথা—

ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাম্।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্ব্বো রজস্যগ্নিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

স্ত্রীর লক্ষণ বিকাশের সময়ে চন্দ্রদেবের অধিকার, স্তন বিকাশের সময় গন্ধর্ব্ব-দেবের অধিকার এবং রজস্বলাবস্থায় স্ত্রীর উপর অগ্নিদেবের অধিকার হইয়া থাকে। এই প্রমাণগুলির ভাবার্থ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে যখন দেবতাত্রয়ের অধিকারের পরে মনুষ্যপতির অধিকার বর্ণন করা হইয়াছে, তখন রজস্বলা হইবার পরেই কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। একটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে স্থূল-সূক্ষ্মের পার্থক্য না জানাতেই এইরূপ বিচার-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে স্ত্রীশরীরের উপর সূক্ষ্মশরীরধারী দেবতা-গণের অধিকার কেন বর্ণিত হইয়াছে তাহা আর্য্যশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞান হইলে বেশ বুঝা যায়। সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড একইরূপ হওয়ায় সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কার্য্য সম্পাদনের জন্য ব্রহ্মাদিপ্রমুখ যে সকল দেবতা নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদের সকলেরই কেন্দ্রস্থান ব্যষ্টিদেহেও বিদ্যমান আছে। জীবদেহে ঐ সকল দেবতা অধিষ্ঠিত থাকাতেই নিয়মিত সময়ে জীবদেহের নানাবিধ পরিণাম এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বাল্যাবস্থা হইতে রজস্বলা অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীশরীরের ত্রিবিধ পরিণাম তিন দেবতার অধীন, ইহাই অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ মহর্ষিগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ সোম দেবতার প্রেরণায় স্ত্রীদেহে স্ত্রীলক্ষণ সমূহের ক্রমবিকাশ হয়, তাহার পর গন্ধর্ব্বের প্রেরণায় পয়োধরের বিকাশ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বশেষে অগ্নিদেবতার তেজে স্ত্রী যখন ঋতুমতী হন, তখনই মনুষ্যপতির দ্বারা গর্ভাধানরূপ স্থূলব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই বিচারের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে স্ত্রী জাতির স্থূলশরীরকে ক্রমশঃ পরিস্ফুট করত গর্ভধারণের উপযুক্ত করিয়া দেওয়াই চন্দ্রাদি দৈবশক্তি সমূহের কার্য্য। ইহা স্থূল ক্রিয়া মাত্র। বিবাহের সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। কারণ বিবাহ সংস্কার কেবল স্থূল সংস্কার নহে, ইহার সহিত হৃদয়ের এবং সূক্ষ্ম জগতের সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়ের রহস্য ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত প্রমাণগুলি দেখিয়া বিবাহকাল নির্ণয় বিষয়ে সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যজাতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যযুগে সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ থাকায় ধর্ম্ম চারিপাদে পূর্ণ ছিলেন। তখন মনুষ্যের অধর্ম্মের দ্বারা অর্থকাম সেবার আদৌ ইচ্ছা হইত না। তদনন্তর ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হইল। তাহার ফলে চৌর্য্য, কপটতা, মিথ্যাপবাদ প্রভৃতি অধোগামিনী প্রবৃত্তি সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সমষ্টি সৃষ্টির ধারা যে নিম্নগামিনী, এই ক্রমিক অধঃপতন তাহার একটী বিশেষ নিদর্শন। কেবল ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নহে, পাশ্চাত্য দেশের অতি প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতেও এই সিদ্ধান্তটী বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। পশ্চিমদেশের সর্ব্বপ্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলে আদম হইতে জীবোৎপত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, প্রথম সৃষ্টির সময় আদমের শরীর হইতে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বহির্গত হইয়া পথিবীর দিকে আসিল। তাহা হইতে অনেক পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ উৎপন্ন হইয়া জ্ঞানে ধর্ম্মে জগৎ উজ্জ্বল করিলেন। কিন্তু সৃষ্টিবিকাশের এই পবিত্র ধারা অধিক দিন বিদ্যমান রহিল না। উহা ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হইয়া পড়িল। গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত 'প্লেটো' 'ফিড্রস্' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রথম বিকাশের সময় যে সকল পুণ্যাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা এত উন্নত ছিলেন যে, স্বর্গে দেবতাদিগের সঙ্গে পর্য্যন্ত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু কালানুসারে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। মানবের বুদ্ধি মায়ায় আবৃত হইল। তাহা হইতে অধার্ম্মিক সন্তান উৎপন্ন হইতে লাগিল। অতএব পূর্ব্ব ও পশ্চিমদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থানুসারে ইহা দৃঢ়নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞানে ধর্ম্মে পূর্ণ-জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মজ্ঞ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণই সৃষ্টির আদি অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে সৃষ্টির অধোমুখিনী গতির সঙ্গে সঙ্গে রাজসিক ও তামসিক বিবিধ -প্রকৃতি-সম্পন্ন মানবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখন সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় উৎপন্ন পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষগণের কোন্ দেশের প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করা সম্ভব তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, ঠিক তদনুকূল প্রকৃতিযুক্ত প্রদেশে তাহার জন্ম হওয়া সম্ভব। অন্যত্র প্রতিকূল প্রকৃতিরাজ্যে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য-ব্যাপার আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি লক্ষিত হয় নাই ; সুতরাং পূর্ণজ্ঞানী পুরুষের জন্ম, সর্ব্ববিষয়ে প্রাকৃতিক পূর্ণ উপাদানে গঠিত ভূমিতেই একমাত্র সম্ভব-যোগ্য বলিয়া অগ্রজন্মা মনস্বীগণ স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। অপূর্ণ-ভূমির অসম্পূর্ণ উপাদানে পূর্ণ-পুরুষের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব পূর্ণ-ভূমিই যদি পূর্ণ-পুরুষের জন্ম-ভূমির একমাত্র যোগ্যস্থান হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পূর্ণপ্রকৃতিযুক্ত ভূমির অন্বেষণ করিলেই আর্য্য-জাতির আদি জন্মভূমি নির্ণীত হইবে। পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশের প্রকৃতি পূর্ণ? পূজ্যপাদ আর্য্যগণ এবং গবেষণাপরায়ণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, সকলেই একবাক্যে পৃথিবীর মধ্যে ভারত-ভূমিকেই পূর্ণ-ভূমিরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দার্শনিক ভাষায় যাহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাব বলে, সেই ত্রিবিধভাবের দ্বারাই প্রকৃতি পূর্ণ হইয়া থাকে। প্রকৃতির পূর্ণতা লইয়া চিন্তাশীল আর্য্যপুত্রগণ চিন্তা করিলে পৃথিবীর মধ্যে কেবল-মাত্র ভারতের প্রকৃতিতেই, উক্ত ত্রিবিধ পূর্ণতা দেখিতে পাইবেন। প্রাকৃতিক পূর্ণতার যাহা যথার্থ লক্ষণ, দৃষ্টান্তরূপে এক একটী করিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। আধিভৌতিক অর্থাৎ স্থূল পূর্ণতার প্রথম লক্ষণ ষড়-ঋতুর অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। সমস্ত সৌর জগতের কেন্দ্রশক্তি সূর্য্যের গতি অনুসারে, দুই দুই মাস অন্তর এক একটী ঋতুর যথাক্রম বিকাশ, ভৌতিক-পূর্ণতার একটী প্রধান পরিচয়। অপূর্ণ প্রকৃতিতে কেন্দ্রশক্তির ঐ প্রকার সম্বন্ধ না হওয়ায়, তথায় ষড় ঋতুর পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ সূর্য্যের প্রভাবের উপর ঋতু-বিকাশ নির্ভর করে। কিন্তু অপূর্ণ ভূমিতে পূর্ণরূপে সূর্য্যের বিকাশ হয় না। ভারতের স্থূল-প্রকৃতি পূর্ণ; তাই সূর্য্য-প্রভাব-বশতঃ ষড়-ঋতুর অপূর্ব্ব-বিকাশ ভারতবর্ষে লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত একই সময়ে ষড়-ঋতুর বিকাশও প্রাকৃতিক-পূর্ণতার অন্যতম বিশেষ লক্ষণ। একই সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ষড়-ঋতুর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় হিমালয়ের শীতময়প্রদেশের তুষারাবৃত পর্ব্বত-রাজি হেমন্ত ও শিশির ঋতুর প্রবল পতাকা উড়াইয়া দেয়, ঠিক সেই সময়ে সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে

গ্রীষ্ম-ঋতুর প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর ধূলিকণা পর্য্যন্ত অগ্নিময় হইয়া উঠে এবং তৎকালে মহীশূরাদি প্রদেশে বসন্ত নিজের প্রস্ফুটিত যৌবন লইয়া সোহাগভরে খেলা করে। আবার আসাম প্রদেশে বর্ষা তখন অমৃতধারা বর্ষণ করে ও বঙ্গদেশ তখন শরতের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সারদার আগমনী-গানে জীবন সার্থক করে। এইরূপে প্রকৃতিমাতার মনঃপ্রাণ-মুগ্ধকর অশেষ-সৌন্দর্য্যরাশি, ভারতের প্রত্যেক অঙ্গে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকলই ভারত-প্রকৃতির পূর্ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্থূল-পূর্ণতার দ্বিতীয় লক্ষণ বর্ণ সমন্বয়। আফ্রিকা দেশের মানুষ কৃষ্ণবর্ণ; ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোক শ্বেতবর্ণের; এবং চীন জাপানাদি দেশের লোক পীতবর্ণের হইতে দেখা যায়। প্রকৃতির অপূর্ণতাই তাহার একমাত্র কারণ। পরন্তু আর্য্য-জাতির পবিত্র মাতৃভূমি পূর্ণ-প্রকৃতি-যুক্ত হওয়ায়, ভারতবর্ষে উজ্জ্বল গৌর-বর্ণ, গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ. শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ সমানরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভূমিগত পূর্ণতার চিহ্ন। ভারতের স্থূল প্রকৃতির পূর্ণতা বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্ভিত্তত্ত্ববেত্তা পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় লতাবৃক্ষাদি ভারতের পূর্ণ-ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ফলপুষ্পে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। যেহেতু, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মৃত্তিকার উপাদানসমূহ, ভারতের মৃত্তিকায় সঞ্চিত আছে। ঐ প্রকার প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণী, ভারতের কোন না কোন প্রদেশে বসবাস করিয়া আনন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে সন্দেহ নাই। ভারত-সমুদ্রের অনন্তবিস্তার ও অতলস্পর্শী গভীরতাও সমুদ্রসেবী নানাপ্রকার জীবজন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া মহামূল্য রত্ন প্রসব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ধারণ করে। অন্যদেশীয় সমুদ্র অপেক্ষা ভারতমহাসমুদ্রের এই অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা, পবিত্র-সলিলা ভাগিরথীজলের অপূর্ব্বতা এবং উহার শক্তি, বর্ত্তমান যুগের দাম্ভিক জড়-বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্যগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রকৃতিমাতার পূর্ণ লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার ভূমি লক্ষিত হয়। সিন্ধুদেশের ও রাজ-পুতনার কোন কোন অংশে জলহীন শুষ্ক মরুস্থল, বঙ্গদেশ কিম্বা মিথিলাদিদেশে সজলা-ভূমি এবং ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশের ভূমিতে উক্ত দুই অবস্থার সমতা বিদ্যমান।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতরাজি হিমালয় এই ভারতবর্ষে। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত সাগর অপেক্ষা বিস্তৃত ও গভীর ভারত-মহাসমুদ্র, অনাদি অনন্তকাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তের মহিমা প্রচার করিতেছে। শ্বেতবর্ণের ব্রাহ্মণ-জাতীয় ভূমি, রক্তবর্ণের ক্ষত্রিয়-জাতীয় ভূমি, পীতবর্ণের বৈশ্য-জাতীয় ভূমি এবং কৃষ্ণ-বর্ণের শূদ্র-জাতীয় ভূমি, ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভারতের ইহা মৃত্তিকাগত পূর্ণতার লক্ষণ। শিবরত্নসার তন্ত্রে লিখিত আছে,—

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
তথা শ্রেষ্ঠা কর্ম্মভূমি র্ভূমৌ ভারতমণ্ডলম্ ॥

দেবতাদিগের মধ্যে যেরূপ বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, হ্রদসমূহের মধ্যে যেমন সমুদ্র, নদী সকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা, পর্ব্বতরাজির মধ্যে যেরূপ হিমালয়, বৃক্ষাদির মধ্যে যেমন অশ্বত্থ ও রাজন্যগণের মধ্যে যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য ভূমি অপেক্ষা ভারতভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সকল আধিভৌতিক পূর্ণতারই লক্ষণ। এক্ষণে আধিদৈবিক পূর্ণতার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

আধিদৈবিকভাবেও ভারতপ্রকৃতি পূর্ণ বিকশিত। তাহারই ফলে অনাদি-কাল হইতে ভারতবর্ষে কাশী প্রভৃতি দৈব-শক্তি-প্রকাশক কেন্দ্ররূপী নিত্য-তীর্থ ও বহু নৈমিত্তিক তীর্থ এবং বিবিধ পীঠস্থান ও জ্যোতির্লিঙ্গাদি বিরাজিত রহিয়াছে। আধিদৈবিক পূর্ণতার ফলে ভগবদ্ভক্তির আধারভূত বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ ও অবতারগণ, প্রয়োজনানুসারে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন। আধিদৈবিক পূর্ণতার জন্যই পূর্ণভূমি ভারতবর্ষে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আছে বলিয়া পূর্ণভূমি ভারতবর্ষে পূর্ণজ্ঞানাধার বেদ এবং পূর্ণ-জ্ঞানময় ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বেদে লিখিত আছে,—

ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ ॥

অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না। ভারতবর্ষে মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায়, আর্য্যগণ, ভারতকেই মানবের মুক্তিভূমিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া

গিয়াছেন। সেই জন্যই ত্রিদিবের অমরমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে ভারতবাসীর যশোগাথা গাহিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-জগতের "মোক্ষমূলার", "কোলব্রুক্" ও "টড্" প্রভৃতি মনস্বীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই পূর্ণজ্ঞানজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া বিশ্বসংসার আলোকিত করিয়াছিল। উল্লিখিত যুক্তি ও বহুবিধ প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পূর্ণজ্ঞানময় পুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পূর্ণভূমি ব্যতীত অপূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত ভূমিতে পূর্ণ-পুরুষের উৎপত্তি অসম্ভব। যখন পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র পূর্ণ-প্রকৃতিযুক্ত ভূমি বলিয়া বহুবিধ শাস্ত্রাদি প্রমাণে প্রমাণিত ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক সিদ্ধান্তিত, তখন প্রথম-জাত পূর্ণ-জ্ঞানী মহাপুরুষগণ যে ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। শাস্ত্রমতে আর্য্যজাতির যাহা যথার্থ লক্ষণ, তদনুসারে ভারতের উপরি-লিখিত অগ্রজন্মা পূর্ণপুরুষগণকেই প্রকৃত আর্য্য বলা যাইতে পারে; সুতরাং সকল মহিমা-শালীনী রাজ্ঞী ভারতমাতার পবিত্রক্রোড়ে ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্য-গণই প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছিলেন। অতএব ভারতবর্ষই আর্য্যজাতির আদি নিবাস-ভূমি। ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের পবিত্র সূতিকাগৃহ। আর্য্যগণ যশের মাল্য গলায় পরিয়া, দেবাদেশে তপস্বীবেশে উদাত্তস্বরে সামগাথা গাহিতে গাহিতে, কোন দেব-নিবাস হইতে, ভারতমাতার এই পবিত্র-কুটীরে আসিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বর্ণদৃষ্টি; তাই মাতার অঙ্গ স্বর্ণময় হইয়াছিল; তাই বুঝি ভারত আজিও "সোনার-ভারত"। ভারতবর্ষই আর্য্যজাতির যৌবনের প্রমোদ উদ্যান; সেই সুরম্য উপবনে আর্য্যগণ জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। উন্নতির অত্যুচ্চ হিমাদ্রিশিখর হইতে দুর্দ্দশার পূতিগন্ধময় অন্ধকূপ-নিমজ্জিত অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বার্দ্ধক্যের ভারতবর্ষই—আর্য্যদিগের অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্র। সেই পুণ্যতীর্থে বসিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-নিপীড়িত আর্য্যগণ—অন্তর-মথিত বিষাদের করুণ-গীতি গাহিয়া থাকেন। অন্যদেশ হইতে আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ সকল স্বাধীন-চিন্তা মনস্বীসমাজে কেবল ভ্রান্তবুদ্ধির পরিচায়ক মাত্র। ভারতবর্ষে আর্য্যগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সংশয়-বিরহিত-চিত্তে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ভারতবর্ষান্তর্বর্ত্তী কোন্‌প্রদেশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শাস্ত্রে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষান্তর্গত কুরুক্ষেত্রাদি ব্রহ্মর্ষিদেশে পূর্ণমানব আর্য্যদিগের প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রাদিতেও বহু প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। মনুসংহিতায় আছে,—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদু র্বুধাঃ॥
সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

যে দেশের পূর্ব্বভাগে ও পশ্চিমদিকে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যগিরি, সেই দেশকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেরই প্রাচীন নাম আর্য্যাবর্ত্ত। কেহ কেহ বর্ত্তমান বিন্ধ্যাচলের উত্তরভাগস্থিত ক্ষুদ্র ভূমি-খণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানযুগের অনেক ঐতিহাসিক, ঐরূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মতে, আর্য্যাবর্ত্তের যে বিস্তৃত পরিধি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারত-বর্ষকেই আর্য্যাবর্ত্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র এই বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তরভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিলে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় সমুদ্র লক্ষিত হয় না। উত্তর ভারতের পূর্ব্বভাগে বঙ্গদেশে পদ্মা ব্রহ্মপুত্র আদি নদ-নদী এবং পশ্চিম সীমায় পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে সিন্ধু ইরাবতী প্রভৃতি নদ-নদী বিদ্যমান। সুতরাং যদি কেবল বর্ত্তমান বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরভাগস্থিত ভূখণ্ডকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হয়, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তের যথার্থ লক্ষণ তাহাতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় সমুদ্র, উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে বিশাল ভূখণ্ড বিদ্যমান, ভারতবর্ষ নামে যাহা চিরন্তন প্রসিদ্ধ, তাহারই নাম আর্য্যবর্ত্ত।

বর্ত্তমানকালে যে বিন্ধ্যপর্ব্বত পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ভারতের কোন সীমায়

স্থিত না থাকিয়া মধ্যদেশে স্থিত থাকায়, বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল পুরুষের মনেও নানাবিধ আশঙ্কার উদ্রেক হইতেছে। কিন্তু মন্বাদি মতের অনুসরণ করিয়া, উক্ত শঙ্কা সমাধানের পথে অগ্রসর হইলে বিশদরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, মধ্যস্থিত আধুনিক বিন্ধ্যপর্ব্বত শাস্ত্রবর্ণিত বিন্ধ্যপর্ব্বত নহে; পরন্তু ভারতের দক্ষিণ সীমায় যে বিশাল পর্ব্বত বিদ্যমান, তাহাকেই বিন্ধ্যাচল বলিয়া ভারতের পরিধি-নিরূপক আর্য্যগণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। পুরাণশাস্ত্রে নীল-পর্ব্বতের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যায়, দক্ষিণ ভারতে এবং হরিদ্বারে অদ্যাপি নীলপর্ব্বত বিদ্যমান। সুতরাং কোন নীলগিরি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণন পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। সেইরূপ দক্ষিণ সমুদ্রের নিকটও বিন্ধ্যনামক এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। অতএব বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিষয় শাস্ত্রে বর্ণন দেখিয়া কেবলমাত্র মধ্যভারতস্থিত বিন্ধ্যকেই গ্রহণ করা যায় না; ভারতের দক্ষিণসীমার বিশাল পর্ব্বতই বিন্ধ্যাচল। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষকেই বুঝিতে হইবে। স্বরস্বতী এবং দৃশদ্বতী, এই দুইটী দেবনদীর অন্তবর্ত্তী যে দেবনির্ম্মিত দেশ, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল এবং মথুরা প্রভৃতি ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তর্গত এবং উহারা ব্রহ্মর্ষিদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমজাত পূর্ণ-জ্ঞানময় পুরুষ, যাঁহারা পৃথিবীতলে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্মভূমি শাস্ত্রনির্দ্ধারিত এই ব্রহ্মর্ষিদেশ। এই মর্ত্তের অমরাপুরী ব্রহ্মর্ষিদেশ হইতে আচার, ব্যবহার, চরিত্র ও মহান আদর্শ সমস্ত বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ব্রহ্মর্ষিদেশকে পৃথিবীর গুরুস্থানরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্যগণ যে এই ব্রহ্মর্ষিদেশে প্রথম জন্মগ্রহণ করেন, বেদাদি শাস্ত্রে তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—

তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং॥

দেবতাদিগের দেবযজ্ঞের স্থান কুরুক্ষেত্র। দেবতাগণ কর্ম্মের প্রেরক; এই জন্যই দেবযজ্ঞের দ্বারা দৈবীশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে সৃষ্টিপ্রবাহ চালিত হয়। দৈবশক্তির প্রথম বিকাশভূমি যখন কুরুক্ষেত্র, তখন সৃষ্টির প্রথম বিকাশস্থলও যে কুরুক্ষেত্রই, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে

হইবে। এই জন্যই ভগবান পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রকে গীতায় ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জাবালোপনিষদে লিখিত আছে,—

যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং।

দেবতাদিগের দেবযজ্ঞের স্থান এবং সমস্ত জীবের আদি জন্মভূমি কুরুক্ষেত্র। সৃষ্টির আদিকালে পূর্ণপুরুষ আর্য্যগণ, ভারতের এই কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে ভারতের সমস্ত প্রান্তে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে বিচরণ ও বসবাস প্রভৃতি নানা কারণবশতঃ সমস্ত ভারতখণ্ডই আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ। আর্য্যশাস্ত্রেও আমরা তাহার বহুপ্রমাণ দেখিতে পাই।

আর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠা আবর্ত্তন্তে পুণ্যভূমিত্বেন বসন্ত্যত্র ইতি আর্য্যাবর্ত্তঃ॥

পবিত্র-ভূমি বলিয়া আর্য্যগণ ভারতের সর্ব্বত্রই বাস করিতেন। তদনুসারে সমগ্র ভারতের নামই আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছিল। কুল্লুক-ভট্ট আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—

আর্য্যা আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনরুদ্ভবন্তি ইতি আর্য্যাবর্ত্তঃ।

আর্য্যগণ এই স্থানে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেন, এই জন্য ভারতবর্ষের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। বেদেও এইরূপ বহুপ্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঋগ্বেদে,—

সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে তত্রাপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তি।

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে প্রাণত্যাগ করিলে ঊর্দ্ধগতি হয়। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের প্রথম কাণ্ডের অষ্টম প্রপাঠকের দশম অনুবাকে লিখিত আছে,—

যে দেবা দেবসুবঃ স্থ ত ইমমামুষ্যায়ণমনমিত্রায় সুবধ্বং
মহতে ক্ষত্রায় মহত আধিপত্যায় মহতে জানরাজ্যায়ৈষ
বো ভরতা রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।
হে দেবা অগ্ন্যাদয়ো যে যূয়ং দেবসুবো যজমানপ্রেরকাঃ স্থ
তে যূয়মিমং যজমানমামুষ্যায়ণং অমুষ্য দেবদত্তস্য পুত্রং

(ক্রমশঃ)

আনন্দ বরণ।

শুনি প্রতিবিম্বে বিশ্বরূপ তুমি
আকাশের মত থাক ব্যাপিয়া।
কবে কোন্ প্রাণে জ্যোছনা পুলক
মধুর নিশিতে উঠ জাগিয়া॥

রেখেছ করিয়া কুহক জড়িত
আবরি বিশ্ব নিজ মায়ায়।
ছিল ক্ষীণস্মৃতি তাহাও ঢেকেছ
লুপ্ত রবি যথা মেঘ মালায়॥

বহে কল্লোলিনী দুকুল আকুলা
রাজে বনরাজি সকিশলয়।
সরসীর নীরে ভাসে কমলিনী
চাতক চাতকী বিহগ চয়॥

চিরদিন হ'তে আছয়ে তাহারা
থাকিবে যাবৎ ভবের লয়।
পাইনাত সুখ দেখিয়া তাদেরে
পুলক হরষ কিছুনা হয়॥

জাগ নবরাগে আবেগ ভরিয়া
বারেকের মত চিতে যাহার।
ছুটে মোহজাল পুলক পূরিত
দেখে বিশ্বময় রূপ তোমার॥

হরষে বরষে সুমধুর ধারা
নয়ন মেলিয়া যে দিকে চায়।
আনন্দের গানে আপনা ভুলিয়া
নীরবে, আনন্দে মন মাতায়॥

তাই বলি এস হে আনন্দময়।
বরিব তোমারে মনের সনে
মোর মন ভাব তোমার ভাবেতে
হউক পূরণ নিশি কি দিনে॥
আলোর সহিত মিলিয়া জুলিয়া
ঘুচিয়া যাউক মনের মলা।
দিবস রজনী হইয়া বিভোর
বিমল আনন্দে করিগো খেলা॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী।

অসবর্ণ বিবাহ-আইনের পাণ্ডুলিপি।

হিন্দু-সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিবার উদ্দেশে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্যাটেল ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন সংপ্রতি উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় উহার সার্থকতা ও অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উহার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দলের মধ্যে বিশেষ বাদানুবাদের পর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ জন্য সিলেক্ট কমিটির প্রতি ভার অর্পিত হইয়াছে। সমস্ত বে-সরকারী সভ্যদগণের বিবেচনার উপর উহার পরিবর্ত্তন, অথবা পরিপুষ্টি ও পরিণতি নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা সত্বর তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পেস করিবেন। প্যাটেল্‌বিল আইনে পরিণত হইলে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-সমাজে যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে তাহা উহার আলোচনা কালে কসিমবাজারের স্বধর্ম্মানুরাগী মাননীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়, মাননীয় শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ও মাননীয় শ্রীযুক্ত শর্ম্মা বিশেষ ভাবে সুযুক্তি পূর্ণ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এজন্য সমগ্র হিন্দু-সমাজ তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ। অসবর্ণ বিবাহ-আইন বিধি-বদ্ধ হইলে হিন্দু-সমাজের অনেক হিন্দু পরিবারে যেরূপ অনর্থ ও অনিষ্টের উৎপত্তি হইতে পারে হিন্দুর পবিত্র বিবাহ-বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া সমাজের যেরূপ ঘোরতর অমঙ্গল সাধন করিতে পারে তাহার চিন্তায় অনেক স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুর প্রাণে গভীর আতঙ্ক ও আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তজ্জন্য নানাস্থানের বিস্তর সভা-সমিতি হইতে উহার প্রতিকূলে গভীর প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই সেদিন দ্বারবঙ্গের স্বধর্ম্মানুরাগী সহৃদয় মহারাজা বাহাদুরের নেতৃত্বে দিল্লী রাজধানীতে ব্যবস্থাপক সভার অনতিদূরে তত্রত্য সনাতন ধর্ম্মসভার উদ্যোগে একটী বিরাট সভায় প্রস্তাবিত আইনের অসারতা ও অনিষ্টকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সভায় সমবেত জনসাধারণ একপ্রাণে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা উক্ত আইনের সমর্থক, বিপুল জনসংঙ্ঘের গভীর প্রতিবাদ ধ্বনি নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই চক্ষু-কর্ণের গোচর হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ শৃঙ্খলার প্রতি যদি তাঁহাদের প্রাণে মায়া মমতা থাকিত, যে সমাজের সুশীতল ছায়ায় তাঁহাদের পূজনীয় পিতৃ পিতামহ ও পূর্ব্বপুরুষগণ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া নানারূপে তাহার কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় উৎকর্ষ অথবা কালচারে তাঁহাদের রুচি বিকৃত ভাবাপন্ন না হইলে আজি তাঁহারা ভারতের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাপক সভায় বিচিত্র অভিনয়ের পরিচয় দানে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্যে যে সকল ভারতীয় সদস্য উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপির পোষকতায় দৃঢ়-সঙ্কল্প, তাঁহার মধ্যে অনেকেই পবিত্র হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও স্বধর্ম্মানুমোদিত শাস্ত্র জ্ঞানের অভাবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে তাঁহাদের রুচি ও প্রকৃতি বিকৃত ভাবাপন্ন। আর্য্য জাতির সদাচার এবং আর্য্য সমাজের সুশৃঙ্খলা যে জাতিকে জগতের সকল সভ্যজাতির নিকট শ্রদ্ধাস্পদ ও বরেণ্য করিয়াছে—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ট প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যঋষিগণ যে জাতির ব্যবস্থা-গুরু,

যাঁহাদের পুণ্য-প্রভাবে হিন্দু-সমাজে যুগধর্ম্মের প্রভাবে নানা আবর্জ্জনা ও বিশৃঙ্খলা জন্মিলেও আজিও বিস্তর সনাতন প্রথা সগৌরবে উন্নত মস্তকে পাশ্চাত্য শক্তিশালী সভ্যজাতিগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতেছে, অতীব দুঃখ, ক্ষোভ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে সনাতন ধর্ম্মশিক্ষায় বঞ্চিত উগ্র সংস্কারকগণ আপন আপন বিকৃত রুচি ও ভ্রান্তধারণা অনুসারে হিন্দুসমাজে বিষম বিশৃঙ্খলা ও অকল্যাণ উৎপাদনে যত্নবান। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যদি অধিক সংখ্যক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ও সদাচার সম্পন্ন সদস্য বিদ্যমান থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা মাননীয় কসিমবাজারের মহারাজ-প্রমুখ সভ্যগণের সহিত সুতীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান আতঙ্ক ও উদ্বেগ নিবারণে যত্নবান হইতেন। এই সন্ধিক্ষণে আমাদের মনে স্বর্গীয় স্বদেশানুরাগী মহাপ্রাণ স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের কথা জাগিতেছে। লর্ড ল্যান্স্ ডাউনের শাসনকালে প্রধান ব্যবস্থাপক সভায় সহবাস সম্মতি আইনের (Age of Consent Bill) প্রবর্ত্তনকালে সমস্ত বাঙ্গালাদেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল সে সময় স্যর রমেশচন্দ্র উক্ত সভায় তাঁহার স্বদেশবাসী জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে সদস্য ছিলেন। উক্ত লজ্জাজনক অথচ হিতকর আইন সম্বন্ধে তাঁহার নিজমত অন্যরূপ থাকিলেও তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী জনসাধারণের মতানুবর্ত্তী হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় একাকী যেরূপ একাগ্রতার সহিত উহার প্রতিবাদ-পূর্ব্বক গভীর সহৃদয়তা ও সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের তথা-কথিত হিন্দু সমাজ সংস্কারক ও স্বদেশ প্রেমিকগণ কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? উক্ত আইন সর্ব্বসম্মতি ক্রমে পাস করিবার জন্য লর্ড ল্যান্স্ ডাউন এবং উহার প্রবর্ত্তনসচিব স্যর এণ্ড্রু স্কোবল তাঁহাকে তাহাদের মতাবলম্বী করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে কত অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দু সমাজের মুখপানে চাহিয়া নির্ভয়ে সকল অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প ও লক্ষ্য এই ছিল যে সংস্কার আপনা হইতেই আসিবে, তাহাকে জোরজবরদস্তি করিয়া প্রবর্ত্তনের জন্য বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিধি ব্যবস্থার শরণাগত হওয়া পরাধীন সভ্য অথচ দুর্ব্বল জাতির পক্ষে একান্ত অশোভন ও নিতান্ত অনভিপ্রেত। তিনি সুস্পষ্টরূপে জানাইয়াছিলেন "Reforms must come from within and not through the legis-

lation of an alien government." স্যর রমেশচন্দ্রের পরলোকগত অমর আত্মা অমরনিকেতন হইতে তাঁহার স্বদেশবাসী বিভ্রান্ত উগ্র সংস্কারক-গণকে চৈতন্য ও সুমতি দান করুন। তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করুন, হিন্দুর বিবাহ রক্ত-মাংসের বিবাহ নহে—নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য উহা পরিকল্পিত হয় নাই। উহা পবিত্র আধ্যাত্মিক সংস্কার—উহা হিন্দুর পবিত্র আশ্রম ধর্ম্মের প্রধানতম বন্ধন এবং সমাজ শৃঙ্খলার মূলভিত্তি। বিভ্রান্ত স্বদেশানুরাগী উগ্র-সংস্কারক! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, না বুঝিয়া নিষ্ঠুর নির্ম্মভাবে পুণ্যময় পিতৃ-পিতামহের সাধনা ও সদাচার পরিপুষ্ট, সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি উৎপাদনে কলঙ্ক অর্জ্জন করিও না। কঠিন আঘাতে, উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাস চূর্ণ করিও না।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল— যেমন বর্ষের পর বর্ষ গত হইতেছে তেমনই তৎসঙ্গে দিন দিন ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত এবং উহার অনুষ্ঠিত কল্যাণকর কার্য্যের প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। গত বর্ষে মহামণ্ডল অনেকগুলি সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহামণ্ডলের গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ পাঠে সনাতন ধর্ম্মানুরাগী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল পুণ্য কার্য্যের পরিচয় পাইয়া নিঃসন্দেহ বিপুল আনন্দ লাভ করিবেন। মহামণ্ডল হিন্দুর পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রের একপ্রান্তে একনিষ্ঠভাবে কঠোর সাধনাপ্রভাবে নানাবিধ কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় সনাতন ধর্ম্মানুরাগী অযুত নরনারীর হৃদয়ে যে গভীর ধর্ম্মভাব পুনরুদ্দীপ্ত করিতেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় আলোকে উদ্ভ্রান্ত

যুবকগণের পক্ষে তাহা বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। উল্লিখিত কার্য্য-বিবরণীতে সে সকল সদনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য :—(১) বিলুপ্তপ্রায় বিশ্ব-বিশ্রুত বিদ্যাপীঠ যোশীমঠের পুনরুদ্ধার, (২) পুণ্য-তীর্থ উত্তরাখণ্ডে কেদার নাথ মন্দিরের পুনঃ সংস্কার, (৩) পুণ্য-তীর্থে অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির ও উপাসনালয় সংস্থাপনে এবং বিবিধ ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় অভিনব প্রণালীতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, (৪) বৈদিক প্রথানুসারে দেশহিতকর বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, (৫) বিবিধ সার-গর্ভ শাস্ত্রীয় গ্রন্থপ্রচার, (৬) জন-সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার উন্নতিকল্পে ধর্ম্মসভার আয়োজনে ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রচার, এবং (৭) হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ বিগর্হিত অসবর্ণ বিবাহ আইনের তীব্র প্রতিবাদ। পরম মঙ্গলময় বিশ্বনাথের আশীর্ব্বাদ শ্রীমহামণ্ডলের প্রতি অজস্রধারে বর্ষিত হউক। উহার কল্যাণকর উদ্দেশ্যনিচয় সুসিদ্ধ হইলে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীজাতবেদসাগ্নি দুর্গাযাগ :—শ্রীমহামণ্ডলের যজ্ঞ-শালায় গত ১৫ই ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী তিথিতে সপ্তাহকালব্যাপী উক্ত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া ২১এ, ফাল্গুন দোল পূর্ণিমার দিনে উহার পূর্ণাহুতি হইয়াছে। এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন প্রাতঃকালে নানাস্থান হইতে বিস্তর স্বধর্ম্মানুরাগী নরনারী দলে দলে সুপবিত্র যজ্ঞ মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ দর্শনে বিপুল আনন্দ ও গভীর শান্তি উপভোগ করিয়াছেন। এই কয়দিন মহামণ্ডলের ঋষিকল্প অধ্যক্ষ ও পবিত্র-হৃদয় উৎসাহশীল কর্ম্মকর্ত্তাগণ মহোৎসাহে বিস্তর দরিদ্র নারায়ণ ও সাধুসন্ন্যাসীর সেবা ও পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

মহামণ্ডলের যজ্ঞ-শালায় এপর্য্যন্ত ৬৯টি প্রধান প্রধান যজ্ঞ মহা সমারোহে ও মহোৎসাহে অনুষ্ঠিত ও সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল সংবাদ :—সম্প্রতি কাশী ভারতধর্ম্ম মহা-মণ্ডলের পার্শ্বে "মহামণ্ডল পোষ্ট আফিস" নামে মহামণ্ডলের একটী স্বতন্ত্র ডাকখানা খোলা হইয়াছে। ইহাতে ডাক সম্বন্ধে মহামণ্ডলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এ সম্পর্কে যুক্ত প্রান্তের পোষ্টমাষ্টার জেনারল ও বেনারস সিটির পোষ্ট মাষ্টার উভয়েই বিশেষ যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা উভয়েই ধন্যবাদার্হ।

গোহত্যা নিবারণ—গত বৎসর অখিল ভারতবর্ষীয় মুসলিম লীগ অমৃতসহরে বকরীদের দিন গোহত্যা নিবারণ বিষয়ক যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের সুপ্রসিদ্ধ মৌলবী আবদুলবারী মহাশয় এবৎসর বকরীদের দিনে গোহত্যা নিবারণকল্পে লক্ষ্ণৌএর বিভিন্ন স্থানে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে আমরা মৌলবী সাহেবকে এই মহৎকার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ মৌলবীসাহেবের এই সৎকার্য্যের অনুকরণ করিয়া হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন।

ধর্ম্মপ্রচার—আম্বালা শাহপুরের সনাতন ধর্ম্মসভার ৮ম বার্ষিকোৎসব বিগত ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সভায় মহামণ্ডলের ধর্ম্মপ্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রবণলাল শাস্ত্রী, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফলাহারী কাব্যতীর্থ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিবংশ বেদান্তশাস্ত্রী প্রভৃতি বক্তাগণ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মের বিভিন্ন বিষয়ে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শাহপুরের সনাতন-ধর্ম্ম-সংস্কৃত-পাঠশালার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করায় সভায় প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়।

সহমরণ—মৈমনসিংহ কেন্দুয়া বরারির মথুরানাথ চক্রবর্ত্তীর আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আর স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই সতী সতীলোকে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের শব এক চিতায় সৎকার করা হইয়াছে। হিন্দু সংসারেই এমন পত্নী সম্ভবে।

—০—

জন্মান্তর-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীবের গতি।

সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ উভয়বিধ কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মগুলি প্রবলতম হওয়ায় চিত্তের উপরের দেশ অর্থাৎ চিত্তাকাশকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যকে ভোগায়তনরূপ নূতন জন্মের নূতন শরীর প্রদান করে তাহাদের নাম প্রারব্ধ সংস্কার। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি কোন মনুষ্য এক জন্মে এইরূপ ক্রিয়মাণ কর্ম্মসংস্কারসমূহ সংগ্রহ করে যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম স্বর্গ-প্রাপ্তির সাধনীভূত, কতকগুলি পশু-যোনিতে পাঠাইবার মত এবং কতকগুলি উন্নত মনুষ্য-যোনিতে আনিবার মত; তবে এত কর্ম্ম করিবার ফল এই হইবে যে তাহার মৃত্যুর সময়ে উক্ত তিন শ্রেণীর কর্ম্মের মধ্যে বলবত্তম কর্ম্মসংস্কারই তাহার চিত্তাকাশকে স্বতঃই আশ্রয় করিবে এবং উহাই প্রারব্ধ হইয়া তদনুসারে মনুষ্যকে পর জন্ম প্রদান করিবে। যদি তাহার মনুষ্য-জন্মযোগ্য সংস্কার বলবত্তম হয় তবে সে প্রথমে মনুষ্যই হইবে এবং পশুত্ব ও অমরত্ব পাইবার কর্ম্ম সঞ্চিত-কর্ম্মরূপে চিদাকাশে গচ্ছিত থাকিবে। মনুষ্য-যোনিতে কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য থাকায় যদি ঐ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষার্থ-বলে অত্যুন্নত সংস্কারসমূহ সংগ্রহ করিতে পারে এবং ঐ সব সংস্কারের ফল পশু-যোনিপ্রাপ্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার সমূহের অপেক্ষাও বলবান হয় তবে বলবত্তর কর্ম্ম সংস্কারের বেগে তাহার তদনুকূল জন্ম হইবে, পশুত্ব বা অমরত্ব প্রাপ্তি দ্বিতীয় জন্মে হইবে না। এবং যদি তাহার ভাগ্যবশে এইরূপই হয় যে সে ক্রমশঃ অত্যুন্নত সংস্কার সংগ্রহ করিতে করিতে মুক্ত হইয়া যায় তবে আর তাহার পশুত্বাদি যোনি প্রাপ্তি হইতে পারিবে না। তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মসংস্কার মহাকাশে বিলীন হইয়া যাইবে। আর যদি এরূপ না হয় তবে দ্বিতীয় জন্মে বা কালান্তরে পশুত্বাদির সংস্কারের দ্বারা তাহার পশু-যোনি প্রাপ্তি হইবে। মনুষ্য-যোনিতে কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য থাকায় মনুষ্য পুরুষার্থবলে মন্দ সংস্কারের বেগকে নষ্ট করিয়া উত্তম সংস্কার উৎপন্ন করিতে পারে। এজন্যই সকল যোনির মধ্যে মনুষ্য-যোনিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় এবং কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে অতীত জীবনে যতই পাপ করুক না কেন পুরুষার্থ করিলে ভবিষ্যৎ জীবনকে সে অবশ্যই ভাল করিতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত ত্রিবিধ কর্ম্ম-ব্যবস্থানু-

সারে যদি তাহার পশু-যোনি প্রাপ্তি বা স্বর্গীয় যোনি প্রাপ্তির যোগ্য কর্ম্ম-সংস্কার মনুষ্য-যোনি প্রাপ্তির যোগ্য কর্ম্ম-সংস্কার অপেক্ষা বলবান হয় তবে তাহার প্রথমতঃ পশু-যোনি বা স্বর্গীয় যোনি প্রাপ্তি হইবে। এই সকল যোনি কেবল ভোগ যোনি হওয়ায় তথায় মনুষ্য স্বতন্ত্র ভালমন্দ কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। তাহাকে ঐ সকল যোনিতে ভোগ সমাপ্ত করিয়া নূতন কর্ম্মের জন্য আবার মনুষ্য-বিগ্রহ ধারণ করিতে হয়। এইরূপে প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সংজ্ঞক ত্রিবিধ সংস্কারের বশে জীব ঘটীযন্ত্রের মত সংস্কার-চক্রে নিঃশ্রেয়সলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনবরত ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহার কখন স্বর্গ, কখন নরক, কখন দেব-যোনি, ঋষি-যোনি, কখন মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি কত যোনিই প্রাপ্তি হয়। মনুষ্য-যোনির মধ্যেও প্রাক্তন কর্ম্মবশে জীব নানাপ্রকার সুখদুঃখময়ী স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ পতঞ্জলি যোগদর্শনে বলিয়াছেন—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।"

"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।"

অবিদ্যা রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি ক্লেশসমূহ যাবতীয় কর্ম্মসংস্কারের মূল কারণ। বর্ত্তমান দৃষ্টজন্ম অথবা ভবিষ্যৎ অদৃষ্টজন্মে এই ক্লেশপ্রদ কর্ম্ম-সংস্কারের ভোগ হইয়া থাকে। অবিদ্যাদি ক্লেশ হৃদয়ে নিহিত থাকিলে মনুষ্য প্রাক্তন কর্ম্মের পরিণামরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জাতি, আয়ু এবং ভোগ লাভ করিয়া থাকে। কোন্ জাতির মধ্যে জন্ম হইবে আর্য্য কি অনার্য্য, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র এই সকল প্রাক্তন কর্ম্মসাপেক্ষ। এবং যতদিনে পূর্ব্বপ্রারব্ধ সংস্কার শেষ হইতে পারে আয়ুও তত-দিনের জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখদুঃখাদি ভোগও প্রাক্তনানুসারে হয়। তবে ইহাও নিশ্চিত যে অলৌকিক পুরুষার্থবলে মনুষ্য নিজের জাতিকে উন্নত অবনত, আয়ুকে কমবেশি এবং ভোগের মধ্যেও নানাপ্রকার তারতম্য করিতে পারে। মনুষ্য যৌগিক পুরুষার্থের বলে দৃষ্টসংস্কারকে অদৃষ্ট এবং অদৃষ্টকে দৃষ্টরূপে পরিণত করিতে পারে। এইরূপে একজন্মেই মনুষ্য উন্নত বা অবনত হইতে পারে। আর যদি এরূপ প্রবল পুরুষার্থ করিবার শক্তি বা সুবিধা উৎপন্ন না হয় তবে শাস্ত্রীয় বিধানা-নুসারে ভাবশুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয় ভোগের দ্বারাও বিষয় বাসনা বলবতী না হইয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। দৃষ্টান্তরূপে বুঝা যাইতে পারে যে যদি কোন লোভের বস্তুকে লোভের সহিত গ্রহণ না করিয়া ভগবৎ সমর্পণপূর্ব্বক তৎপ্রসাদ রূপে গ্রহণ করা

যায় তবে লোভ-বুদ্ধি অবশ্যই মন্দীভূত হইবে। কামের বস্তুকে যথেচ্ছভাবে উপভোগ করিলে কাম-বাসনা মন্দীভূত না হইয়া ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ প্রবলতরই হইয়া উঠে। কিন্তু ধার্ম্মিক সন্ততিলাভ-কামনায় দম্পতি যদি উভয়কে প্রজাপতি ও বসুন্ধরার প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামসম্বন্ধ করে তবে উক্ত বাসনা বলবতী না হইয়া ক্রমশঃ নাশ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে ভাবশুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয়ভোগের দ্বারাও মনুষ্য সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল সংস্কার-শুদ্ধির সহায়তা গ্রহণে এবং অসৎ সংস্কার হইতে নিবৃত্তিলাভের নিমিত্ত সৎশাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক। সেই শাস্ত্র ও ধর্ম্মাধিকার আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ও অধিকারানুসারে নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। এই হেতুই সংসারে নানাবিধ ধর্ম্মমত পরিদৃষ্ট হয়। এই সবগুলিই সত্য, কারণ সবগুলিরই জীবের উচ্চনিম্ন অধিকারানুসারে উপযোগিতা এবং কল্যাণকারিতা আছে। এইজন্যই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

নিজের ধর্ম্ম সাধারণ অধিকারের হইলেও তাহাই ভাল। কারণ যাহার যে ধর্ম্মমতের ভিতরে জন্ম হয় উহা তাহার প্রকৃতির অনুকূল অবশ্যই হইবে। নতুবা সেখানে তাহার জন্ম হইত না। এবং প্রকৃতির অনুকূল হওয়ায় উহার দ্বারা তাহার কল্যাণ অবশ্যই হইবে। অন্যের ধর্ম্ম উন্নত হইলেও উহা তাহার পক্ষে ভাল নহে। কারণ উহা তাহার প্রকৃতির অনুকূল নহে। একারণ নিজের ধর্ম্মে প্রাণ দেওয়া ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে। পশু-প্রকৃতি-পরায়ণ নিকৃষ্ট মনুষ্য জাতির মধ্যে কোনপ্রকার ধর্ম্মব্যবস্থার অধিকার উৎপন্ন না হইলেও তদপেক্ষা উন্নত অনার্য্যজাতির মধ্যে স্বাধিকারানুকূল ধর্ম্মবিধি ও ধর্ম্মমত অবশ্যই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ সকল ধর্ম্মবিধির অনুবর্ত্তনের দ্বারা অনার্য্যসুলভ পশুভাব, বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা আদি দোষসমূহ ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং ইহারই পরিণামে উন্নত প্রাক্তনদ্বারা আর্য্যজাতির মধ্যে উহাদের জন্ম হয়। আর্য্যজাতির মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশের অবসর অধিক হওয়ায় উক্ত যোনিতে মনুষ্যের আধিভৌতিক লক্ষ্য নিরস্ত হইয়া আধ্যাত্মিক লক্ষ্য উৎপন্ন হয়। তখন জীবের লক্ষ্য আত্মার দর্শন এবং সুখের লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দ সাগরে অবগাহন স্নান হইয়া থাকে। বেদ-বিহিত বর্ণ-ধর্ম্ম এবং

আশ্রমধর্ম্মের অনুজ্ঞানুসারে আর্য্যজাতি উল্লিখিত লক্ষ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। অনার্য্যজাতির মধ্যে ত্রিগুণের বিকাশঃ সম্পূর্ণ না হইয়া রজোগুণ তমোগুণের আধিক্য এবং সত্ত্বগুণের ন্যূনতা থাকায় আর্য্যজাতি-সুলভ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিধি উক্ত জাতির কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের বিধি কেন অনাদিকাল হইতে আর্য্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে এবং ইহাদের মৌলিকতাই বা কি, গ্রন্থান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ইহাই আলোচ্য যে কিরূপে বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মের সহায়তায় আর্য্যজাতি মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে। শাস্ত্র বর্ণধর্ম্মকে প্রবৃত্তিরোধক এবং আশ্রমধর্ম্মকে নিবৃত্তিপোষকরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির তমোরাজ্যে জীবত্বের বিকাশ হইবার পর ক্রমশঃ তমোভূমি, রজস্তমোভূমি, রজঃ সত্ত্বভূমি এবং সত্ত্বভূমি এতরূপে চারভূমির সাহায্যে জীব ক্রমোন্নত হইয়া তবে সত্ত্বগুণের পূর্ণতায় মোক্ষলাভ করিতে পারে। এই চার ভূমিতে বিচরণার্থ স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি অনুসারে জীবকে যে সকল ক্রমোন্নতিদায়িনী ধর্ম্মবিধির প্রতিপালন করিতে হয় তাহাই আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণধর্ম্মবিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভূমি শূদ্রের। উহাতে তমোগুণের আধিক্য থাকে। তামসিক বুদ্ধির লক্ষণ গীতায় এইরূপ কথিত হইয়াছে যে উহা অধর্ম্মে ধর্ম্মবুদ্ধি এবং ধর্ম্মে অধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন করে। অর্থাৎ বিপরীত বোধই তামসিক বুদ্ধির লক্ষণ। এজন্য তামসিক ভূমিতে নিজের বুদ্ধির দ্বারা কাজ করিতে গেলে ভ্রমপ্রমাদ এবং পতন সম্ভাবনা পদে পদে অবশ্যম্ভাবী। একারণ আর্য্যশাস্ত্র শূদ্রকে নিজের ইচ্ছায় কাজ না করিয়া দ্বিজবর্ণের অনুজ্ঞানুসারে কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উহাতে শূদ্রের অবমাননা না করিয়া বরং অধিকারানুসারে কল্যাণকর উন্নতির পন্থাই প্রশস্ত করা হইয়াছে। এইভাবে কার্য্য করিলে শূদ্রবর্ণে থাকিবার সময় মনুষ্য বিপরীত বুদ্ধিসুলভ উদ্দাম প্রবৃত্তির গতিনিরোধ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে। তৎপরে যখন সে বৈশ্যযোনিতে পদার্পণ করিবে, তখন রজস্তমোগুণ তাহার মধ্যে নৈসর্গিকভাবে প্রকাশিত হওয়ায় কর্ম্মস্পৃহা এবং ধনার্জ্জনস্পৃহা অবশ্যই বলবতী হইবে। কারণ লালসা উৎপন্ন করা রজোগুণের স্বভাব। কিন্তু ঐ লালসা যদি কল্যাণবাহিনী না হইয়া বিষয়াভিমুখিনী হয় তবে বৈশ্যের আবার পতন হইবে, অভ্যুত্থান হইবে না। এজন্য বৈশ্যযোনিতে জীবের উন্নতিসাধনার্থ আর্য্যশাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন যে বৈশ্য

বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনার্জ্জন অবশ্য করুন, কিন্তু ঐ ধনে তাঁহাকে গোরক্ষা, অন্যবর্ণের প্রতিপালন, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি জীবোপকারসাধন করিতে হইবে। এইরূপে রজোগুণসুলভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়াও বৈশ্যযোনিতে প্রবৃত্তি-নিরোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদনন্তর ক্ষত্রিয়যোনিতে আসিয়া তাঁহার মধ্যে রজঃসত্ত্বগুণ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইবে। রজোগুণের সংশ্রবহেতু যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের অবশ্যই হইবে। কিন্তু ঐ যুদ্ধ যাহাতে পরকীয় পীড়নরূপে পরিণত না হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বকীয় রক্ষা ও জগতে শান্তি বিস্তাররূপে পরিণত হয় সেজন্য ক্ষত্রিয় প্রকৃতিগত সত্ত্বগুণের সাহায্য আর্য্যশাস্ত্র লইতে বলিয়াছেন। সত্ত্বগুণের সাহায্যেই রজোগুণী ক্ষত্রিয় নরপতি প্রজারক্ষণার্থ আবশ্যকতানুসার ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া এবং প্রাণ বিনিময়ে প্রজার শান্তিবিধান করিয়া প্রবৃত্তিনিরোধ করিতে পারিবেন। তাহার পর ব্রাহ্মণযোনিতে আসিয়া তাঁহার মধ্যে যখন রজোগুণ তমোগুণের নাশে শুদ্ধসত্ত্বগুণের ক্রমবিকাশ হইবে তখন তিনি স্বতঃই প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করতঃ নিবৃত্তিপথের পথিক হইবেন। তখন দ্রবিণলালসা পরিহার করিয়া তিনি তপোধন হইবেন, ইন্দ্রিয়স্পৃহা দমন করিয়া তিনি সংযমী হইবেন, ইহলোকের সুখে আস্থাহীন হইয়া তিনি পরলোকের আনন্দের জন্য সাধনা ও তপস্যা করিবেন, অনাত্মীয় বস্তুসমূহের প্রতি বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মানুসন্ধান-তৎপর হইবেন। এইরূপে জীবন নদীর গতিকে অন্তর্মুখ করিয়া তিনি ব্রহ্মসমুদ্রের দিকে প্রবাহিত করিবেন। ইহাই ব্রাহ্মণযোনির একমাত্র উদ্দেশ্য ও আর্য্যশাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালনে যিনি পরাঙ্মুখ হইবেন তাহার ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণই বৃথা, তিনি জাতিব্রাহ্মণ মাত্র, পূর্ণব্রাহ্মণ নহেন। এরূপ ব্রাহ্মণ জন্মান্তরে আর পুনরায় ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত না হইয়া কর্ম্মানুসার নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে অথবা তীব্র দুষ্কর্ম্মের ফলে এই জন্মেই হীনযোনিত্ব লাভ করিয়া থাকে। অন্যপক্ষে ব্রাহ্মণযোনির অন্তর্গত নৈসর্গিক সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপর কথিত কর্ত্তব্যসমূহের অনুষ্ঠান করিলে তিনি সত্ত্বগুণ পরিণামে প্রবৃত্তির পূর্ণনিরোধ করিয়া অপবর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাই বর্ণধর্ম্মের দ্বারা উত্তরোত্তর প্রবৃত্তিনিরোধের আর্য্যশাস্ত্রসঙ্গত পন্থা। এইরূপে আশ্রমধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে পরিপালন দ্বারা নিবৃত্তির পোষণ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আচার্য্যের অধীনস্থ হইয়া ইহাই শিক্ষা করিতে হয় যে কিরূপে গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তির

সেবা হইতে পারে যাহার দ্বারা শীঘ্রই প্রবৃত্তিবীজ নষ্ট হইয়া নিবৃত্তির পথে চিত্ত প্রধাবিত হয়। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ধর্ম্মমূলক প্রবৃত্তির শিক্ষালাভ করতঃ গৃহস্থাশ্রমে উক্ত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়। উহা ভাবশুদ্ধির সহিত ধর্ম্মভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় চিত্তকে অধিকতর বাসনার দ্বারা বাসিত না করিয়া বাসনার বীজনাশই করিয়া থাকে। এইরূপে বাসনার নাশে নিবৃত্তির পোষণ হইলে পর তবে বানপ্রস্থাশ্রম আরম্ভ হয়। এই পরম তপোময় পবিত্র আশ্রমে তপস্যার অগ্নিতে ভোগদিগ্ধ কলেবরকে উত্তপ্ত করিয়া অনলসংযোগে পবিত্রীকৃত সুবর্ণের ন্যায় উহার ভোগ-মালিন্য নিঃশেষিত করা হইয়া থাকে। তৎপরে তপঃক্ষীণ-কল্মষ, পরম পবিত্র বানপ্রস্থসেবী যথাকালে তুরীয়াশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মধ্যানযোগে নিঃশ্রেয়সলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে নিবৃত্তির বীজ বপন করা হয়, তাহাই গৃহস্থাশ্রমে অঙ্কুরিত এবং বানপ্রস্থাশ্রমে পল্লবিত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে ত্যাগ-রস, সাধন-কিরণ ও জ্ঞান-মলয় সংযোগে পরম পরিপুষ্ট কলেবর লাভ করিয়া নিত্যানন্দময় মধুর মোক্ষফল প্রসব করিয়া থাকে। ইহাই আশ্রমধর্ম্মের সহায়তায় নিবৃত্তিপোষণের নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ।

সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম সৎভাব, চিৎভাব এবং আনন্দভাবের দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে বিলাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহার ত্রিভাবকে উপলব্ধি না করিলে জীবের পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং অপবর্গলাভ হয় না। তাঁহার অদ্বিতীয় সৎভাবের উপরই দ্বৈতভাবময় সমস্ত বিশ্বের বিকাশ হইয়া থাকে। এজন্য কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সৎভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী নিজের প্রাণকে জগৎ সেবার দ্বারা বিরাটের প্রাণের সহিত মিলাইয়া এই অদ্বিতীয় সৎভাব অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। জ্ঞানযোগের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানময় চিৎভাবের এবং উপাসনা যোগের দ্বারা তাঁহার নিত্য-সুখময় আনন্দভাবের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এজন্য কর্ম্ম-উপাসনা-জ্ঞান এই ত্রিবিধ যোগের সহায়তাব্যতীত ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হওয়া অতি কঠিন। কোন একটি যোগ অবলম্বন করিলেও অন্তে একের পূর্ণতায় অন্য দুইটি ভাব স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু অন্য দুই যোগের সাধনা সহযোগী না হইলে সাধনপথে নানাপ্রকার অসুবিধা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য পদেপদে সাধকের পতন সম্ভাবনা হয়। একারণ নিঃশ্রেয়সলাভ প্রয়াসী মুমুক্ষুর পক্ষে কর্ম্মোপসাসনাজ্ঞানরূপী

ত্রিবিধ যোগেরই যুগপৎ সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই সকলের বিস্তারিত রহস্য পুরাণতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এই জন্যই স্বমুখনিঃসৃক্ত গীতার প্রথম ৬ অধ্যায়ে প্রধানতঃ কর্ম্মযোগের কথা, দ্বিতীয় ৬ অধ্যায়ে প্রধানতঃ উপাসনাযোগের কথা এবং তৃতীয় ৬ অধ্যায়ে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগের কথা বলিয়া মোক্ষলাভার্থ ত্রিবিধযোগেরই আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার নিঃশ্বাসরূপী বেদেও এই জন্য কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানাকাণ্ডের বিজ্ঞান প্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও উপনিষদ নামক ভাগত্রয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানরূপ যোগত্রয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধক সত্বরই সচ্চিদানন্দ সত্তার সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া নিঃশ্রেয়সপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তাঁহার জীবত্ব আমূল নাশ প্রাপ্ত হইয়া নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি মহাবাক্যের চরিতার্থতা এই অবস্থাতেই হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যতদিন স্বরূপস্থিত পুরুষের শরীর থাকে, ততদিন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। তাঁহার ক্রিয়মান সংস্কার, বাসনার নাশে, আমূল নাশ প্রাপ্ত হয়। তিনি নিজের ইচ্ছায় তখন আর কিছুই করেন না। সঞ্চিত কর্ম্ম তাঁহার কেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বিরাট কেন্দ্রকে আশ্রয় করে। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মেরই অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার শেষশরীর প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহার বেগ থাকে। তিনি সেই বেগেই কাজ করিয়া থাকেন। বাসনার নাশ হওয়ায় প্রারব্ধবেগানুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারাও নবীন সংস্কার উৎপন্ন হয় না। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ সংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। উহা ভর্জ্জিত বীজের মত নবীন ক্রিয়মাণ সংস্কার উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে সমস্ত অবশিষ্ট প্রারব্ধ নষ্ট হইয়া গেলে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আকাশ হইতে সমুদ্রে পতিত বিন্দুর ন্যায় তাঁহার আত্মা তখন ব্যাপক পরমাত্মায় বিলীন হইয়া অনন্তকালের জন্য আনন্দময় হইয়া যায়। তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-শরীর মহাপ্রকৃতির তত্ত্বোপাদানের সহিত সম্মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের দ্বারা যে জীবত্ব-নিদানভূত চিজ্জড়গ্রন্থির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এইখানে গ্রন্থিভেদের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। এই ভাবের আভাস লইয়াই বেদ বলিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ব্রহ্মদর্শনে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয়জাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমস্ত কর্ম্মরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। বেদ আরও বলিয়াছেন—

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে।

তাঁহার প্রাণ উপরদিকে উঠে না এই সংসারেই মহা প্রাণে বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। কারণ সহজ গতিতে উৎক্রমণ নাই। অনাদিকাল হইতে যে জন্মমরণ চক্র চলিতেছিল, তাহার গতি এইখানে আসিয়াই চিরশান্তি অবলম্বন করে। সমুদ্র-গত স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাঁহার জীবাত্মা ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন হইয়া সদানন্দময় চির-শান্তি চির-অমরতা প্রাপ্ত হয়। এই মর্ম্মেই মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।
গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি॥

যেরূপ প্রবাহিনী বহিতে বহিতে সমুদ্রে মিশিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার পৃথক নাম ও আকৃতি থাকে না সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার পর মুক্তপুরুষ নাম-রূপময়ী মায়ার রাজ্য অতিক্রম করতঃ পরাৎপর পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকেন। তাঁহার দশেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ মহাপ্রকৃতির মধ্যে লয় হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সমষ্টি দেবতায় বিলীন হন, সঞ্চিত ক্রিয়মাণাদি সমস্ত কর্ম্ম মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহার জীবাত্মা অব্যয় পরমাত্মসত্তায় চিরবিলীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই সহজগতির চরম সীমায় জীবের নিঃশ্রেয় লাভ।

ধূমযান গতি।

সহজগতির দ্বারা এই সংসারেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অন্য দুই প্রকার গতি আছে যাহার দ্বারা এরূপ হয় না। এই দুই গতিকে ধূমযান এবং দেবযান গতি বলে। যথা গীতায়—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥

(ক্রমশঃ)

ভাবময় দৃশ্য চতুর্দ্দশবিধ হওয়ায় জ্ঞান-ভূমি সাতপ্রকার এবং অজ্ঞানভূমিও সাত-প্রকার।১৫।

ভাবময় দৃশ্য চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "সমস্ত দৃশ্য বস্তুর মধ্যে সাত সাতটি বিভাগ আছে*" এইজন্য জ্ঞানভূমি এবং অজ্ঞানভূমিও সপ্ত সপ্ত বিভাগে বিভক্ত। পরমাত্মার আধিভৌতিক দেহস্বরূপ এই যে কার্য্যব্রহ্ম বা বিরাট, উঁহাকেও বেদে চতুর্দ্দশ ভুবন-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সত্ত্ব ও তম, পুণ্য ও পাপ এবং প্রকাশ ও অন্ধকার অনুসারে বিরাট পুরুষের নাভিদেশের উপরিভাগে সপ্তলোক এবং নিম্নভাগে সপ্তলোক বিদ্যমান। এইরূপে স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "সেই সহস্রউরু, সহস্রপাদ, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রমুখ এবং সহস্রশীর্ষ মহাপুরুষের শরীরে সমস্ত লোক বা ভুবনের কল্পনা হইয়া থাকে। তাঁহার কটীদেশের নিম্নভাগে সপ্তলোক এবং জঙ্ঘার উপরিভাগে সপ্তলোক বিদ্যমান। তন্মধ্যে (তাঁহার) পদদেশে ভূর্লোক, নাভিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক (স্বর্গলোক), বক্ষঃস্থলে মহর্লোক, গলদেশে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক, এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক বিদ্যমান এবং কটী-দেশে অতল, উরুদেশে বিতল, জানুদেশে সুতল, জঙ্ঘাদেশে

(১৫) ভাবময়দৃশ্যস্য চতুর্দ্দশ-বিধত্বয়া সপ্তজ্ঞানভূময়ঃ সপ্তাজ্ঞান-ভূময়ঃ ।১৫।

* ওঁ যে তে পাশাঃ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি।

তলাতল, গুল্ফ দেশে মহাতল, পাদাগ্রভাগে রসাতল এবং পাদদ্বয়ের তলদেশে পাতালরূপে সপ্ত অধোলোক বর্ত্তমান রহিয়াছে* ।” এইজন্য কার্য্য এবং কারণের অভেদ-সম্বন্ধ অনুসারে ব্যষ্টি সৃষ্টিতেও সর্ব্বত্র সপ্ত সপ্ত অন্তর্বিভাগ বিদ্যমান, যথা :— সপ্তব্যাহৃতি, সপ্তদর্শন, সপ্তধাতু ইত্যাদি। এবং শ্রুতিস্মৃতি আদিতেও বর্ণন আছে যে, “সাতপ্রকার প্রাণের মহিমাদ্বারাই সপ্তবিধ হোমকার্য্যে সপ্তবিধ অগ্নিশিখার বিস্তার হইয়া থাকে; এই সাতটী ঊর্দ্ধলোক-যে সকল লোকের মধ্যে প্রাণ সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে বিভক্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। গ্রাম্য পশু সাত প্রকার, বন্য পশু সাতপ্রকার, এবং এইরূপে সাতপ্রকার ছন্দঃদ্বারা দেবতাদিগের নিকট যজ্ঞভাগ পহুঁছিয়া থাকে; সপ্ত ঋষি, পূজার উপকরণ সাতপ্রকার এবং বীণাযন্ত্রও সপ্ততন্ত্রীর

---

* স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্বঙ্ঘ্রি-বাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥
যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥
ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোহস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ॥
গ্রীবায়াং জনলোকোহস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥
তৎকট্যাঞ্চাতলং ক্লিপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাং তু তলাতলম্ ॥
মহাতলন্তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলং।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্ ॥

সহিত মানবের কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া থাকে*।"

এইরূপ বিজ্ঞান,—শাস্ত্রসম্মত বিচার অনুসারেই জ্ঞানভূমি এবং অজ্ঞানভূমিরও সাত সাত প্রকার ভেদ করিয়া উভয়তঃ চতুর্দ্দশ প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে ॥১৫॥

এইরূপে রসেরও (গৌণমুখ্যভেদে) বিভাগ করা হইয়াছে—

রসজ্ঞানও চতুর্দ্দশপ্রকার, তন্মধ্যে সাতটি মুখ্য এবং সাতটি গৌণ ।১৬।

মুখ্য অর্থাৎ প্রধান সপ্তরস এবং গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান সপ্তরস ভেদে রসজ্ঞানও চতুর্দ্দশভাগে বিভক্ত। গৌণ সপ্তরস, নিম্নভূমিগত হওয়ায় উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উন্নতিকর নহে। পরন্তু মুখ্য সপ্তরস সাক্ষাৎ উন্নতিকারক হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর সূত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইবে ॥১৬॥

বিশেষ ভেদ বর্ণিত হইতেছে যথা—

---

* সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণাঃ
গুহাশয়াঃ নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥
সপ্ত গ্রাম্যা পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ
সপ্তচ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি
সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥

(১৬) রসজ্ঞানমপি চতুর্দ্দশধা, তত্র সপ্ত মুখ্যাঃ সপ্ত গৌণাঃ ।১৬।

হাস্য আদি (সপ্ত) রস গৌণ এবং দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্ম-নিবেদনাসক্তি, গুণকীর্ত্তনাসক্তি ও তন্ময়াসক্তি নামক সপ্তরস মুখ্য ।১৭।

হাস্য আদি সাতপ্রকার রস গৌণ এবং দাস্য আদি সাত প্রকার রস মুখ্য বলিয়া কথিত। রসভাবে ভাবিত-চিত্ত, পূর্ব্বাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি শৃঙ্গার-প্রচুরা অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের শৃঙ্গারদ্বারাই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় দশাতে সৎ, অসৎ এবং আকাশাদি কিছুই ছিলনা ; কেবল গভীর অন্ধকারই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। মৃত্যু ছিলনা, অমৃত ছিলনা, দিন ছিলনা এবং রাত্রিও ছিলনা ; তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন। তদনন্তর প্রলয়-গর্ভলীন সমষ্টিজীবের সংস্কাররাশি হইতে যখন অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার সময় আসিল, তখন পরমাত্মা তপশ্চরণ পূর্ব্বক মৈথুনের ইচ্ছা করিলেন। এই তপঃ মনুষ্য সাধারণ তপঃ নহে, পরন্তু পূর্ব্বকল্পানুসারে সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বারা প্রেরিত হইয়া যখন তিনি এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহারই শরীর হইতে (অর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা) প্রকৃতিরূপিণী জায়ার উৎপত্তি হইল, যাঁহার সহিত মিথুনী-

---

(১৭) হাস্যাদয়ো গৌণাঃ, দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্ত্যা-আত্মনিবেদনাসক্তি-গুণকীর্ত্তনাসক্তি-তন্ময়াসক্তয়শ্চ মুখ্যাঃ ।১৭।

ভাবের উদয় হইয়া তাহারই ফলরূপে এই সঙ্করপ্রচুরা সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে*।" এইরূপে স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে, "পরমাত্মা আপন দেহকেই দুইভাগে বিভক্ত করত অর্দ্ধ শরীর দ্বারা নারী,-জায়া উৎপন্ন করিলেন এবং ঐ জায়ার গর্ভেই বিরাটের সৃষ্টি করিলেন†।" এতদ্ব্যতীত

---

* "তমসা আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং।"
নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং,
নাসীদ্রজো ন ব্যোম পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি-
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুরসতো নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥
"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব
সোঽকাময়ত, জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়।"
"স তপস্তপ্ত্বা মিথুনমৈচ্ছৎ।"
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥
† দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥

নিম্ন লিখিত রূপেও কোন কোন স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে যে, "ভগবানের চিত্তে যখন সৃষ্টি রচনা করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তিনি যোগবলে আপন শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। তন্মধ্যে শরীরের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ দ্বারা পুরুষরূপ ও বামভাগ দ্বারা প্রকৃতিরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর শ্রীভগবান কোমল-কমল-দল-সদৃশ সুকোমলা, সুন্দরী, অত্যন্ত রমণীয়া সেই রমণীর প্রতি কামানুরাগে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহার সহিত শৃঙ্গারসম্বন্ধীয় নানা প্রকার লীলা করিতে লাগিলেন এবং জগৎপিতা পরমেশ্বর শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া যথাকালে বীর্য্যা-ধান করিলেন। তদনন্তর সুরতাবসানে জগজ্জননী প্রকৃতিমাতার অঙ্গ হইতে শ্রমজল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং উক্ত রতি-ক্রিয়ায় অত্যন্ত শ্রম-বাহুল্য জন্য প্রবলবেগে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। প্রকৃতিমাতার অঙ্গ হইতে বিনির্গত উক্ত শ্রমজল দ্বারা সমস্ত বিশ্বগোলক আচ্ছাদিত হইল এবং নিশ্বাস বায়ু সমস্ত জীবের প্রাণরূপ সর্ব্বাধার বায়ুস্বরূপ হইল। রতিশ্রমহেতু নির্গত ঘর্ম্মবিন্দুসমূহের অধিদেবশক্তিরূপে বরুণদেব উৎপন্ন হইলেন এবং বরুণদেবের বাম অঙ্গ হইতে তাঁহার স্ত্রী বরুণানীর উৎপত্তি হইল। তদনন্তর শ্রীভগ-বানের শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিমাতা ব্রহ্মতেজে তেজস্বিনী হইয়া শতমন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া পরে সুবর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল এক অণ্ড প্রসব করিলেন*।" ইহাই সমস্ত জীবের

* যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারাং সনাতনঃ।
অতীব কমনীয়াঞ্চ চারুপঙ্কজ-সন্নিভাম্॥

আধার স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড ব'লয়া ক'থিত। ভক্তির চতুর্দ্দশ রস এই সৃষ্টির আদিভূত শৃঙ্গাররসেরই পরিণাম মাত্র। সমস্ত জগতের মূল কারণ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগরূপ সেই শৃঙ্গার রসই বহুভেদ প্রাপ্ত হইয়া নিখিল জীবের হৃদয় রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ রসের মধ্যে সাত রস মলিন শৃঙ্গারপূর্ণ ও সাত রস শুদ্ধ,-পবিত্র শৃঙ্গারপূর্ণ। হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস এবং রৌদ্র এই সপ্তরস গৌণ অর্থাৎ মলিন শৃঙ্গার যুক্ত। যদিও এই সকল রসের বিষয়ে কোন কোন স্থানে ভক্তিরসের আচার্য্যগণের এইরূপ সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বপ্রকার রস আনন্দের পরিণামরূপ হওয়ায় সকল রসের দ্বারাই উন্নতি হইতে পারে, তথাপি এই সকল রসের আশ্রয়, আধার মলিনতাপূর্ণ হওয়ায় তত্তৎ আধার-জাত রসসমূহও মলিন এবং এইহেতুই ঐসকলকে গৌণ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। হাস্য আদি গৌণরসের দ্বারা উন্নতি-লাভ বিষয়ে স্মৃতিতে এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, "যেপ্রকার দ্বেষভাব প্রদর্শন করিলেও ভগবানেরই প্রতি

দৃষ্ট্বা তাংতু তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে।
রাসোল্লাসেষু রসিকো রাসক্রীড়াং চকারহ॥
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব।
চকার সুখ-সম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো দিনম্॥
ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্তস্যা যোনৌ জগৎপিতা।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দে শুভক্ষণে॥
গাত্রতো যোষিতস্তস্যাঃ সুরতান্তে চ সুব্রত।
নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়াস্তেজসা হরেঃ॥

দ্বেষভাব প্রযুক্ত হওয়ায় শিশুপালাদি উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য অথবা সৌহৃদ্যাদির মধ্যে হইতে যে কোন একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া যদি ভগবানে তন্ময়তা হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারাই সাধকের উন্নতি হইয়া থাকে, যথাঃ— পিতামহ ভীষ্মদেব বীররস দ্বারা ও রাজা দশরথ করুণরস দ্বারা এবং রাজা বলি, অর্জ্জুন ও যশোদা বিরাট স্বরূপ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অদ্ভুত রসদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এইরূপে গোপাল বালকগণ হাস্য রসদ্বারা ও কংস ভয়ানক রসদ্বারা এবং অঘাসুর বীভৎস রসদ্বারা ও ইন্দ্র রৌদ্র রসদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন*। পরন্তু মুখ্য সাত রসের

মহাক্রমণক্লিষ্টায়া নিশ্বাসশ্চ বভূব হ।
তদা বব্রে শ্রমজলং তৎসর্ব্বং বিশ্বগোলকম্॥
স চ নিশ্বাসবায়ুশ্চ সর্ব্বাধারো বভূব হ।
নিশ্বাসবায়ুঃ সর্ব্বেষাং জীবনাঞ্চ ভবেষু চ॥
ঘর্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্।
তদ্বামাঙ্গাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা॥
অথ সা কৃষ্ণচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণগর্ভং দধার হ।
শতমন্বন্তরং যাবজ্জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা॥
শতমন্বন্তরান্তে তু কালেঽতীতেচ সুন্দরী।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বধারালয়ং পরম্॥
উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

বিষয় এইরূপ নহে। কেননা দাস্যআদি মুখ্য আসক্তি সমুদয়ের মধ্যে মলিনতার নাম গন্ধও না থাকায় তৎসমুদয়ের দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভক্তের কল্যাণ হইয়া থাকে। ভগবানের প্রতি রাগের,—অনুরাগের উদয় হওয়ায় ভক্তের চিত্ত নিশিদিন সেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকে এবং প্রকৃতির বৈচিত্র্য হেতু কল্পতরু শ্রীভগবানের প্রতি কোন ভক্ত দাস্যভাবের আশ্রয় করিয়া, কোন ভক্ত সখ্যভাবের অবলম্বন করিয়া, কেহ হয় ত কান্তাভাবের সমাশ্রয়ে ভগবৎরাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। এইরূপে কেহ বাৎসল্যভাবের আশ্রয়ে, কেহ বা আত্মনিবেদনভাবে ভাবিত হইয়া, আবার কেহ হয় ত গুণকীর্ত্তনভাবে মত্ত হইয়া এবং কেহ কেহ বা তন্ময়াসক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ ভগবৎরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে সেই পরমানন্দপদ প্রাপ্ত

ভৈষ্মীরাধাদিরূপেষু শৃঙ্গারঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
ভীষ্মো বীরে দশরথঃ করুণে স্থিতিমাপ্তবান্॥
বল্যর্জ্জুনযশোদানাং বিশ্বরূপস্য দর্শনে।
অত্যদ্ভুতরসাস্বাদঃ কৃষ্ণানুগ্রহতো ভবেৎ॥
গোপালবালা হাসস্য শ্রীদামোদ্বহনাদিষু।
এবমন্যত্র ভীত্যাদিত্রিতয়েঽপি বিচিন্ত্যতাম্॥
গোপ্যঃ কামাস্তয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ পার্থা ভক্ত্যা মুনীশ্বরাঃ॥
শৃঙ্গারী রাধিকায়াং সখিষু সকরুণঃ ক্ষ্বেড়দগ্ধেষ্বঘাহে-
র্বীভৎসী তস্য গর্ভে ব্রজকুলতনয়াচৈলচৌর্য্যে প্রহাসী।
বীরী দৈত্যেষু রৌদ্রী কুপিতবতি তুরাসাহি হৈয়ঙ্গবীন-
স্তেয়ে ভীমান্ বিচিত্রী নিজমহসি শমীদামবন্ধে স জীয়াৎ॥

হইয়া থাকেন। ভগবান ভক্তেরই অধীন। এইজন্য তাঁহার (ভগবানের) প্রতি আসক্তিযুক্ত ভক্তকে ভগবান অসীম কৃপাবিতরণে সর্ব্বদাই রক্ষা করত অবশেষে পরমানন্দরূপ মুক্তিপদ প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, "আমি কখনও স্বাধীন নহি; কেননা আমি ভক্তের অধীন, আমার হৃদয় আপনার (নিজের) নহে, পরন্তু সাধু ভক্তজনেরই অধিকৃত। যেসকল ভক্ত অনন্যশরণ হইয়া আমাকেই একমাত্র শরণ মনে করত আমার উপরে নির্ভর করিয়া কলত্র, পুত্র, ভবন, স্বজন ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য আদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি? সতী স্ত্রী যেমন পতিভক্তি ও সতীত্ববলে আপন পতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণ আমাতে মনঃপ্রাণ অর্পণ করত অনন্য ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন। সাধুগণ আমার হৃদয়স্বরূপ এবং আমি সাধুগণের হৃদয়রূপ; তাঁহারা আমাকে ভিন্ন ত্রিভুবনে দ্বিতীয় আর কাহাকেও জানেননা, আর আমিও ত্রিভুবনে তাঁহাদিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না" *। শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় ভক্ত-

---

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহম্পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

মণ্ডলীর দাস্য, সখ্য আদি আসক্তির বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্রে অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি পবননন্দন হনুমানের যে অপূর্ব্ব দাস্যাসক্তি ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এইরূপ দাস্যাসক্তির উদয় হইলে ভক্ত সেবক ভাবে আপনাকে ভগবানের এবং ভগবদ্‌ভক্তগণের সেবা-ব্রতেই নিয়োজিত করেন। শ্রীভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন যে "আমার ভক্তগণেরও যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রিয়তম ভক্ত। জগতে কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, তবে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহারই" *।

সখ্যভাবের দৃষ্টান্তরূপে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নাম লওয়া যাইতে পারে। যিনি যথার্থ সৌহৃদ্যের অন্তিম সীমায় যাইয়া আপনার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদ-বুদ্ধি রহিত হইয়াছিলেন, সখ্যভাবের দৃষ্টান্তে সেই কৃষ্ণসখা পার্থকেই অগ্রে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ভক্ত-বীর অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানেরই কৃপায় বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ জানিতে

---

* ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।

"মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ"

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

পারিয়া সভক্তিক সখ্যভাবে করযোড়ে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন "হে বিশ্বরূপ! আপনাকে চিনিতে না পারিয়া- আপনার স্বরূপ, বিশ্বরূপ জ্ঞাত হইতে না পারায় অজ্ঞতা বশতঃ বা প্রণয় হেতু বন্ধু মনে করিয়া হে কৃষ্ণ হে যাদব আদি কত সামান্য সম্বোধনে ডাকিয়াছি, এমন কি কত সময়ে উপহাস ও করিয়াছি, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; অতএব আমায় ক্ষমা করুন *"। কান্তাসক্তির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রূপে ব্রজগোপিনী-দিগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজগোপিনীগণ লোকলজ্জা, কুলমর্য্যাদা, ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম আদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান বোধে বৃন্দাবন বিলাসী, মোহনমুরলীধারী, আনন্দকন্দ সচ্চিদানন্দরূপ প্রেমময় ভগবানশ্রীকৃষ্ণের প্রেমসিন্ধুনীরে নির্ভিক চিত্তে আপন আপন জীবনতরণী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের এরূপ আত্মসমর্পণ ও কান্তাসক্তি ছিল যে, ভগবানকেও এইরূপ বলিতে হইয়াছিল-"হে ব্রজগোপিনীগণ! আমার প্রতি আপনাদের পবিত্র প্রেমভাব এরূপ গাঢ় ও বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, আমি কখনও তাহার পরিশোধ করিতে পারিবনা। আপনারা সুকঠিন সংসার পাশ ছেদন করিয়া আমাতেই কায়মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তবে এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনাদের এই সাধুকার্য্যই আমার প্রতি প্রেমের প্রতি-

---

* সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোহথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

দান স্বরূপ হউক*"। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইতেছিলেন, সেই সময়েও বলিয়াছিলেন যে, "আমার প্রিয়তম গোপিনীগণের প্রাণ মন আমার উপরেই সমর্পিত, কেননা কেবল আমার জন্যই তাহারা সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। বোধহয় এখনও আমার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহারা কঠিন দুঃখের সহিত জীবনভার বহন করিতেছে। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে আমার পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া তাহাদের তাপিত,-ব্যাকুলিত প্রাণ শীতল করিবে†"।

বাৎসল্যাসক্তির দৃষ্টান্তস্থলে যশোদা এবং নন্দগোপাদিকে আদর্শরূপে লওয়া যাইতে পারে। কেননা উঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বরূপধারণ এবং কালীয়নাগ দমন আদি অলৌকিক কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিতে দেখিয়াও তাঁহার সহিত পুত্র ভাবেই প্রেম করিয়াছিলেন। এইরূপ বাৎসল্যভাবে ভাবিত হইয়াই কোন এক ভক্ত বলিয়াছিলেন যে "হে বৎস! নবনীরদ কোমলাঙ্গ,-তুমি আমার নিকটে এস, আমি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুত্রস্নেহ চরিতার্থ করি—মস্তকে চুম্বন করি অথবা তোমার চরণ-কমলদ্বয়ে অভিবাদন

---

* নপারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং।
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

† তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদেহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

করি*"। আত্মনিবেদনাসক্তির বিষয়ে দেবর্ষি নারদই উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মেই দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আত্মনিবেদনাসক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আত্মনিবেদন ভাবের উদয় হইলে ভক্তের চিত্তে অহং ভাবের লেশমাত্রও থাকে না এবং তাঁহার জীবন ও সমস্ত চেষ্টা আদি শ্রীভগবানেরই প্রীতি সম্পাদনের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "বাক্যের মধ্যে যথার্থবাক্য তাহাকেই বলা যায়, যাহাদ্বারা ভগবানের গুণ গীত হয়; হস্ত তাহাই, যে হস্তদ্বারা ভগবানের কার্য্যসম্পাদিত হয়; যথার্থ মন তাহাকেই বলা হইয়া থাকে, যে মন সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার স্মরণে তৎপর থাকে; যথার্থ কর্ণ তাহাই, যে কর্ণ দ্বারা ভগবানের মহিমা শুনিতে পাওয়া যায়; যথার্থ মস্তক তাহাই, যাহাদ্বারা ভগবানের চরণাভিবন্দন করিতে পারা যায়; যথার্থ নেত্র তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহাদ্বারা ভগবানের দর্শন হইয়া থাকে; এইরূপ শারীরিক অবয়বের মধ্যে যথার্থ অবয়ব তাহাই, যাহাদ্বারা ভগবানের এবং ভগবদ্ ভক্তগণের

যে ত্যক্তলোক-ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্।
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ॥
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন-সন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥

* এহ্যেহি বৎস নবনীরদ-কোমলাঙ্গ।
চুম্বামি মূর্দ্ধনি চিরায় পরিষ্বজে ত্বাম্॥

সেবা করা যাইতে পারে*"। এইসকল আত্মনিবেদনাসক্তিরই ভাব।

গুণকীর্ত্তনাসক্তির দৃষ্টান্তস্থলে মহর্ষি বেদব্যাসের নাম দেওয়া যাইতে পারে,-যাঁহার জীবনের অখিলব্রত ভগবদ্ গুণানুকীর্ত্তনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, যাঁহার উন্মাদিনী লেখনী পুরাণে, ইতিহাসে ও দর্শনে- সর্ব্বত্রই ভগবানের মধুর গুণগান দ্বারাই পবিত্র হইয়াছিল। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "শ্রীভগবানের মধুর গুণকথা—যাহা মুক্ত পুরুষগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, এবং ভব-ব্যাধির যাহা একমাত্র ঔষধি স্বরূপ, কর্ণকুহর পবিত্রকারী, মাধুর্য্যময়, মনোমলাপসারক ও চিত্ত-বিনোদন ভগবানের সেই গুণকথা যাহারা গান করেন না,

---

আরোপ্য বা হৃদি দিবা-নিশমুদ্বহামি
বন্দেঽথবা চরণ-পুষ্করকদ্বয়ং তে ॥

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥
শিরস্তু তস্যোভয়-লিঙ্গ-মানমে—
ত্তদেব যৎপশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তবপাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাংশিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনুনাম্ ॥

তাহারা নিশ্চয়ই আত্মঘাতী *"। এইরূপে আরও কথিত হইয়াছে যে, "ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের মুখ হইতে যখন অমৃত ধারার ন্যায় ভগবানের গুণকথা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভক্তগণ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা পান করিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ আদি যাবতীয় দুঃখ হইতে নিস্তার পাইয়া, অবশেষে মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন †"।

রাগাত্মিকা ভক্তির অন্তিম অবস্থার নাম 'তন্ময়াসক্তি'—যাহা প্রাপ্ত হইলে ভক্ত আপনাকে ভগবানেরই স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহারই প্রতি অপূর্ব্ব প্রীতি প্রবাহে অহোরাত্র নিমগ্ন থাকেন। এই তন্ময়সক্তিরই বর্ণন প্রসঙ্গে স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে যে, "এই তন্ময়াসক্তির উদয় হইলে ভক্ত তন্ময় হইয়া ভগবানকে প্রণাম করেন, আর কখনও স্বয়ং ভগবদ্রূপ হইয়া আপনাকেই আপনি প্রণাম করেন ‡"। এইরূপ

নিবৃত্ততর্ষৈরুপ-গীয়মানা—
ভবৌষধা-চ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
* উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

† তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিশ্চরিত্র
পীয়ূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তাং যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়-কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়-শোক-মোহাঃ॥

‡ নমস্তুভ্যং পরেশায় নমো মহ্যং শিবায় চ।
প্রত্যক্ চৈতন্যরূপায় মহ্যমেব নমো নমঃ॥
মহ্যন্তভ্যমনন্তায় মহ্যস্তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে॥

ওঁ

পঞ্চদেবতা।

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্ম-কার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য হি যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ॥

১ম ভাগ { চৈত্র, ১৩২৬। ইং মার্চ্চ, ১৯২০ } ১২শ সংখ্যা।

ধর্ম্মই সকল উন্নতির মূল ভিত্তি।

[শ্রীবিজয়লাল দত্ত।]

প্রথম প্রস্তাব।

ভারতের অতীত গৌরব।

"ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ।"

প্রকৃতির প্রাণারাম লীলাস্থল, সাধনার সুবিশাল সমুর্ব্বর ক্ষেত্র, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ এক সময় পৃথিবীর সকল মহাশক্তিশালী সুসভ্য জাতির বরেণ্য, ধর্ম্ম-প্রাণ আর্য্য-ঋষিগণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, বিপুল সাধনা ও সুকৃতি প্রভাবে সমগ্র অবনীর সমুজ্জ্বল ললাট-মণিরূপে পরিগণিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। বিশ্ব-বিধাতা ভারতের জল-বায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, শোভা ও সম্পদ, উৎপাদিকাশক্তি ও প্রকৃতি এবং জীবন সংগ্রামের অনুকূল বিপুল ঐশ্বর্য্যরাজি দ্বারা তাঁহাদের সাধনা সরস ও মধুময় করিয়াছিলেন। পুণ্য-তোয়া স্রোতস্বতীর তট-বর্ত্তী বনভূমি অথবা উপবন, তুষার-ধবলিত অভ্র-ভেদী গিরি-গুহা, অথবা অনুচ্চ শৈল-রাজি পরিবেষ্টিত উপত্যকা, অধিত্যকা অথবা সমতলক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বিলাস-বাসনা-পরিশূন্য হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন জন্য যেরূপ কঠোর ত্যাগ-

স্বীকার ও আত্ম-নিগ্রহ করিয়াছিলেন, জগতের কোন সভ্যজাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। সেই মহাপ্রাণ আড়ম্বর বিহীন আর্য্য ঋষিগণ দীন-বেশে সুসংযত ও সমাহিত চিত্তে, সুপবিত্র হৃদয়ে ধ্যান-নিমীলিতনেত্রে সর্ব্বান্তঃ-করণে পরম দেবতার ধ্যানে বিভোর হইয়া জড় জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধ নিরূপণ, জড়বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি ও সমুন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সুদুর্লভ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য অনুসন্ধান, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের গভীর রহস্যময় নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা ও উৎকর্ষ সাধনে সুকৌশলে অসংখ্য নর-নারীর তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যে অতুলনীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে হৃদয় যুগপৎ গভীর বিস্ময় ও অতুল আনন্দে অভিভূত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাঁহারা আত্মকল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণকামী হইয়া স্বার্থের সহিত পরার্থের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক সমাজ-বিজ্ঞান ও জীবন-মুক্তির বিস্তর জটিল তত্ত্বের যেরূপ সহজ সমাধান করিয়াছিলেন জগতের কোন সভ্যজাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর, এবং জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধন জন্য যাহা কিছু প্রার্থনীয়, তাঁহাদের মহাসাধনা প্রভাবে তৎসমস্ত পূর্ণবিকাশে বিকশিত ও আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। তাঁহাদের একাগ্রতাপূর্ণ কঠোর সাধনা ও আত্মোৎসর্গ প্রভাবে একদিন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সুশিক্ষা, সদাচার, সভ্যতা ও উন্নতির সমুচ্চ রত্ন-বেদীতে সগৌরবে উপবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর সকল সভ্য-দেশের উপর আধিপত্য ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতের প্রাচীন সভ্যতার জননী মিসর, গ্রীস, রোম, কার্থেজ প্রভৃতি মহাশক্তিশালী দেশ নিচয়ের প্রাথমিক শিক্ষা, সাধনা ও অভ্যুদয় আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্য-প্রতিভার হিন্দোল-দোলায় পরিপুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়াছিল। আর্য্য সভ্যতার সুবিমল আলোকে দেশ দেশান্তর আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া আর্য্য জাতিকে সকল সভ্যজাতির সম্পূজ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ করিয়াছিল। তখন তাঁহাদের সহিত কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের উপযুক্ত কোন জাতি পৃথিবীর কোথাও বিদ্যমান ছিল না। ভারতের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে অথবা ভারতীয় পণ্য ও জ্ঞানের সহিত বিনিময় ও ভাবের আদানপ্রদান উপলক্ষে

যে সকল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যজাতির কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহারা সসম্ভ্রমে অবনত মস্তকে ভারতভূমির চরণে গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে কৃতার্থ হইত। যখন ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী ক্ষণজন্মা সুকৃতিশালী সন্তানগণ সৃষ্টির প্রাণরূপিণী মূর্ত্তিমতী সরলতার হস্তধারণপূর্ব্বক সত্যানুরাগ ও সত্যানুসন্ধানকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞানে পরমদেবতার স্বরূপ চিন্তন ও আরাধনায় বিভোর ও আত্মহারা হইয়া পরমার্থ-তত্ত্ব নির্ণয়ে যোগ-রত তপস্বীর ন্যায় আত্ম-প্রতিষ্ঠ ও ধ্যান-নিমগ্ন থাকিতেন, তখন অনেক পাশ্চাত্য দেশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। তখনও তাহাদের মধ্যে সভ্যতার বিন্দুমাত্র আলোক প্রবেশ করে নাই। নিবিড় অরণ্য, তরু-কোটর অথবা বৃক্ষ-শাখা এবং কদর্য্য জীর্ণ পর্ণ কুটীর তাহাদের মধ্যে অনেকের বাসস্থান ছিল। পশুচর্ম্ম অথবা সংযুক্ত বৃক্ষপত্রে তাহারা কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিত। আম মাংস অথবা অর্দ্ধদগ্ধ পশুমাংস তাহাদের উপাদেয় আহার্য্য ছিল; তাহাদের নরনারীর সুকোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত প্রভৃতিবর্ণের বিচিত্র অলকা-তিলকায় সুরঞ্জিত হইত। তাহাদের মধ্যে যৌন বিচার ছিল না এবং নীতি-জ্ঞানের কণামাত্রও বিদ্যমান ছিল না। অনেকে ভূতের ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড় ও অবসন্ন থাকিত। সে ত অধিক দিনের কথা নয়—মধ্যযুগের ইতিহাস অকপটে সুস্পষ্টরূপে তাহার প্রমাণ দিতেছে। পক্ষান্তরে উহার শত শত বর্ষ পূর্ব্বে মহাপ্রতিভাশালী স্বধর্ম্মানুরাগী আর্য্য-ঋষিগণের হৃদয়-মন্দির মথিত ও আলোড়িত করিয়া বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, ষড়দর্শন, পুরাণ ও সংহিতা আদি বিবিধ রত্নরাজি ও অমৃত-ভাণ্ডার উত্থিত হইয়া ভারতের গৌরব শত শাখায় বিস্তৃত করিয়াছে। যে মহাপ্রাণে উদ্বুদ্ধ ও অণুপ্রাণিত হইয়া আর্য্য-ঋষিগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ সমস্ত জগতের সম্মুখে সকল কল্যাণকর বিষয়ে সমুজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন জাতীয় সুপণ্ডিত-গণ এখনও সসম্ভ্রমে, অবনত মস্তকে ও মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। যুগ যুগান্তর পরে আজিও কালের নিষ্ঠুর হস্ত তাহার সুষমা মলিন করিতে পারে নাই। আমার দুর্ব্বল লেখনী ভারতের অতীত গৌরবের জলন্তচিত্র প্রদর্শনে অক্ষম হইলেও অমর ইতিহাস তৎপক্ষে নীরব নহে।

বৈদিকযুগে শুভক্ষণে আর্য্য-ঋষিগণের সুব্যবস্থা ও বিধানানুসারে ভারতে

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার সুশীতল ছায়ায় ভারতের প্রধান চতুর্ব্বর্ণ পরিপুষ্টিলাভে সমাজ-বন্ধন ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন পূর্ব্বক ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। জ্ঞানের অরুণ আলোকে ভারতভূমি আলোকিত ও আশ্বস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্য সন্তান পুণ্যাত্মা ঋষির শ্রীমুখ হইতে শিক্ষা করিয়াছিল—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

যতদিন ভারতের সৌভাগ্য-রবি ভারত-গগনে উজ্জ্বল প্রভায় কিরণদান করিয়াছে ততদিন ভারতের কোটি কোটি নরনারী উক্ত মহাসত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অদৃষ্টের ঘোর বিড়ম্বনায় পুণ্যভূমির সেই প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মানুরাগ আজি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের সেই অতুলনীয় গৌরব-শ্রী আজি অনেক স্থলে অতীত কাহিনী অথবা উপন্যাসে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের কঠিন আঘাতে প্রাচীন ভারতের অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থা, বিধান ও শৃঙ্খলা চূর্ণ হইবার সূচনা হইয়াছে।

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দূরতিক্রমঃ॥"

এই মহাবাক্য সৃষ্টি, স্থিতি, উত্থান, পতন, ও লয় কার্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তে অক্ষরে অক্ষরে সার সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। ভারতের সেই একদিন আর এই একদিন! একদিন ভারতের গৃহে গৃহে পরম দেবতার মঙ্গল আরতিতে অযুত নরনারী প্রতিদিন উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, ভারতের ঋষিবৃন্দের পবিত্র তপোবন ও পুণ্যময় আশ্রম শুভ শঙ্খ-নিনাদ ও পূত সামগানে অসংখ্য মনুষ্যকে উদ্বুদ্ধ ও ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত করিত। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগধর্ম্মের প্রভাবে আজি সব নীরব ও নিস্তব্ধ—সে বিপুল ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রভাব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কালবশে ভারতের সেই শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী সুস্নিগ্ধ রজনীর কমনীয়তার অবসানে প্রগাঢ় সূচী-ভেদ্য অমানিশার ভীষণতায় চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ভারতের অতীত সৌভাগ্য-লক্ষ্মীই ভারতের অনর্থ ও অবনতির মূল। কিরূপে দুর্দ্দিন আসিয়াছিল—কিরূপে শত শত বর্ষ-ব্যাপী অধীনতার নিষ্পেষণে ভারতভূমি চূর্ণ, বিচূর্ণ, বিকলাঙ্গ ও অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, অমর ইতিহাস করুণ বিলাপে সেই মর্ম্মভেদী অতীত কাহিনী পরি-

ঘোষণ করিতেছে। আর হতভাগ্য আমরা ঘোর অবনতির অনিবার্য্য স্রোতে ভাসিয়া আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ও ধর্ম্মভাব বিসর্জ্জন দিতেছি!

অদৃষ্ট-চক্রের পরিবর্ত্তনে যেদিন ভারতবর্ষ আর্য্যজাতির অধিকার ও শাসন হইতে বঞ্চিত হইয়া বিজাতীয় শাসনে অধীনতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই ঘোর দুর্দ্দিন হইতেই ভাগ্য-লক্ষ্মী ভারতবাসীর প্রতি বিমুখ। আর্য্যজাতির যে বিরাট সাধনা, গভীর নিষ্ঠা, ত্যাগানুরাগ, বিপুল ধর্ম্মভাব ও সবল ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভাবে ভারতের সকল বিভাগে সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অধর্ম্মের প্রসার এবং অনৈক্য ও আত্ম-বিচ্ছেদের পরিপুষ্টিতেই উহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ভারতের সে সুখের দিন আর নাই—ভারতবাসীর সে শৌর্য্য-বীর্য্য, সে সাহস ও শিক্ষা-দীক্ষা, সে সাধনা ও ধর্ম্মভাব, সে স্বচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দতা, সে পরিতৃপ্তি, সরলতা, উদারতা, সে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম এবং হৃদয়ের সে চারু শোভা ও মহত্ব আর নাই। যে ধর্ম্মানুরাগ, সত্য-নিষ্ঠা ও পরার্থপরতা এক সময় ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করিয়াছিল—যাহার প্রভাবে ভারতবর্ষ একদিন সমস্ত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহার অভাবে উহার কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে! ধর্ম্ম-ভাব ও সদাচার-সম্ভূত যে সকল সদ্‌গুণ রাজি এক সময় ভারত-সমাজের ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হইত, অধঃপতিত ভারত-সন্তানের সেই সকল দেবজন-স্পৃহনীয় মনুষ্যত্বের পরিচায়ক অতুলনীয় গুণরাশি আজি কোথায়? প্রতিধ্বনি উন্মাদিনী বেশে বিষাদ-বিকম্পিত স্বরে ছুটিতে ছুটিতে বলিতেছে—"আর কোথায় !!"

বিপুল সাধনার ধন ধর্ম্মকে লাভ ও রক্ষা করিবার জন্য একদিন যে আর্য্য-জাতি সমস্ত পার্থিব সুখ-সম্পদকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তাঁহাদের বংশধরগণের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কাহার হৃদয় ঘোর বিষাদে অবসন্ন না হইয়া থাকিতে পারে? ধর্ম্মশিক্ষার অভাব ও ধর্ম্ম-ভাব ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধায় তাহাদের কি ঘোর দুর্গতি ও অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। পরাধীন জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল অঘটন ঘটিয়া থাকে, বর্ত্তমান ভারতবাসিগণের ভাগ্যে তাহাই সংঘটিত হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে আমরা জড়বাদের উপাসক হইয়া সনাতন ধর্ম্মভাবকে মলিন বেশে বিদায় দিতেছি। সদাচার ও সদনুষ্ঠান ভুলিয়া আমরা যথেচ্ছাচার ও অধর্ম্মানুষ্ঠানে দিন দিন

অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইতেছি। পাশ্চাত্যভাব, পাশ্চাত্যচিন্তা, পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও চাল-চলন এক্ষণে অধঃপতিত হিন্দু-সমাজের প্রধান অনুকরণের বিষয় হইয়াছে। দেবভাবাপন্ন আর্য্য-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আর্য্য-সন্তানগণ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় ধর্ম্ম-ভাব-বর্জ্জিত ও পরের অনুকরণ প্রিয় হইয়া কি শোচনায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। আজি যদি কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে আর্য্য-জাতির মহামনীষী ও ও মহাতপা ব্যবস্থা ও শিক্ষা-গুরু-কুল এবং আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কোন কোন মহাত্মার অমর মুক্ত আত্মা ক্ষণকালের জন্য দিব্যধাম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক লোক-চক্ষুর অগোচরে ভারতভূমির একপ্রান্ত হইতে অপর-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ পূর্ব্বক দেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও ধর্ম্মনীতিক অবস্থা ও কুৎসিৎ বিজাতীয় অনুকরণ প্রিয়তা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের অন্তরে এই সন্দেহ জন্মিবে, এই দেশ কি তাঁহাদের সাধনা ও সুকৃতিতে গৌরবান্বিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান সদাচার-পরিভ্রষ্ট সনাতন ধর্ম্ম-ভাব-বিহীন ভারত-সন্তানগণ কি তাঁহাদের বংশসম্ভূত? যে পবিত্র ধর্ম্ম-ধনকে তাঁহারা কৃপণের স্বর্ণ মুদ্রার ন্যায় পরম যত্নে, পরমাদরে রক্ষা করিয়াছিলেন, বিজাতীয় ধর্ম্মহীন শিক্ষার মোহান্ধকারে ও বিজাতীয় কুৎসিৎ ও কদর্য্য আচার ব্যবহারে তাঁহাদের বংশধরগণের কি মর্ম্মভেদী পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ নিঃসন্দেহ গভীর দুঃখ, ক্ষোভ ও হতাশায় আকুল ও মৃয়মান হইবে। এই ঘোর অধঃপতনের সময় কে ভারত-সন্তানগণকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবে? কে প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে এই মহাশিক্ষা দানে তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে—ধর্ম্মই সকল উন্নতির মূল ভিত্তি—এই মনোজ্ঞ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অচল ও অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আর্য্যজাতি অসাধ্য-সাধনে সমস্ত পৃথিবীর বরেণ্য ও সম্পূজ্য হইয়াছিলেন?

বৌদ্ধ-যুগে মহাবতার সিদ্ধার্থের মন্ত্র-শিষ্য সম্প্রদায়ের অদূরদর্শীতায় যখন সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ঘোরতর আবর্জ্জনা ও অনিষ্ট উৎপত্তির আশঙ্কায় ভারতভূমি আন্দোলিত ও অস্থির হইয়াছিল সেই দুর্দ্দিনে সাক্ষাৎ শঙ্করতুল্য মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী পরমারাধ্য শঙ্করাচার্য্য যেরূপ দুর্দ্দমনীয় তেজে বিপুলবিক্রমে ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্ম উপদেশ প্রচার ও সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনায় অতুলনীয় কৃতিত্বপ্রদর্শন করিয়া-

ছিলেন, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা মঙ্গলময় পরমাত্মাদেবের কৃপায় আবার কি সেইরূপ একজন ক্ষণ-জন্মা অত্যদ্ভূত শক্তিশালী ধর্ম্ম-প্রাণ মহোপদেশকের আবির্ভাব হইবে না, যাঁহার কৃপায় সনাতন ধর্ম্মের সকল গ্লানি, সমস্ত আবর্জ্জনা এবং সর্ব্ববিধ মলিনতা দূরে যাইয়া অধঃপতিত ভারতভূমির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পুনঃসূচনা হইবে ? পতিত-পাবন, অধম-তারণ কাঙ্গালের ধন নারায়ণ! কবে আবার তেমন শুভদিন আসিবে যেদিন সনাতন ধর্ম্মের অমোঘ ও অব্যর্থ প্রভাবে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত ভারতসন্তান নব-জীবনলাভে সকল ভয়, ভ্রূকুটি, আতঙ্ক ও লাঞ্ছনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া জাতীয় সমাজে সুপবিত্র ভাবে সগৌরবে সমুচ্চ আসন অধিকারে সমর্থ হইবে ? মঙ্গলময় প্রভো! তোমার শ্রীমুখের সেই মৃতসঞ্জীবনী অভয় বাণী—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আবার কতদিনে সফল হইবে ? —ক্রমশঃ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জোষী মঠ—গাড়োয়ালের সুযোগ্য ডিপুটী কমিশনার সাহেব বাহাদুর সনাতন ধর্ম্মের উন্নতিজনক কার্য্যে সহায়তা করিয়া ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে সুতরাং সমস্ত হিন্দুজাতিকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধীয় সংবাদ কয়েকবার ধর্ম্মপ্রচারকে দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথের মন্দির এবং জোষীমঠের সমস্ত মন্দিরাদির জীর্ণোদ্ধারের নিমিত্ত খরচের অনুমান পত্র এবং নক্সা মহামণ্ডলে মঞ্জুরীর জন্য পাঠাইয়াছেন। বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে মহামণ্ডল হইতে যত খরচের অনুমান করা হইয়াছিল উক্ত কমিশনার সাহেবের আনুমানিক খরচ তালিকায় তাহা অপেক্ষা অনেক কম খরচ ধরা হইয়াছে। কমিশনার সাহেব এই খরচের মধ্যেই উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। এতাদৃশ লোকপ্রিয়, দূরদর্শী এবং পক্ষপাত শূন্য শাসনকর্ত্তাই ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ।

সতী—বিরভূম জেলার বাজিতপুর গ্রাম নিবাসী কুলদাপ্রসাদ মণ্ডল সত্তর বৎসর বয়সে গত ৫ই চৈত্র পরলোক গমন করেন। ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইঁহার সহধর্ম্মিণীও পতির পদতলে মস্তক রাখিয়া পতি-লোকে প্রস্থান করিলেন। উভয়েরই শব এক চিতায় সংকার করা হইয়াছে। হিন্দুসতীর এই সতীত্ব-মহিমার কথা শুনিলে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে।

জন্মান্তরীণ সংস্কার—সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে দুইজন ভদ্র মহিলা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগের বিশ্রামাগারের সম্মুখস্থ এক বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা উঠিয়া যাইতেই একটা বানর আসিয়া সেখানে বসিল। পরে সেখান হইতে লাফাইতে লাফাইতে কেলনার কোম্পানীর জলযোগের ঘরে উপস্থিত হইল এবং খাবার টেবলের উপর হইতে একখণ্ড রুটী লইয়া ই, আই, আর কোম্পানীর ২৫নং আপ্ গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় গিয়া বসিল। যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কেহ তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইতে পারিল না। ঐ গাড়ীতে সে পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে যাইয়া অবতরণ করে। এই ঘটনায় আমরা ঐ বানরটার জন্মান্তরীণ সংস্কার অনুমান করিতে পারি।

দান—শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য আপদ বিপদের সময় শ্রীহট্টবাসীর সাহায্য কল্পে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের নামে একটী ধনভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে আসাম সরকারের হস্তে তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি বঙ্গের অন্যান্য জেলার ভূম্যধিকারীগণ কিশোরীবাবুর অনুকরণে স্ব স্ব প্রদেশের দুস্থ ব্যক্তিবর্গের দুঃখ মোচন করিতে মুক্তহস্ত হইবেন।

পরোপকারে আত্মোৎসর্গ—বাখরগঞ্জ জেলার শিকারপুর গ্রামে দুর্গাকুমার চট্টোপাধ্যায় কয়েকটী বালককে উদ্ধার করিতে যাইয়া জলমগ্ন হন। সংপ্রতি দুর্গাকুমারের স্মৃতি রক্ষার কল্পনা হইতেছে। বরিশাল হিতৈষী বলিতেছেন দুর্গাকুমারের নিঃসন্তান ও নিঃসহায় পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী এতদিনে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাও করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়।

—০—

নারীজীবন।

[স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।]

বিবাহকাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উক্ত বিষয়ের সহায়তায় স্ত্রীশরীরে আরও কি কি পরিণাম হয় তদ্বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ সংহিতায় বর্ণন করিয়াছেন যথা—

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ॥

চন্দ্রদেবতা স্ত্রীশরীরে শুচিতা আনয়ন করেন, গন্ধর্ব্বগণ মধুর বাণী প্রদান করেন এবং অগ্নির কৃপায় স্ত্রীশরীরে পবিত্রতা আসে। এজন্যই স্ত্রীগণ পবিত্র। এইভাবে দেবতাগণের সহায়তায় স্থূল শরীরের বিবিধ পরিণাম বর্ণন করত বিবাহকাল নির্ণয় প্রসঙ্গে গোভিল ঋষি বলিয়াছেন যথা—

তস্মাদব্যঞ্জনোপেতামরজামপয়োধরাম্।
অভুক্তাঞ্চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকা তু প্রশস্যতে॥

অতএব স্ত্রীলক্ষণ বিকাশ, পয়োধর বিকাশ, রজোধর্ম্ম এবং চন্দ্রাদি দেবগণের অধিকার লাভের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রশস্ত। এই সকল বিচার ও প্রমাণের দ্বারা রজোধর্ম্মের পূর্ব্বেই পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়ে মহর্ষিগণের ঐকমত্য প্রমাণিত হইতেছে। কোথাও কোথাও স্মৃতিশাস্ত্রে যে রজস্বলা হইবার পরেও বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঘটনাচক্রে আপদ্ধর্ম্ম পালনের অনুরোধেই করা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এবং যে প্রসঙ্গে ঐরূপ বিধান দেখা যায় তাহার প্রতি অনুধাবন করিলেই এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ হইবে। মনুসংহিতায় এরূপ আপদ্ধর্ম্ম পালন বিষয়ে নিম্নলিখিত বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি ॥
পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কং তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতুনাং প্রতিরোধনাৎ ॥

ঋতুমতী হইবার পরেও যদি পিতামাতা যোগ্যপাত্রে কন্যাকে সমর্পণ না করেন তবে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া কন্যা স্বয়ংই যোগ্য পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিতে পারেন। পিতামাতার এইরূপ অবহেলা প্রযুক্ত স্বয়ম্বরা হইলে কন্যা পাপগ্রস্ত হন না এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত পতিকেও কোন পাপ স্পর্শ করে না। বরঞ্চ যদি ধন লইয়া কন্যাদান করাও পিতার অভিপ্রেত থাকে, তথাপি ঋতুকাল অতীত হওয়ায় পিতার সে ধনেও অধিকার নষ্ট হয়। এই সকল শ্লোকে পিতামাতার অপারগ পক্ষেই ঋতুকালের পরে কন্যার স্বয়ম্বরা হইবার আজ্ঞা দান করা হইয়াছে, সাধারণ অবস্থায় নহে। অতএব ইহা এক প্রকার আপদ্ধর্ম্ম হওয়ায় সাধারণ বিবাহকাল নির্ণয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। মহর্ষি বশিষ্টও নিজ সংহিতায় এইরূপই লিখিয়াছেন, যথা—

ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতী কাঙ্ক্ষেত পিতৃশাসনম্।
ততশ্চতুর্থে বর্ষে তু বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥

অবিবাহিতা অবস্থায় ঋতুমতী হইলে পর তিন বর্ষকাল পিতার প্রতীক্ষা করত চতুর্থ বর্ষে কন্যার স্বয়ংই যোগ্য পতি দেখিয়া লওয়া উচিত। কেবল ইহাই নহে আপদ্ধর্ম্মের বিচারে ভগবান্ মনু কন্যাকে যাবজ্জীবন কুমারী থাকিবারও আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি ॥
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥

যদি সৎকুলোদ্ভব গুণবান্ বর পাওয়া যায়, তবে বিবাহানুকুল বয়সের পূর্ব্বেও যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করা উচিত। অন্য পক্ষে কন্যাকে ঋতুমতী হইবার পরেও যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে রাখাও ভাল, তথাপি গুণহীন পাত্রে

কদাপি সম্প্রদান করা উচিত নহে। এইরূপে বিবাহকাল নির্ণয় বিষয়ে দূরদর্শী মহর্ষিগণ দেশকালপাত্রানুসারে মত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, মহর্ষিগণ কি কারণে রজোধর্ম্মের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দানের নিমিত্ত এরূপ অবশ্য পালনীয় আজ্ঞার বিধান করিলেন? যদি

বিশেষ বিধির বিশেষ কারণ।

মহর্ষিগণ নারীজাতিকে সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র মাত্র মনে করিতেন, তাহা হইলে কখনই বিবাহকাল নির্দ্ধারণ বিষয়ে এত সাবধানতা অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় জানিতেন যে স্ত্রীজাতির মধ্যে পতিপ্রেম, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম এবং তপস্যার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা হইলেই সন্তান-সন্ততির মধ্যেও আর্য্যজাতি-সুলভ ধার্ম্মিক ভাবের ন্যূনতা হইয়া থাকে এইজন্যই তাঁহারা অনেক বিচার করিয়া বিবাহ সংস্কারের জন্য এরূপ বয়ঃক্রম নির্ণয় করিয়াছেন যাহাতে দাম্পত্য প্রেমের মধুর বিকাশের দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে শান্তি বিরাজমান থাকে, দম্পতির শারীরিক এবং মানসিক কোনরূপ হানি না হয় এবং ধর্ম্মপরায়ণ নীরোগ-শরীর সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে। রজোধর্ম্মের পূর্ব্বে কন্যাদানের সহিত এই বিষয়গুলির কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়। যৌবনের প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে পরস্পর ভোগ্যভোক্তৃভাবের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, উহা একটি স্বাভাবিক সাধারণ বিষয়। স্ত্রীজাতির পক্ষে কিন্তু এই সাধারণ বিষয়ের অতিরিক্ত একটী অসাধারণ বিষয়েরও বিকাশ হইয়া থাকে। উহা স্ত্রীজাতির রজোধর্ম্ম, যাহা পুরুষের মধ্যে হয় না কিন্তু কেবল স্ত্রীজাতির মধ্যেই হইয়া থাকে। রজোধর্ম্ম সন্তানোৎপাদনের জন্য প্রকৃতির বিশেষ প্রেরণা। অর্থাৎ ঐ সময়ে স্ত্রী গর্ভধারণ-যোগ্যা হন, এ বিষয়ে উহা প্রকৃতির স্পষ্ট ইঙ্গিত। অতএব স্ত্রীজাতির মধ্যে ঐ সময়ে কামেচ্ছা বলবতী হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতির ইঙ্গিতে পরিচালিত পশুপক্ষিগণের গর্ভধারণ কালের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধ হইতে পারে। অতএব ঋতুকালীন নৈসর্গিক রতিস্পৃহাজনিত চাঞ্চল্য নিবারণের জন্য এমন কোন শুদ্ধ কেন্দ্রের প্রয়োজন, যে কেন্দ্রে ধর্ম্মভাবে রত হইয়া স্ত্রী পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইতে পারেন। পতি ভিন্ন এরূপ পবিত্র কেন্দ্র আর কি হইতে পারে? এজন্যই মহর্ষিগণ রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদানের বিধান করিয়াছেন।

কারণ ঐ নৈসর্গিক রতিপ্রেরণা-দশায় কেন্দ্র না পাইয়া স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে পারে এবং তাহার ফলে সতীধর্ম্মের হানি হইয়া স্ত্রীজীবন কলুষিত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্ত্রীজাতি প্রকৃতির অংশ হওয়ায় উহাদের মধ্যে বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয় ভাবই বিদ্যমান থাকে। অতএব রজস্বলা অবস্থায় ধার্ম্মিক কেন্দ্র না পাইলে অবিদ্যাভাবের প্রাকট্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এবং একবার অবিদ্যাভাবের দিকে চিত্ত রমমান হইলে উহাতে পুনরায় বিদ্যাভাবের বিকাশ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। অন্ততঃ ওরূপ চিত্তে ত্রিলোকপবিত্রকর পাতিব্রত্যধর্ম্মের সেরূপ অলৌকিক গাম্ভীর্য্য আর কদাপি থাকিতে পারে না। তাঁহার নিরঙ্কুশ, কেন্দ্রহীন প্রকৃতি বহুপুরুষে অন্তঃকরণের দ্বারা রমমান হইয়া অবশ্যই কিছু তরল হইয়া যায়। এইজন্যই মহর্ষিগণ স্ত্রীজাতির রক্ষার নিমিত্ত এত সাবধান হইয়াছেন। কিন্তু পুরুষের প্রকৃতি এরূপ হয় না। কারণ পুরুষের মধ্যে যৌবন-সুলভ সাধারণ রতিস্পৃহা থাকে। এবং উহার বিকাশও সাধারণ ভাবেই হইয়া থাকে। রজস্বলা দশার অসাধারণ ভাব উহাতে থাকে না এবং ওরূপ অসাধারণ প্রাকৃতিক ইঙ্গিতও পরিদৃষ্ট হয় না। একারণ স্ত্রীজাতির মত যৌবনভাববিকাশের সূচনা হইবা মাত্রই পুরুষের পরিণয় সংস্কার বিধানের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ পুরুষের মধ্যে জ্ঞানশক্তির আধিক্য থাকায় পুরুষ বিচারের দ্বারা কামাদিবৃত্তি সমূহকে সংযত করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীজাতির মধ্যে অজ্ঞানভাব অধিক হওয়ায় ঐরূপ অসাধারণ প্রাকৃতিক প্রেরণার সময়ে সংযম করা তাহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ যদি মনঃসংযম অসম্ভবই হইয়া উঠে তথাপি পুরুষের ব্যভিচার অপেক্ষা স্ত্রীর ব্যভিচারে সমাজের অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ পুরুষের ব্যভিচারের প্রভাব কেবল তাহার নিজের শরীর, মন ও আত্মার উপরই পড়িয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীর ব্যভিচারের দ্বারা বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হইয়া জাতি, সমাজ, বংশ সকলই নষ্ট করিয়া ফেলে। এই সকল কারণেই মহর্ষিগণ নারীদিগের নিমিত্ত রজোধর্ম্মের পূর্ব্বে এবং পুরুষগণের নিমিত্ত অধিক বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ এবং সংযমের পরে বিবাহের আজ্ঞা দিয়াছেন। এবং যদি সংযম করা পুরুষের পক্ষে

অসম্ভব হয় সেজন্যও মনু বলিয়াছেন—"ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা হইলে পুরুষ চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বেও বিবাহ করিতে পারে। এইরূপে সমগু আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কল্যাণকর বিচারের প্রতি অনুধাবন করিয়া দেখিলে পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের আজ্ঞা সর্ব্বথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যখন পাতিব্রত্য ভিন্ন স্ত্রীজাতির পক্ষে নিঃশ্রেয়সলাভ অসম্ভব এবং জীবনই বৃথা, তখন যে সকল কারণে জগন্মাতার অংশরূপিণী নারীগণের হৃদয়ে সতীধর্ম্মবিরোধী কোনরূপ ভাবের উন্মেষ হইতে পারে, তাহা দূর হইতেই অপসারিত করিয়া স্ত্রীজাতির হৃদয়নিহিত সাত্ত্বিক বিদ্যাভাবের বিকাশ করাই তাহাদের এবং আর্য্যজাতির পরম কল্যাণকর হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর্য্যশাস্ত্রে স্থূলশরীরকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধন রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। কারণ স্থূলশরীর নীরোগ ও স্বাস্থ্যযুক্ত না থাকিলে সাধনায় বাধা হইয়া থাকে।

বিশেষ বিধির সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ বিচার।

তজ্জন্য পাতিব্রত্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়েও দৃষ্টি রাখা সর্ব্বথা ধর্ম্মানুকূল হইবে। মাতাপিতার শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে সন্তানও অল্পায়ু এবং রুগ্নদেহ হইয়া থাকে। একারণ সন্তান কেবল ধার্ম্মিক না হইয়া যাহাতে সুস্থকলেবরও হইতে পারে তজ্জন্য উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। গর্ভাধান কালের বিষয়ে সুশ্রুত সংহিতায় লেখা আছে—

উনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং গর্ভস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

পঞ্চবিংশতি অপেক্ষা অল্পবয়স্ক পুরুষ যদি ষোড়শবর্ষ অপেক্ষা অল্পবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করে তবে গর্ভস্থ শিশুর হানি হইয়া থাকে। সে হয়ত জন্মিয়াই কিছুদিন পরে মরিয়া যায়, আর যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। এই হেতু অল্পবয়ষ্কা বালিকাতে গর্ভাধান করা উচিত নহে। এইরূপে সুশ্রুত গর্ভাধান কালের নির্ণয় করিয়াছেন। অনেকে এই শ্লোক দুইটির ভাবার্থ না বুঝিয়া ষোড়শবর্ষকেই কন্যার বিবাহকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত

করিয়াছেন। কিন্তু শ্লোক দুইটির অর্থ সম্বন্ধে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এখানে গর্ভাধানেরই কাল নির্ণয় করা হইয়াছে, বিবাহের কাল নির্ণয় করা হয় নাই। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, অল্প বয়সে বিবাহ এবং গর্ভাধান হইলে সন্তান দুর্ব্বল হয় এবং রজোধর্ম্মের পরে বিবাহ হইলে পাতিব্রত্যপালনে বাধা হয়, অতএব এই দুইএর সামঞ্জস্য কিরূপে বিহিত হইতে পারে, যাহাতে সন্তানও ভাল হয় এবং পাতিব্রত্যেরও হানি না হয়। সাধারণতঃ রজোদর্শনকালের বিষয়ে সুশ্রুতে লেখা আছে—

তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্কশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥

সাধারণতঃ দ্বাদশবর্ষের সময় রজোধর্ম্ম আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশৎবর্ষ আয়ু পূর্ণ হইলে পর জরার প্রভাবে রজোনিবৃত্তি হইয়া যায়। তজ্জন্য দ্বাদশবর্ষই রজোদর্শনের সাধারণ কাল। তবে কোন বিশেষ কারণে এই কালের অন্যথাও হইতে পারে। বৈদ্যশাস্ত্রে লেখা আছে বাতপ্রধান স্ত্রীশরীরে প্রায় দ্বাদশ বর্ষে রজোদর্শন এবং পিত্তপ্রধান স্ত্রীশরীরে প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষে রজোদর্শন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অসময়ে রজোদর্শনের আরও কতিপয় কারণ দেখা যায় যথা—অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ, উত্তেজক ঔষধসেবন, রতিবিষয়ক চিন্তা, কার্য্য বা বার্ত্তালাপ ইত্যাদি। এজন্য বিবাহের পূর্ব্বে পিতামাতার সদাই সাবধান হইয়া দেখা উচিত যে কুসঙ্গাদির প্রভাবে কন্যার ভিতরে উল্লিখিত কোনপ্রকার দোষ না আসিয়া পড়ে। তাহার পর যখন কন্যার মধ্যে স্ত্রীভাবের বিকাশের সূচনা হইতে আরম্ভ হয় তখনই যোগ্যপাত্রে তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু বিবাহ হওয়ার পরই স্ত্রীপুরুষের কামসম্বন্ধ হওয়া উচিত নহে। কারণ পাতিব্রত্যধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কন্যার চিত্তকে পতিরূপ কেন্দ্রের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইল, ইহার এই তাৎপর্য্য নহে যে সেই দিন হইতেই তাহার সহিত পাশবিক ব্যবহার আরম্ভ হইবে। শাস্ত্রে রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীগমনকে ব্রহ্মহত্যার মত পাপ-জনক বলা হইয়াছে, যথা স্মৃতি—

প্রাগ্ রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেয়াদ্ গত্বা পতত্যধঃ।
ব্যর্থীকারেণ শুক্রস্য ব্রহ্মহত্যামবপ্নুয়াৎ॥

রজোদর্শনের পূর্ব্বে কখনই স্ত্রীগমন করা উচিত নহে, করিলে পুরুষের পতন হয় এবং বৃথা শুক্রনাশে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করে। এজন্য রজোধর্ম্মের পূর্ব্বে স্ত্রীর সহিত কামসম্বন্ধ করা পতির কদাপি উচিত নহে। তাহার হৃদয়ে কামের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ প্রেমের ও সতীধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করা পতির কর্ত্তব্য। বাল্যকালে তাহার যে শিক্ষা হইয়াছিল সেই শিক্ষাকে আরও পরিমার্জ্জিত করা, এবং তাহার মধ্যে স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা, শ্রী, তপস্যা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, ভগবদ্‌ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ করা উচিত। এই সব করিলেই পতির সহধর্ম্মিণীর প্রতি নিজের ধর্ম্মানুকূল যথার্থ কর্ত্তব্যপালন করা হইবে। রজোদর্শনের পূর্ব্বে এইরূপ আচরণ করিয়া রজোদর্শনের পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত দম্পতির ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত। অবশ্য শাস্ত্রে ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন না করাকে ভ্রূণহত্যার তুল্য পাপ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে যথা ব্যাসসংহিতায়—

ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি ঋতৌ ভার্য্যাপরাঙ্মুখঃ।
সা ত্ববাপ্যান্যতো গর্ভং ত্যাজ্যা ভবতি পাপিনী॥

ঋতুকালে ভার্য্যাগমন না করিলে পুরুষের ভ্রূণহত্যার পাপ হয় এবং ঋতুমতী স্ত্রী যদি অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভোৎপাদন করে তবে সে পাপিনী ও ত্যাজ্যা হয়। সৃষ্টি বিস্তারের জন্য স্ত্রীজাতির ঋতুকাল স্বাভাবিকরূপে হইয়া থাকে, কারণ ঐ সময়ে পুরুষের শুক্র প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী গর্ভধারণ করিতে পারেন। এইহেতু ঋতুকালে স্ত্রীগমন না করিলে স্বাভাবিক সৃষ্টি ক্রিয়ার বাধা হওয়ায় পুরুষকে পাপস্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু ইহা সাধারণ গৃহস্থধর্ম্ম মাত্র। বিশেষ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যদি পতি পত্নী উভয়েই কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিতে পারেন তবে কোনই হানি বা অধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ প্রবৃত্তি সর্ব্বসাধারণের জন্য ধর্ম্ম হইলেও নিবৃত্তি সদাই আদরণীয়। এই নিবৃত্তিভাব অবলম্বন করিয়া যদি গৃহস্থ নরনারী কিছুদিন সংযম অভ্যাস করেন তবে অধর্ম্ম ত হইবেই না, অধিকন্তু সংযমের ফলে সন্তান সন্ততি উত্তম হইবে। একারণ প্রকৃতি-বৈচিত্র্য, শারীরিক অসম্পূর্ণতা অথবা অন্য কোন কারণে যদি অল্প বয়সেই স্ত্রীর রজোদর্শন হইয়া যায় তাহা হইলে যতদিন না তাহার শরীর গর্ভধারণের উপযুক্ত হয় ততদিন দম্পতির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করাই কর্ত্তব্য। এবং এইজন্যই সুশ্রুতাদি

শাস্ত্রে দ্বাদশ বর্ষে রজোদর্শনের সম্ভাবনা বর্ণন করিয়া ষোড়শ বর্ষে গর্ভাধানের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য ধারণের বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যায় যথা কাত্যায়নীয় গৃহ্যসূত্রে—

ত্রিরাত্রমক্ষারালবণাশিনৌ স্যাতামধঃ
শয়ীয়াতাং সংবৎসরং ন মিথুনমুপেয়াতাম্।

তিন রাত্রি দম্পতির লবণ বা অন্য প্রকার ক্ষার দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত নহে, ভূমিশয্যায় শয়ন করা উচিত এবং এক বর্ষ পর্য্যন্ত সংসর্গ করা উচিত নহে। এই প্রকার সংস্কার-কৌস্তভেও প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং তৌ দ্বাদশাহমথাপি বা।
শক্তিং বীক্ষ্য তথাব্দং বা চরন্তাং দম্পতী ব্রতম্॥
অক্ষারলবণাহারৌ ভবেতাং ভূতলে তথা।
শয়ীয়াতাং সমাবেশং ন কুর্য্যাতাং বধূবরৌ॥

বিবাহের পর তিন রাত্রি, বার দিন অথবা শক্তি থাকিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত দম্পতির ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা উচিত। ক্ষারদ্রব্য বা লবণ খাওয়া উচিত নহে। এইরূপ ব্রহ্মপুরাণেও লেখা আছে যথা—

কৃতে বিবাহে বর্ষৈস্তু বাস্তব্যং ব্রহ্মচারিণা।

বিবাহের পরে কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত দম্পতির ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করা উচিত। ভারতের কোন কোন প্রদেশে এখনও যে দ্বিরাগমন প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে উপর লিখিত শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালনেরই আভাস দেখা যায়। ঐ প্রথানুসারে বিবাহের পরে কিছুদিন বধূকে পিত্রালয়ে থাকিতে হয় এবং তাহার পর গর্ভধারণের সময় হইলে তবে বধূর দ্বিরাগমন করিয়া পতির সহিত সম্বন্ধ করান হয়। এই রীতির শাস্ত্রীয় সংস্কার আচরিত হইলে সকল দিকে কল্যাণ হইতে পারে। দম্পতির একস্থানে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করা কলিযুগে অতি কঠিন, একারণ উল্লিখিত প্রথার অবলম্বনে সুফল হইতে পারে। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল যে বিবাহ হইলে পরেও যতদিন স্ত্রীপুরুষের শরীর পূর্ণ না হয় ততদিন গর্ভাধান হওয়া কিছুতেই উচিত নহে।

(ক্রমশঃ)

সন্ধ্যারহস্য।

[শ্রীমৎস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী।]

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সূর্য্যোপস্থানের মন্ত্রের ঋষ্যাদি ("ঋতমিত্যাদি" মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, দেবতা ভাববৃত অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হইয়াছে) স্মরণ করিয়া উদীয়মান সূর্য্যদেবতার সন্ধ্যোক্তমন্ত্রের আবৃত্তি সহ নিম্নলিখিতরূপে চিন্তা করিতে হইবে। অগ্নির ন্যায় তেজসম্পন্ন সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত সূর্য্যদেব, যিনি ত্রিজগৎ প্রকাশক, যাঁহার রশ্মিসমূহ সপ্তাশ্বরূপে তাঁহারই জ্যোতির্ম্ময় রথে সংবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তিনিই মিত্র বরুণ ও অগ্নির নেত্রস্বরূপ বা তাঁহাদের প্রকাশক, এতদ্ভিন্ন তিনি সমস্ত দেবতাদেরই সমষ্টিস্বরূপ এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বজগতের আত্মাস্বরূপ, তিনিই নিজ অপূর্ব্ব ময়ূখমালাদ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছেন; যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সেই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং (জন্তূনাং) জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥ হৃদয়স্থশ্চ (হৃদ্যাকাশেচ) যো জীবঃ প্রাণিনাং হৃদিমন্দিরে (সাধকৈশ্চ উপাস্যতে)। স এবাদিত্যরূপেন বহির্নভসি রাজতে॥ পাষাণমণিরত্নানাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ। বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি॥"

এই আদিত্যান্তর্গত যে পরম জ্যোতিঃ সমস্তপ্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রাণিগণের হৃদয়স্থিত জীবাত্মাই আবার বহিরাকাশে আদিত্যরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। পাষাণ ও মণিরত্নাদির মধ্যেও তিনিই তেজোরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং বৃক্ষাদি ওষধি ও তৃণ সমূহের মধ্যে তিনিই রসরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ফলতঃ তিনিই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পরমাত্মা স্বরূপ। তাঁহার সেই তেজআধার অব্যয় ও অবিনাশী। তাহাই প্রাজ্ঞ ব্রহ্মতেজ বলিয়া জানিতে হইবে এবং তাহাই একাধারে ত্রিগুণাত্মক ত্রিগুণাত্মিকা আদ্যা মহাশক্তি তাঁহারই অন্তরের অন্তরে গায়ত্রীরূপে বিরাজিতা

রহিয়াছেন সেই কারণ গায়ত্রী উপাসনার পূর্ব্বে হৃদয়মধ্যে সেই মহাশক্তি আত্মার আধারভূত জ্যোতির্ম্ময় আদিত্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিরাট বহির্জ্যোতিকে লক্ষ্য করিয়া সূক্ষ্ম অন্তর্জ্যোতিকে উদ্বোধিত করাই সূর্য্যোপস্থানের প্রধান কার্য্য। পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে সুতরাং সাধকমাত্রেই এই অনুষ্ঠানে বিশেষ যত্নবান হইবেন। এই ক্রিয়া উপলক্ষে প্রথমে তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে তিনবার জলাঞ্জলি দিবে। পরে উভয় পদাগ্রে ভর দিয়া বা এক পায়ে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়াই মনে উক্তরূপে দাঁড়াইবার কল্পনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া (মধ্যাহ্নে উর্দ্ধবাহু হইয়া) কার্য্য করিবে।

অনন্তর ব্রহ্মাআদি দেবতা, আচার্য্য, ঋষি ও গুরুমণ্ডলী প্রভৃতির যথারীতি তর্পণ ও প্রণাম করিবার ব্যবস্থা আছে। স্ব স্ব বেদ ও গুরূপদেশ মত তাহাও সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

৭ম। গায়ত্রীর আবাহন, ধ্যান ও জপ। ইহাই সন্ধ্যোপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। প্রাতরাদিভেদে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রতিপাদ্য গায়ত্রীমন্ত্রের দেবতা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী ও তুরীয়া দেবতা। প্রত্যেক সন্ধ্যানুষ্ঠানের সময়ে তত্তৎ-সাময়িক গায়ত্রীর ধ্যান করিবার পূর্ব্বে প্রোক্ত সূর্য্যোপস্থানের পর সেই জ্যোতির্ম্ময় মহামণ্ডল মধ্য হইতে তদীয় মহাপ্রাণ বা মহাশক্তি আদ্যা ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী দেবীকে কৃতাঞ্জলি হইয়া অর্থাৎ আবাহনী মুদ্রায় আবাহন করিতে হয়।

উক্ত আবাহনমন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ—হে বরপ্রদে ভক্তজনকল্যাণকারিণি দেবি, হে অ+উ+ম এই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ অক্ষরত্রয়ময়ি, হে ব্রহ্মবাদিনি ব. বেদপ্রকাশিনি, হে ছন্দোজননী, হে সনাতনি বেদোদ্ভবে গায়ত্রী! মা কৃপা করিয়া একবার আগমন কর, আমার ধ্যানভূতা হও, আমার জপকালে একবার অচঞ্চলভাবে অন্তরে অধিষ্ঠান কর, তোমার অনন্ত ও অক্ষয় শক্তি সমষ্টির অতি ক্ষীণ অনুকণা মাত্রও আমাকে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দাও। আমার সভক্তি অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ কর। তুমি তোমার গানকর্ত্তা অর্থাৎ তোমার সেবকজনকে ত্রাণ করিয়া থাক। এই নিমিত্ত পূর্ব্বাচার্য্য ঋষি মুনিগণ তোমায় গায়ত্রীনামে অভিহিত করিয়াছেন। "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বমতঃ স্মৃতঃ।"

ইহার পর নিম্নলিখিতরূপে ন্যাস করিতে হইবে—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র সংযোগ দ্বারা হৃদয়দেশ স্পর্শ করিয়া "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ একত্র সংযোগে মস্তক স্পর্শ করিয়া "ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র বলিবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের পশ্চাদ্‌ভাগদ্বারা শিখা স্পর্শ করিয়া "ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্‌" বলিবে। দক্ষিণ করের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামবাহুমূল এবং বাম করের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিয়া "ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ" বলিবে। দক্ষিণ করের তর্জ্জনীর অগ্রভাগদ্বারা দক্ষিণ চক্ষু, মধ্যমার অগ্রভাগদ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মধ্যচক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু এবং অনামার অগ্রভাগদ্বারা বামচক্ষু স্পর্শ করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌" বলিবে। সর্ব্বশেষে "ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণকরের তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগের পিছন দিয়া বামকরের পৃষ্ঠ স্পর্শ করণানন্তর উক্ত অঙ্গুলিদ্বয়ের অগ্রভাগের সম্মুখ দিয়া বাম করতলে তালি দিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত সাধারণভাবে প্রাতরাদি সকল সন্ধ্যার অনুষ্ঠানেই ক্রিয়া করিতে হইবে। এইবার যে সময়ের যে ধ্যান ভিন্ন ভিন্ন বেদ বা তন্ত্রে উক্ত আছে সেই সময়ে সেই ধ্যানটী সম্প্রদায় ও অধিকারীভেদে করিতে হইবে। এস্থলে বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন যে ধ্যান অর্থে কেবল মুখে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করা নহে। ধ্যান অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর রহস্য অনুভবসহ একাগ্রভাবে তাঁহারই চিন্তা। পরিতাপের বিষয় অধুনা প্রায় কেহই ধ্যানের উদ্দেশ্য আদৌ অনুভব করেন না, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল "সাপের মন্ত্র পড়ার" মত বিড় বিড় করিয়া ধ্যান মন্ত্রটী অনর্থক উচ্চারণ করেন মাত্র। সেই জন্য তাহার কোন ফলই হয় না। সুতরাং সাধকের ধ্যেয় বস্তুর রহস্য ও অর্থবোধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মৎ-প্রণীত "সাধন প্রদীপে" গায়ত্রীর রহস্য বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তাহা দেখিয়া লইলে গায়ত্রী ধ্যানের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। তবে এস্থলে সাধনার্থীর অবগতির জন্য সংক্ষেপে প্রাতরাদি চতুর্ব্বিধ ধ্যানেরই সাধারণ মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাতর্ধ্যানে দেবী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী কুমারী বা বালিকা মূর্ত্তিতে রক্তবস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় উপবিষ্টা রহিয়াছেন। তাঁহার দেহকান্তি লোহিত আভা-বিশিষ্ট। তিনি সতত ঋগ্বেদযুতা বা সেই আদ্যা ব্রহ্মশক্তির কুমারী কণ্ঠেই

ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রথম সমদ্ভূত হইয়াছে ও নিত্য উচ্চারিত হইতেছে। সকল সাধকই সেই মহান্ প্রকৃতি তুরীয়া দেবীর ইচ্ছাশক্তি বা ব্রাহ্মীমূর্ত্তিকে এইরূপভাবেই ধ্যান করিবেন। বেদভেদে কেহ তাঁহাকে দ্বিভুজা কেহবা চতুর্ভুজারূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। যিনি যে বেদী তাঁহার পক্ষে সেইরূপভাবেই ধ্যান করা শাস্ত্রসঙ্গত। তবে সেই ইচ্ছাশক্তি বা ব্রাহ্মীমূর্ত্তি প্রাতর্গায়ত্রী দেবী সর্ব্বত্রই সৃজনরতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বাস্তবিক তিনিই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সবিতাশক্তি রজোবর্ণিনী। রজঃ বা স্ত্রী-আর্ত্তব রক্তবর্ণ অর্থাৎ লোহিত বর্ণ। এই রজঃ হইতেই রঞ্জন শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্ববিধ বর্ণই মূল রজঃ বা রক্তবর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বর্ণাবলীর সাধারণ নাম রং এবং তাহার ক্রিয়ামাত্রকে রঙ্গান বা রঙ্গান বলে। বিবিধবর্ণাত্মিকা চিত্রবিচিত্ররূপময়ী প্রকৃতির তেজস্তত্ত্বের মূলাধার সূর্য্যদেবের লোহিতাভ মূল রশ্মিসমূহ হইতেই প্রথমে প্রতিভাত হয়। সূর্য্যের তেজ বা তাপশক্তি তাঁহার রক্তবর্ণ রশ্মিগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনায় সূর্য্যের ঐ লোহিত রশ্মি-গুলিকেই উত্তাপক রশ্মি (Heating rays) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে তেজস্তত্ত্বের গুণকেই "রূপ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সমস্তই রূপময়ী প্রকৃতি। তাহা সূর্য্যের সবিতাদেবতার সেই লোহিত বর্ণ রজঃশক্তি হইতে জাত। জগতে রক্ত বা রজঃ অথবা রসের সাহায্যেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোনও বীজই রজঃ বা রসসংযুক্ত না হইলে আদৌ অঙ্কুরিত হয় না। পক্ষান্তরে সূর্য্যের প্রাতঃ রশ্মি যে স্থানে ভাল পতিত না হয়, সে স্থানে বৃক্ষলতাদিও ভাল জন্মে না। সুতরাং এই রক্ত বা রজঃ হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মযোনি আত্মার আদি রজঃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মী শক্তি রজোরূপে রজো-গুণান্বিতা হইয়া রক্তবর্ণে প্রতিদিন জগতে নূতন নূতন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছেন। বেদ ও আগম সেই কারণ ব্রহ্মের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তিশক্তি ব্রহ্মাণী রক্তবর্ণা সূর্য্যমণ্ডলাভ্যন্তরে অবস্থিতা বলিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সকল বেদ, তন্ত্র বা সম্প্রদায়ের সাধকগণই প্রাতঃকালে ব্রাহ্মীর এই অবিরোধ লোহিতাভ রজঃ-শক্তির ধ্যান করিবেন।

মধ্যাহ্ন ধ্যানে—বেদভেদে মধ্যাহ্ন গায়ত্রীর বর্ণ ও বাহন সম্বন্ধে বিভিন্ন

মত থাকিলেও সাধারণভাবে দেবী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, যুবতী, যজুর্ব্বেদযুতা বা যজুর্ব্বেদবক্ত্রী, ত্রিনেত্রা ও চতুর্ভুজা এইরূপভাবেই তাঁহার ধ্যান করিবার বিধি সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে। তাঁহার সেই মধ্য বা যুবতী কণ্ঠেই যজুর্ব্বেদ প্রথমে বিনির্গত হইয়াছিল বা নিত্য উচ্চারিত হইতেছে। দেখা যাইতেছে মার কুমারীকণ্ঠে প্রথমে ঋগ্বেদ, পরে তাহার দ্বিতীয় অবস্থায় যুবতী-কণ্ঠে যজুর্ব্বেদ সমুদ্ভূত হইয়াছে। গদ্য, পদ্য ও গীতময়ী ত্রয়ীশাস্ত্রের প্রথম বিকাশ গদ্যভাগ ঋক, তাহাই কুমারী বা বালিকা, দ্বিতীয় পদ্য অংশ যজুঃ বা যুবতী এবং শেষ গীত অংশ সাম প্রবীণা বা বৃদ্ধা, বেদ-জননী মায়ের এই ত্রিধা অবস্থায় তাহাই ক্রমশঃ পর পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। একথা সর্ব্ববেদ সম্মত। যিনি যে বেদী তাঁহার পক্ষে সেই বেদানুযায়ী ধ্যানই সঙ্গত তবে মধ্যাহ্ন-গায়ত্রী অধিকাংশ বেদ ও আগমের মতেই বৈষ্ণবী বা বিষ্ণুরূপিণী সুতরাং নীলবর্ণা পুষ্টিশক্তিসম্পন্না বা পালনরতা। পূর্ব্বে প্রাতর্গায়ত্রীরহস্যে বলা হইয়াছে দেবী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী রজোবর্ণিনী বা সূর্য্যের লোহিত-কিরণময়ী। দিবসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেবের সেই লোহিতাভ প্রাতঃ-কিরণ মন্দীভূত হইতে থাকে। সেই জন্য সেই লোহিত রশ্মির অল্পতার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের নীল রশ্মিগুলির ক্রমশঃ বিকাশ হয়। মধ্যাহ্নে তাহা পূর্ণ-শক্তিযুক্ত বা পুষ্টিক্রিয়া সমন্বিত হইয়া উঠে। জগতের যাহা কিছু পুষ্টি ক্রিয়া তাহা সবিতা দেবতার এই নীল রশ্মিগুলীর দ্বারা সংসাধিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোচনাজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সূর্য্যের এই নীল রশ্মিগুলিকে ক্রিয়াবান্ রশ্মি (Acting rays) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের মধ্যাহ্ন গায়ত্রীমাতা সবিতা দেবতার সেই স্থিতি, পুষ্টি বা পালনীশক্তি সমন্বিতা; সেই কারণ তিনি নীলবর্ণা পালনতৎপরা সুতরাং গরুড়বাহনা। সাধকগণ তাঁহাকে এইভাবেই নিত্য মধ্যাহ্নে ধ্যান করিবেন।

সায়াহ্নধ্যানে—দেবী তৃতীয়া শেষশক্তিসম্পন্না সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা বৃদ্ধা সামবেদসমাযুতা ও ত্রিনেত্রা। কেবল ঋগ্বেদ ব্যতীত সর্ব্বত্রই সায়াহ্ন গায়ত্রী দেবী বৃষভবাহিনী রুদ্রাণী ত্রিশূলডমরুকরা দ্বিভুজা ও শুক্লবর্ণারূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সাধকগণ সায়ংসন্ধ্যাকালে দেবীর এই রূপই ধ্যান করিয়া থাকেন। নিবৃত্তিভাবব্যঞ্জক অস্তগামী সূর্য্যের কিরণজাল

যে সংহারক বা লয়-শক্তি সম্পন্ন তাহা বোধ হয় সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন। কারণ সায়ংকালের সূর্য্যকিরণ প্রাতঃকালের ন্যায় উত্তেজনা বা প্রবৃত্তিপ্রদায়ক নহে। পতনোন্মুখ রৌদ্রের তেজ অল্প হইলেও তাহা যেন কেমন একপ্রকার তীব্র ও তৃপ্তিবিহীন। সেই রৌদ্রে অধিকক্ষণ বিচরণ করিলে শরীর যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। যে ভূমিতে কেবলমাত্র সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কিয়ৎক্ষণ সূর্য্যকিরণ পতিত হয় তথায় উদ্ভিদাদিও ভালরূপ জন্মে না। এ সমস্ত বিষয় প্রায় সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। দিবসের সেই অবসান সময়ে সর্ব্বজনবরেণ্য সবিতা দেবতার পীতাভ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিকীরণ সহ জগৎ-তৃপ্তিপ্রদ তাঁহার সেই পূর্ব্বতেজোরাশি জগতের মঙ্গলোদ্দেশে কিয়ৎক্ষণের জন্য পুনরায় সঙ্কর্ষণ করিয়া লন। তাঁহার সেই আকর্ষণ শক্তিই বিশ্বসংহাররূপিনী। পক্ষান্তরে গৌরবর্ণা পীতভ শ্বেত রশ্মি জ্যোতিঃপ্রকাশক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনায় সূর্য্যের এই পীতরশ্মি সমূহকে প্রকাশকরশ্মি (Illuminating) বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সাধকের প্রবৃত্তি ও স্থিতির প্রখরতেজের সংহার বা নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। সাধকবৃন্দ তাই সায়ংকালে পীতাভ শুভ্রজ্যোতিসমন্বিতা দেবী জ্ঞানপ্রকাশক মাহেশ্বরী বা গৌরীশক্তির অথবা জ্ঞানশক্তিপ্রকাশিনী মহাসরস্বতীর ধ্যান করিবেন। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী ত্রিধা গায়ত্রী দেবী যথাক্রমে রক্তবর্ণা প্রবৃত্তি, নীলবর্ণা স্থিতি এবং পীতাভশ্বেতবর্ণা নিবৃত্তি শক্তিসমন্বিতারূপে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে বিভিন্ন মহাশক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনা করা সাধকমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ কার্য্য-প্রতিবন্ধকতা বশতঃ কোন সময় অসমর্থ হইলেও তত্তৎসময়ে মুহূর্ত্তমাত্রের জন্যও একাগ্রভাবে সেই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী রক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাত্মিকা দেবীর চিন্তামাত্র করিবেন। ইহার দ্বারাও নিঃসন্দেহ সাধকের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। এই পর্য্যন্ত সকল সাধকই নিত্যক্রিয়ারূপে সন্ধ্যার ত্রিকাল-উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সঙ্গে গায়ত্রী জপ করিবার ব্যবস্থা আছে। নিশা বা মহাসন্ধ্যার ধ্যান বা উপাসনা সকলের পক্ষে সাধারণ নহে। তাহা শ্রীগুরুর কৃপায় অধিকারী হইলেই নিত্যক্রিয়ার মধ্যে কর্ত্তব্য, তাহা পরে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইবে।

গায়ত্রীজপের প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে সমর্থ হইলে গায়ত্রীর কবচ ও গায়ত্রীর শাপোদ্ধার পাঠকরা কর্ত্তব্য। প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিবার ব্যবস্থা কোন কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ উপবেশন করিয়াই জপবিধি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এবং তাহাদ্বারা সাধকের জপ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়

বলিয়া মনে হয়। সায়াহ্নে ও নিশায় উপবেশন করিয়া জপের ব্যবস্থা সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রাতঃকালে উত্তানকরে অর্থাৎ হস্ত চিত করিয়া, মধ্যাহ্নকালে হস্ত তির্য্যক্ অর্থাৎ বক্র করিয়া এবং সায়ংকালে ও নিশায় হস্ত অধোমুখ অর্থাৎ উপুর করিয়া জপ করিবে। ১০ দশ বার ১০৮ বার অথবা ১০০৮ বার সাধক যথাশক্তি জপ করিবেন। এই সময়ে জপবিধি অনুসারে মন্ত্রাত্মক ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত সংযত ও গুরূপদেশক্রমে প্রাণ সংযমও করিতে হইবে। গায়ত্রীমন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে :—যিনি ভূর্ভুবাদি লোক সমূহ মধ্যে সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে ব্যাপ্ত থাকিয়া ব্রহ্মতেজের প্রাণভূত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী শক্তিত্রয়ের অভিন্ন আধারস্বরূপ সবিতাদেব আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত রহিয়াছেন, যিনি আমাদিগের এই ভবদুঃখ নাশের কারণ বলিয়া উপাস্য, তাঁহাকে আমি চিন্তা করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করুন। গায়ত্রীর সঙ্গে প্রথমে প্রণব ও ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এবং অন্তেও প্রণবযুক্ত করিয়া গায়ত্রী মহা-মন্ত্রের বা জপের বিধান হইয়াছে। নতুবা উক্ত প্রণব ও ব্যাহৃতি ব্যতীত উহা "তৎ সবিতু" হইতে "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট। উহাই সামগানে স্বর-সহযোগে গীত হয়।

ইহার পর গায়ত্রী বিসর্জ্জন—মন্ত্রার্থ যথা,—হে মহেশবদনোৎপন্না, হে বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা, হে ব্রহ্মাকর্তৃক সমনুজ্ঞাতা উপাশকগণের কল্যাণময়ী দেবী এখন যথাস্থানে সুখে গমন কর এই বলিয়া এক গণ্ডুষ জল প্রদান করিবে।"অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ।"

৮ম। আত্মরক্ষা—অর্থাৎ আত্মাকে স্থিত করা। ইহা লয়যোগের বিশেষ ক্রিয়া, ইহাতে অগ্নির আরাধনা করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ দীপজ অগ্নি ইহার উপাস্য নহে। শ্রীমন্মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ। তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতো হচ্যুতঃ। একোহি সোমমধ্যস্থোহমৃতং জ্যোতিঃস্বরূপকং। হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ॥" অর্থাৎ রবির মধ্যে সোম, সোমের মধ্যে হুতাশন, তেজ বা অগ্নি, তাহার মধ্যে সত্যস্বরূপ চৈতন্য। চেতনাত্ম স্বরূপ পরব্রহ্ম বা ব্রহ্মাগ্নি, তাহা অরণিসম্ভূত। দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতে অতি গুহ্য নবচক্রান্তর্গত মনশ্চক্রের রবি বা সূর্য্যপার্শ্বে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে অরণিযোগমুদ্রাসম্ভূত অগ্নিসহযোগে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ক্রিয়া সাধক গুরুমুখে স্পষ্টতরভাবে অবগত হইবেন। এস্থলে অতি সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে সাধকের যোগ হৃদয় আজ্ঞাচক্র ও মনশ্চক্রের মধ্যে চিত্তের অবিরত আবর্ত্তন চিন্তা করিতে হইবে।

যখন তাহাতে স্থিরাগ্নি রক্ষিত হইবে অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চিত্ত একাগ্র হইয়া অনাহত শব্দগত হইবে, তখনই চেতনাত্মস্বরূপ বা পরব্রহ্মের নাদময় আভাস উপলব্ধি হইবে। অথবা তখন চিত্ত অবিচলিতভাবে অবস্থিত হইয়া সেই চেতনাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহাই সাধকের সোঽহমস্মি ভাব। ইহাই আত্মরক্ষার গূঢ়তাৎপর্য্য। স্থিরভাবে গুরুপাদুকা চিন্তার পর এই বিষয় চিন্তা করিতে ক্রমে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে। এই ক্রিয়াটী প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা উপযুক্ত গুরুদেবের শিক্ষার অভাবে কেবল পুঁথি দেখিয়া সন্ধ্যামন্ত্র কণ্ঠস্থ করা হয় বলিয়া কেবল মাত্র দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্পর্শ করিয়া যেন সন্ধ্যোপাসনায় অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া "জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র কেবল পাঠ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ—এই মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ইহার ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, ইহার দেবতা অগ্নিদেব, আত্মরক্ষার জন্য জপে প্রয়োগ হইয়াছে। সেই মন্ত্রাত্মক সোমযজ্ঞাধীশ অগ্নিদেব আমাদিগের সম্বন্ধে শত্রু বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যাক্তিদিগের ধনাদি অর্থাৎ পাপপ্রবৃত্তিরূপ আসুরী সম্পদসমূহ ভস্মীভূত করুন; এবং সমুদ্রগামী নাবিকদিগের ন্যায় আমাদিগের এই ভবদুঃখ সাগরের কর্ণধার হইয়া আমাদিগকে এই ভীষণ পাপপ্রবাহ হইতে মুক্ত করুন; অর্থাৎ এই পার্থিব চিন্তাসমূহ হইতে মুক্ত করিয়া আমায় তোমার সহিত মিলাইয়া লউন। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর এই মন্ত্রচিন্তাসহ মন্ত্রাত্মক দেবতার নিকট করুণভাবে প্রার্থনা করিবেন।

৯ম। রুদ্রোপস্থান ইহা সত্যস্বরূপ পরম পুরুষের বা ব্রহ্মের শেষ বিশ্বরূপ তমোগুণাশ্রিত রুদ্রের প্রণাম। এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপে—"ঋতমিত্যাদি" মন্ত্রের ঋষি কালাগ্নি রুদ্র, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা রুদ্রদেব, রুদ্রের উপাসনায় বিনিয়োগ হইয়াছে। যিনি ঋত বা একাক্ষরময়, যিনি সত্য বা অনন্ত জ্ঞানময় পরব্রহ্ম, যিনি একাধারে কৃষ্ণপিঙ্গলাত্মক অর্থাৎ তমোময় সংহার মূর্ত্তিতে রোষ-বিকটভাবে অর্দ্ধনারীশ্বর এবং যিনি ঊর্দ্ধলিঙ্গ বা ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ সৃষ্টি বীর্য্য নিরোধ করিয়াছেন, তিনি বিরূপাক্ষ বা ত্রিনয়নবিশিষ্ট ভূতাদি ত্রিকালদৃষ্টিসম্পন্ন সেই বিশ্বরূপকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও বরুণকে জলাঞ্জলি দিয়া তৃপ্ত করিতেছি।

১০ম সূর্য্যার্ঘ্য—ইহা ব্রহ্মবিভূতি সূর্য্যদেবের শেষ অভিনন্দন বা সর্ব্বপাপঘ্ন ভগবান্ সূর্য্যের দিবাভাগের অন্তিম অর্চ্চনা। অর্ঘ্যপ্রদানমন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ "হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব! তুমি তেজ ও দীপ্তিমান্ বিশ্বব্যাপী তেজের আধার স্বরূপ জগতের কর্ত্তা পবিত্র ও কর্ম্ম প্রবর্ত্তক, তোমাকে প্রণাম করি।" "ওঁ সূর্য্য ভট্টারকায় নমঃ" মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে তাহার পর প্রণাম—জবা-পুষ্পেরন্যায় রক্তবর্ণ কশ্যপতনয় অতিশয় দীপ্তিশালী অন্ধকারনাশক সর্ব্বপাপ-বিনাশক দিবাকরকে প্রণাম করি।

জন্মান্তর-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জীবের গতি।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

যেকালে গতি প্রাপ্ত হইলে অনাবৃত্তি এবং যেকালে পুনরাবৃত্তি হয় তাহা নিম্নে বলা হইতেছে। অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা, জ্যোতিরভিমানিনী দেবতা, দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষদেবতা এবং উত্তরায়ণ দেবতা—এই সকল দেবতার লোক অতিক্রম করিয়া যে ঊর্দ্ধগতি লাভ হয় তাহাকে দেবযান গতি বলে। এই গতি প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তিনি ক্রমশঃ সপ্তমলোকে যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। আর যাহা দ্বিতীয় গতি পিতৃযান বা ধূমযান নামে প্রসিদ্ধ, তাহার দ্বারা নীত হইলে জীবকে ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষদেবতা এবং দক্ষিণায়ণদেবতাগণের লোক অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছিতে হয়। ধূমযান গতি-প্রাপ্ত যোগীকে চন্দ্রলোকে ভোগসমাপ্তির পর আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। অনাবৃত্তি ও আবৃত্তিদায়িনী শুক্লা ও কৃষ্ণানাম্নী এই দুইটি গতি বিশ্বজগতে চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে প্রথমতঃ ধূমযানগতির বিষয়ে বর্ণন করিয়া পরে দেবযানগতির বিষয়ে বর্ণন করা হইবে। ধূমযানগতি সম্বন্ধে ছান্দোগ্যোপনিষদে নিম্নলিখিত বর্ণন পাওয়া যায়—

অথ য ইমে-গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপর-পক্ষাদ্যান্ ষড় দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদি সকাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলে গৃহস্থগণ মৃত্যুর পর ধূমযান অর্থাৎ পিতৃযান গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই গতি অনুসারে ক্রমশঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিদেবতা, কৃষ্ণপক্ষদেবতা, মাসদেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতার লোক অতিক্রম করত তাঁহারা সংবৎসরাভিমানিনী দেবতার লোক প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে পিতৃলোক ও আকাশের ভিতর দিয়া যাইয়া পরিশেষে তাঁহারা চন্দ্রদেবতার লোক প্রাপ্ত হন। তথায় চন্দ্রই রাজা। এই লোকে জলময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া জীব, তত্রত্য দেবতাগণের ভোগ অর্থাৎ বিলাসের বস্তু হন। তিনি দেবতাগণের সহিত বিবিধ আনন্দ উপভোগ করেন। জীব কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত এইরূপ চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পরে যে পথে উর্দ্ধগতি হইয়াছিল, সেই পথেই পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে। শাস্ত্রে যে স্বর্গাদি প্রাপ্তির কথা বর্ণিত আছে এই ধূমযান গতি উহারই অন্তর্গত। এই জন্যই শ্রুতিতে স্বর্গ সম্বন্ধে লেখা আছে—

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতোঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বাবিশন্তি।

স্বর্গে পুণ্যফল ভোগ করিয়া পুনরায় নরলোক বা আরও হীনলোকে জীবের জন্ম হয়। গীতায়ও আছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাধিকারী পুরুষগণ সকাম যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমপান করতঃ নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। এই পুণ্যময় স্বর্গলোকে তাঁহাদের দিব্যভোগ সমূহ লাভ হয়। এইরূপে বিশাল স্বর্গলোকে বিবিধ ভোগের সহিত অনেক দিন বাস করিবার পর পুণ্যশেষে তাঁহারা আবার মৃত্যুলোকে প্রবেশ করেন। ইহাই পুনরাবৃত্তিপ্রদ ধূমযান গতি। এই গতির দ্বারা ভূলোক হইতে কেবল স্বর্গলোকেই জীব যায় না, প্রত্যুত পিতৃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন এই প্রকারে উর্দ্ধপঞ্চম লোক পর্য্যন্ত জীবের গতি হইতে পারে। এবং

এই পাঁচ লোকেই বিচিত্র প্রকার ভোগলাভের পর কর্ম্মক্ষয়ে জীবের আবার সংসারে জন্ম হয়। লোক কি, এই বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক বিচার পাওয়া যায়। এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ লোকের স্থিতি হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণন করা হইয়াছে। কেন্দ্র-শক্তিস্বরূপ একটি সূর্য্য এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী যাহারা সূর্য্যের আলোকেই আলোকিত এবং সূর্য্যের মহাকর্ষণেই কেন্দ্রানুগমন করে, এই সমস্তকে লইয়াই একটি সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড। এই স্থূল-সূক্ষ্ম সৃষ্টিময় ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মহর্ষিগণ উহাদের নাম চতুর্দ্দশ ভুবন রাখিয়াছেন। আমাদের এই মৃত্যুলোক ও অন্যান্য গ্রহগুলিই স্থূললোক। যেমন আমাদের স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্মশরীরও আছে সেই প্রকার প্রত্যেক ভুবনের স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ রূপই আছে। সচরাচর চতুর্দ্দশ লোক বলিতে সূক্ষ্ম লোকই বুঝায়। তবে প্রত্যেক সূক্ষ্ম লোকের সহিত সমভাবাপন্ন স্থূল লোকও আছে। উহা উপর্যুক্ত গ্রহোপগ্রহাদির মধ্যে বিন্যস্ত। স্থূল লোকের দেশাবচ্ছিন্নতা থাকিলেও সূক্ষ্মের তদ্রূপ নাই। এজন্য সূক্ষ্ম চতুর্দ্দশ লোক একের পরে দ্বিতীয় এরূপভাবে সজ্জিত না হইয়া একের মধ্যে সূক্ষ্মতররূপে দ্বিতীয়, এইভাবে সজ্জিত আছে। জীব কর্ম্মবশে ঐ সকল লোকে গিয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে ভোগানুকূল সাত্ত্বিক কর্ম্মের দ্বারা সূক্ষ্ম উর্দ্ধলোক সমূহে এবং রাজসিক কর্ম্মের দ্বারা সূক্ষ্ম অধোলোক সমূহে জীবের গতি হইয়া থাকে। এরূপ স্থূলশরীরে ভোগযোগ্য সাত্ত্বিক কর্ম্মের দ্বারা তত্তৎ স্থূল উর্দ্ধলোকে এবং প্রবল রাজসিক কর্ম্মের দ্বারা তত্তৎ স্থূল অধোলোক সমূহে জীবের গতি হইয়া থাকে। স্থূললোক গুলি পাঞ্চভৌতিক হইলেও প্রত্যেক লোকে কোন না কোন তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে যেমন চন্দ্রলোকে জলতত্ত্বের প্রাধান্য, স্বর্গলোকে তেজস্তত্ত্বের প্রাধান্য ইত্যাদি। এজন্য ঐ সকল লোকপ্রাপ্ত জীবগণের শরীরও ঐরূপ তত্ত্ব বিশেষের প্রাধান্যে গঠিত হয়। উপর পঞ্চম লোক অর্থাৎ জনলোক পর্য্যন্ত ধূমযান গতি। এজন্য পঞ্চম লোক পর্য্যন্ত লোক সমূহ হইতে ভোগান্তে সংসারে নবীন কর্ম্ম সংগ্রহের জন্য জীবকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। দেবযান গতির দ্বারা ষষ্ঠ লোক বা সপ্তম লোকে গতি হইয়া থাকে। উহা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বর্গাদি লোকের যে বিচিত্র বর্ণন আছে তাহা দ্বারা পিতৃলোক এবং এই সকল লোক বুঝিতে হইবে। এই সকল লোকে সূক্ষ্ম শরীরে

সূক্ষ্মভাবে সুখভোগ হইয়া থাকে। যথার্থপক্ষে আমাদের স্থূল মৃত্যুলোক ব্যতীত প্রেতলোক, নরকলোক, পিতৃলোক, ভুবঃ আদি ছয় উর্দ্ধলোক এবং অতল আদি সাত অধোলোক সকলই সূক্ষ্মলোক। ঐ সকল সূক্ষ্ম লোকের ভোগ অতি বিচিত্র।

যথা মহাভারতে—

সুসুখঃ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা।
ক্ষুৎপিপাসাশ্রমো নাস্তি ন জরা ন চ পাতকম্।

তথায় শীতল স্নিগ্ধ পবন প্রবাহিত হয়, সুগন্ধে দশদিক আমোদিত থাকে, ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ থাকে না, রোগ বা বার্দ্ধক্য থাকে না, নীরোগ চিরযৌবন লাভ করত স্বর্গবাসী জীব আনন্দে কাল কাটাইতে পারে। পরন্তু ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সুখদুঃখমোহময়ী হওয়ায় স্বর্গের অনুপম সুখও দুঃখলবলেশ-বিহীন নহে। স্বর্গীয় সুখের সঙ্গে তাপদুঃখ খুবই বেশি থাকে। সুখের সময়ে অধিকতর সুখভোগীকে দেখিয়া ঈর্ষ্যাজন্য যে দুঃখের উদয় হয় তাহাকে তাপ দুঃখ বলে। যে পুণ্যকর্ম্ম সমূহের বিপাক বলে স্বর্গলাভ হয়, তাহা প্রত্যেক স্বর্গবাসীর একরূপ নহে, উহার মধ্যে তারতম্য থাকে। এই তারতম্য হেতু দিব্য সুখভোগের মধ্যেও তারতম্য হয়। এজন্য অধিক সুখপ্রাপ্ত স্বর্গবাসীকে দেখিয়া তদপেক্ষা অল্প-সুখ-প্রাপ্ত স্বর্গবাসীর হৃদয়ে ঈর্ষ্যার তুষানল দিবানিশি প্রজ্জ্বলিত থাকে। আর সংসারে সুখভোগ কম, এজন্য তাপদুঃখও কম, কিন্তু স্বর্গবাসীর তীব্র সুখভোগ প্রবণ চিত্তে তাপদুঃখের মর্ম্মব্যথা নিদারুণ কষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার দুঃখ স্বর্গসুখের সহিত অবশ্যম্ভাবীরূপে সম্বদ্ধ থাকে।

যথা গরুড় পুরাণে—

স্বর্গেঽপি দুঃখমতুলং যদারোহণকালতঃ।
প্রভৃত্যহং পতিষ্যামি ইত্যেতদ্ধৃদি বর্ত্ততে॥
নারকাংশ্চৈব সংপ্রেক্ষ্য মহদ্দুঃখমবাপ্যতে।
এবং গতিমহং গন্তেত্যহর্নিশমনির্বৃতঃ॥

স্বর্গসুখের মধ্যেও দুঃখের সীমা নাই, কারণ স্বর্গারোহণের দিন হইতেই পতনের চিন্তা স্বর্গীয় জীবের হৃদয়ে অহরহ জাগরূক থাকে। নরকস্থ জীবগণকে স্বর্গ হইতে দেখিয়াও মহান্ দুঃখের উদয় হয়। কারণ স্বর্গভোগান্তে না জানি আমারও বুঝি এই গতি হইতে পারে, এতাদৃশ দুশ্চিন্তা স্বর্গবাসীর হৃদয়কে নিশিদিন

উদ্বেলিত করে। যাহার জীবনে যত বেশি সুখ, তাহার হৃদয়ে দুঃখের আঘাতও তত তীব্রভাবে লাগিয়া থাকে। এজন্য স্বর্গসুখ ভোগাবসানে পতনের চিন্তা এবং নরক যাতনার আশঙ্কা স্বর্গবাসীর হৃদয়ে দুঃখের শেল বিদ্ধ করিয়া থাকে এবং অমরপুরীর অমৃতের সঙ্গে তীব্র হলাহল মিশ্রিত করিয়া দেয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে স্বর্গের সুখদুঃখ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

উপরিষ্টাচ্চ স্বর্লোকো যোঽয়ং স্বরিতি সংজ্ঞিতঃ।
ঊর্দ্ধগঃ সৎপথঃ শশ্বদ্দেবযানচরো মুনে॥
নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ।
নানৃতা নাস্তিকাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মুদ্গল॥
ধর্ম্মাত্মানো জিতাত্মানঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ।
দানধর্ম্মরতা মর্ত্ত্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ॥
তত্র গচ্ছন্তি ধর্ম্মাগ্র্যং কৃত্বা শমদমাত্মকম্।
লোকান্ পুণ্যকৃতাং ব্রহ্মন্ সদ্ভিরাচরিতান্ নৃভিঃ॥
দেবাঃ সাধ্যাস্তথা বিশ্বে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
যামা ধামাশ্চ মৌদ্গল্য গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা॥
এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ।
ভাস্বন্তঃ কামসম্পন্না লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ॥
ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি যোজনানি হিরণ্ময়ঃ।
মেরুঃ পর্ব্বতরাড্ যত্র দেবোদ্যানানি মুদ্গল॥
নন্দনাদীনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন শীতোষ্ণে ভয়ং তথা॥
বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
মনোজ্ঞাঃ সর্ব্বতোগন্ধাঃ সুখস্পর্শশ্চ সর্ব্বশঃ॥
শব্দাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহ্যা সর্ব্বতস্তত্র বৈ মুনে।
ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে॥
ঈদৃশঃ স মুনে লোকঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকঃ।
সুকৃতৈস্তত্র পুরুষাঃ সম্ভবন্ত্যাত্মকর্ম্মভিঃ॥

তৈজসানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপন্নতাম্।
কর্ম্মজান্যেব মৌদ্গল্য ন মাতৃপিতৃজান্যুত॥
ন সংস্বেদো ন দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব বা।
তেষাং ন চ রজো বস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে॥
ন ম্লায়ন্তি স্রজস্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মন্নেবংবিধৈশ্চ তে॥
ঈর্ষ্যাশোকক্লমাপেতা মোহমাৎসর্য্যবর্জ্জিতাঃ।
সুখস্বর্গজিতস্তত্র বর্ত্তয়ন্তে মহামুনে॥
তেষাং তথাবিধানাং তু লোকানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
উপর্য্যুপরি লোকস্থ লোকা দিব্যগুণান্বিতাঃ॥
পুরস্তাদ্ ব্রাহ্মণাস্তত্র লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ।
যত্র যান্ত্যৃষয়ো ব্রহ্মন্ পূতাঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ।
ঋভবো নাম তত্রান্যে দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষাং লোকাৎ পরতরে যান্ যজন্তীহ দেবতাঃ॥
স্বয়ম্প্রভাস্তে ভাস্বন্তো লোকাঃ কামদুঘাঃ পরে।
ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বর্য্যমৎসরঃ॥
ন বর্ত্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ।
তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্ত্তয়ঃ॥
ন সুখে সুখকামাস্তে দেবদেবাঃ সনাতনাঃ।
ন কল্পপরিবর্ত্তেষু পরিবর্ত্তন্তি তে তথা॥
জরা মৃত্যুঃ কুতস্তেষাং হর্ষঃ প্রীতিঃ সুখং ন চ।
ন দুঃখং ন সুখং চাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মুনে॥
দেবতানাঞ্চ মৌদ্গল্য কাঙ্খিতা সা গতিঃ পরা।
দুষ্প্রাপ্যা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদিমে দেবা যেষাং লোকা মনীষিভিঃ।
গম্যন্তে নিয়মৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দ্দানৈর্ব্বা বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত, তথায় নিরন্তর দেবযান সকল গমনাগমন করিতেছে। সে স্থানে তপোবলবিহীন, যজ্ঞানুষ্ঠানবিরহিত মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা

গমন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মৎসর, ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং সমরপ্রিয় মহাবীর, তাঁহারাই শমদমমূলক অনুত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সৎপুরুষগণ-নিষেবিত এই পবিত্র লোক প্রাপ্ত হন। দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ইহাঁদের কামফলপ্রদ অনেকানেক লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত হিরণ্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেকানেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে। সেই স্থান পুণ্যবান্ লোকদিগের বিহারভূমি। তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোনপ্রকার অশুভ অনুভূত হয় না। সর্ব্বদাই পরম রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দমন্দ বেগে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। শ্রুতিসুখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মন মোহিত করিতেছে। তথায় শোক, তাপ, জরা ও আয়াসের লেশ নাই। ইহলোকে স্বোপার্জ্জিত পুণ্যফলে মনুষ্য এইরূপ সর্ব্বসুখাস্পদ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথায় গমন করিলে কর্ম্মজ, তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয়। পিতৃমাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। তথায় স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজঃ প্রভৃতি বস্তু দ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন হয় না। তত্রত্য লোকদিগের দিব্যগন্ধযুক্ত মনোরম মাল্যদাম ম্লান হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা বিমান দ্বারা গমনাগমন করেন। ঈর্ষা, শোক ও শ্রমজনিত ক্লেশের লেশও অনুভব করেন না এবং নির্ম্মৎসর ও মোহবিবর্জ্জিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করেন। ঈদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আরও লোকসমূহ আছে। এইরূপে অশেষ গুণসম্পন্ন অনেকানেক দিব্যলোক উপর্য্যুপরি অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বদিকে শুভাস্পদ তেজোময় ব্রহ্মলোক অবস্থিত। তথায় পবিত্রস্বভাব ঋষিগণ স্ব স্ব শুভকর্ম্মফলে গমন করেন। তথায় ঋভু নামে দেবগণ আছেন। তাঁহাদিগের লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবতারাও তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রভাসম্পন্ন, সকলের অভীষ্ট ফলপ্রদাতা, তাঁহাদের স্ত্রীজন্য তাপ নাই এবং ঐশ্বর্য্যাকৃত মাৎসর্য্যও নাই। তাঁহারা আহুতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং অমৃত ভোজন করেন না। তাঁহাদের শরীর দিব্য ও অনির্ব্বচনীয়, কোনপ্রকার আকৃতি বা মূর্ত্তি নাই। তাঁহারা দেবদেব ও সনাতন, তাঁহাদের সুখকামনা নাই। কল্প পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হন না, নিরন্তর একভাবেই থাকেন। তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ

নাই। এই দুষ্প্রাপ্য পরম গতি দেবতাদিগেরও অভিলষনীয়, ইহা বিষয়বাসনা-নিরত জনগণের অগম্য। মনীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক দানাদি দ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্মলোকের বিষয় দেবযানগতির অন্তর্ভূত, এজন্য ইহার বিষয়ে পরে বলা হইবে। এখন স্বর্গের দুঃখ সম্বন্ধে বর্ণন করা হইতেছে। যথা মহাভারতের বনপর্ব্বে—

কৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি।
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে॥
সোঽত্র দোষো মম মতস্তস্যান্তে পতনং চ যৎ।
সুখব্যাপ্তমনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদ্গল॥
অসন্তোষঃ পরীতাপো দৃষ্ট্বা দীপ্ততরাঃ শ্রিয়ঃ।
যদ্ভবত্যধরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্॥
সংজ্ঞা মোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধর্ষণম্।
প্রম্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতিষোর্ভয়ম্॥

লোকে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে, কিন্তু অন্য কোনরূপ নবীন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় যে অধঃপতন হয়, ইহা স্বর্গসুখের দোষ। কারণ বহুদিবস সুখে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতি লাভ করিলে তাহা সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। স্বর্গগত অন্য ব্যক্তির অধিকতর পুণ্যার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া অমরলোকস্থ জনগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে ইহা অপেক্ষা ক্লেশজনক আর কি আছে? কণ্ঠ বিলম্বিত মাল্য ম্লান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতনকালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত হন ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায়। এই সকল কারণেই বিচারবান্ জ্ঞানী পুরুষগণ স্বর্গসুখকেও পরিণামদুঃখপ্রদ হওয়ায় পরিত্যাজ্য ও তুচ্ছীকরণের যোগ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপে পূর্ব্ব বর্ণনানুসারে চন্দ্রলোকে (পিতৃলোক) সুখ ভোগ করিবার পর কর্ম্মাবসানে জীবের চন্দ্রলোকগত জলময় শরীর অগ্নিসংযোগে ঘৃতকাঠিন্য-বিলয়ের ন্যায় অচিরেই বিগলিত হয়। তখন জীব আর চন্দ্রলোকে ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। সে যে পথে চন্দ্রলোকে গিয়াছিল সেই পথেই আবার তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

[ক্রমশঃ]

তন্ময়ভাবের দৃষ্টান্ত ভগবদ্ গুণগান-পূর্ণ পুরাণ শাস্ত্রে বহুধা পরিলক্ষিত হইলেও হরিহরের তন্ময় ভাবেই ইহার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হরি ও হরের যে পারস্পরিক অপূর্ব্ব আসক্তি তাহা এই তন্ময়াসক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীহরি নিজমুখে লক্ষ্মীদেবীকে বলিতেছেন- "আমি দিবানিশি আশুতোষের ধ্যানে নিমগ্ন থাকি, আর আশুতোষও আমার চিন্তনেই তন্ময় হইয়া থাকেন; শঙ্কর আমার প্রাণ স্বরূপ এবং আমিও শঙ্করের প্রাণস্বরূপ। পরস্পর তন্ময় ভাবাপন্ন আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই *"। তন্ময়াসক্তির এই অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ কান্তাসক্তির উৎকৃষ্ট দশায় ব্রজবাসিনী গোপিনীদিগের মধ্যেও কখনও কখনও হইত। যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপিনীগণকে অভিমানিনী মনে করিয়া তাঁহাদের অভিমান দূর করিবার জন্য রাসলীলা করিতে করিতে গোপিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছিলেন, তখন গোপিনীগণ কি প্রকার শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ বর্ণন আছে যে, "গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের

---

* শৃণু কান্তে প্রবক্ষ্যামি যং ধ্যায়ামি সুরোত্তমম্।
আশুতোষং মহেশানং গিরিজাবল্লভং হৃদি ॥
কদাচিদ্দেব-দেবো মাং ধ্যায়ত্যমিতবিক্রমঃ।
ধ্যায়াম্যহঞ্চ দেবেশং শঙ্করং ত্রিপুরান্তকম্ ॥
শিবস্যাহং প্রিয়প্রাণঃ শঙ্করস্তু তথা মমঃ।
উভয়োরন্তরং নাস্তি মিথঃ সংসক্তচেতসোঃ ॥

বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ তন্ময় অবস্থাতেই তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সকল করিতে লাগিল! তাহাদের মধ্যে কেহ পুতনা হইল এবং আর এক গোপিনী শ্রীকৃষ্ণ হইয়া তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিল; কোন এক গোপিনী গোপাল হইয়া প্রচ্ছন্নশকটরূপ শকটাসুরভাবপ্রাপ্ত অপর এক গোপিনীকে পদপ্রহার করিতে লাগিল; আবার এক গোপিনী অন্য এক গোপিনীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কালীয়দমনের লীলা দেখাইতে লাগিল; পুনরায় কেহ আপন উত্তরীয় বস্ত্র অঙ্গুলি দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া গোবর্দ্ধন ধারণরূপ লীলা করিতে লাগিল ইত্যাদি *"। এই সমস্তই তন্ময়াসক্তির ভাব। এইরূপে হাস্যাদি সপ্তগৌণ আসক্তি সমূহ এবং দাস্য আদি মুখ্য সপ্ত আসক্তি সকলের দ্বারা

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥
কস্যাশ্চিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎস্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্॥
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রিং কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ॥
মা ভৈষ্ট বর্ষবাতাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্তৈ্বকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্॥
আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছজাতোঽহং খলানাং নন্ নু দণ্ডধৃক্॥

ইত্যাদি।

রাগাত্মিকা ভক্তির সাধক ভগবানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

রসভাবে নিমগ্ন হইলে ভক্ত সাধকের কিরূপ অবস্থা হয় ?—

ভাবে নিমগ্ন হওয়ায় সাধক রস স্বরূপ হইয়া যান। ১৮।

ভগবদ্ ভাব সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ভক্ত রসরূপ হইয়া যান। সকল প্রকার রসই আনন্দময়। এইজন্য আনন্দময় ভগবানের চরণকমলে চিত্ত একাগ্র করিয়া ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয়রূপা ত্রিপুটীর অবলম্বন দ্বারা ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ ত্রিপুটীর নাশ হইয়া অন্তিমে ভগবানের সহিত ভেদ-বুদ্ধি থাকেনা। এবং অবশেষে সবিকল্প সমাধির উদয় হইলে ধ্যাতা সাধক ধ্যেয় আনন্দময় ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, "ভগ-বানের উপাসক সাধক ভগবচ্চরণে লীন ও ভগবানের স্বরূপ হইয়া যান *"। এইরূপে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "তৈলপায়ীকীট যেমন ভ্রমরকীটের চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরকীট হইয়া যায়, সেইরূপ ভক্ত সাধক ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ভগবৎরূপ হইয়া যান †" ॥ ১৮ ॥

---

(১৮) রসরূপ এবায়ং ভবতি ভাবনিমজ্জনাৎ। ১৮।

তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।

কীটকো ভ্রমরধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥

দাস্য আদি মুখ্যভাব সকলের বিশেষত্ব নির্ণয় করা হইতেছে—

সকল প্রকার রসের দ্বারা উন্নতি হয়; কিন্তু পরাভক্তি লাভ মুখ্য রসের দ্বারাই হইয়া থাকে। ১৯।

হাস্য আদি গৌণরসই হউক অথবা দাস্য আদি মুখ্য রসই হউক সকল প্রকার রসের দ্বারাই সাধক উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ভগবানের পরমপদ আনন্দরূপ আর সর্ব্বপ্রকার রসের মধ্যেই স্বাভাবিকরূপে আনন্দসত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকারের রসের দ্বারাই সাধক অবশ্য উন্নতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুই প্রকার রসের মধ্যে ভেদ এই যে, হাস্য আদি গৌণ রসের সহিত বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ থাকায় গৌণরস সর্ব্বথা নির্ম্মল হইতে পারেনা। অতএব তৎসমুদয়ের দ্বারা উন্নতি হইলেও পরাভক্তি লাভ হয়না। কিন্তু দাস্যাদি মুখ্য রস সমূহে বহির্বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের লেশ মাত্র না থাকায় তৎসকলের দ্বারা ভক্ত সাক্ষাৎরূপে পরাভক্তির লাভ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন রাজা আপন

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো,
ধ্যায়ন্ যথালিহ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া॥

(১৯) পরা মুখ্যরসসন্নিকর্ষাদুন্নতা তু সর্ব্বরসাশ্রয়া। ১৯।

রাজ্যোদ্ধারের জন্য বীরতা প্রকাশ করেন, তবে ঐ ভাব বীর-রসের হইলেও উহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় উহা সর্ব্বথা নির্ম্মল হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ বীর ভাবের প্রয়োগ নিষ্কাম ভাবে করা যায়, তখন মলিনতার সম্বন্ধ না থাকায় উহা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব গৌণরসের দ্বারা যদি কদাচিৎ পরাভক্তি লাভের বিষয়ে উপকার হয়, তবে ঐ উপকার পরম্পরা রূপেই হইবে। কিন্তু সপ্ত মুখ্য রস নির্ম্মল ও একমাত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত হওয়ায় তৎসমুদায়ের দ্বারা ভক্তের সাক্ষাৎরূপে পরাভক্তির প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

রসভাবের দ্বারা পরাভক্তির লাভ কিরূপে হইতে পারে ?—

অদ্বৈত ভাবপ্রদ তন্ময়াসক্তিরূপ ভাবসাগরে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা পরাভক্তির উদয় হয়। ২০ ।

ভক্ত যখন ভগবানে তন্ময় হইয়া ভাবসমুদ্রে উন্মজ্জন নিমজ্জন করেন তখনই অদ্বৈতভাবপ্রদ ঐরূপ তন্ময়তা দ্বারা ভক্তের পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পবিত্র—নির্ম্মল রস সমূহের ধারণা দৃঢ় হইয়া যাওয়ায় সাধক ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ সমাধিভূমি প্রাপ্ত হন। তদনন্তর ঐ ভাবসমুদ্রে অবগাহন করিতে করিতে ভাবুক ভক্ত শীঘ্রই সবিকল্প সমাধির বিতর্ক, বিচার আনন্দ এবং অস্মিতা নামক চার অবস্থা অতিক্রম করিয়া

(২০) পরালাভো ব্রহ্মসদ্ভাবিকাত্তন্ময়াসক্ত্যুন্মজ্জননিমজ্জনাৎ। (২০)

নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই স্থানে আসিয়াই জ্ঞানের এবং ভক্তির একই ভূমি হইয়া যায় এবং পরাভক্তি প্রাপ্ত কৃতকৃত্য যোগী সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতে থাকেন। ইহাই অদ্বৈতভাবাত্মিকা, পরমানন্দদায়িনী পরা-ভক্তি। এই পরাভক্তিগত পরমানন্দের বিষয়ে স্মৃতি সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ভগবানের অপূর্ব্বভাবে তন্ময় হইয়া যখন ভক্ত নিখিল চরাচর বিশ্বে 'আমি' ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের সত্তা দেখিতে পান না, তখনই তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ সময় 'তাঁহাতে' ও 'আমাতে' কোন ভেদ থাকে না এবং সর্ব্ব আনন্দময় ভগবানের দর্শন হওয়ায় ভক্ত আনন্দস্বরূপই প্রাপ্ত হইয়া যান। তখন তাঁহার সমস্ত প্রাকৃতিক বন্ধন ও জীবভাব বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলীন হইয়া যান। ঐ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয়, হেয় বা উপাদেয়, দৃশ্য বা দ্রষ্ট্রাদি কিছুই ভেদভাব থাকে না; তিনি যথার্থ শুদ্ধ আনন্দরূপ হইয়া অবিদ্যার আবরণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই পরাভক্তির পরাকাষ্ঠা, বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, এবং জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা" * ॥ ২০ ॥

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দ্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা,
ভক্তিপ্রয়োগেন সমেত্যধোক্ষজম্ ॥
অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ,

রস প্রবাহের অন্তিমগতি কোথায় ?—
সকল রসেরই পরিসমাপ্তি এক স্থানেই

শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্।
তদ্ব্রহ্ম নির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥
তং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত-
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥
মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং,
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা,
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ,
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ব্রহ্মদর্শনম॥
যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ।
ন বিগৃহ্ণাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত॥
স তদৈবাত্মনাত্মনং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে॥
জ্ঞানমাত্রং পরংব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

হয়।২১।

রস সমূহের প্রবাহে যদি কোনরূপ বাধা না হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার রসই সেই পরমপদে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুকূল হইলে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গও যেমন সমস্ত গ্রাম, নগর ও সংসারকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভগবান রসস্বরূপ হওয়ায় সামান্য হইতেও সামান্যতর যে কোন রস হউকনা কেন, যদি বিকাশকার্য্যে তাহার কোন বাধা না হয়, তাহা হইলে সেই রসই সমুন্নত হইতে হইতে ভক্তের চিত্তে ভগবানের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন করত তাঁহাকে (ভক্তকে) ভক্তির উন্নতোন্নত ভূমিতে গতি ও স্থিতি লাভ করিবার সামর্থ্য প্রদান করে

পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্‌যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাংনিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥
ময়ি প্রেমাকুলবতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষা কণ্ঠগদ্‌গদনিস্বনঃ॥
উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতঃ॥
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরাভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাং দেবাতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে॥
ইত্থংজাতা পরাভক্তির্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ॥
ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥

(২১) সর্ব্বেষামেকত্রৈব পর্য্যবসানম্। (২১)

এবং অবশেষে সেই পরমানন্দপদরূপ মুক্তিপদ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। তরল-তরঙ্গিণী পতিত-পাবনী জাহ্নবী যেমন ভিন্ন ভিন্ন জনপদে প্রবাহিত হইয়া আপন অমৃতময় পবিত্র প্রবাহ দ্বারা তত্তৎদেশ সকল পবিত্র করত মহাসমুদ্রে যাইয়া বিলীন হন, সেইরূপ ভগবদ্ভাবমূলক সমস্ত রসের প্রবাহ ভক্ত-হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবাহিত হইতে হইতে আপন অমৃত-ময় ভাব সমূহদ্বারা ভক্তের হৃদয়কে পবিত্র ও উন্নত করত অন্তিমে ব্রহ্মানন্দ সাগরে যাইয়া বিলীন হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

উক্ত রসপ্রবাহ ভগবানের প্রতি প্রবর্ত্তিত হইলে কি ফল হয়?—

তাঁহার (ভগবানের) প্রতি যে ভক্তি, তাহাই নিঃশ্রেয়সকরী। ২২।

রসময় পরমাত্মার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেই ভক্ত মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এবং তপোদানাদি ধর্ম্মাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকের অভ্যুদয় ও অন্তিমে নির্ব্বাণ লাভ হয়। পরন্তু ভগবদ্ ভক্তিদ্বারা ভক্তগণ পরমানন্দময় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতম মহিমা। এইরূপে স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে যে "যাঁহারা ভগবানকেই সর্ব্বব্যাপীরূপে জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য অপদেবতার উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানের প্রতিই অনন্য ভক্তি ও আসক্তি যুক্ত হন, ভগবান তাঁহাদিগকে অভ্যুদয় প্রদান এবং পরিশেষে আবাগমন-

(২২) তদ্ভক্তির্নিঃশ্রেয়সকরী।

মগ্ন সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যিনি একমাত্র ভগবানের চরণকমলই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহ'কে কোন-রূপেই বিপদাপন্ন হইতে হয় না। এমন কি তিনি ভগবচ্চরণার-বিন্দরূপ ভেলার উপর নির্ভর করিয়া দুস্পার ভব-পারাবার অক্লেশে গোস্পদের ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন। শ্রীভগবান অচ্যুতের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত সংসারের বিষয়-সুখে বিরক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করত অনন্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মাতে যেই সকল ভক্তের চিত্ত একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় রজোগুণ ও তমোগুণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। তদনন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা সত্ত্বগুণেরও বিলয় হইলে পর তিনি পরমানন্দময় নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া থাকেন" * এইরূপেই ভগদ্ভক্তি দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেব বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥
সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবম্
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদম্
পদং পদং তদ্বিপদাং ন যেষাম্ ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥
যস্মিন্মনো লব্ধপদং যদেতৎ

এতদ্ব্যতীত ভগবদ্ বিভূতি সমূহের প্রতিই বা ভক্তিরস প্রবাহ হইলে কিরূপ ফল হইবে ?—

ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণের প্রতি যে ভক্তি, তাহা অভ্যুদয়কারিণী। ২৩।

ভগবানের সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপ নিত্য ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তি দ্বারা উন্নতি হয়। সাধারণতঃ উন্নতি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যথা:—ইহলৌলিকক উন্নতি এবং পারলৌকিক উন্নতি। সংসারে ধন, জন ও সুখ সম্পত্তি আদি প্রাপ্ত হওয়াকে ইহলৌকিক উন্নতি, আর স্বর্গাদি উন্নত লোকে গমন পূর্ব্বক দিব্যসুখ লাভ করাকে পারলৌকিক উন্নতি বলা হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার উন্নতিই ঋষি, দেব ও পিতৃগণের প্রতি ভক্তি করিলে তাঁহাদেরই কৃপাবলে লাভ হইতে পারে। শ্রীগীতোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, "দেবযজ্ঞকারিগণ দেবলোকে এবং পিতৃযজ্ঞকারিগণ পিতৃলোকে গমন করেন। সাধারণতঃ সাধকগণ প্রায়শঃ সকাম ভাবেই সকাম কর্ম্মসম্বন্ধীয় সিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাদির পূজা উপাসনাদি করিয়া থাকেন এবং ইহা দ্বারা সকাম সাধকগণ ইহলোকে সুখ এবং মৃত্যুর

শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।

সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ

বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্॥

(২৩) ঋষিদেবপিতৄণাং ভক্তিরভ্যুদয়প্রদা।

পর স্বর্গাদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেননা মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি অতি সত্বরই হইয়া থাকে" * এইরূপে শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, "যাঁহারা দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে দীপ্তিমতী আহুতিগণ মধুর বচনে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দিব্যলোকে লইয়া যাইয়া থাকেন" † ॥ ২৩ ॥

নিকৃষ্ট বিভূতি-সমূহের প্রতি রস প্রবাহের কিরূপ ফল হয়?—

এতদন্যতর বিভুতি সকলের প্রতি যে ভক্তি, তাহা নিকৃষ্ট ॥ ২৪ ॥

ভূত, প্রেত, পিশাচ আদিতে যে ভক্তি, তাহা পূর্ব্বোক্ত ভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এবং রুচির

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ"
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

† এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥
এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥

(২৪) অন্যেষা নবরা।

বিভিন্নতাই এইরূপ নিকৃষ্ট বিভূতি সকলের প্রতি ভক্তিভাব উদয়ের কারণ। উন্নত অধিকারী মানব নিষ্কাম ভাবে কেবল ভগবানের প্রতিই অনন্য ভক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহাতেই তাঁহারা মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মধ্যম অধিকারিগণ সকাম কর্ম্মপরায়ণ হইয়া অভ্যুদয়ের আশায় ঋষি দেবতা ও পিতৃগণের উপাসনা করেন ;—ইহাতে তাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার অধীকারই প্রশস্ত, কিন্তু অধম অধিকারী মনুষ্য স্বার্থান্ধ ও বিষয় লোলুপ হইয়া মলিন কামনা পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র বিভূতি স্বরূপ ভূত, প্রেত আদির উপাসনা করে এবং তদনুসারে তাহারা সেইরূপ ফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ নিকৃষ্ট ভক্তি ও তদনুযায়ী ফল লাভ যথার্থ ধার্ম্মিক পুরুষের নিকট সর্ব্বদা নিন্দনীয় ॥ ২৪ ॥

ভক্তির দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় ;—যাহার আস্বাদ পাইলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। ২৫।

ভক্তিদ্বারা ভক্তগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তৎপর তাঁহারা তাঁহাদের আপন আপন উন্নতপদ হইতে চ্যুত হন্ না। সাধারণ অমৃত পান দ্বারাই যখন দেবতাগণ অমরত্ব লাভ করেন, তখন পরম অমৃতরূপ ভগবদ্ভক্তির আস্বাদন করিয়া সাধক অমর হইয়া যাইবেন, ইহাতে আর

(২৫) ভক্ত্যামৃতত্বং তদাস্বাদাদনবপাতঃ

সন্দেহ কি ? রসস্বরূপ ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ভক্ত তাঁহারই চরণকমলে লীন হইয়া সকল প্রকার বিষয় বাসনা ত্যাগ করায় করুণানিধান ভগবান ঐ ভক্তের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে (ভক্তকে) আপন সচ্চিদানন্দময় পরম স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন—যাহাতে তাঁহার (ভক্তের) জন্ম-মরণ রূপ সংসার যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহাই সাধক ভক্তের অমরতা। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, "ভক্তির দ্বারাই ভক্তগণ আমাকে যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং এইরূপে আমার যথার্থতঃ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া অমৃতময় পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" *। তরঙ্গ-মালা-সমাকুল অতল জলধিবক্ষে গমনশীল তরণীর চালক নাবিকগণ ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে যেমন কখনও দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া অনায়াসে সত্বর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন, সেই-

---

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতি পরমংপদম্॥

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্ত
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রানি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥
তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।

রূপ সংসার সাগরে কোটি কোটি জন্ম হইতে ভ্রমণশীল জীবনতরণীর পরিচালক ভক্তগণ আপন আপন হৃদয়আকাশে প্রকাশমান ধ্রুবতারারূপ (ভগবানের প্রতি) ভগবদ্‌ভক্তিরস লাভ করিতে পারিলে কদাপি সংসার সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া কুপথে গমন করত অবনতি প্রাপ্ত হন না, অধিকন্তু উত্তরোত্তর উন্নত হইতে হইতে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের পরম পবিত্রধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, "শ্রীভগবানের মধুর গুণকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তের চিত্তগত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, যাহাতে ঐ ভক্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় এবং শোকআদি রহিত হইয়া নিশিদিন সেই পরম অমৃতপানে মত্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

ভক্তির অপর মহিমা বর্ণন করা হইতেছে—

ভক্তিতে কোনরূপ কামনা নাই, কেননা উহা নিরোধস্বরূপা ॥ ২৬ ॥

ভক্তিযোগ সাধনের মধ্যে কামনারূপ দোষ থাকিতে

তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপগাঢ়কর্ণৈ
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্‌ভয়শোকমোহাঃ ॥
ভক্তিংমুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতা মমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসো ল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ কথামৃতপানমত্তঃ ॥

(২৬) অকাম্যা সা নিরোধরূপত্বাৎ।

পারে না। কারণ ভক্তি নিরোধ স্বরূপিণী। যে কামনা দ্বারা সমস্ত কামনা নিবৃত্ত ও সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাদৃশ কামনাকে কামনাই বলা যাইতে পারে না। অতএব ভক্তিযোগ সাধনের যে মুক্তি কামনা, সে কামনা কামনাই নহে। সৃষ্টির কারণ স্বরূপ বিষয় কামনা ঐ রূপ নহে; কেননা উহাদ্বারা ক্রমশঃ কামনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও এইরূপেই লিখিত হইয়াছে যে, "কামোপভোগের দ্বারা কাম উপশমিত হয় না, অধিকন্তু ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় পুনঃ পুনঃ দ্বিগুণতর রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে" *। কামনাপরায়ণ জীব কাল্পনিক আপাতমধুরতাময় বিষয়সুখে আসক্ত হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিবিধ বিষয়ে সুখ ও শান্তির অন্বেষণ করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি পরিণামিনী হওয়ায় যাবতীয় বৈষয়িক সুখ আপাত মধুর কিন্তু পরিণাম দুঃখপ্রদ ক্ষণভঙ্গুর এবং নশ্বর। সুতরাং অনবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দ প্রয়াসী জীবের অনিত্য বিষয়ে সুখ লাভ হইতে পারে না। চিত্তের শান্তিই একমাত্র সুখের কারণ। স্মৃতিতেও এইরূপেই কথিত হইয়াছে যে, "বায়ুরহিত স্থানে প্রদীপ যেমন নিশ্চল, নিষ্কম্প ও স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকে অথবা সুষুপ্তিদশায় চিত্ত যেমন স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সেই রূপেই যখন চিত্ত শান্ত হয়, তখনই জীবের সুখ

---

* ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥